আত্মদীপ

আন্তর্জাতিক দ্বিমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা

পর্ব-১, সংখ্যা-৫, মে ২০২৫

সম্পাদক:

ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

সহ-সম্পাদক:

আজিজুল সেখ

UTTAR SURI

Inheriting the spirit, inspiring the future

প্রকাশক:

উত্তরসূরি, শ্রীভূমি, আসাম

ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-V, May, 2025

Published by:
Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: https://www.atmadeep.in/
Article Submission Link: https://www.uttarsuri.com/uttarsuri
Email: editor@atmadeep.in

Editor-in-Chief
Dr. Bishwajit Bhattacharjee

Associate Editor
Azizul Sekh

Type Setting:
Amrika Das Purkayastha
Soumili Dhar

Printed at:
Scholar Publications
Sribhumi, Assam, India, 788710

Cover Page:
Kajal Ganguli

Price: Rs. 600.00

© Uttarsuri

The views and contents of this Journal are solely of the authors. This Journal is being sold on the condition and understanding that its contents are merely for information and reference and that neither the author nor the publishers, Printers or Sellers of this Journal are engaged in rendering legal, accounting or other professional service.
The publishers believe that the contents of this Journal do not violate any existing copyright/intellectual property of others in any manner whatsoever. However, in the event the author has been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.
Atmadeep, is a Bi-monthly electronic & Print journal of open Access Category. The Readers do not need to pay/register themselves to read and download the articles in the journal. However, it is only for scholarly/academic purpose that is non-commercial. Users while using excerpts from Atmadeep, must cite the author, content and the journal by including the link of the content. Individuals/ Companies/ Organizations intending to use contents from Atmadeep, for commercial purpose must contact the Editor-in-Chief.

Editorial Board

Advisor

Dr. Tapadhir Bhattacharjee
Former Vice-Chancellor, Assam University, Silchar, Assam
President, Uttarsuri, Karimganj, Assam
Mo: +919435566494

Dr. Nirmal Kumar Sarkar
Former Associate Professor, Karimganj College, Karimganj, Assam
Vice-President, Uttarsuri, Karimganj, Assam
Mo: +919435375599

Editor-in-Chief

Dr. Bishwajit Bhattacharjee
Asst. Professor, Karimganj College
Karimganj, Assam, 788710
Mo: +919435750458, +917002548380
Email: bishwajit@karimganjcollege.ac.in

Associate Editor

Azizul Sekh
Research Scholar, Dept. of Bengali, Tripura University, Tripura
Mo: +919126261414
Email: azizul.bengali@tripurauniv.ac.in

Editorial Board Member:

Dr. Debasish Bhattacharjee
Professor & Head, Dept. of Bengali
Assam University, Silchar
Email: debashish.bhattacharya@aus.ac.in

Dr. Rupasree Debnath
Assistant Professor, Department of Bengali
Gauhati University, Assam, India
Email: rupasree@gauhati.ac.in

Dr. Malay Deb
Assistant Professor, Dept. of Bengali
Tripura University, Tripura, India
Email: malaydeb@tripurauniv.ac.in

Dr. Madhumita Sengupta
Asst. Professor, Dept. of Bengali
Arya Vidyapeeth College, Guwahati, Assam, India
Email: madhumita.sengupta@avcollege.ac.in

Dr. Debjani Bhowmick (Chakraborty)
Associate Professor, Dept. of Bengali,
Sripat Singh College, Murshidabad, West Bengal, India
Email: dbhowmick@sripatsinghcollege.edu.in

Romana Papri
Lecturer, Department of Pali and Buddhist Studies
University of Dhaka, Bangladesh
Email: romanapapri@du.ac.bd

Dr. Rajarshi Chakrabarty
Assistant Professor, Dept. of History
University of Burdwan, West Bengal, India
Email: rchakrabarty@hist.buruniv.ac.in

Dr. Mumit Al Rashid
Associate Professor and chairman
Department of Persian Language and Literature
University of Dhaka, Bangladesh
Email: mumitarashid@du.ac.bd

Dr. Barnali Bhowmick Ghosh
Associate Professor and HOD
Department of Bengali
Bir Bikram Memorial College, Agartala, Tripura

প্রথম পর্ব, প্রথম সংখ্যায় যাদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে

১। **সেলিম মুস্তাফার কবিতায় কবি সত্তার বাঁক বদল ও হাংরি প্রভাব**
শান্তনু ভট্টাচার্য, ৮-২০
২। **বাংলা কবিতায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিভাবনার স্বতন্ত্রতা: বিষয়ে ও আঙ্গিকে**
দেবপ্রসাদ গোস্বামী, ২১-৩৬
৩। **হাইডেগারের দর্শনে Dasein: একটি সমীক্ষা**
আসলাম মল্লিক, ৩৭-৪৭
৪। **শোষণে এবং বৈষম্যে চা-বাগানের নারী: নির্বাচিত গল্পের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা**
আজিজুল সেখ, ৪৮-৫৮
৫। **অনুরূপা বিশ্বাসের 'নানা রঙের দিন': অব্যক্ত ইতিহাসের গ্রন্থিমালা**
ড. মধুমিতা সেনগুপ্ত, ৫৯-৭২
৬। **দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার দর্পণে ১৯৪২-৪৩ সালের কাঁথির দুর্ভিক্ষ**
মৌসুমী খাতুন, ৭৩-৮৪
৭। **ভাষাচার্য সুনীতিকুমার: একটি আলোকিত জীবন**
ড. দেবযানী ভৌমিক (চক্রবর্তী), ৮৫-৯৩
৮। **মল্লিকা সেনগুপ্তের সীতায়ন: নারী ভাবনার নবতর ভাষ্য**
ড. অরূপা চক্রবর্তী ৯৪-১০১
৯। **কোশলরাজ প্রসেনজিত ও বৌদ্ধধর্ম**
রোমানা পাপড়ি ও শিরীন আক্তার, ১০২-১১৫
১০। **দেবেশ রায়ের 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' উপন্যাসের চ্যারকেটু চরিত্র: নিম্নবর্গীয় চরিত্রের আধারে একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন**
জানকী প্রসাদ দেবনাথ, ১১৬-১২৯
১১। **প্রকৃতি সচেতনতা ও পরিবেশ ভাবনা: আসামের ছোটগল্পে**
নয়ন দে, ১৩০-১৪৪
১২। **অমিতাভ দেব চৌধুরীর গল্পে দেশভাগোত্তর সাম্প্রদায়িকতা**
প্রিয়াংকা ধর ও ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, ১৪৫-১৫৯
১৩। **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প ভুবন: প্রতিবাদ ও নির্বাসিতের প্রতিবেদন**
অমিত দেব, ১৬০-১৭২
১৪। **মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত ছোটগল্পের আলোকে নিম্নবর্গ তথা অন্ত্যজ আদিবাসীদের বয়ান**
অনুরাধা দাস, ১৭৩-১৮৮

প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় সংখ্যা: সূচিপত্র

১। **ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থের সত্যাসত্যতা অনুসন্ধান**
অঙ্কুর দেববর্মা, ১৮৯-২০২

২। **রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আদলে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা'**
ড. দেবযানী ভট্টাচার্য্য, ২০৩-২২১

৩। **'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' এর শকুন্তলা ও 'বীরাঙ্গনা'র শকুন্তলার তুলনাত্মক পর্যালোচনা**
জয়দেব পাল, ২২২-২৩৫

৪। **ভাষা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলা ভাষা**
মো: রিপন মিয়া, ২৩৬-২৫৪

৫। **জহির রায়হানের গল্প: রাজনৈতিক চেতনার বিপ্রতীপে নিম্ন-মধ্যবিত্তের বিবর্ণ দিনলিপি**
ড. প্রতাপ ব্যাপারী, ২৫৫-২৭৫

৬। **বাণী বসুর অন্তর্ঘাত: 'ময়না তদন্তের হ্যাজাক আলোকে'**
ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী, ২৭৬-২৯৩

৭। **কাকদ্বীপের ভাষা**
রিক্তা সরদার, ২৯৪-৩০৫

৮। **সংখ্যার উদ্ভব ও সংখ্যা পদ্ধতির বিবর্তন**
মো. তাহমিদ রহমান, ৩০৬-৩২৮

৯। **কাজী নজরুল ইসলামের 'বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি' : প্রেম ও প্রকৃতি চেতনার সমন্বয়**
তাপস মণ্ডল, ৩২৯-৩৩৯

১০। **হুমায়ূন আহমেদের 'মিসির আলি! আপনি কোথায়?' উপন্যাসের মনঃসমীক্ষণাত্মক সমালোচনা**
ড. প্রসেনজিৎ দাস, ৩৪০-৩৫১

১১। **কথাসাহিত্যিক আবুল বাশারের নির্বাচিত ছোটগল্পে রাজনীতি: একটি পর্যালোচনা**
মাসুদ আলী দেওয়ান, ৩৫২-৩৬৯

১২। **অশরীরী চিন্তা-চেতনায় শীর্ষেন্দুর কিশোর উপন্যাস: ভূত ও মানুষের পারস্পারিকতায় এক স্বতন্ত্র মাত্রা**
নমিতা হালদার, ৩৭০-৩৮১

১৩। **ঔপনিবেশিক আমলে মুর্শিদাবাদ জেলার জনস্বাস্থ্য বিষয়ক একটি পর্যালোচনা**
মেহেবুব হোসেন, ৩৮২-৩৯৯

১৪। **বেলা বসুর 'স্মৃতিপট': নারীশিক্ষা ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং সমকাল**
পর্ণা মণ্ডল, ৪০০-৪১২

১৫। **দিনাজপুরের গ্রামীণ সমাজে মনোহলী জমিদারির সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা**
সুরাট সরকার ও কামানুজ্জামান, ৪১৩-৪২৪

১৬। **বাউল মতাদর্শ: উৎস, বিকাশ ও সাধক-শিল্পীদের অবদান**
নিরঞ্জন মণ্ডল, ৪২৫-৪৩৬

১৭। **ভারতবর্ষের নাট্য-ঐতিহ্যে থার্ড থিয়েটার**
প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী, ৪৩৭-৪৪৪

১৮। **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে আখ্যানের বিনির্মাণ**
ড. সেখ মোফাজ্জাল হোসেন, ৪৪৫-৪৫৫

প্রথম পর্ব, তৃতীয় সংখ্যা: সূচিপত্র

আমন্ত্রিত পাঠ

১। **তলস্তয়ের গল্প**
মানস মজুমদার, ৪৫৯-৪৬৬

২। **বহির্বঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে-পার্বত্য ত্রিপুরা**
ড. খেলন দাস হালদার, ৪৬৭-৪৭৪

ভাষা ভাবনা

৩। **বাংলা ভাষার আলোকে কুড়মালি ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: এক ভাষাবৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন**
মৌসুমী মাহাত, ৪৭৫-৪৮৭

৪। **বাংলা 'লোকভাষা'-র নানা প্রসঙ্গ: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা**
অদিতি দাস, ৪৮৮-৪৯৭

কবি সমন্বয়

৫। **আধুনিক ভাষ্যে প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় সাহিত্য: কবি বিষ্ণু দে-র কাব্য সমগ্র**
ড. অসিত বিশ্বাস, ৪৯৮-৫০৮

৬। **'একা এবং কয়েকজন': তরুণ কবির নিজস্ব কণ্ঠস্বর**
ড. শেখ নজরুল ইসলাম, ৫০৯-৫২২

চেতনায় স্বামীজী

৭। **সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় প্রেষণার ভূমিকা: স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার আলোকে একটি পর্যালোচনা**
অনন্যা সরকার, ৫২৩-৫৩১

৮। **স্বামী বিবেকানন্দের সংগীত প্রজ্ঞা**
মো. আফতাব উদ্দিন ৫৩২-৫৩৮

লোকসংস্কৃতি

৯। **বাংলার পীরসংস্কৃতি ও পীরসাহিত্য: একটি নিরীক্ষা**
ড. সুদীপ্ত চৌধুরী, ৫৩৯-৫৪৭

নাট্যালোচনা

১০। **আধুনিক সংস্কৃত নাটকে অন্ত্যজ জীবন**
এস কে মইনুদ্দিন, ৫৪৮-৫৫৫

১১। **অভিনয় জীবনের উত্থান পতনের আলেখ্য 'নানা রঙের দিন'**
রাজেশ সরকার, ৫৫৬-৫৬২

১২। **বাস্তবের দর্পণে বীরভূমের গণনাট্য সংগঠন (১৯৬৯ - ২০২০): উত্থান ও পরিণতি**
ড. অঙ্কুশ দাস, ৫৬৩-৫৭৫

১৩। **বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক**
সুমনা বিশ্বাস, ৫৭৬-৫৮৩

কথাসাহিত্য

১৪। **মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত গল্পে ভাতের অভাব একটি বিশ্লেষণী পাঠ**
রাজু লায়েক, ৫৮৪-৫৯১

১৫। **যে স্মৃতি নহে হারাবার: বিভূতিভূষণের 'স্মৃতির রেখা'**
ড. অনুপম নস্কর, ৫৯২-৬০০

১৬। **বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের আলোকে তৎকালীন বাঙালি সমাজচিত্র**
বকুল সাহা, ৬০১-৬০৯

১৭। **বিশ শতকে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি: প্রসঙ্গ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্প**
রাকেশ চন্দ্র সরকার, ৬১০-৬১৫

১৮। **জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্পে চিত্রভাবনা**
আদেশ লেট, ৬১৬-৬২৩

১৯। **সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্প: আটপৌরে লৌকিক জীবনের ইতিবৃত্ত**
বাবলী বর্মন, ৬২৪-৬৩২

২০। **শচীন দাশের গল্প: সুন্দরবনের বাঘ-বিধবা মহিলাদের জীবন সংগ্রাম**
সমরেশ বাগ, ৬৩৩-৬৪০

২১। **অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্পে প্রান্তজনের জীবনচর্যা**
সীমা সূত্রধর, ৬৪১-৬৪৮

২২। **অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে সংস্থান**
উর্বী মুখোপাধ্যায়, ৬৪৯-৬৫৯

২৩। **স্যাফো সই-কথা ও কয়েকটি বাংলা উপন্যাস**
ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী, ৬৬০-৬৬৯

২৪। **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস: বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের আত্ম-সংকট ও আত্ম-অন্বীক্ষা**
শুভঙ্কর দাস, ৬৭০-৬৮২

২৫। **মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য ধারায় অন্ত্যজ নারী ও আদিবাসী জীবন জিজ্ঞাসা**
বিকাশ মন্ডল, ৬৮৩-৬৯২

২৬। **রাভা জনগোষ্ঠীর পরিচয় এবং 'সৌদাল' ও 'বিনদনি' উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে বাস্তব চিত্র**
ধনেশ্বর বর্মন, ৬৯৩-৬৯৯

২৭। **আধুনিক নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের বহুমাত্রিক সংকট: প্রসঙ্গ 'বিষবৃক্ষ', 'ঘরে বাইরে' ও 'গৃহদাহ' উপন্যাস**
ড. বাপি চন্দ্র দাস, ৭০০-৭০৭

২৮। **লোকসংস্কৃতির আলোকে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস: একটি বিশ্লেষণ**
ড. আনন্দ ঘোষ, ৭০৮-৭১৪

২৯। **বাংলা সাহিত্যে দলিত ও শরৎচন্দ্র**
কিরণ মন্ডল, ৭১৫-৭২৪

৩০। **সমরেশ বসুর 'বিবর': নৈতিক সংকট, পাপবোধ ও আত্মদ্বন্দ্বের গল্প**
মৌমিতা হালদার, ৭২৫-৭৩৬

৩১। **রহু চণ্ডালের (হার-না-মানা) হাড়: মানব-জমিনের সন্ধানে**
শ্রীচরণ দাস বিশ্বাস, ৭৩৭-৭৪৪

৩২। **হুমায়ূন আহমেদের ময়ূরাক্ষী: একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন**
ড. প্রসেনজিৎ দাস, ৭৪৫-৭৫২

৩৩। **নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্পে কর্ণ-কুন্তী কথার বিবর্তন**
সঞ্চারী হালদার, ৭৫৩-৭৬১

৩৪। **বাস্তুআধ্যাত্মিকতার প্রেক্ষাপটে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'**
ড. শেখ ইমরান পারভেজ, ৭৬২-৭৭১

দার্শনিক আলোচনা

৩৫। **বোধিসত্ত্বভূমি গ্রন্থনিষ্ঠ দানের ধারণা: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা**
প্রিয়াঙ্কা দত্ত, ৭৭২-৭৭৮

৩৬। **অনুমানের প্রকার প্রসঙ্গে প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িক মত: একটি আলোচনা**
সুফল দাস, ৭৭৯-৭৮৫

৩৭। **মহর্ষি পতঞ্জল ও শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে 'যোগ': একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা**
রাজকুমার পণ্ডিত, ৭৮৬-৭৯৬

৩৮। **সাংখ্যমতে জগতের ক্রমাভিব্যক্তিবাদ বা উৎপত্তিবাদ: একটি সমীক্ষা**
রাজিবুল খান, ৭৯৭-৮০৪

৩৯। **বিবরণপ্রস্থানে শাব্দাপরোক্ষবাদ**
সন্তু ঘোষ, ৮০৫-৮১১

বিবিধ

৪০। **মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও তৎকালীন কোচবিহারের সাহিত্যচর্চা**
কালিপদ বসুনিয়া, ৮১২-৮১৮

৪১। **শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চায় ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরীকারা**
দেবরূপা সেন, ৮১৯-৮২৬

৪২। **সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথায় কলুটোলা-সেনবাড়ির অন্তঃপুরচিত্র**
সৌমী বসু, ৮২৭-৮৪২

৪৩। **ভিটগেনস্টাইনের চিত্রতত্ত্ব: একটি পর্যালোচনা**
ইন্দ্রজ্যোতি কর্মকার, ৮৪৩-৮৫০

৪৪। **বাঙালির হিমালয়-প্রবজ্যা: ভারতাত্মার সন্ধান (নির্বাচিত ভ্রমণকাহিনি অবলম্বনে)**
সুস্মিতা দে, ৮৫১-৮৫৮

৪৫। **শ্রী শ্রী সারদা মায়ের ব্যবহারিক বেদান্ত: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা**
ড. অমিত কুমার বটব্যাল, ৮৫৯-৮৬৫

প্রথম পর্ব, চতুর্থ সংখ্যা, সূচিপত্র

কথাসাহিত্য

১। **রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ : একটি সমীক্ষা**
অঞ্জন পাল, ৮৬৭-৮৭৩

২। **কল্যাণী ভট্টাচার্যের উপন্যাসে নারী পরিসর: একটি বিশ্লেষণাত্মক পাঠ**
রুমি দেব, ৮৭৪-৮৮১

৩। **নারী-পুরুষের দাম্পত্য রসায়ন: কণা বসু মিশ্রের নির্বাচিত উপন্যাস**
ইপ্সিতা দেব, ৮৮২-৮৮৭

৪। **বনফলু: এক প্রেমানুভবী শিল্পী সত্ত্বা**
দেবশ্রী পাণ্ড রায়, ৮৮৮-৮৯৫

৫। **বিনতা রায়চৌধুরী-র গল্পে সামাজিক সংকট ও তার উত্তরণ**
অপূর্ব রায়, ৮৯৬-৯০২

৬। **সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্প: সমাজ ও জীবন-ভাবনা**
মো: আবু বাকার সিদ্দীক, ৯০৩-৯১৫

৭। **তিরিশের দশক: জগদীশ গুপ্তের গল্পে স্বতন্ত্র নারী**
মানালী হালদার, ৯১৬-৯২২

৮। **জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' ও দেশভাগ: একটি পর্যালোচনা**
অরুনিমা রায় চৌধুরী, পার্থপ্রতিম সেন, ৯২৩-৯২৮

কাব্যালোচনা

৯। **হারাধন বৈরাগীর কাব্য ভাবনায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনুসন্ধান**
অমর্ত্য দাস, ৯২৯-৯৩৬

১০। **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা: কবির চোখে কবি**
সৌরভ মজুমদার, ৯৩৭-৯৪৩

লোকসাহিত্য

১১। **আশরাফ সিদ্দিকীর লোকসাহিত্যে প্রবাদ: দর্পণে সমাজ জীবন**
রাকেশ দেবনাথ, ৯৪৪-৯৫০

১২। **অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতিও লোকাচার**
বিশ্বজিত দেবনাথ, ৯৫১-৯৫৭

১৩। **গ্রন্থচিত্রে অনন্য: দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'ঠাকুরমার ঝুলি'**
ড. কাজল গাঙ্গুলী, ৯৫৮-৯৬৪

ভাষা

১৪। **প্রমিত বাংলার সংকট ও ঔপনিবেশিক ভাষানীতি: একটি পর্যালোচনা**
ইয়াসমিন প্রামানিক, ৯৬৫-৯৭২

দর্শন ভাবনা

১৫। **রবীন্দ্র দর্শনে মানুষের ধারণা: একটি সমীক্ষা**
রনজয় খাঁ, ৯৭৩-৯৭৮

১৬। **অদ্বৈতবেদান্তের আলোকে জগতের কারণতা উপপাদন: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা**
প্রশান্ত মাঝি, ৯৭৯-৯৮৪

১৭। **নব্য-ন্যায়ের দৃষ্টিতে পদশক্তি: একটি দার্শনিক সমীক্ষা**
সৌরভ মজুমদার, ৯৮৫-৯৯০

১৮। **প্রমাণ প্রসঙ্গে নাগার্জুন: একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা**
প্রিয়াঙ্কা মুখার্জ্জী, ৯৯১-৯৯৭

১৯। **কাল বিষয়ে জৈনমত ও কান্টের মত: একটি তুলনামূলক আলোচনা**
মনিরুল খাঁন, ৯৯৮-১০০৩

২০। **উপনিষদের আলোকে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক: একবার ফিরে দেখা**
ড. ব্রততী চক্রবর্তী, ১০০৪-১০০৯

২১। **অদ্বৈত ও দ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে মহাবাক্যার্থ বিচার**
রত্না দালাল, ১০১০-১০১৫

২২। **বেদান্ত আধুনিক হতাশাগ্রস্ত জীবনের মহৌষধ**
ড. কৃষ্ণ ধীবর, ১০১৬-১০২৬

বিবিধ

২৩। **বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বের অনুসন্ধান: একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ**
ড. মো. সিদ্দিক হোসেন, ১০২৭-১০৩২

২৪। **অষ্টম গর্ভ: পৌরাণিক উপমায় অলংকৃত সমাজ বাস্তবতার কাহিনি**
সৌরভ মুখার্জি, ১০৩৩-১০৩৯

২৫। **যাদুগোড়ার রঙ্কিনী দেবীর ইতিহাস: আদিবাসী দেবীর ব্রাহ্মণ্যবাদী নির্মাণ**
রুনা শ্যামল, ১০৪০-১০৪৫

২৬। **ভারতীয় সাহিত্যে নদীমাতৃক পুরাণ ও আধুনিক বয়ান**
ড. সমরেশ মন্ডল, ১০৪৬-১০৫১

২৭। **উনিশ শতকের কলকাতার শহুরে বাবুদের গণিকাযাপন: যৌনতার নানা রূপ**
ড. দোয়েল দে, ১০৫২-১০৫৯

২৮। **টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের পদক্ষেপ হিসাবে আদিবাসী মহিলা উন্নয়ন প্রচেষ্টা**
শুভেন্দু বোস, ১০৬০-১০৭০

২৯। **নাটোর জেলায় শিক্ষাক্ষেত্রে জমিদারদের ভূমিকা: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা**
মোঃ তৈয়বুর রহমান, ১০৭১-১০৭৯

৩০। **শামসুর রাহমান: বাতাসে বারুদ গন্ধ, বন্দি শিবির থেকে**
ড. পীযূষ পোদ্দার, ১০৮০-১০৮৫

প্রথম পর্ব, পঞ্চম সংখ্যা

সূচিপত্র

কথাসাহিত্য

১। **উপন্যাস ‘বাঁধনহারা’: নজরুলের প্রজ্বলিত আত্মদীপ**
ড. মানস জানা, ১০৮৬-১০৯১

২। **নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশুপ্রেম**
ড. কৌশিকোত্তম প্রামানিক, ১০৯২-১০৯৯

৩। **কবিতা সিংহের ছোটগল্পের আঙ্গিক ও আবহ: প্রসঙ্গ ‘পার্শ্বচরিত্র’ ও ‘খেলতে খেলতে- একদিন’**
মেঘা ভট্টাচার্য, ১১০০-১১০৬

৪। **স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাস (নির্বাচিত): প্রসঙ্গ উনিশ শতকের কৃষক জীবনচর্যা ও নীল বিদ্রোহ**
গোপাল ঘোষ, ১১০৭-১১২২

৫। **বাণী বসুর উপন্যাসে নারীচরিত্র: আত্মপ্রকাশ, সংগ্রাম ও সমাজদৃষ্টির পুনর্মূল্যায়ন**
সৌরভ মুখার্জি, ১১২৩-১১৩৩

৬। **তারাশঙ্করের গল্পে একাল-সেকাল**
অমিত মুর্মু, ১১৩৪-১১৩৯

৭। **দেবব্রত দেবের গল্প: বহুমাত্রিকতার অন্য স্বর**
সায়ন মণ্ডল, ১১৪০-১১৪৬

৮। **সমরেশ বসুর ‘আদাব’ ও কণা বসু মিশ্রের ‘দু-বাংলার মাটি’-তে দেশভাগের অভিঘাত: তুলনাত্মক অধ্যয়ন**
ইপ্সিতা দেব, ১১৪৭-১১৫২

৯। **সৌমিত্র বৈশ্যের গল্পভাঁড়ার: প্রেক্ষিত ব্যক্তি পরিসর থেকে সমাজ জীবন**
সুস্মিতা ব্যানার্জী, ১১৫৩-১১৫৮

১০। **পাঁচের দশকে বাংলা ছোটগল্পে নতুন ধারার আভাস**
ড. সুমিতা চক্রবর্তী, জিতব্রতা গুহ, ১১৫৯-১১৬৫

নাট্যভাবনা

১১। **রবীন্দ্রনাটক এবং গুপী-বাঘা ত্রয়ী**
অর্ঘ্যদীপ ব্যান্যার্জী, ১১৬৬-১১৭৮

দর্শন ভাবনা

১২। **বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মায়া ও আত্মজ্ঞান লাভের পথ অনুসন্ধান**
সন্তু কান্ডার, ১১৭৯-১১৮৩

১৩। **ভারতীয় দর্শনের আলোয় মুক্তির স্বরূপসন্ধান**
স্নিগ্ধা চ্যাটার্জী, ১১৮৪-১১৮৯

১৪। **সাংখ্য দর্শনে অনুমান প্রমাণ: একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা**
রোজিনা খাতুন, ১১৯০-১১৯৮

বিবিধ

১৫। **প্রাগাধুনিক বাংলা হস্তলিপি: ঐতিহ্যের শিল্পিত রূপান্তর ও ইতিহাসের নীরব ভাষ্য**
ইয়াসমিন প্রামানিক, ড. মোঃ সিদ্দিক হোসেন, ১১৯৯-১২১৩

১৬। **অষ্টাদশ শতকের শেষ ও ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের সাংগঠনিক দিক**
দিলীপ সরকার, ১২১৪-১২২২

১৭। **বিতর্কের 'কষ্টিপাথরে' 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়**
সুরজিৎ চক্রবর্তী, ১২২৩-১২২৯

১৮। **কৈলাসবাসিনী দেবীর 'জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী': প্রসঙ্গ ঊনবিংশ শতকের 'নতুন' পরিবারভাবনা**
সৌমী বসু, ১২৩০-১২৩৮

১৯। **রবীন্দ্র জীবনে প্রেম ও প্রকৃতি**
সুমন্ত রবিদাস, ১২৩৯-১২৪৮

২০। **১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আসামের সাংস্কৃতিক কর্মীদের অবদান**
পুনম মুখার্জী, ১২৪৯-১২৫৮

২১। **বৈদিক যুগে নারীদের স্থান বিশ্লেষণ বা সমসাময়িক প্রেক্ষাপট**
সম্রাট কোনাই, ১২৫৯-১২৬৫

২২। **ঔপনিবেশিক আমলে মেদিনীপুর জেলার ক্যানেল ব্যবস্থা ও তার প্রভাব**
রাজীব বেরা, ১২৬৬-১২৭১

২৩। **'কবিতা' পত্রিকার যাত্রা: বুদ্ধদেব বসুর স্বপ্ন ও বাস্তবতার এক বিশ্লেষণাত্মক পাঠ**
শঙ্কু ভূষণ লস্কর, ১২৭২-১২৮১

২৪। **প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রে ক্যান্সার বিষয়ক একটি আলোচনা**
ড. অসীম চক্রবর্তী, ১২৮২-১২৯০

২৫। **সংগঠিত খেলার নতুন দিক হল ই-স্পোর্টস**
চিন্ময় মণ্ডল, ড. সুশান্ত সরকার, ১২৯১-১২৯৮

২৬। **'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে পরিবেশ সচেতনতা ও আজকের সমাজ**
মুস্তাফিজুর রহমান, ১২৯৯-১৩০৫

Guidelines, Review Process & Publication Ethics, Page No: 1306
Publication Charge, Page No: 1307

সম্পাদকীয়

অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে বিষয়-বৈচিত্র্য এবং উপস্থাপনায় ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের গবেষক, অধ্যাপক এবং প্রাবন্ধিকদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে 'আত্মদীপ'। এটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একটি আন্তর্জাতিক দ্বিমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা, যা উত্তরসূরি থেকে প্রকাশিত হয়। আত্মদীপের এই পর্বের নির্বাচিত লেখাগুলোকে কথাসাহিত্য, নাট্যভাবনা, দর্শন, বিবিধ ইত্যাদি নানারকম ভাগে সাজিয়ে তোলার প্রয়াস করা হয়েছে। যারা বাংলা ভাষায় লিখছেন, গবেষণা করছেন তাদের ভাবনাগুলোকে প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করার একটি ক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়াই এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য।

আত্মদীপ পত্রিকায় শুধু সাহিত্যকেন্দ্রিক নয়, বাংলা ভাষায়, যে কোন বিষয় নিয়ে লেখা গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠানো যেতে পারে। পত্রিকাটি অনলাইন এবং প্রিন্ট দুভাবেই প্রকাশিত হওয়ায় গবেষক এবং লেখকদের অনেকটা সাহায্য হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রতিটি প্রবন্ধ DOI সহকারে প্রকাশিত হয়, যা প্রবন্ধটির স্থায়ী ওয়েব ঠিকানা হয়ে থাকবে।

ভারত এবং বাংলাদেশ থেকে যারা লেখা দিয়েছেন এবং পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলী, যারা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করেছেন, সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরবর্তী সংখ্যাগুলিতেও আপনাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করছি। আত্মদীপের পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য (সম্পাদক)
আজিজুল সেখ (সহ-সম্পাদক)

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1086-1091
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.108

উপন্যাস 'বাঁধনহারা': নজরুলের প্রজ্বলিত আত্মদীপ

ড. মানস জানা, *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ (অটোনমাস), পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: .21.05.2025; Accepted: 24.05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

“Badhanhara" is the first successful epistolary novel in Bengali literature, consisting of 18 letters. The central theme revolves around the emotionally charged love story of Mahbuba and Nurul Huda. The protagonist, Nurul, like his creator (Kazi Nazrul Islam), is both a poet and a soldier—a free-spirited wanderer. Through Nurul Huda's character, Nazrul portrays his own romanticism, rebellious spirit, and unrestrained way of life. Nurul breaks off his marriage amidst difficult circumstances and goes to war. Two women shape his life- Mahbuba and Sofia-leading him to emotional turmoil. This forms the crux of the novel's plot. Two other notable aspects of the novel are secularism and women's dignity. Nazrul firmly believed that religious beliefs and practices should remain personal and should not dictate state or social policies. The novel features two remarkable female characters. Sahashikadi, a progressive, educated, and independent headmistress of a Brahmo school and Rabeya, the beloved wife of Rabiul, who is revered as Bhabijaan (elder sister). Even Mahbuba, in the end, refuses to conform to marriage, asserting her individuality. Nazrul experimented with a blend of realism and emotional intensity. Despite the communal frenzy of the time, Nazrul's literature consistently advocated for Hindu-Muslim unity. The novel embodies his dream of a united India, where people rise above religious divides as one nation. This vision reflects Nazrul's lifelong philosophy, struggles, and self-realization.

"Badhanhara" thus stands as a bold literary experiment -a fusion of love, rebellion, and social reform -mirroring Nazrul's own revolutionary spirit.

Keywords: Epistolary Novel, Muslim India, Secularism, Women's Dignity, Independence

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার এলবার্ট হলে ‘নজরুল সম্বর্ধনা সমিতি’র পক্ষ থেকে কাজী নজরুল ইসলামকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। সেই সম্বর্ধনা সভায় প্রতিভাষণে নজরুল বলেছিলেন,

> “বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরই অভিযান সেনাদলের তূর্য-বাদকের একজন আমি--- এই হোক আমার সবচেয়ে বড়ো পরিচয়।... আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তার চোখে চোখ-ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে, তাকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি।” (ইসলাম, ২০০১, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ: ৪৭৭- ৪৭৮)

উপন্যাস যে সামাজিক যোগাযোগ গড়ে তোলে। এযাবৎ তার সৃষ্টিকেন্দ্রে মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। নজরুল উপন্যাস জীবননির্ভর, সমাজনির্ভর। তিনি বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী ধারার স্রষ্টা, যিনি দুঃখী, বেদনাভারাতুর হতভাগ্যদের

একজন হয়ে বেদনার গান গেয়েছেন। নজরুলের কবিতা ও গান নিয়ে যত আলোচনা হয়, সেই তুলনায় উপন্যাস নিয়ে আলোচনা হয় খুবই স্বল্প। বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরবর্তীকালে নজরুল তিনটি উপন্যাস রচনা করেন—'বাঁধনহারা', 'মৃত্যুক্ষুধা' ও 'কুহেলিকা'। 'বাঁধনহারা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে (শ্রাবণ ১৩৩৪)। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩২৭) থেকে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ গ্রন্থাকারে প্রকাশনার সাত বছর আগে থেকে ১৯২০ সালের এপ্রিল সংখ্যার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'বাঁধনহারা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক পত্রোপন্যাস। উপন্যাসটিতে ১৮ টি পত্র আছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় মাহ্‌বুবা ও নূরুল হুদার আবেগ সংরক্ত প্রেম। দুই নারী এসে দাঁড়িয়েছে নূরুলের জীবনে -- মাহ্‌বুবা এবং সোফিয়া। নূরুলের চিন্তায় তা নিয়ে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং মাহ্‌বুবার সঙ্গে বিয়ের সমস্ত পাকা আয়োজন ভেঙে দিয়ে যুদ্ধে চলে যাওয়া-- মূল কাহিনি হলো এই। আলোচকরা মূলত চরিত্র, কাহিনি, গঠনশৈলী, ভাষা অর্থাৎ এটি উপন্যাস হিসেবে কতখানি সার্থক সৃষ্টি, নাকি ব্যর্থ তা নিয়েই বিশ্লেষণ করে থাকেন। কিন্তু এই উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যে জাতি, সমাজ ও দেশভাবনা তা নিয়ে আলোকপাত করার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

নজরুলের শিল্পভাবনা:

লেখকের ব্যক্তিচিন্তা, ব্যক্তিগত আবেগ কোনোভাবেই সমাজবিচ্ছিন্ন নয়। তা কোনো না কোনো সমাজচিন্তা, সমাজভাবনার ব্যক্তিকৃত রূপ। শিল্প অর্থাৎ আর্ট - তা গল্প, উপন্যাস, কাব্য বা নাটক যাই হোক না কেন, তার লক্ষ্য আনন্দ বা মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করা ; অভেদ - সুন্দর সাম্যের চিন্তা তুলে ধরা, যার মধ্য দিয়ে মানবচিন্তায় উন্নত উপলব্ধি প্রোথিত হয়। সমাজের অনেক অন্যায়, চাপা পড়া দীর্ঘশ্বাস, হতাশা, গুমরে ওঠা কান্না রূপ পায় চরিত্রে। পুরনো প্রথা, বিশ্বাস, সংস্কার - যুগ যুগ ধরে চলে আসছে বলেই তা সত্য নয়। যুক্তির কষ্টিপাথরে যা একদিন না একদিন সমাজে আসা উচিত, সেই অনাগত কালের কথা, তার ইঙ্গিত, তা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরবে সাহিত্য। নজরুল যা কাব্যের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে উঠতে পারেননি, প্রবন্ধে - অভিভাষণে যা স্পষ্ট করতে পারেননি, সেই ভাবকে চরিত্রে রূপ দিয়ে অধিকতর সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

> "আর্টকে সৃষ্টি, আনন্দ বা মানুষ এবং প্রকৃতি (man plus nature) ইত্যাদি অনেক কিছু বলা যাইতে পারে; তবে সত্যের প্রকাশই হইতেছে ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।" (ইসলাম,২০০১, প্রথম খন্ড, পৃ: ৪২৭)

নজরুল কেবল শিল্পচর্চার জন্য সাহিত্য লিখতে বসেননি। যে সামাজিক - অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল, তা থেকে উত্তরণ সাহিত্যের মধ্য দিয়েই সম্ভব, একথা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। আমরা দেখতে চাই, তাঁর ভাবনাগুলো চরিত্রের সঙ্গে যথাযথ সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে কি না! নজরুলের সজাগ শিল্পী মানসিকতার প্রকৃতিটাকে অনুধাবন করলে এ দ্বন্দ্ব থাকে না। তাঁর ছিল খেয়ালি, জেদি, একরোখা মনোভঙ্গি। 'কল্লোল'-এর প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল। যা কিছু পুরাতন, গতিহীন, প্রথাসর্বস্ব, স্থবির, সংকীর্ণ তা পরিত্যাগ করে এক পরিবর্তনের প্রত্যাশা নিয়েই নজরুলের শিল্পচর্চা। তিনি প্রয়োজনে শৈলীগত দিককে উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন বৃহত্তর প্রয়োজনে সাহিত্যকে তুলে ধরার জন্য। এখানেই তাঁর অনন্যতা।

'বাঁধনহারা' আত্মজৈবনিক উপন্যাস?

উপন্যাসের নায়ক নূরুল হুদা। তার কোনো বাঁধন নেই, তাই সে বাঁধনহারা। সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে নজরুলের মতোই নূরুল করাচি সেনানিবাসে গিয়েছে। নজরুল বাঙালি পল্টন থেকে কলকাতায় ফেরার কিছুদিন পরেই এই উপন্যাসটি ছাপার কাজ শুরু করেন। যদিও উপন্যাসটি তিনি রচনা করেছিলেন করাচিতে বসেই। রবিয়ল এবং মনুয়রকে লেখা চিঠি দুটো তার প্রমাণ। রবিয়লকে লিখেছেন, 'আজকাল খুব বেশি প্যারেড করতে হচ্ছে'। কখনও বা হাবিলদারজীর হাঁক পাড়ার প্রসঙ্গ আছে। আর মনুয়রকে লেখা চিঠিতে আছে ঝড়বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর করাচির প্রাকৃতিক বর্ণনা। উপন্যাসটি কেন বেশি মাত্রায় আত্মজৈবনিক? নূরুল হুদা চরিত্রে আছে নজরুল চরিত্রের ছায়া। 'বাঁধনহারা' উপন্যাসের 'নূরু' নামটিও নজরুলের ডাকনাম। 'পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ও তার প্রিয় বন্ধুকে এই নুরু নামেই ডাকতেন। বাঁধন হারা-র নায়ক নূরুল তার স্রষ্টার মত কবি ও সৈনি।' (সরকার,১৯৯৯, পৃ: ১৭৫) নজরুলের জীবনের

রোমান্টিকতা, বিদ্রোহ এবং বন্ধনহীন জীবন পরিচালনার মূল দিকগুলি নূরুল হুদা চরিত্রের মধ্যে লক্ষ করা যায়। নূরুলের জীবনে দুঃখ আছে এবং দুঃখকে অতিক্রম করার জন্যই সে ঘরছাড়া হয়েছে। মনুয়রকে নূরুল লিখেছে,

> “রবিয়লের স্নেহময়ী জ্যোতির্ময়ী জননীর কথা মনে হলে আমার মাতৃ-বিচ্ছেদ ক্ষতটা নতুন করে জেগে ওঠে। আমি কিন্তু বড্ডো অকৃতজ্ঞ! না?”

সম্ভবত নজরুলের নিজ মায়ের প্রতি যে হৃদয়বেদনা, সেই ব্যথা, ক্ষত উপন্যাসের কাহিনিতে রূপ পেয়েছে বলেই ধারণা করা যায়। অবশ্য একথা কখনও তিনি স্পষ্ট করেননি। জেলে অনশন চলাকালীন মায়ের সঙ্গে দেখা করা বা পরে কখনও ফিরে যাওয়ার কথা তিনি আর ভাবেননি। এত কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যই নিজেকে নিজেই বড্ড ‘অকৃতজ্ঞ’ বলে হৃদয়ক্ষত উন্মোচন করলেন। বাংলা সাহিত্যে নিজ জীবন নিয়ে উপন্যাস নজরুলের আগে ও পরে লেখা হয়েছে। শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীকান্ত’ সৃষ্টি হয়েছে আগেই। আর ‘বাঁধনহারা’র পরে লেখা হয়েছে বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ (প্রকাশ ১৯২৯)। এখানে উপন্যাস ও লেখক-জীবন হয়ে ওঠে পরস্পরের পরিপূরক। আত্মজৈবনিক উপন্যাসে লেখকের চিন্তন-মনন-অভিমত, আশা-অনুভব-আত্মদ্বন্দ্ব-অনুশোচনা-- এইসব নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। আধুনিক আত্মজৈবনিক উপন্যাসে আত্মানুসন্ধানই হল প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু নজরুল এই উপন্যাসে ব্যক্তি নজরুলকে নয়, তাঁর উদার অসাম্প্রদায়িক মনন, সমাজ ও দেশভাবনাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে তুলেছেন।

স্বাতন্ত্র্যময়ী নারী চরিত্রগুলির চিন্তার উৎকর্ষতা:

মাহ্‌বুবা:

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সমস্যা মাহ্‌বুবা ও নূরুল হুদার হৃদয়াবেগ। কিন্তু এরা কেউ কাউকে কোনো চিঠি লেখেনি। যদিও এই হৃদয়াবেগ চাপা থাকেনি। মনুয়রকে লেখা চিঠিতে নূরুল হুদা মাহ্‌বুবাকে গভীর ভালোবাসার কথা জানিয়েছে। অন্যদিকে মাহ্‌বুবাও মনের কথা জানিয়েছিল চল্লিশোর্ধ্ব এক জমিদারের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর। এই বিয়েকে মনে করেছিল জাঁতা পেষা হয়ে মরবার যন্ত্র। কিন্তু সে মরতে চায় না। কোনোদিন সেই সফল পরিণতি সম্ভব নয়, কিন্তু সে আশায় আছে, একদিন দক্ষিণ হস্তের বরণমালা নুরুলের প্রতি দিয়ে তারপর জীবন থেকে মুক্তি নেবে। মাহ্‌বুবার সাহস এবং নারী হিসেবে আত্মস্বাতন্ত্র্য লক্ষ করার মতো। পুরুষদেরকে সে মনে করে ‘স্ত্রী শিকারী’। স্বামীকে বলেছে, ‘দুর্দান্ত পশু’। বলেছে, ‘আমার স্বামী আমার রূপকে চেয়েছিলেন, রূপার দরে যাচাই করতে।’ স্বামীকে শরীর এবং রূপ দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এজন্যই ভালোবাসা দেয়নি। ভালোবাসা তার হৃদয়ে ফল্গুধারার মতো বয়ে গিয়েছে নূরুলের উদ্দেশ্যে। মাহ্‌বুবা যেহেতু বিবাহিত, তাই তার ভালোবাসা ঝরে পড়েছিল সোফিয়ার প্রতি। সোফিয়াকেও সে মনে করেছে সূর্য।

সাহসিকা:

প্রগতিশীল, বিদুষী, স্বাতন্ত্র্যময়ী, ব্রাহ্ম স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সাহসিকা। ব্রাহ্মস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। একসময় কৃতী ছাত্রী ছিলেন তিনি। তাঁর কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। তিনি বলতেন, সব ধর্মের ভিত্তি চিরন্তন সত্যটিকে যখন মানি, তখন আমাকে যে ধর্মে ইচ্ছে ফেলতে পারিস। অনেক সমালোচক সাহসিকার মধ্যে দেখতে পান সরলা ঘোষালকে। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা। পুরো নাম-- মিস সাহসিকা বোস। তাঁর সই রেবাকে পত্র লিখেছেন কলকাতার বিডন স্ট্রিট থেকে। এই পত্রে ধর্মের প্রকৃত সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন তিনি। ধর্মীয় প্রবক্তারা প্রচার করেন মানবিকতা, উদারতা, সহৃদয়তা, পরমতসহিষ্ণুতার মহাবাণী। সাহসিকা জোরের সঙ্গেই বলেছেন-

> “প্রত্যেক ধর্মই সত্য-- শাশ্বত সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত এবং কোনো ধর্মকে বিচার করতে গেলে তার এই মানুষের গড়া বাইরের বিধান শৃঙ্খলা দিয়ে কখনও বিচার করবেনা...” (ইসলাম, বাঁধনহারা, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৫৬)

তিনি প্রশ্ন তুলেছেন ‘মন্দিরে গিয়ে পূজা করা আর মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়াটাই কি ধর্মের সার সত্য?’ (ইসলাম, বাঁধনহারা, ২০০১, পৃষ্ঠা ৩৫৬-৩৫৭) ধর্মের নাম করে বিধর্মী আচরণ ভন্ড-ধার্মিকদের মজ্জাগত হয়ে গেছে। তাই বাইরের ‘বিধি’, আচরণকেই এরা বড়ো করে তুলে ধরার জন্য নানাভাবে প্রচার করেন ক্ষমতাবানের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। প্রকৃত অন্তরের সাধনা এদের নেই।

> "মন্দিরে গিয়ে দেবতার সামনে মুখস্ত মন্ত্র আওড়ায় কিন্তু তার মন থাকে লোকের সর্বনাশের দিকে। মসজিদে গিয়ে নামাজের 'নিয়ত' করেই ভাবে যত সব সংসারের পাপ দুশ্চিন্তা! এই ভণ্ডামি এই প্রতারণাই তো এঁদের সত্য!" (ইসলাম, বাঁধনহারা, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৫৭)

আচার, বিচার, সংস্কার, জপ-তপ-মন্ত্র আওড়ানোর মধ্য দিয়ে মিথ্যা ধর্মের অভিনয় করে যারা, সেই বকধার্মিকদের মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছেন নজরুল। বলেছেন

> "এই বেচারারা অন্ধ বিশ্বাসীর দল? বেচারারা কিছু না পেয়েই পাওয়ার ভান করে চোখ বুজে বসে আছে। অথচ এদের শুধোও, দেখবে দিব্যি নাকি-কান্না কেঁদে লোকদেখানো ভক্তিগদগদ কণ্ঠে বলবে, 'আঁ হাঁ হাঁ। মরি মরি ওই ওই ওই দেখ তিনি! মিথ্যার কি জঘন্য অভিনয় ধর্মের নামে সত্যের নামে। ঘৃণায় আপনিই আমার নাক কুঁচকে আসে।" (ইসলাম, বাঁধনহারা, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৫৯)

ধর্ম সম্পর্কে সাহসিকার বিশ্লেষণ হল –

> "সব ধর্মেরই ভিত্তি চিরন্তন সত্যের পর যে সত্য সৃষ্টির আদিতে ছিল, এখনও রয়েছে এবং অনন্তেও থাকবে। এই সত্যটাকে যখন মানি, তখন আমাকে যে ধর্মে ইচ্ছা ফেলতে পারিস। আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি খ্রিস্টান, আমি বৌদ্ধ, আমি ব্রাহ্ম।" (ইসলাম, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৫৯)

এ যেন নজরুলের অন্তরের প্রতিচ্ছবি। দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়ে ফুটে ওঠে এক স্বচ্ছ নির্মল হৃদয়, যে হৃদয়-মন্দিরে নেই কোনো বিভেদ, বিধিনিষেধের গন্ডি। ধর্মের নামে ভন্ডামি দেখে ক্ষোভে-বিরক্তিতে সাহসিকা বলেছেন,

> "এই সব কারণেই, ভাই, আমি এইরকম ভন্ড আস্তিকদের চেয়ে নাস্তিকদের বেশি ভক্ত, বেশি পক্ষপাতী... তারা এই সত্যের স্বরূপ বুঝতে, এই সত্যকে চিনতে এবং সত্যকে পেতে দিবা-রাত্তির প্রাণপণ চেষ্টা করচে-- এই তো সাধনা-- এই তো পূজা, এই তো আরতি। এই জ্ঞান-পুষ্পের নৈবেদ্য চন্দন দিয়ে এরা পূজা করবে আর করচে, তবু দেবতাকে অন্তরে পায়নি বলে মুক্তকণ্ঠে আবার স্বীকারও করচে যে, কই দেবতা! কাকে পূজা করচি? আহা! কি সুন্দর সরল সহজ সত্য! এদের প্রতি ভক্তিতে আপনিই যে মাথা নুয়ে পড়ে।" (ইসলাম, বাঁধনহারা, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৫৯)

নজরুল এ কারণেই 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় বলেছিলেন,

> "গোঁড়া-রাম ভাবে নাস্তিক আমি, পাতিরাম ভাবে কনফুসি!" (ইসলাম, আমার কৈফিয়ৎ, ১৯২৬)

রাবেয়া:

আর রাবেয়া হলেন রবিয়লের স্ত্রী। তিনি সপ্রতিভ, স্বচ্ছন্দ যুবতী। তিনি শুধু নিজের পরিবার নয়, বহুজনের হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি স্নেহময়ী। নারী - পুরুষের সম্পর্ক, দেশ এবং সমাজ সম্পর্কে তিনি স্পষ্টবক্তা। নূরুলের বন্ধু রবিয়ল। রবিয়লের স্ত্রী রাবেয়া সবার প্রিয় ভাবীজান। নূরুর প্রেমিকা মাহ্‌বুবাকে শুভাকাঙ্ক্ষী ভাবীজান 'ভাগ্যবতী' সম্বোধন করে সালার থেকে পত্র লিখেছে। এই পত্রে আছে প্রগতিশীল, বিদুষী, স্বাতন্ত্র্যময়ী, ব্রাহ্ম স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সাহসিকা-র পরিচিতি। রাবেয়া বলেছে –

> "এঁদের সঙ্গে যে খুব সহজ সরল, স্বচ্ছন্দে প্রাণ খুলে মিশতে পারা যায়, এইটেই আমাকে আনন্দ দেয় সবচেয়ে বেশি। এঁদের মধ্যে ছোঁয়াচ রোগ বা ভূতমার্গের ব্যামো নেই, কোনো সংকীর্ণতা, ধর্ম-বিদ্বেষ বেহুদা বিধি-বন্ধন নেই। আজ বিশ্ব-মানব যা চায়, সেই উদারতা, সরলতা, সমপ্রাণতা যেন এর বাইরে-ভিতরে ওতপ্রোতভাবে জড়ানো রয়েছে।" (ইসলাম, বাঁধনহারা, ২০০১, পৃষ্ঠা ৩৩৫)

রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর'-এর অন্তর্গত 'লোকহিত' প্রবন্ধে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্বলতা-অন্তর্বিভেদ মুদ্রিত করে রেখে গিয়েছেন।

> "হিন্দু - মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচবোধ করেন নাই।... আমরা বিদ্যালয়ে ও অফিসে প্রতিযোগিতার ভিড়ে মুসলমানকে জোরের সঙ্গে ঠেলা দিয়াছি।" (ঠাকুর ১৩৯৭, পৃ: ৫৪৯)

নজরুল উপন্যাসে রাবেয়াকে দিয়ে একথাই ফুটিয়ে তুললেন। রাবেয়ার অভিজ্ঞতা তো রবীন্দ্রনাথের দেশ নিয়ে উদ্বেগের প্রতিধ্বনি। রাবেয়ার চিঠিতে হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যেকার পার্থক্যও উঠে এসেছে। হিন্দুধর্মের নানা কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা থেকে মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ায় যে ব্রাহ্মধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল, তার বিভিন্ন জটিলতা ও দ্বন্দ্বের মধ্যে না ঢুকেও নজরুল সংস্কারমুক্ত মনন ও আচরণের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। রাবেয়ার চিঠিতে 'ব্রাহ্ম' ও 'হিন্দু' দুটি পরিবারের মহিলাদের ধর্মীয় আচরণ সম্পর্কে একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরলেন। রাবেয়া বলেছে,

> "আমরা বড়ো বড়ো হিন্দু পরিবারের সঙ্গেও মিশেছি, খুব বেশি করেই মিশেছি এবং অনেক হিন্দু মেয়ের সঙ্গে ভাবও হয়েছিল, কিন্তু এমন দিল-জান খোলসা করে প্রাণ খুলে সেখানে মিশতে পারিনি। কোথায় যেন কী ব্যবধান থেকে অনবরত একটা অসোয়াস্তি কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে।" (ইসলাম, বাঁধনহারা, ২০০১, পৃষ্ঠা ৩৩৫)

মানসিক জগতের এই ব্যবধান সামাজিক জীবনে চলার পথে কত সূক্ষ্মদাগে কাজ করে যায়। রাবেয়ার কথায়,

> "আমরা তাঁদের বাড়ি গেলেই, তাঁরা হন আর না হন, আমরাই বেশি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি, এই বুঝি বা কোথায় কী ছোঁয়া গেল, আর অমনি সেটা অপবিত্র হয়ে গেল। আমরা যেন কুকুর বেড়াল আর কী! তাঁরাও আমাদের বাড়ি এসে পাঁচ-ছয় হাত দূরে দূরে পা ফেলে ড্যাং পেড়ে পেড়ে আসেন, পাছে কোথায় কী অখাদ্য কুখাদ্য মাড়ান। এতে মানুষকে কতো ছোটো হয়ে যেতে হয়, তার বুকে কত বেশি লাগে।... ভিতরে এত অসামঞ্জস্য ঘৃণা- বিরক্তি চেপে রেখে বাইরের মুখের মিলন কি কখনও স্থায়ী হয়? এ মিথ্যা আমরা উভয়েই মনে মনে খুব বুঝি কিন্তু বাইরে প্রকাশ করিনে। পাশাপাশি থেকে এই যে আমাদের মধ্যে এত বড়ো ব্যবধান, গরমিল -- এ কী কম দুঃখের কথা? আমাদের আত্মসম্মান আর অভিমান এতে দিন দিনই বেড়ে চলেছে।" (ইসলাম, বাঁধনহারা, ২০০১, পৃষ্ঠা ৩৩৫)

নজরুল বারবার আশ্বস্ত করেছেন, প্রত্যেকেই নিজ ধর্মের সত্যকে জানুক। নিজের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস থাকলে, অন্য সকলকে বিশ্বাস কররার শক্তি পাবে। আর অন্য মানুষকে ঘৃণা করে তারাই, যাদের নিজের কোনো ধর্ম নাই। এই উদারতায় নবীনদেরকেই আহ্বান করেছেন তিনি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সেই দুর্বলতা, বিদ্বেষ, বিভেদের সাংঘাতিক রূপ তিনি দেখেছিলেন। রাগে - ক্ষোভে বলেছিলেন,

> "কি ভীষণ প্রতারণা! মিথ্যার কী বিশ্রী মোহজাল! এই দিয়া তুমি একটা অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিবে?" (ইসলাম, ২০০১, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৩০)

নজরুলের মূল্যায়নে কয়েকটি প্রশ্ন:

অনেকে নজরুলের সাহিত্যকে প্রচারধর্মী বলেন, চড়া সুরের বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু যা সমাজ-বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, সমাজ অভ্যন্তরে নিহিত সত্যকে তুলে ধরে, তাকে শুধুই প্রচারধর্মী আখ্যা দেওয়া সঙ্গত নয়। নজরুল সাহিত্য সমাজের সঙ্গে অন্বিত অর্থনীতি, রাজনীতিকে তুলে ধরে। আর এই রাজনৈতিক ধ্যানধারণা, মেহনতি মানুষের ঘামে-অশ্রুতে সিক্ত। নজরুল-সৃষ্ট নারীরা স্বাতন্ত্র্যময়ী। তাঁরা নবজাগরণের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়। নজরুলের সাহিত্য নিয়ে মূল্যায়ন করতে হলে সমসাময়িক হিন্দু ও মুসলমান লেখকদের পাশাপাশি রেখে বিশ্লেষণ করা দরকার। অবিভক্ত বাংলাদেশের জনসমষ্টিতে শতকরা হিসেবে মুসলমানদের সংখ্যাই ছিল বেশি। কিন্তু মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটেছে হিন্দু মধ্যবিত্ত বিকাশের তুলনায় দেরিতে। নজরুলের সময়ে মুসলমান মধ্যবিত্তরা হিন্দু মধ্যবিত্তদের ভয়ের চোখে দেখত। তার চেয়ে বড়ো কথা, মুসলমানদের মধ্যে দরিদ্র, যারা সংখ্যায় বেশি, তাদের সমাজ ছিল দেশের শিক্ষিত - মধ্যবিত্ত শ্রেণির থেকে বহু দূরে। তারা তখন অতিমাত্রায় নিজেদের সমাজের বাইরে পা ফেলতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল।

শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন,

> "সাহিত্য সাধনা যদি সত্য হয়, সেই সত্যের মধ্যেই ঐক্য একদিন আসবেই। কারণ সাহিত্য - সেবকেরা পরস্পরের পরমাত্মীয়।" (চট্টোপাধ্যায় ১৩৯৩, পৃ: ২১৬৯)

নজরুল আরও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন,

> "হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না, আমিও মানি। এবং আমিও জানি যে, একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়েই এ-অশ্রদ্ধা দূর হতে পারে। ...আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের এ-সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্যে অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্য হানি হয়েছে। তবু আমি জেনে শুনেই তা করেছি।" (ইসলাম, ২০০১ দ্বিতীয় খন্ড, পৃ: ৫০৭- ৫০৮)

নজরুলের এই দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বাঁধনহারা'র অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

উপসংহার:

নজরুলের উপন্যাসগুলিতে ধরা দিয়েছে বাস্তব জীবনকাহিনি। চরিত্রগুলি সবই মৌলিক, কিন্তু কাহিনি মুসলমান সমাজের। তিনি সত্য সৃষ্টির লক্ষ্যে সাহিত্যের শৈলীগত দিককেও তুলনায় লঘু করে দেখতে চেয়েছিলেন। সমাজ এবং মানুষের স্বার্থ তাঁর কাছে প্রধান। নজরুলের উপন্যাস তো আজও অপাঙংক্তেয় থেকে গিয়েছে! কিন্তু কেন? সেজন্যই কি মুসলমান সম্পাদক এবং মুসলমান গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত পত্রিকা ছাড়া অন্যত্র নজরুলের উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হলো না? পরবর্তী সময়েও তা খুব একটা প্রাসঙ্গিক বলে দিক্‌পাল সমালোচক, গবেষকরা মনে করছেন না! আজ দেশ ও বিশ্বের পরিস্থিতির দিকে তাকালে যে ভয়াবহ মনুষ্যত্বহীনতা চোখে পড়ে, সামাজিক দায়িত্বহীনতা হৃদয়কে বিদীর্ণ করে, সম্প্রদায়গত বিভেদ যেভাবে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলছে- তখন নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র:

১. ইসলাম, নজরুল, প্রত্যভিভাষণ, কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০১

২. ইসলাম, নজরুল, বাঁধনহারা, কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০১

৩. ইসলাম, নজরুল, যুগবাণী, কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র, প্রথম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০১

৪. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, মুসলমান সাহিত্য সমাজ, শরৎ সাহিত্য সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, আনন্দ, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৯৩

৫. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশনা, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৭

৬. সরকার, তারক, ঔপন্যাসিক নজরুল, একবিংশতি -১, মে ১৯৯৯

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1092-1099
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.109

নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশুপ্রেম

ড. কৌশিকোত্তম প্রামানিক, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 26.05.2025; Send for Revised: 26.05.2025; Revised Received: 27.05.2025; Accepted: 28.05.2025;
Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In recent decades, we have seen many confrontations between man and wild animal. Our activities and actions are responsible for making animal in compulsion with inevitable confrontation. Lack of food, existential crisis makes them so furious. But there is a little space in the world where man fells love and affection for animals. For this reason, the story writers can not ignore and avoid this. They depict this type of affection vividly in their short stories, at their best level. Like other literatures Bengali literature can not be apart from this area, we find so many short story writers who became so popular by writing this type creation. In this context, we recall the renowned Bengali short story writers and their immemorable short stories like ‘Mahesh’, ‘Adorini’, ‘Lambokorno’, ‘Kalapahar’, ‘Nari o Nagini’ and ‘Goghno’ etc. Thease short stories have shown unselfish love between man and animal besides reflection of society.

Keywords: Affection, Love, Creativity, Refection of society, Releationship

পৃথিবী সৃষ্টি আদি থেকেই মানুষের সাথে মানুষের ভালবাসা দেখতে পাওয়া যায়। এই ভালবাসা শুধুমাত্র মানুষ থেকে মানুষে সঞ্চারিত হয় নি, এই ভালবাসা সঞ্চারিত হয়েছে মানুষ ও পশুদের মধ্যেও। স্বাভাবিক ভাবেই সাহিত্যেও উঠে এসেছে মানব ও পশুর চিরন্তন প্রেম। বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যে যেমন পশু ও মানবের প্রেম, সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে তেমনি বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পকারদের রচনায় পশু ও মানবের প্রেম সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিক কালের ছোটগল্পকারদের মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে অতি অবশ্যই যে সব ছোটগল্পকারদের নাম উঠে আসে তাঁরা হলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়(১৮৭৩-১৯৩২), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৮৭৬-১৯৩৮), রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০), তারাশঙ্কর বন্ধ্যোপাধ্যায়,(১৮৯৮-১৯৭১) সৈয়দ মুজতবা সিরাজ, (১৯৩০-২০১২) প্রমুখেরা। পশুপ্রেম বিষয়ে তাঁদের রচিত গল্পগুলি হল, যথাক্রমে- ১) মহেশ (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ২) আদরিনী (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়) ৩) লম্বকর্ণ(পরশুরাম ছদ্মনামে রাজশেখর বসু) ৪) কালাপাহাড়(তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়) ৫)নারী ও নাগিনী(তারাশঙ্কর বন্ধ্যোপাধ্যায়) ৬) গোঘ্ন (সৈয়দ মুজতবা সিরাজ)

প্রথমেই শুরু করা যাক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘অনধিকার প্রবেশ’ গল্পটির মধ্য দিয়ে। গল্পের প্রধান চরিত্র জয়কালী। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখক লিখেছেন-

> *“জয়কালী দীর্ঘিকার দৃঢ়শরীর তীক্ষ্ণনাসা প্রখর বুদ্ধি স্ত্রীলোক। তাঁহার স্বামীর অবর্তমানে তাহাদের দেবোত্তর সম্পত্তি নষ্ট হইবার জো হইয়াছিল। বিধবা তাহার সমস্ত বাকি বকেয়া আদায়,*

> *সীমাসরহদ্দ স্থির এবং বহুকালের বেদখল উদ্ধার করিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাপ্য হইতে কেহ তাহাকে এক কড়ি বঞ্চিত করিতে পারিত না।"*[১]

জয়কালীর চারিত্রিক গঠন যেমন একদিকে কঠিন ছিল অন্যদিকে তেমনি আবার স্নেহ, প্রেম, ভালবাসায়ও পরিপূর্ণ ছিল। এই বিধবার ঠাকুর বাড়ি, মন্দির ছিল তাঁর সমস্ত সংসার। কোনরকমের শৈথিল্য তিনি বরদাস্ত করতেন না। এমনকি বাইরের লোক তো দূরের কথা, নিজের আত্মীয় স্বজনদেরও ছিল এই মন্দিরে প্রবেশের অনধিকার। এই দেবালয়েই একদিন ঘটে যায় এক অভূতপূর্ব ঘটনা। বলি হবার পূর্বে ডোমের দলের তাড়া খেয়ে একটি শূকর প্রাণভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে দেবালয় প্রাঙ্গণে। মন্দিরের পুজারি শূকরটিকে তাড়া করতে যায়, কিন্তু জয়কালী বাঁধা দেন। পশুটিকে তিনি আর ডোমেদের হাতে তুলে দেন না। প্রাণভয়ে তাড়িত এক পশুর জন্যে জয়কালীর অন্তরে নির্মল মমতাবোধ জেগে উঠে। সকলে অবাক হয়ে যায় কর্তব্যে কঠিন জয়কালীর এই আচরণে-

> *"জয়কালী রুদ্ধদ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, যা বেটারা, ফিরে যা! আমার মন্দির অপবিত্র করিসনে।*
>
> *ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরানী সে তাঁহার রাধানাথ জীউর মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দেবেন, ইহা তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না।"*[২]

পশু প্রেমের উল্লেখ রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' ও 'সুভা' গল্পেও। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মৃণালের পশুপ্রেমকে তার শ্বশুরবাড়ীর মানুষেরা সহ্য করতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কথাকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে ভালোবাসা যে কত প্রগাঢ় হয়, তার অন্যতম উদাহরণ হল তাঁর রচিত 'আদরিণী' গল্পটি। গল্পের প্রধান চরিত্র মোক্তার জয়রাম মুখোপাধ্যায়। অভিমানী কিছুটা বদরাগী কিন্তু স্নেহে বাৎসল্যে তার ভরাট হৃদয়। পীরগঞ্জের মেজবাবুর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে তিনি ও তার বন্ধুদের সাথে ঠিক করেছেন বিয়ের নিমন্ত্রণ তিনি রক্ষা করবেন হাতিতে চড়ে। মোক্তার হিসাবে তার সাথে পার্শ্ববর্তী মহারাজ নরেশচন্দ্রের ভালো সুসম্পর্ক থাকার সুবাদে তিনি মহারাজকে হাতি পাঠাবার জন্য পত্র লিখেছিলেন। পত্রবাহক ফিরে এসে জানায় মহারাজ হাতি দিতে অস্বীকার করেছেন। দেওয়ানজী মারফত পত্রবাহককে শুনিয়ে দেওয়া হয়-"বিয়ের নেমতন্ন হয়েছে তার জন্যে হাতী কেন? গরুর গাড়িতে আস্তে বোলো।"[৩] একগুয়ে জয়রামের জেদ চেপে যায়, তিনি ঠিক করেন হাতীতে চেপেই তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবেন নতুবা যাবেন না।সেই রাতেই তিনি বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর থেকে দুই হাজার টাকা দিয়ে একটি মাদী হাতি কেনেন। নাম রাখেন আদরিণী। হাতির পিঠে চেপেই তিনি অবশেষে নিজের জেদ ও সম্মান বজায় রাখেন।

পাঁচ বছর পর মোক্তার জয়রাম বাবুর ভাগ্য উল্টোদিকে হাটতে থাকে। তার অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমে ভেঙ্গে পড়ে। নবীন শিক্ষানবিস ইংরেজি জানা উকিলদের সাথে তিনি প্রতিযোগিতা করতে পারেন না। উপার্জনে ভাঁটা পড়ে।অবসর গ্রহনের উপযুক্ত বয়সও হয়ে যায়। একসময় তিনি কাছারী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অন্যদিকে সাংসারিক ব্যায় ক্রমে উর্ধ্বমুখী হতে থাকে। তার প্রথম দুটি পুত্র মূর্খ উপার্জনহীন, ছোটছেলে কলকাতায় ফেল করেছে, বরবধূ, মেজবধূ উভয়েই অন্তঃসত্ত্বা, বিবাহযোগ্যা বড় পৌত্রী কল্যাণী, এই সকল সাংসারিক সমস্যায় জয়রাম মুখোপাধ্যায় জর্জরিত।এইরকম পারিবারিক অর্থনৈতিক দুরাবস্থায় তাঁর অনেক হৈতেষী বন্ধুই পরামর্শ দেন আদরিণীকে বিক্রি করে দেবার। প্রথম দিকে তিনি বন্ধুদের এই প্রস্তাবে দুঃখিত হন-"তার চেয়ে বল না তোমার এই ছেলেপিলে নাতি-পুতিদের খাওয়াতে অনেক টাকা ব্যায় হয়ে যাচ্ছে- ওদের একে একে বিক্রী করে ফেল।"[৪] কিন্তু পৌত্রী কল্যাণীর বিয়ে ঠিক হলে, পণ স্বরপ বরপক্ষকে আড়াই হাজার টাকার দরকার। টাকা জোগাড় করতে একসময়ের একগুয়ে অর্থবান প্রতাপশালী জয়রাম বাধ্য হয়ে আদরিণীকে বামুন হাটের চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেন। ভগ্নহৃদয় জয়রাম আদরিণীকে মেলায় বিদায় দেবার পূর্বে তার গলায় হাত বুলিয়ে বলেন- "আদর, যাও মা, বামুনহাটের মেলা দেখে এস।"[৫] তিন হাজার টাকায় বিক্রি করার মত খরিদ্দার বামুন হাটের মেলায় পাওয়া যায় না। আদরিণীকে ফিরে আসতে হয় জয়রামের বাড়িতেই। অন্যদিকে কল্যাণীর বিয়েরও বেশী দিন বাকী নেই। এবার আদরিণীকে রসুলগঞ্জের মেলায় পাঠানোর ব্যাবস্থা করা হয়। এবার দুঃখে ভারাক্রান্ত জয়রাম আদরিণীর

সাথে বিদায়ের পূর্বে আর দেখা করলেন না।নাতনীর মুখে তিনি শুনতে পান যাবার সময় আদরিণীর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। তিনি নিজ মনে সগতোক্তি করেন-

> *"যাবার সময় আমি তোর সঙ্গে দেখা করলাম না - সে কি তোকে অনাদর করে? না মা, তা নয়। তুই ত অন্তর্যামী - তুই কি আমার মনের কথা বুঝতে পারিস নি? - খুকীর বিয়েটা হয়ে যাক। তার পর তুই যার ঘরে যাবি, তাদের বাড়ি গিয়ে আমি তাকে দেখে আসব। তোর জন্যে সন্দেশ নিয়ে যাব।- রসগোল্লা নিয়ে যাব। যতদিন বেঁচে থাকব, মনে কোনও অভিমান করিসনে মা।"*[৬]

রসুলগঞ্জের মেলায় যাবার পথে আদরিণী অসুস্থ হয়ে পড়ে। একজন চাষি পত্রবাহকের মাধ্যমে জয়রাম জানতে পারেন। অসুস্থতার খবর তাকে বিচলিত ও অস্থির করে তুলে-

> *"আমার গাড়ির বন্দোবস্ত করে দাও। আমি এখনি বেরুব। আদরের অসুখ- যাতনার সে ছটপট করছে। আমাকে না দেখতে পেলে সে সুস্থ হবে না। আমি আর দেরী করতে পারব না।"*[৭]

যখন জয়রাম পৌঁছান আদরিণীর কাছে, ততক্ষণে আদরিণী শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছে। মানুষ ও পশুর স্নেহ ও ভালোবাসা যে কত উচ্চতায় পৌঁছে গেছে তা গল্পের শেষ কয়টি লাইনে লেখক সুনিপুণ ভাবে বর্ণনা করেছেন-

"বৃদ্ধ ছুটিয়া গিয়া হস্তিনীর শবদেহের উপর লুটাইয়া পড়িয়া, তাহার মুখের নিকট মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বারম্বার বলিতে লাগিলেন-অভিমান করে চলে গেলি মা? তোকে বিক্রি করতে পাঠিয়েছিলুম বলে- তুই অভিমান করে চলে গেলি?"[৮]

এরপর জয়রাম শুধুমাত্র দুই মাস বেঁচেছিলেন।

পশুপ্রেমমূলক গল্প শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত 'মহেশ' সর্বজনবিদিত। গল্পটিকে কেন্দ্র করে লেখক একদিকে যেমন পশুর প্রতি মানুষের হার্দিক ভালোবাসার পরিচয় রয়েছে, ঠিক তেমনি অন্যদিকে রয়েছে সমাজের প্রতি লেখকের নির্মম ব্যঙ্গ। সমাজ বিদীর্ণ হয়েছে লেখকের ব্যঙ্গবাণে। গল্পের শুরুতেই লেখক এক সামন্ততান্ত্রিক জমিদার তন্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন-

> *"গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট, তবু দাপটে তাঁর প্রজারা টু শব্দ করিতে পারে না- এমনই প্রতাপ"*[৯]

এই ব্রাহ্মণ জমিদারের 'সীমানার পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ি।' সুতরাং এই ম্লেচ্ছ গফুরকে যে জমিদারের চাপে থাকতে হয় একথা বলাবাহুল্য। গফুরের একটি ষাঁড়ের প্রতি ভালোবাসার নাম 'মহেশ'। মহেশকে কেন্দ্র করেই লেখক তাঁর অভাবনীয় শিল্পকুশলতায় গল্পটিকে রসোত্তীর্ণ করেছেন। প্রান্তিক ও গরীব গফুরের পক্ষে মহেশের প্রয়োজনীয় খড়ের জোগান দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। ব্রাহ্মণ তর্করত্নের কাছে গফুর ব্যক্ত করে-

> *"বিঘে চারেক জমি ভাগে করি, কিন্তু উপরি উপরি দু'সন অজন্মা- মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল- বাপ বেটিতে দুবেলা দুটো পেট ভরে খেতে পর্যন্ত পাইনে। ঘরের পানে চেয়ে দেখ, বিস্টি-বাদলে মেয়েটাকে নিয়ে ঘরের কোণে বসে রাত কাটাই, পা ছাড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না। তাকিয়ে দেখ, পাঁজরা গোণা যাচ্ছে, - দাও না ঠাকুরমশাই, কাহন দুই ধার, গরুটাকে দুদিন পেটপুরে খেতে দিই।।... আমরা না খেয়ে মরি ক্ষেতি নেই, কিন্তু ও আমার অবলা জীব-কথা বলতে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।"*[১০]

কিন্তু কেউ কথা শোনেনি গফুরের, কাহন দুই খড় ধারের পরিবর্তে জুটেছে তর্করত্নের গঞ্জনা-'যেমন চাষা, তার তেমনি বলদ।'গঞ্জনা সত্ত্বেও মহেশের প্রতি গফুরের ভালোবাসা একদম কমে না, বরঞ্চ ভালোবাসা আরও প্রগাঢ় হয়-

> *"মহেশ, তুই আমার ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রিতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস, তোকে আমি পেটপুরে খেতে দিতে পারি নে- কিন্তু তুই ত জানিস, তোকে আমি কত ভালোবাসি।"*[১১]

একদিকে মহেশের প্রতি ভালোবাসা অন্যদিকে নিত্যনৈমিত্তিক অভাব এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে গফুর বিচলিত। তার উপর রয়েছে সামাজিক অবহেলা, জমিদারের অত্যাচার, সামাজিক মেরুকরণের অভিশাপ। জমিদার পয়সার লোভে জমা বিলি করে দিয়েছে, অনেকে গফুরকে বলেছে মহেশকে বেঁচে দিতে, কিন্তু পারেনি গফুর। মানুষ অভাব বুঝতে

পারে, কিন্তু মহেশ পারেনি। দমন করতে পারেনি তার স্বাভাবিক ক্ষুধাকে। মানিক ঘোষের বাগানে ঢুকে সে গাছপালা খেয়েছে, পরিণতিতে মানিক ঘোষেরা তাকে খোয়ারে দিয়েছে। মহেশকে খোয়ার থেকে বার করতে গফুর নিজের পিতলের থালাটিও বন্ধক দিয়েছে। সাধারণ বিরক্তিবোধ ও অভাবে একসময় গফুর ঠিক করে মহেশকে সে বিক্রি করে দেবে। ক্রেতাও এসেছে, দশ টাকা দিয়ে দরদামও ঠিক হয়েছে কিন্তু মহেশকে নিয়ে যাবার সময়ই বেধেছে গোলযোগ, গফুরের অস্বাভাবিক আচরণে –

> *"যে দুইজন লোক সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা গরুর দড়ি খুলিবার উদ্যোগ করিতেই কিন্তু সে অকস্মাৎ সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দড়িতে হাত দিয়ো না বলছি-খবরদার বলছি, ভালো হবে না।"*[১২]

গল্পে ট্রাজেডি সংগঠিত হয়েছে তৃতীয় পর্বে। জ্যৈষ্ঠ মাসের তীব্র দাবদাহে গফুরের জ্বর এসেছিল। অভাবে সে এখন জনমজুরে পরিণত হয়েছে। এমনই এক কর্মহীন দিনে সে মেয়ে আমিনার কাছে ভাত চেয়েছিল, পায় নি, কারণ ঘরে নিত্যঅভাব, জল চেয়েছে সে মেয়ের কাছে মেয়ে দিতে পারেনি, কারণ সমাজে জাতপাত সমস্যা-

> *"গ্রামে যে দুই তিনটা পুষ্করিণী আছে তাহা একেবারে শুষ্ক। শিবচরণবাবুর খিড়কীর পুকুরে যা একটু জল আছে তা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ে মাঝখানে দু একটা গর্ত খুঁড়িয়া যাঁহা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি তেমনি ভিড়।"*[১৩]

সেকারণেই হয়তো আমিনা খাবার জল সংগ্রহ করতে পারেনি। এসব কথা গফুরের মনে আসেনি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তার মাথার ঠিক ছিল না। এরই মাঝে জমিদার পেয়াদার তলব "বাবুর হুকুম জুতো মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।"[১৪] কারণ মহেশ জমিদারের প্রাঙ্গণে ফুল গাছ খেয়েছে, ধান নষ্ট করেছে, জমিদারের মেয়েকে ফেলে দিয়েছে সর্বোপরি গফুরের সেই উদ্ধত উক্তি-"মহারাণীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাবো না।"[১৫] এরই ফলশ্রুতিতে জমিদার বাড়িতে পেয়াদার হাতে গফুরকে মার খেতে হয়েছে। ক্রুদ্ধ, ও ক্ষুব্ধ গফুর উন্মাদ হয়েছে যখন সে দেখতে পেয়েছে তৃষ্ণার্ত মহেশ আমিনাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা বিক্ষিপ্ত ভাঙ্গা ঘটের জল মরুভূমির মত শুষে নিচ্ছে। এই দৃশ্যই গফুরকে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য করে তুলেছে। পরিণতিতে লোহার লাঙ্গল দিয়ে গফুর মহেশকে আঘাত করেছে, যে মহেশকে সে সন্তানের মতো ভালবাসে।

> *"একটিবার মাত্র মহেশ মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরেই তাহার অনাহার ক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। চোখের কোণ বাহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ও কান বাহিয়া ফোঁটা কয়েক রক্ত গড়াইয়া পড়িল। বার-দুই সমস্ত শরীরটা তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উথিল, তার পরে সম্মুখ ও পশ্চাতের পা-দুটো তাহার যতদূর যায় প্রসারিত করিয়া দিয়া মহেশ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।"*[১৬]

গল্পটির শিল্পকুশলতা এখানেই ব্যক্ত হয়েছে। একটি আকস্মিক কারণে ট্রাজেডি নেমে এসেছে গফুরের জীবনে। মহেশের প্রতি গফুরের ভালোবাসার খামতি ছিল না। গো হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করতে শেষপর্যন্ত গফুর নিজের শেষ সম্বল ভিটেমাটি, তার খাওয়ার পিতলের থালা ও জল খাওয়ার ঘটি রেখে গিয়েছে। শুধু একটি প্রার্থনা করেছে ঈশ্বরের কাছে-

> *"নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিও, কিন্তু মহেশ তোমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না।"*[১৭]

পশুপ্রেমমূলক আর একটি গল্পের সন্ধান আমরা পাই লেখক রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম রচিত 'লম্বকর্ণ' নামক গল্পে। গল্পটিতে একটি ছাগলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। গল্পটিতে লেখক পশুপ্রেমের মোড়কে অনাবিল হাস্যরসের উন্মোচন করেছেন। গল্পের শুরুতেই রায় বংশলোচন ব্যানার্জি বাহাদুর জমিদার অ্যান্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বিকালে খালের ধারে একটি ছাগলের সাক্ষ্যাৎ ঘটে। স্ত্রীর প্রতি ভয় থাকা সত্ত্বেও, সেই ছাগলকে তিনি নিজের বাড়ি নিয়ে আসেন-

> *"একটা পাঁঠা পুষিবেন তাতে কার কি বলার আছে? তাঁর কি স্বাধীনভাবে একটা শখ মিটাইবার ক্ষমতা নাই? তিনি একজন মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তি, বেলেঘাটা রোডে তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বিস্তর ভুসম্পত্তি। তিনি একজন খেতাবধারী অনারারি হাকিম, - পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, এক মাস পর্যন্ত জেল দিতে পারেন। তাঁহার কিসের দুঃখ, কিসের লজ্জা, কিসের নারভেস্‌নেস? বংশলোচন বার বার মনকে প্রবোধ দিলেন- তিনি কাহারও তোয়াক্কা রাখেন না।"*[১৮]

সাহস করে তিনি নব আবিষ্কৃত পাঁঠাটিকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। মজলিশি আড্ডার বন্ধুগণ পরামর্শ দিলেন পাঁঠাটির কালিয়া হোক, তবে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হবে। কিন্তু বংশলোচনবাবু তাতে রাজী হলেন না। পাঁঠার নামকরণ করা হল লম্বকর্ণ।ক্রমে পাঁঠাটির অত্যাচারে বাড়ীর লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। স্ত্রী মানিনীর সাথে একপ্রস্থ মনোমালিন্যও হয়ে গেছে। তিনি শোবার ঘর ছেড়ে বৈঠকখানায় আশ্রয় নিলেন। কিন্তু পাঁঠাটির অত্যাচার এতটাই বাড়বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে যে, তিনি পাঁঠাটিকে বেলেঘাটা কেরোসিন ব্যান্ডের ব্যান্ড মাষ্টার লাটুবাবুর হাতে তুলে দিলেন। শর্ত তিনি একটাই রাখলেন "ছাগলটিকে আপনি যত্ন করে মানুষ করবেন, বেচতে পারবেন না, মারতে পারবেন না।"[১৯] লাটুবাবু রাজী হয়ে নিয়ে গেলেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই লাটুবাবু ফিরে বংশলোচন বাবুর বাড়ী ফিরে এলেন। কারণ লম্বকর্ণ লাটুবাবুর ব্যান্ডের ঢোলের চামড়া কেটেছে, ব্যায়লার তাঁত খেয়েছে, হারমনিয়ার চাবি সমস্ত চিবিয়েছে।আর তাঁর পাঞ্জাবির পকেটে থাকা নব্বই টাকার নোটও চিবিয়েছে। এত কিছু শোনার পর বংশলোচনকে একশ টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে। লম্বকর্ণকে নিয়ে আরও মুশকিলে পড়লেন বংশলোচন। ঠিক করলেন প্রভাতে যেখান থেকে তিনি লম্বকর্ণকে পেয়েছেন সেখানেই পুনরায় তাকে রেখে আসবেন। যথারীতি লম্বকর্ণকে সেখানেই রেখে তিনি লম্বকর্ণের গলায় একটি কাগজ টিনের কৌটায় বেঁধে দিলেন। কাগজে তিনি লিখলেন-"এই ছাগল বেলেঘাটার খালের ধারে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম, প্রতিপালন করিতে না পারায় আবার সেইখানেই ছাড়িয়া দিলাম। আল্লা কালী যিশুর দিব্য ইহাকে কেহ মারিবেন না।"[২০] ফেরার পথে দুর্যোগে বংশলোচন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। এই দুর্যোগে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছে একমাত্র লম্বকর্ণই। লম্বকর্ণের সেই কাহিনী বংশলোচন শুনতে পান স্ত্রী মালিনীর বক্তব্যে-"ও বেচারা বৃষ্টি থামতেই ফিরে এসে তোমার খবর দিয়েছে। তাইতেই তোমায় ফিরে পেলুম। ওঃ, হরি মধুসূদন।"[২১]

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালাপাহার' ছোটগল্পটিতেও পশুপ্রেম বর্ণিত হয়েছে। একথা বলাইবাহুল্য যে, শিল্পি তারাশঙ্কর ছিলেন রাঢ় বাংলার অন্যতম কথাকার। রাঢ়ের জীবনযাত্রা তাঁর লেখনীতে প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থগুলিতে লিখেছেন যে, তিনি মানুষের পরিচয় নিতে চান, মানুষকে জানতে চান। আর সে কারণেই বিচিত্র ধরণের মানুষের খোঁজ পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। মানুষের পাশাপাশি তিনি মানুষ ও প্রাণীর প্রেমকে গল্পের বিষয়বস্তু করে তুলেছেন আলোচ্য 'কালাপাহাড়' গল্পে। কালাপাহাড় নামের মহিষ এক জীবন্ত চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গল্পের কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই রংলাল নামের একজন গৃহস্থ সম্পন্ন চাষি খুঁজে ফেরে একজোড়া বলদ। যে বলদ দিয়ে সে চাষ করবে, আর তা দিয়ে সোনা ফলাবে মাটিতে। প্রথমদিকে রংলালের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে তার নব্য শিক্ষিত পুত্র যশোদানন্দন। অর্থের টানাটানিও রংলালকে তাঁর ইচ্ছা থেকে টলাতে পারে না। সুরহা হয় বউয়ের গয়না দিয়ে। হাট গিয়েছিল সে বলদ কিনবার বাসনা নিয়ে, কিন্তু হাটে গিয়ে তাঁর নজরে পরে যায় একজোড়া মহিষের উপর। স্বাস্থ্যবান মহিষ দুটি নজরে আসা মাত্র রংলালের কল্পনায় ভেসে উঠে হাল চাষের চিত্র। শেষপর্যন্ত একশ আটানব্বই টাকায় মহিষজোড়া কেনে রংলাল। মহিষ কেনায় বাড়ীর লোক খানিকটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, কিন্তু রংলাল তাঁর স্বীয়আনন্দে মশগুল। একটার নাম রাখে কালাপাহাড় ও অপরটির নাম রাখে কুম্ভকর্ণ। সবই ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু রংলালের জীবনে নেমে আসে এক অভাবিত দুর্ঘটনা। রংলাল নদীর চরে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণকে চড়াতে নিয়ে গেলে সেখানে বাঘের অতর্কিত আক্রমণ হয় রংলালের উপর। মালিক রংলালের প্রতি ভালবাসার দরুন কুম্ভকর্ণ ও কালাপাহাড় বাঘের এই অতর্কিত আক্রমণের উপযুক্ত জবাব দেয়। বাঘের সাথে লড়াই করে কুম্ভকর্ণ গুরুতর আহত হয়, ক্রমে বাঘের সাথে সেও মৃত্যুর কলে ঢলে পরে। একলা হয়ে যায় কালাপাহাড়, সাথীহীন জীবন ক্রমশ কালাপাহাড়কে আক্রমণাত্মক করে তুলেছিল। একবার রংলাল একটি নতুন মহিষকে কিনে এনেছিল কালাপাহাড়ের সাথী করার জন্য। কিন্তু কালাপাহাড় সেই মহিষকে সাথী মনে করেনি, তাকে মেরে ফেলেছে। এহেন বিষময় অবস্থায় কালাপাহাড়কে বিক্রি করে দেওয়া

ছাড়া রংলালের আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু রংলালকে ছেড়ে কালাপাহাড় থাকতে পারবে না। একবার রংলাল তাকে বিক্রি করে দিলে সে পুনরায় রংলালের বাড়িতেই ফিরে এসেছে। ক্রমশ বিরক্ত হয়ে রংলাল গ্রামের থেকে দূরের হাটে কালাপাহাড়কে বিক্রি করে দিয়েছে। কালাপাহাড়ে ভাবনাকে লেখক খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন-

> *''সে রংলালকে খুঁজিতেছিল। কিন্তু কই- সে কই? পাইকারটা লাঠি দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া তাড়া দিল, চল্ চল্।*
>
> *কালাপাহাড় আবার ডাকিল, আঁ- আঁ-আঁ।*
>
> *সে খুটি পাতিয়া দাঁড়াইল, যাইবে না।*
>
> *পাইকারটা আবার তাহাকে আঘাত করিল। কালাপাহাড় পাগলের মত চারিদিকে রংলালকে খুঁজিতেছিল।*
>
> *কই, সে কই? নাই, সে তো নাই।*
>
> *কালাপাহাড় দুর্দান্ত টানে পাইকারের হাত হইতে আপন গলার দড়ি ছিনাইয়া লইয়া ছুটিল।''*[২২]

এই ছোটাই কালাপাহাড়ের কাল হল, চলতি হাট বাজারে কালাপাহাড়ের উন্মত্ততাই পুলিশ সাহেবকে গুলি করতে বাধ্য করেছে, নির্মম ভাবে তাকে মরতে হয়েছে। 'আঁ – আঁ- আঁ' এই তিনটি শব্দের মধ্য দিয়েই লেখক মানুষ ও পশুর ভালবাসাকে দর্শিত করেছেন।

মানুষ ও প্রাণীর মেলবন্ধনের কথা পাওয়া যায় তারাশঙ্কর বন্ধ্যোপাধ্যায়ের রচিত নারী ও নাগিনী নামক গল্পেও। গল্পের প্রধান চরিত্রগুলি হল খোড়া শেখ, জোবেদা, ও উদয়নাগ সাপিনী। উদয়নাগ কোন মানব চরিত্র নয়, একটি সাপ কিন্তু নিজের অস্তিত্বে সে তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে। খোড়া শেখ পেশায় সাপের ওঝা। সাপ নিয়ে সে খেলা করে। সাপের ওঝা বা বাজিকর পেশায় তার দিন অতিবাহিত হতে চায় না। সংসার চালাতে তাকে মাঝে মধ্যে মজুরিও খাটতে হয়। জোবেদা তার স্ত্রী। সুখের সংসারে তাদের দিন কোনরকমে চলে যায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন খোরা শেখ ইটের পাজরে একটি উদয়নাগের শিশু রূপ দেখে মোহিত হয়ে যায়। এই শিশু সাপিনীকে সে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। এরপরেই সেই সাপিনীর প্রতি খোরা শেখের প্রেম জেগে উঠে। একটি সাপের প্রতি একজন মানুষের প্রেম। ঘটনাক্রমে ছয় মাস অতিবাহিত হয়। খোড়া শেখ সাপিনীর জন্য একটি মিনি নিয়ে আসে। যেমন করে একজন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসায় তার জন্য উপহার নিয়ে আসে তেমনি সাপিনীর জন্য খোড়া শেখ নিয়ে আসে মিনি। এই প্রেমেই তার স্ত্রী জোবেদার ঈর্ষার কারণ। জোবেদা সাপিনীকে নিজের সতীনের মতো দেখে। কারণ খোড়া শেখের ভালোবাসার অনেকটাই চলে যায় সাপিনীর প্রতি। অন্যদিকে সাপিনীও জোবেদাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে। একসময় খোড়া শেখ সাপিনীকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসে, কিন্তু সাপিনী আবার ফিরে আসে তার বাড়িতে। জোবেদা ঘুটে দিয়ে সাপিনীকে মারে, প্রতিশোধকল্পে সাপিনীও সেই রাত্রে জোবেদাকে কামড়ে দিয়ে যায়। স্ত্রীর প্রতি গভীর প্রেম থাকার দরুন খোড়া শেখ উচ্চারিত করে যদি জোবেদা না বাঁচে, তবে সাপিনীও বাঁচবে না। জোবেদার মৃত্যু হয়েছে, সেই অনুযায়ী সাপিনীকে হত্যা করার কথা ছিল খোড়া শেখের, কিন্তু পরবর্তীতে তা আর হয়ে উঠেনি। খোড়া শেখ সাপিনীর প্রতি ভালবাসায় তাকে হত্যা করতে পারেনি। আলোচ্য গল্পে ঈর্ষাই প্রধান রূপে দেখা দিয়েছে। যার প্রমাণ আমরা পাই গল্পের শেষে খোড়া শেখের স্বীকারোক্তিতে-'' শুধু তার দোষ কি, মেয়ে জাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।''[২৩]

সৈয়দ মুজতবা সিরাজের 'গোঘ্ন' গল্পটি পশুপ্রেমের এক বলিষ্ঠ উদাহরণ। গল্পের কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই গাড়োয়ান হারাই বাঘেরি অঞ্চলের বাসিন্দা। রোজ শীতে তাঁরা রাঢ় অঞ্চলে আসে ধানের জন্য। চারু মাষ্টারের মেয়ের বিয়েতে সে বড়ভাই এর কথা রক্ষা করার জন্য কুমড়ো ও কলাই নিয়ে আসে চারু মাষ্টারের বাড়িতে। ফেরার পথে তার গাড়ির দুটো গরুর মধ্যে একটি গরু অসুস্থ হয়ে পড়ে। চারু মাষ্টার বিদায়কালে হারাইকে বলে অসুস্থ গরুটিকে কবিরাজ পরিমল বৈদ্যকে দেখাতে। পরিমল বৈদ্যর ওষুধ খেয়েও ধনা(গল্পে উল্লেখিত গরু) সুস্থ হয়ে উঠে না। বাকী পথ কিভাবে যাবে এই প্রশ্নই হারাইয়ের মাথায় দুঃশ্চিন্তা বয়ে নিয়ে আসে। শেষে নিজেকেই গরুর জোয়াল টানতে হয়। মেদীপুরের পথে রাতের অন্ধকারে দেখা হয় গরুর পাইকার দিলজানের সঙ্গে। দিলজান হারাইকে জানায় তার এই অসুস্থ গরু বেশিক্ষণ টিকবে না। এই সুযোগে সে ধনাকে কিনে নিতে চায়। প্রলোভন দেখায় হারাইকে। ৫০ টাকার বিনিময়ে এই গরু দিলজান কিনে নিতে চায়। সেইসঙ্গে হারাইকে জানায় যেহেতু সে

জাতভাই, তাই এই গরু মানুষের ভোগে লাগুক। দিলজানের কথা শুনে হারাই চমকে উঠে। সন্তানতুল্য ধনাকে সে কখনো একজন কসাইয়ের হাতে তুলে দেবে না। রাগান্বিত হয়ে দিলজানকে সে চলে যেতে বলে।

এই দিলজানকেই আবার পাওয়া যায় মেদীপুরের হাটে। সেদিন ছিল মেদীপুরের হাট। রাত্রিটুকু কোনরকমে কাটে হারাইয়ের। সকাল সকাল সে এসে পৌঁছয় মেদীপুরের হাটে। তার গরুর অবস্থা দেখে সবাই তাকে গরুটি বিক্রি করার পরামর্শ দেয়। কিংকর্তব্যবিমুঢ় হারাই ধনাকে বিক্রি করে দেয় দিলজানের কাছে। এরপর হারাইের সাথে সাক্ষ্যৎ হয় পুণ্যাত্মা বদর হাজির। বদর হাজি হারাইকে রাত্রিটুকু তার আশ্রয়ে থাকার আমন্ত্রণ জানান। সেখানে অন্যান্য বাঘারি গাড়োয়ানদের সাথে হারাইয়ের খানাপিনার ব্যবস্থা করে বদর হাজি। নৈশভোজে গাড়োয়ানদের পাতে তুলে দেওয়া হয় গরুর মাংস। এই মাংস হারাই মুখে তোলার সময় বদর হাজি ও মৌলবির কথোপকথনে জানতে পারে এই মাংস কেনা হয়েছে দিলজানের থেকে।হারাইয়ের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মাংস সে মুখে তুলেছে তা আসলে তার আদরের সন্তানতুল্য ধনার। ক্ষোভে, ঘৃণায়, সে ফেটে পড়ে। তার এই ঘৃণা দেখে বদর হাজি ও অন্যান্য গাড়োয়ানরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। গল্প শেষ হয়েছে হারাইয়ের ভাঙ্গা গলার চিৎকারে-

> ‘‘হেই হাজি সাব! আমাকে হারাম খাওয়ালেন!
>
> ...
>
> হারাই কথা কানে নেয় না। বারান্দা থেকে নিচে নেমে রাতের আবহমণ্ডল এফোঁড় ওফোঁড় করে বলে- হামাকে হামার বেটার গোশতো খাওয়ালেন! হেই হাজিসাব ! হামার ভেতরটা জ্বলে খাক হয়ে গেল গে ! এক –পদ্মার পানিতেও ই আগুন নিভবে না গো।’’[২৪]

গল্পটির শেষে হারাইয়ের বেদনার্ত উক্তিতেই গল্পটি রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য গল্পগুলিতে পশুপ্রেমের আড়ালে একদিকে বর্ণিত হয়েছে সমাজের বীভৎসতা, অন্যদিকে নরনারীর সম্পর্কের জটিলতা উন্মচিত হয়েছে। আমরা মহেশ গল্পে পেলাম প্রান্তিক মানুষের জীবনের ছায়াছবি, যেখানে সমাজের প্রতাপ প্রবল। অন্যদিকে ‘নারী ও নাগিনী’ গল্পতে রয়েছে সাধারণ নরনারীর সম্পর্কের জটিলতা ও ঈর্ষা। ‘কালাপাহাড়’, ‘আদরিনী’ ও ‘লম্বকর্ণ’ গল্প তিনটিতে যে বাৎসল্য রসের পরিচয় পাওয়া যায় তা এককথায় অনির্বচনীয়।

তথ্যসূত্র:

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, এস. বি.এস পাবলিকেশন, কলকাতা-৭০০০০৯,প্রথম প্রকাশ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ১৯৫
২) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯৮
৩) চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ সম্পাদনা, প্রভাতকুমারের শ্রেষ্ঠগল্প, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলিকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ. পৃষ্ঠা-৩
৪) তদেব,পৃষ্ঠা- ৭
৫) তদেব,পৃষ্ঠা- ৯
৬) তদেব,পৃষ্ঠা- ১০
৭) তদেব পৃষ্ঠা- ১০
৮) তদেব পৃষ্ঠা- ১০
৯) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার সম্পাদনা, বাংলা গল্পসংকলন প্রথম খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমি, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ. পৃষ্ঠা- ১২১
১০) তদেব পৃষ্ঠা- ১২২
১১) তদেব পৃষ্ঠা- ১২৩
১২) তদেব পৃষ্ঠা- ১২৫
১৩) তদেব পৃষ্ঠা- ১২৬

১৪) তদেব পৃষ্ঠা- ১২৭
১৫) তদেব পৃষ্ঠা- ১২৭
১৬) তদেব পৃষ্ঠা- ১২৭
১৭) তদেব পৃষ্ঠা- ১২৮
১৮) বসু, রাজশেখর, একালের ছোটগল্প সঞ্চয়ন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৭০০০৭৩, প্রথমসংস্করণ ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা-৩
১৯) তদেব, পৃষ্ঠা- ৮
২০) তদেব, পৃষ্ঠা- ১২
২১) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪
২২) ভট্টাচার্য, জগদীশ সম্পাদনা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৭৩
২৩) তদেব, পৃষ্ঠা-৬৪
২৪) সিরাজ, সৈয়দমুজতবা, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথমপ্রকাশ ২০০৭. মুদ্রণ, পৃষ্ঠা- ৬৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১) বসু, রাজশেখর, পরশুরাম গল্পসংগ্রহ, এন.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ প্রকাশ ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ. মুদ্রণ

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1100-1106
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.110

কবিতা সিংহের ছোটগল্পের আঙ্গিক ও আবহ: প্রসঙ্গ 'পার্শ্বচরিত্র' ও 'খেলতে খেলতে- একদিন'

মেঘা ভট্টাচার্য, *অতিথি অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ (স্নাতকোত্তর পর্যায়), ময়নাগুড়ি কলেজ, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 30.04.2025; Accepted:14 .05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The present article analyzes the stylistic aspects of the stories of the bengali author Kabita Sinha based on two of her short stories. The short stories are– 'Parshwacharitra' and 'Khelte Khele- Ekdin'. Discussing form involves examining how the storyteller uses naming, character, setting, scene, sentence structure, imagery and other tools to complete or bring the content of the story to its ultimate conclusion. This article sheds light on the nature, content, significance of the naming, and characterization in the two short stories, and how they reach their conclusions. Plot construction plays a crucial role in the discussing form, and this article analyzes the plot construction, narrative technique, use of imagery, similes, and symbols, as well as the sentence structure of the story, and how it reveals the internal conflicts of the characters or event. The article concludes by reviewing the distinctive features of the stories' beginnings and endings.

Keywords: Naming, Characterization, Plot construction, Imagery, Syntax, Ending

(১)

ছোটগল্পের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে কবিতা সিংহ (১৯৩১-১৯৯৮) তাঁর মায়ের উক্তি স্মরণ করে বলেছিলেন- "ছোটগল্প মেয়েদের কাঁচুলির মত- তাতে দরকার ছাড়া এক চিলতেও কাপড় থাকতে পারে না"[১]। ছোটগল্পের রীতি নিয়ে আলোচনায় যে বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা বাঞ্ছনীয় তা মোটামুটি এরকম যে তাতে আরম্ভের তির্যকতা, চমৎকারিত্ব, প্রতীকধর্মীতা থাকবে, এতে কাহিনির একমুখীনতা, একটি মহামুহূর্ত বা 'ক্লাইম্যাক্স' থাকবে, গল্পের পরিনতিতে ব্যঞ্জনা সহ ভাষা ও গদ্যভঙ্গির মধ্যে চিত্রকল্পের সহজ প্রকাশ থাকবে ইত্যাদি[২]। বর্তমান প্রবন্ধে কবি, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক, ও ছোটগল্পকার কবিতা সিংহের ছোটগল্পের আঙ্গিক ও আবহ বিশ্লেষণের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস করতে চলেছি। এই উদ্দেশ্যে তাঁর রচিত দুটি গল্পকে নির্বাচন করেছি-'পার্শ্বচরিত্র' ও 'খেলতে খেলতে-একদিন'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যে ছোটগল্প' গ্রন্থে ছোটগল্পকে যন্ত্রণার ফসল বলে উল্লেখ করেছিলেন। বিশ শতকে প্রকাশিত এই দুই গল্পেও ভিন্ন ভিন্ন জীবন-যন্ত্রণা বা সংকট কীভাবে ক্রমে ক্রমে নিজস্ব পরিধি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে পাঠকহৃদয়কে গভীর ব্যঞ্জনায় আচ্ছন্ন করেছে তা লক্ষনীয়। 'কাঁচুলির' আচ্ছাদনটুকু রক্ষা করে অপূর্ব দক্ষতায় গল্পকার সমাজের বিবেকের প্রতি নানা প্রশ্ন রেখে গেছেন। মূলত, এই প্রবন্ধের বিষয় উপরোক্ত গল্প দুটির আঙ্গিক অর্থাৎ গল্পকার একটি বিষয়/ Content-কে রূপদান করার সময় যেভাবে চরিত্র, পটভূমি, পরিবেশ, দৃশ্য, সংলাপ, বাক্য, চিত্রকল্পকে ব্যবহার করে তার রূপায়ণ করেছেন তার পর্যালোচনা করা। এই আঙ্গিকগত উপাদানগুলি একটি গল্পের আবহ নির্মাণ করে তাকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়। গল্পগুলির আঙ্গিক ও প্রকরণগত বৈশিষ্টের স্বরূপে নিম্নে আলোকপাত করা হল।

কবিতা সিংহের সৃষ্টিতে 'নারী' বরাবরই তার ভিন্ন স্বতন্ত্রসত্তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তাঁর ছোটগল্পগুলি সর্বজ্ঞকথন বা আত্মকথনের ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে গল্পের চরিত্রদের চিন্তাভাবনা বলিষ্ঠভাবে পাঠকের মনে দাগ রেখে যায়। ছোটগল্পের আঙ্গিকের আলোচনায় 'নামকরণ' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নামকরণ নামক চাবিকাঠি দিয়েই পাঠক গল্পের অন্দরমহলে প্রবেশ করেন। প্রথমেই নামকরণের পাশাপাশি গল্পের চরিত্রায়ন/ characterization এর উপরেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন কারণ উভয়ে মিলিতভাবে গল্পের মূল থিম-কে পরিণতি দান করে। 'পার্শ্বচরিত্র' গল্পের নামকরণটি চরিত্রকেন্দ্রিক। লেখক সুশোভন ঘোষের 'রানী' গল্পে পার্শ্বচরিত্র শোভনা প্রেমহীন বিবাহিত জীবনের চেয়ে বিবাহহীন কেরানী জীবন অনেক বেশি শ্রেয় মনে করেছে। তাই নামহীন এক পাঠিকা লেখককে একটি বিষয়ে সমালোচনা করে চিঠি লিখেছে, আর এই চিঠিই আলোচ্য গল্প 'পার্শ্বচরিত্র'। পত্রগল্পের আদলে লেখা এই গল্পে পত্রলেখিকা জানতে চেয়েছে পার্শ্বচরিত্রদের নিয়ে কেন কোনো গল্প লেখা হয় না আর লিখলেও তারা শেষপর্যন্ত খাঁটি পার্শ্বচরিত্র হয়েই থাকছে কি না। সুশোভনবাবু 'রানী' গল্পের পার্শ্বচরিত্র শোভনাকে দিয়ে তার গল্প শুরু করেছেন এইভাবে 'একটি কেরানী মেয়ের বিনিদ্র রাত্রির চিন্তা' দিয়ে। অথচ গল্পের শুরুতেই মেয়েটির 'শয়নঘর' তার 'রাত্রিকে উন্মোচিত' করে দেওয়ার চেষ্টাকে নিন্দা করেছেন পত্রলেখিকা। সুশোভনবাবু যেভাবে শুধুমাত্র 'যৌবনজ্বালার' বর্ণনা দিয়ে গল্প দাঁড় করিয়েছিলেন তাতেই একান্ত আপত্তি পত্রলেখিকার। তাঁর মতে 'যৌবনজ্বালাই' সব নয় আবার তা অনেকটাই। চিঠির বয়ানে গল্প এগোলে বুঝতে পারি লেখিকার সুচারু বুনোনে পত্রপ্রেরণকারী নারী আর তার আইডিয়াল পার্শ্বচরিত্র 'শোভনা' মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আসলে 'শোভনা'-রাও কষ্ট পায় একলা বিকেলে একলা চলার কষ্ট। একটি বন্ধুর মত পুরুষসঙ্গীর অভাবের কষ্ট, কষ্ট শুধু রাত্রির অন্ধকারেই তীক্ষ্ণ নখ মেলে আঘাত হানবে বিষয়টা তেমন নয়-

> "সে ভাবে এমন কোনো সঙ্গী যদি তার থাকত, যার সঙ্গে সে একমন চোরকাঁটা ডিঙিয়ে, শাড়ি লুটিয়ে চলে যেতে পারত ময়দানের মাঝখানে।...একটি বন্ধুর মতো পুরুষের অভাবে, ঐ নির্জন গোধূলির বিশেষ অনুভবের নাগাল শোভনা পেল না।"[৩]

ক্রমে গল্পে শোভনার নায়ক হিসেবে সঞ্জীবের আগমন ঘটে। সে তার পাশের বাড়ির বিকলাঙ্গ প্রাক্তন প্রেমিকাকে গ্রহন না করার ইতিবৃত্ত শুনিয়ে শোভনাকে একটি প্রেমহীন বিয়ের প্রস্তাব দেয়-

> "আমি তোমায় ভালবাসি না, তবু বিয়ে করব, কারণ বিয়ে আমায় করতে হবেই, আর দুজনের টাকায় অনটনের কুশ্রী মুখটা আমরা ঢাকতে পারব।"[৪]

শোভনা তার নায়ককে বিয়ে করেনি- প্রেমহীন বিবাহিত জীবনের থেকে বিবাহহীন কেরানী জীবন অনেক স্বস্তির মনে হয়েছিল তার। আর এখানেই পত্রলেখিকার দাবি সুশোভনবাবু শোভনাকে তাঁর 'পার্শ্বচরিত্র' হিসেবে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। ভালোবাসাহীন 'অর্থনৈতিক সমঝোতায়' বিবাহে অস্বীকৃতি জানিয়ে শোভনার চরিত্রে 'নায়িকাত্ব' আরোপিত হল। এখানেই পত্রলেখিকা জানায় সে শোভনাকে নিজের আদলে নিঃশঙ্ক 'পার্শ্বচরিত্র'ই বানাতে চায়। সে নিজের জীবনেও যেমন এক 'সঞ্জীব'-কে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে গল্পের শোভনাকেও তাই করতে বলেছে। আসলে সে শেষপর্যন্ত সম্পর্ককে পরিণতি দেওয়ার মাধ্যমে দেখতে পরখ করে দেখতে চায় ভালবাসাহীন দুজন নিঃস্ব নরনারীর জীবন এক সুতোয় বাঁধা পড়লে প্রেম জন্মায় কি না! হয়ত অভ্যাসেই প্রতিরাতের মিলনে 'সেই আশ্চর্য রাসায়নিক উচ্চতায়' 'একটি ভীরু কাপুরুষ যুবক' ও 'একটি প্রায় গতযৌবনা রমণী' আগুন থেকে আলো হতে পারে কি না এই দেখার তীব্র বাসনায় গল্প শেষ হয়-

"এ আমি দেখব। আমি এই-ই হব। একটি কাটা সৈন্যের মতো হাস্যকরভাবে সাহসী পার্শ্বচরিত্র।"[৫] শ্রী সুমিত কুমার বড়ুয়া গ্রন্থের শুরুতে এই গল্পের মূল ভাব সম্পর্কে বলেছিলেন "শৃঙ্গার নয় উৎসাহ"[৬]; অবশ্যই এ বিগতযৌবনা নারীর আশ্রয়লাভের আকুতি নয় বরং শঙ্কাহীন এক নারীর সার্থকভাবে 'পার্শ্বচরিত্র' হয়ে ওঠার একটি চ্যালেঞ্জ।

'খেলতে খেলতে-একদিন' গল্পের নামকরণ বিষয়কেন্দ্রিক ও ব্যঞ্জনাময়। এই গল্পে 'অণিমা' এক বিপর্যস্ত মূল চরিত্র। তার স্বামী হিসেবে সুরেন, দেওর বীরেন তার স্ত্রী কণা ও তাদের সন্তান দীপুর নাম জানতে পারি। গল্পে দেখি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে সে মিথ্যে 'বাঁজা' আখ্যায়িত হয়ে অপমানিত হয়েছে। দেওরের ছেলে দীপুকে সে

আত্মহত্যার প্রতিশ্রুতি দিয়েও ফিরে এসেছে। স্বামী সুরেনের সাথে তার কোনো ভালোবাসার সম্পর্ক অবশিষ্ট ছিল না। সামান্য বিড়ালের প্রতি অসন্তোষও যখন সে প্রকাশ করেছে তখন সকলে বলেছে-

> “আরে বাবা বাঁজা তো। কী করে ষষ্ঠীর বাহনের মর্যাদা বুঝবে?... কালচার কালচার, এসব হলগে ফ্যামিলি ট্র্যাডিশনের ব্যাপার।”[৭]

আবার এই ‘কালচারসর্বস্ব’ বিশ্বাসঘাতক স্বামীই যখন অণিমার ওভারটাইমের টাকা চুরি করেছে সে দৃশ্যে তার ‘দমফাটা হাসি’ ছাড়া যেমন কোনো অনুভূতি জেগে ওঠেনি তেমনই স্বামীর সাথে দূরত্ব বৃদ্ধিতেই সে স্বস্তি পায়, গল্পকারের বর্ণনায়- “আজকাল আর স্বামীকে দেখিয়ে দেখিয়ে সে দুঃখের চ্যারিটি শো করে না।”[৮] আবারও ‘জীবন’ যদি একটা ‘খেলা’ হয় সেই ‘খেলা’ শেষ করার উপায় হিসেবে গোটা গল্প জুড়ে ‘নীল ঘুঁটি’ সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরে আবারও আত্মহত্যার চেষ্টা ত্যাগ করে গ্লানিময় জীবনেই ঘুরে দাঁড়িয়ে খেলা শেষের এই ‘একদিন’-এ পৌঁছেছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া ‘অণিমা’ চরিত্রকে ব্যবহার করে গল্পকার বিপর্যস্ত নারীহৃদয়ের বেঁচে থাকার প্রতি মুহূর্তের সংগ্রামকে দেখিয়েছেন।

(২)

ছোটগল্পের আঙ্গিক বিশ্লেষণে বৃত্ত গঠন/ Plot construction একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এতে সোপানারোহ গঠন/ Stair-step construction, চকিতোন্নত গঠন/ Rocket construction এবং ঘূর্ণরেখ গঠন/ Circular construction পরিলক্ষিত হয়। ছোটগল্পে কোনো অপ্রাসঙ্গিকতার সুযোগ না রেখে সংযতভাবে ক্লাইম্যাক্স-এর মাধ্যমে ঘটনার ব্যঞ্জনাময় সমাপ্তি ঘটাতে হবে। ‘খেলতে খেলতে- একদিন’ গল্পের ক্ষেত্রে সোপানারোহ গঠন পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। একটি প্রারম্ভিক ঘটনা বা Initial incident দিয়ে গল্পের সূচনা হয়েছে-

> “সদর দরজা ঠেলে বাড়ির ভিতর ঢুকেই অনিমা... দীপুকে দেখল... দীপু বলল- তবে যে সকালে বলে গেলে বাড়ি ফিরবে না, গাড়ি চাপা পড়ে মরবে?”[৯]

ক্রমশ গল্প এগিয়েছে।

অণিমা দীপুকে আত্মহত্যার প্রতিশ্রুতি দিয়েও ফিরে এসেছে(সূচনা)➔পুনরায় আত্মহত্যা করার জন্য ঘুমের ওষুধ ক্রয় করেছে➔ আত্মহত্যা করার সময় চূড়ান্ত উপলব্ধি(ক্লাইম্যাক্স)➔ সে বেঁচে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় (সমাপ্তি)

‘পার্শ্বচরিত্র’ গল্পের গঠনবিন্যাসও মূলত সোপানারোহ প্রকৃতির। একমুখী হয়ে কাহিনী এগিয়ে গেলেও ক্লাইম্যাক্সের পরে ভিন্ন ধরণ এখানে দেখা যায়-

সুশোভনবাবুকে পত্রপ্রেরনকারী নারী চিঠি লিখছে(সূচনা)➔ সঞ্জীবের সাথে শোভনার ভালোলাগার পর্ব➔সঞ্জীবের শোভনাকে প্রেমহীন বিবাহ এবং অর্থনৈতিক সুবিধার স্বার্থে বিয়ের প্রস্তাব প্রদান➔ শোভনার ‘নায়িকাসুলভ’ আচরণ ক’রে এই কুশ্রী প্রস্তাব ত্যাগ করার প্রসঙ্গ(ক্লাইম্যাক্স)➔ পত্রলেখিকা চায় শোভনা সঞ্জীবকে বিয়ে করে তারই আদলে আদর্শ ‘পার্শ্বচরিত্র’ হয়ে উঠুক➔ পত্রলেখিকা ও তার সৃষ্ট ‘ideal’ শোভনা যে একই নারী তার স্বীকারোক্তির উল্লেখ (সমাপ্তি)

ক্লাইম্যাক্সের পরে মূলত দ্বিমুখী ঘটনা ঘটতে দেখা গেল। প্রথমত, ‘রানী’ গল্পের শোভনা সঞ্জীবকে বিয়ে না করে একলা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ‘রানী’ গল্পের সমাপ্তি ঘটাল, দ্বিতীয়ত, গল্পের এই সমাপ্তির বদলে পত্রলেখিকা চায় ‘শোভনা’ তারই মতো সঞ্জীবকে বিয়ে করে যথার্থ ‘পার্শ্বচরিত্র’ হয়ে উঠুক। প্রকৃত Circular construction এখানে ঘটেনি কারণ বৃত্তাকারে ব্যাকগ্রাউন্ড-এ কোনো অতীত কাহিনী এগোয়নি। তা সত্ত্বেও যেভাবে পত্রলেখিকা বর্তমানে চিঠি লিখছে (‘পার্শ্বচরিত্র’ গল্প) এবং তার চিঠি জুড়ে পূর্বে প্রকাশিত সুশোভনবাবুর ‘রানী’ গল্পের সংশোধনপ্রক্রিয়া চলেছে অর্থাৎ গল্পের ভেতর গল্পের এই দ্বিবিধ Parallel technique পরিলক্ষিত হয়, যা অভিনব।

আঙ্গিকের আলোচনায় ‘খেলতে খেলতে- একদিন’ গল্পের বিশ্লেষণে পরিলক্ষিত হয় গল্পটি সর্বজ্ঞকথনরীতিতে রচিত হয়েছে। অণিমার মনের মধ্যে ‘Third person omniscient’ আলো ফেলে সর্বজ্ঞতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বর্ণনাত্মক রীতিতে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে। এক্ষেত্রে ‘Flashback’ রীতির প্রয়োগ দেখা গিয়েছে, অর্থাৎ

বর্তমানে উপস্থিত থেকে অতীতের স্মৃতিচারণ করে পুনরায় বর্তমানে ফিরে আসা। যেমন- অণিমা নিজের জীবনের ইচ্ছে বিসর্জন দিয়ে (সুবলের সাথে কথপোকথনে জানা যায় সে প্রফেসর হতে চেয়েছিল) সুরেনের সাথে পালিয়ে বিয়ে করেছিল। বিবাহপরবর্তী জীবনেও সে ক্লেদাক্ত পঙ্কিল সম্পর্ক বহনে ক্লান্ত বিপর্যস্ত হয়ে ফ্ল্যাশব্যাকে ছোটবেলায় ফিরে গেছে, ভেবেছে-

> ''ছোটোবেলায় মা কাঁসার বাটিতে দুধ দিত। দুধ খেয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে সেই খাঁটি দুধের স্বাদ মুছে ফেলে অণিমা মেরুদণ্ড সোজা করে... পড়ার দিকে মুখিয়ে দাঁড়াত। এখন কোথায় সেই সব? নির্ভেজাল, খাঁটি, আসল?''[১০]
>
> অথবা,''ছোটোবেলায় খেলাফেরত বাড়ি ফিরলে মা যখন ধোয়া ফ্রক, মুচমুচে গামছা এগিয়ে দিত, তখনই তো অণিমা বুঝতো স্নান কত জরুরি।''[১১]

অর্থাৎ ফেলে আসা দিনের সাথে অণিমাকে গল্পকার এই ফ্লাশব্যাক পদ্ধতির মাধ্যমে যোগাযোগ করিয়েছেন।

'পার্শ্বচরিত্র'- গল্পটি উত্তমপুরুষ বা First person narration- এ বর্ণিত হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে সীমিত অংশে মধ্যমপুরুষে বর্ণনা আছে যেখানে পত্রপ্রেরণকারী নারী সুশোভনবাবুকে 'আপনি' সম্বোধন করে লিখেছেন- ''আপনার লেখা আমার ভালো লাগে''[১২] অথবা ''গল্পটি আপনি আরম্ভ করেছেন শোভনা নামে একটি কেরানী মেয়ের বিনিদ্র রাত্রির চিন্তা দিয়ে''[১৩] ইত্যাদি। এই গল্পে বিশেষভাবে চরিত্রের অনুভূতিকে চিত্রপটে ফুটিয়ে তোলার জন্য গল্পকারের হাতিয়ার হয়েছে চিত্রকল্প (Imagery)। কবিতা সিংহ তাঁর গল্পগুলিতে শক্তিশালী বেশ কিছু চিত্র, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি ব্যাবহার করে পাঠকের ইন্দ্রিয়কে সজাগ রেখেছেন। যেমন- 'পার্শ্বচরিত্র' গল্পে দেখি ক্যানভাসে শব্দের চিত্র এঁকেছেন গল্পকার – কলকাতা শহরে বিকেল নামার দৃশ্যে

> ''এইসব প্রাসাদ, সিনেমা, দোকানপাটের মধ্যে দিয়ে রোদ্দুরের হলুদ ঝরনা ছবিতে আঁকা অবাস্তব জ্যোতির মতো গলে গলে পড়ে, ময়দানের সবুজ ঘাস সেই তাপহীন আলোসর্বস্ব রোদে পেস্তারঙের হয়ে যায়;''[১৪]

'খেলতে খেলতে- একদিন' গল্পে অণিমা বাড়ি ফিরেই বুঝতে পেরেছিল তার স্বামী কাজে না গিয়ে ঘরে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আড্ডা দিয়েছে এবং এই বিষয়টি তার যে কত অপছন্দের তা বোঝানোর জন্য লেখিকা 'গন্ধের' মাধ্যমে তা পাঠকের মস্তিষ্কে পৌঁছে দিয়েছেন-

> ক। ''ঘরে কেমন গাঁজ ওঠা জ্যাম আর সিগারেটের পোড়া গন্ধ... বিছানাটা মানুষের গন্ধ মাখানো...ঘামে ভেজা ব্লাউজ-ব্রেসিয়ারের পূতিগন্ধ...দেশি মদের গন্ধ, চাপা অন্ধকার, ফ্যান-বন্ধ করা গলির গুমোট, এই সবকিছু আগুনের মত মেখে জড়িয়ে ঠায় পড়ে রইল চুপচাপ''[১৫]

অথবা অণিমা যখন বিনয়কে নিয়ে কাল্পনিক সংলাপে ব্যস্ত তখনই তার মনে হয় স্বামীর বন্ধুর সাথে তার যে একটি সম্পর্ক ছিল তাও যখন নষ্ট হল তখন তার চোখে সে কোথায় নেমেছিল তা বোঝাতে লেখিকা বলেছেন-
খ। ''হাতের রজনীগন্ধা থেকে যোনীর দুর্গন্ধ উঠতে লাগল''[১৬] অণিমা যখন দ্বিতীয়বার দীপুকে আত্মহত্যার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘর থেকে ত্রিশ টাকা নিয়ে বেরিয়ে যায় তখন বাইরে বেরিয়ে তার বেশ কিছুক্ষণ যে কোনো অনুভবশক্তি ছিল না সেই বিষয়টিকে উপমার সাহায্যে গল্পকার এভাবে দেখিয়েছেন-

> "বাইরে বেরিয়ে পড়ে অণিমার বেশ কিছুক্ষণ কোনো বোধ ছিল না। সদ্য জন্মাবার পর অনেক শিশু পাছায় চাপড় না খেলে যেমন কাঁদে না। তেমনি" ।[১৭]

অথবা দীপুকে দেওয়া প্রথমবারের আত্মহত্যার প্রতিশ্রুতি যে সত্য ছিল না তা বোঝাতে সে বলেছে কথাগুলি ছিল 'শো-করবার জন্য'- ''সামনে জামা, পেছন ন্যাংটো, বাক্সের পুতুলের মতো।''[১৮]

প্রতীকের ব্যবহারে উজ্জ্বল কবিতা সিংহের গল্প। 'পার্শ্বচরিত্র'- গল্পে দেখি, প্রথমত কেরানী মেয়েটির বাড়ি ফেরার ট্রামে দুই জানালায় দুই রকম দৃশ্য তার দ্বিধাবিভক্ত মানসিক স্তরকে ইঙ্গিত করে, দ্বিতীয়ত,

> ''রোজকার সেই সাদা রাজহাঁস ট্রাম, সেদিন তাকে একটা বন্ধ ময়াল সাপের মতো পেটে পুরে নিয়ে তার হোস্টেলের সামনে উগরে দেয়।''[১৯]

অর্থাৎ এই 'ময়াল সাপ'-এর পেটে পুরে থাকা জীবন তার একঘেয়ে বদ্ধ সঙ্গীহীন নিত্য অফিস যাতায়াতকেই ইঙ্গিত করে। সে তার জীবনে বিরক্ত হয়ে পড়েছিল বলেই তার পরের বাক্য- "এজন্য সঙ্গীর দরকার সুশোভনবাবু।"[২০] তৃতীয়ত, সঞ্জীবের প্রাক্তন বিকলাঙ্গ প্রেমিকাকে এখানে 'ছেঁড়া ন্যাকড়ার অকেজো বস্তা' এবং সেই মুহূর্তে তার 'পুরুষ' না হতে পারার বিষয়কে 'স্তম্ভিত ছন্নমতি বৃহন্নলা' বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। যা শব্দের আড়ালে সঞ্জীবের অক্ষমতার ব্যঞ্জনা ধারণ করে। তাকে সে গ্রহণ না করে শোভনার দিকে ঝুঁকেছিল কারণ শোভনার জীবনে আর্থিক নিশ্চয়তা ছিল। চতুর্থত, 'খেলতে খেলতে- একদিন' গল্পে কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফিরে অণিমা নোংরা, অগোছালো ঘরে কামনা করেছিল 'একটা ধোপভাঙা নিষ্কলঙ্ক সেমিজ'- যে শুভ্রতা ও শান্তি সে নিজের জীবনে চেয়েছিল তার প্রতীকই এই 'সেমিজ' এবং খেলার জন্য নীল ঘুঁটি' সংগ্রহ করা ছিল আত্মহত্যার জন্য ঘুমের ওষুধ সংগ্রহের প্রতীক। পঞ্চমত, এই গল্পেই একটি সাদা বিড়ালের উল্লেখ আছে। যাকে অণিমা পছন্দ করত না, অথচ সে নিজেই ছিল 'বিড়ালমুখি'। বিড়ালটি কিন্তু তার পিছু ছাড়ত না। গল্পের শেষাংশে দেখি অণিমা তার খেলার সিদ্ধান্ত বদলে বেঁচে থাকার সিদ্ধান্ত যখন নেয় তখনও এই বিড়ালের উপস্থিতি লক্ষনীয়-

> "গ্লাসের দিকে এবার হাতটা বাড়িয়ে দিল অণিমা। ঠিক তখনই হঠাৎ টেবিলের ওপর লাফিয়ে পড়ল বেড়ালটা। শব্দ করে উল্টে গেল গ্লাসটা।"[২১]

পনেরটা ঘুমের ওষুধ মেশানো জলের গ্লাসটি বিড়ালটিই উলটে ফেলে দিয়েছিল। এই সাদা বিড়ালটি ছিল তার বিবেকের প্রতীক। বিড়ালটির গ্লাস ফেলে দেওয়া= আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করার বিষয়- বুঝতে পাঠকের অসুবিধা হয় না।

(৩)

আলোচ্য কবিতা সিংহের গল্পগুলিতে বাক্যগুলি সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত, মাঝারি অথবা ছোট ধরণের প্রায় জটিলতা বর্জিত। 'পার্শ্বচরিত্র' গল্পে চিঠিতে একতরফাভাবে বাক্যবিন্যাস এগিয়েছে কোনো প্রত্যুত্তর নেই বলে একে কথপোকথন বলা গেল না-

> "সুশোভনবাবু সেদিন রাসবিহারী এভিনিউর মোড়ে ললিতা রায়ের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল। আশা করি মনে আছে।"[২২]

আবার যখন পত্রলেখিকা আবেগে উত্তেজিত হয়ে তার মানসিক অবস্থা প্রকাশ করতে চাইছে তখন তার বয়ানে ক্ষিপ্রতা এসেছে। ছোট ছোট অংশে বাক্য একটি কমা(,), সেমিকোলন(;), হাইফেন(-) ইত্যাদি বিরামচিহ্ন দ্বারা বিভক্ত হয়ে এগিয়েছে-

> "- ভালোবাসা বলব না সুশোভনবাবু, অত সাহস আমার নেই, বিনয় করে বলছি না, বিনয় ভাববেন না; …"[২৩]

বিশ শতককে বলা হয় 'Age of Interrogation'-"এ যুগ হল প্রশ্নচঞ্চল উৎকণ্ঠার যুগ, তীক্ষ্ণকণ্ঠ জিজ্ঞাসার যুগ, বিচিত্র বিস্ময় ও কৌতূহলের যুগ"[২৪]- এসময়ের গল্পগুলি যেন বিভিন্ন আঙ্গিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তার পরিপূর্ণ রূপ খুঁজে চলেছিল। 'খেলতে খেলতে- একদিন' গল্পে দেখা যায় চেতনাপ্রবাহের একটি বিস্তৃত পরিসর। মানবমনের মগ্নচৈতন্যলোকে Third person omniscient narrator আলো ফেলে চিন্তাভাবনাকে যেভাবে প্রবহমান করে তুলেছে তার বিপরীতে বাস্তব কথপোকথনের জায়গা অতি অল্প। যেমন- অণিমার সাথে দীপুর কথপোকথন "- খেলে না? -না -কখন ফিরবে? -ফিরবোই না, গাড়ি চাপা পড়ে মরব"[২৫] অপরদিকে বিনয়ের সাথে সে অর্ধেক পৃষ্ঠা জুড়ে মানসিকভাবে কথপোকথন চালিয়েছে। অথবা সুবলের সাথে দেখা করে ফের ট্যাক্সিতে বসে যে পুনরায় চিন্তাস্রোতে ডুবে গিয়েছিল তা তার নির্ভার চেতনার মতই সাবলীল, ক্রমাগত বয়ে চলা বাক্যস্রোত-

> "যখন শরীর থাকবে না তখন মনে হবে আহা সেই যে সারাদিন পরে কী অদ্ভুত ক্লান্ত হতুম, বিছানার জন্য কোষে কোষে এক ফোঁটা করে কান্না, পাকস্থলীর ভিতর খিদের জন্য পরতে পরতে ঘষা খাওয়া, মাথার ভিতরের ধূসর পরমাণুর মধ্যে সারিডনের জন্য তীব্র চিৎকার তৈরি করতুম… মূত্র নিঃসরণের সেই নির্ভার হওয়ার শারীরিক সুখ…"[২৬]

- অসমাপিকা ক্রিয়াকে ব্যবহার করে বাক্যকে দীর্ঘ করার এ এক বিশেষ কৌশল। যা পাঠকের আগ্রহকে বর্ধিত করে।[২৭] সামান্য সংলাপ এবং চিন্তার দীর্ঘ প্রবহমানতা এটাই বুঝিয়ে দেয় যে প্রতিনিয়ত অপমান সহ্য করার পর নিঃশব্দে এভাবেই জাগতিক মানুষের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছে যেন ‘অণিমা’ চরিত্রটি।

ছোটগল্পের সমাপ্তি প্রসঙ্গে আলোচ্য গল্পগুলিতে ‘Whip-crack ending’ বা চাবুক হাঁকড়ানো সমাপ্তি নেই, যা আছে তা হল ব্যঞ্জনাময় ব্যাপ্তি। ‘পার্শ্বচরিত্র’- গল্পের শেষে পত্রপ্রেরণকারী নারী জানায় তার মতে ‘রানী’ গল্পের শোভনা যথার্থ পার্শ্বচরিত্র হতে পারেনি। তাকে যথার্থ ‘পার্শ্বচরিত্র’ হতে গেলে তার জীবনের আদলেই সঞ্জীবকে বিয়ে করতে হবে। তার ‘ideal’ পার্শ্বচরিত্র শোভনা প্রেমহীন বিবাহের প্রস্তাবপ্রদানকারী ক্ষয়িষ্ণু, আর্থিক হিসাবে ‘দক্ষ’, ভীরু, কাপুরুষ নায়ককেই বিবাহের সিদ্ধান্ত নেয়। আর এখানেই পত্রলেখিকার সাথে তার ‘ideal’ শোভনা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। শেষবাক্যে সে বলেছে-

> ‘‘পুনশ্চঃ অনেক জায়গায় শোভনা আমি হয়ে গেছে, আমি, শোভনা বদলালাম না। কারণ আপনার কাছে নিজেকে লুকোতে পারিনি, চাইও না আর সেইজন্যই।’’[২৮]

এতে অবশ্য কোনো চমক সৃষ্টি হয় না। অন্তঃত, এক পৃষ্ঠা পাঠের পরেই সচেতন পাঠকের দৃষ্টিগোচর হবে সেই বাক্যটি ‘‘আপনার গল্পের নায়িকা শোভনাও কতকগুলো সাধারণের গুণের অধীন হওয়ায় তাকে বারবার আমাদের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছি’’[২৯]- এই শুরুর একাত্মতাই যে ছিল একাকার হয়ে যাওয়ার বীজ, তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না।

‘খেলতে খেলতে- একদিন’- গল্পের শেষে যেভাবে বিড়ালকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে জীবনে ফেরার দৃশ্য আঁকা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবুও সংশয় জাগে শেষ বাক্যে –
‘‘অণিমা ভাবলো, খেলতে যখন শিখে গেছে তখন খেলাই চলুক- খেলা চলুক...তারপর এভাবেই খেলতে, খেলতে, খেলতে...একদিন!’’[৩০]- ‘তারপর’ এবং ‘একদিন’ শব্দবন্ধ কী ইঙ্গিত করতে চাইল? হতে পারে এটি আত্মহত্যা মুলতুবি করার সেই জীবন বদলে দেওয়া বা ‘Life changing’ একদিনকে বোঝাতে চাইল অথবা হতে পারে সে যখন ‘খেলার ঘুঁটি’ (আত্মহত্যার উপকরণ) সংগ্রহ করা শিখেই গেছে এইবার না হোক কোনো ‘একদিন’ অনায়াসে হয়তো পুনরায় গ্রহণ করা কোনো এক হঠকারী সিদ্ধান্তের পূর্বাভাষ! যার উল্লেখ গল্পে নেই, এবং এখানেই গভীর ব্যঞ্জনা দোলায়িত হয় এই বিস্ময়সূচক চিহ্নের(!) মাধ্যমে। ছোটগল্প তার পরের কথা শোনানোর দায় নেয় না। এক অপূর্ব ঘটনার বুনোনে, জীবন জিজ্ঞাসায়, নারীত্বের চেতনায় তাঁর অভিনব প্রকাশ-আঙ্গিকে আলোচ্য কবিতা সিংহের ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

তথ্যসূত্র:

১। সিংহ, কবিতা, ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা- ৭০০০৭৩, সেপ্টেম্বর ২০২০, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৩, পৃষ্ঠা-৯
২। দত্ত,বীরেন্দ্র, ‘বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ’ (প্রথম খণ্ড), পুস্তক বিপণি প্রকাশনী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ১৯৫৫, পৃষ্ঠা- ৭
৩। পূর্বোক্ত, ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’, পৃষ্ঠা- ৫১-৫২
৪। পূর্বোক্ত, ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’, পৃষ্ঠা-৫৫
৫। পূর্বোক্ত, ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’, পৃষ্ঠা- ৫৬
৬। পূর্বোক্ত, ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’, পৃষ্ঠা- ২৫
৭। পূর্বোক্ত, ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’, পৃষ্ঠা- ৮৩
৮। পূর্বোক্ত, ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’, পৃষ্ঠা- ৮৩
৯। পূর্বোক্ত, ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’, পৃষ্ঠা- ৮০
১০। পূর্বোক্ত, ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’, পৃষ্ঠা- ৮৩-৮৪

১১। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৮২
১২। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৪৯
১৩। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৫০
১৪। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৫১
১৫। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৮০
১৬। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৯৩
১৭। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৮৫
১৮। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৮৬
১৯। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৫২
২০। পূর্বোক্ত,'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৫২
২১। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৯৫
২২। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৪৯
২৩। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৫৩
২৪। রায়,রথীন্দ্রনাথ, 'ছোটগল্পের কথা', সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, ৯ রায়বাগান স্ট্রিট কলকাতা- ৬, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ১৯৫৯, পৃষ্ঠা- ১৫২
২৫। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৮৪
২৬। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৯২
২৭। মজুমদার, ড. অভিজিৎ, 'শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা-১৮
২৮। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৫৬
২৯। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৫০
৩০। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৯৫

সহায়ক গ্রন্থ:

১। দত্ত, বীরেন্দ্র, 'বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ'(প্রথম খণ্ড), পুস্তক বিপণি প্রকাশনী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ১৯৫৫
২। রায়,রথীন্দ্রনাথ, 'ছোটগল্পের কথা', সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, ৯ রায়বাগান স্ট্রিট কলকাতা- ৬, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ১৯৫৯
৩। চট্টোপাধ্যায়, হীরেন, 'সাহিত্য প্রকরণ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- ১৪০২
৪। মজুমদার, ড. অভিজিৎ, 'শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০৭

আকরগ্রন্থ:

১। কবিতা সিংহ, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৩

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1107-1122
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.111

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাস (নির্বাচিত): প্রসঙ্গ উনিশ শতকের কৃষক জীবনচর্যা ও নীল বিদ্রোহ

গোপাল ঘোষ, *গবেষক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 22.05.2025; Accepted:25 .05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The most deprived and neglected class in predominantly agricultural India is the peasant community. This is true in the context of colonial India or 21st century India as well. However, the research on the life of these farmers began during the colonial period. Especially in the context of the 19th century, the opinion of Bengali scholars about farmers is quite significant. Peary Chand Mitra, Akshay Kumar Dutta, Bankim Chandra Chattopadhyay, Dinabandhu Mitra, Harish Chandra Mukherjee were all sympathetic to the farmers. Especially Dinabandhu Mitra's Nildarpan (1860) has presented a realistic account of the life of the indigo farmers of Bengal. Again, the rebellion that the indigo farmers waged against this helplessness is known as the Indigo revolt. Incidentally, the life of the 19th century farmers and the Indigo revolt has become particularly relevant in the post-independence Bengali novel genre. The lives of farmers and the events of the Indigo Rebellion have become the controlling force in the story-building of Bibhutibhushan Banerjee's *Ichamati* (1950), Dinesh Chandra Chatterjee's Neel Ghurni (1378 Bangabdo) and Sunil Gangopadhyay's Sei Samoy (Part 1-1981, Part 2-1982). I would like to shed light on these novels written over a period of time, keeping in mind the lives of farmers and the events of the Indigo Rebellion.

Kewords: Farmers, Indigo revolt, Post-independence Bengali novel, *Ichamati*, Neel Ghurni, Sei Samoy.

একুশ শতকের ভারতবর্ষ কৃষক বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে আজও উত্তাল। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, থেকে শুরু করে পাঞ্জাব দিল্লির সড়ক পথে কৃষকদের রক্তাক্ত পায়ের ছাপ ভীষণ টাটকা স্মৃতি। ইন্টারনেটের সৌজন্যে সেই সংবাদ বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছাতে বেশি সময় লাগেনি। টুইটার, ইনস্ট্রাগ্রামে বিদেশি রিহানা, গ্রেটা থুনবার্গদের এই নিয়ে প্রতিবাদ সামাজিক মাধ্যমে রীতিমত চর্চিত বিষয়। তবে কেবলমাত্র বিদেশি ব্যক্তি কিংবা কোনো সামাজিক মাধ্যমে কৃষকদের এই দুরবস্থার কথা ফুটে উঠেছে এমনটা নয়, এদেশের সরকারি সংস্থাগুলির বাৎসরিক কিংবা দশক ভিত্তিক পরিসংখ্যানেও কৃষক শ্রেণির ক্ষয়িষ্ণু চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর প্রতিবেদনে প্রকাশিত একুশ শতকের প্রতিটি বছরেই কৃষকদের আত্মহত্যার হার ক্রমশ উর্ধ্বমুখী। অথচ এই ভারতবর্ষে ৭০ শতাংশ মানুষই কৃষক। যদিও ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতবর্ষে কৃষকদের প্রতি নিপীড়ন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা শোষিত ভারতবর্ষের অধিকাংশ সাধারণ মানুষই ছিল কৃষক শ্রেণির। তাঁদের অবস্থা কীরূপ ছিল— এই নিয়ে কম বেশি সকলেরই জানতে ইচ্ছা করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে কৃষকদের জীবনচর্যা নিয়ে শিক্ষিত সমাজকে আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল। বিশেষত

কৃষকদের জীবনচর্যা নিয়ে উনিশ শতকের বাঙালি বিদ্বৎসমাজের মতামত আসলে উনিশ শতকের সমাজ-বাস্তবতার নিদারুণ বয়ান স্বরূপ। এই সমাজ-বাস্তবতার পরিসর ছিল বহুমুখী। বস্তুত বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ রচনার মধ্যে দিয়ে উনিশ শতকে কৃষকদের জীবনচর্যার সূত্রপাত হয়েছিল। পরবর্তীতে কৃষকদের জীবনচর্যা ও তাঁদের সঙ্কট সম্ভাবনার কথা জায়গা করে নিয়েছে বাংলা কথাসাহিত্য শাখায়। বিশেষত স্বাধীনতা-উত্তর সময়কালে উনিশ শতকীয় কৃষক বিদ্রোহ নিয়ে লেখা হয়েছে একাধিক উপন্যাস। সেই আলোচনার প্রবেশের পূর্বে উনিশ শতকের কৃষকদের জীবনচর্যার গতিমুখ নিয়ে উনিশ শতকের মনীষাদের অভিমতকে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন।

(২)

উনিশ শতকের সূচনাপর্ব থেকে বাংলায় একাধিক সভা-সমিতি গড়ে উঠেছিল। সেই সভা-সমিতিকে কেন্দ্র করে বাংলায় বহু মানুষই কৃষক এবং জমিদারি ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ মতামত প্রদান করেছিলেন৷ রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ১৫ ডিসেম্বর ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক বক্তৃতা সভায় বাংলার কৃষকদের জীবনধারণের মান উন্নয়নে নীলকর সাহেব ও ব্রিটিশ প্রশাসনের কার্যকলাপের উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা করেছিলেন[১] এবং নীল চাষ প্রসারের দাবি জানিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে সুপারিশ পাঠান।[২] উনিশ শতকের বিখ্যাত ব্যক্তি দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) জমিদারদের স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ সচেতন ছিলেন৷ বলা বাহুল্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে রাধাকান্ত দেবের (১৭৮৪-১৮৬৭) সভাপতিত্বে 'জমিদার সভা'[৩] বা 'ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর৷ সভার নাম থেকেই অনুমান করতে পারা যায়, জমিদারদের স্বার্থরক্ষার বিভিন্ন দাবি দাওয়া পেশের জন্য এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল৷ আবার ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রি উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪) কর্তৃক 'এগ্রিকালচার এন্ড হর্টিকালচার সোসাইটি অব ইন্ডিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৪] এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে *ক্যালকাটা রিভিউ* পত্রিকায় লেখেন 'জমিদার অ্যান্ড দি রায়ত' নামক প্রবন্ধ। উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে কৃষকজীবন সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ৷ কোম্পানির ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে ভারতবর্ষের কৃষকরাই যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ, সে তথ্য লেখক সবিস্তারে তুলে ধরেছেন—

> "ইউরোপ বা এশিয়ার এমন কোনো দেশের কথা আমাদের জানা নেই যেখানে মোট উৎপাদনের অর্ধেক কর আরোপ করা হয়৷ হিন্দু শাসনামলে রাজস্ব ছিল উৎপাদনের এক-দ্বাদশাংশ, এক-অষ্টামাংশ, এক-ষষ্ঠাংশ এবং বিশেষ ও আপৎকালীন অবস্থায় এক-চতুর্থাংশ৷ ... কিন্তু ব্রিটিশ শাসনে, বহুক্ষেত্রেই, তা উৎপাদনের অর্ধেক হিসেবে ধার্য হয়েছে।"[৫]

লেখক মূলত এই প্রবন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন পরবর্তী বাংলার সামাজিক পরিবর্তনকে পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করেছেন৷ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও সামাজিক ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাবের মূলে ছিল এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন৷ সেই কারণে লেখক কৃষকদের দুরবস্থার প্রতিকার ও উত্তরণের পূর্বে উদ্ভূত সমস্যাগুলিকে পারম্পরিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন বিশদে—

> "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মৌলিক ভ্রান্ত ভিত্তি, ঠিকা দেওয়ার ব্যবস্থার পরিণতিতে কৃষক নিষ্পেষণ, নিরিখ স্থির না হওয়ার কারণে স্বত্বের অনিশ্চয়তা; মহাজনি প্রথার সর্বনাশী ফল; জমিদার ও নায়েবি আবওয়াব চাপানো, জমিদার ও তার প্রতিনিধির অত্যাচার; পুলিশের তোলা আদায়, প্রশাসনের অসাধুতা; সংশ্লিষ্ট আইনের ত্রুটি বিচ্যুতি, বিচার প্রক্রিয়ায় শুল্কের কুপ্রভাব, সপ্তম ও পঞ্চম রেগুলেশনের অপপ্রয়োগ; নীলকরদের অত্যাচার— সবই গ্রামজনতার দুরবস্থাকে আরও অবনতির দিকে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পিত আয়োজন।"[৬]

পরাধীন দেশের কৃষকদের দুর্দশার মূল শিকড় যে অনেক গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত, তার খতিয়ান হয়ে উঠেছে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'জমিদার অ্যান্ড দি রায়ত'। উনিশ শতকীয় প্রেক্ষাপটে কৃষক জীবনের প্রকৃত গতিমুখ ও তাঁদের বাস্তব অবস্থানের যথার্থ দলিল এই প্রবন্ধ।

অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত *তত্ত্ববোধিনী* (১৮৪৩) পত্রিকা উনিশ শতকে বাংলার সমাজ, রাজনীতি, ধর্মচর্চা সম্পর্কে আলোচনায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল৷ ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থার বর্ণন'। অক্ষয়কুমার দত্তের 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থার বর্ণন' প্রবন্ধে বাংলা দেশের

সাধারণ কৃষক সমাজের সামগ্রিক জীবনচর্যা ও তাদের সংকট মূর্ত হয়ে উঠেছে৷ তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থার বর্ণন' প্রবন্ধের প্রথম দুটি সংখ্যায় মূলত ভূস্বামী কর্তৃক বাংলার কৃষক নিপীড়নের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রাবন্ধিক কৃষকদের জীবিকার সংকটের কারণ অনুসন্ধানে জমিদারদের স্বেচ্ছাচারিতাকে দায়ি করেছিলেন৷ রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো রূপ নিয়ন্ত্রণের সীমা মানতে চায়নি তৎকালীন জমিদারেরা। কর ব্যবস্থা এতটায় অনিয়ন্ত্রিত ছিল যে মামলা-মকদ্দমায় ভূস্বামী বা জমিদারের কারাজীবনকালে ভিক্ষাবৃত্তিচ্ছলে কৃষকদের থেকে অর্থ আদায় করত। ব্রাহ্মণ সেবা, বিগ্রহ সেবা, দেবত্তোর সম্পত্তি রক্ষা প্রভৃতি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কৃষকদের দ্বারপ্রান্তে জমিদারের আদায়বৃত্তি তো লেগেই থাকত। উপরন্তু জমিদারের মামলা নিষ্পত্তি কিংবা কারাবাসকালীন জমিদারি ব্যবস্থা বহাল রাখতে কৃষকদের দায় ছিল সবচেয়ে বেশি। এই শোষণে কোম্পানি ছিল নীরব দর্শক৷ তার ঘুম ভাঙতো কেবল রাজস্ব আদায়কালে৷ আবার অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা-খরা অর্থাৎ আবহাওয়ার খামখেয়ালি অনেক ক্ষেত্রে কৃষকদের জীবনযাত্রাকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল।

উনিশ শতকের ভারতবর্ষে শাসকের রাজস্ব আদায়ের মূল উৎস ছিল কৃষি ব্যবস্থা। কৃষি ব্যবস্থায় রাজস্ব সংগ্রহে আলাদা মাত্রা যোগ করেছিল নীল চাষ। প্রবন্ধের তৃতীয় সংখ্যায় প্রাবন্ধিক নীলকরদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। লেখকের নিপুণ পর্যবেক্ষণ নীলকর সম্বন্ধে— 'নীলকরদিগের কার্য্যের বিবরণ করিতে হইলে কেবল প্রজাপীড়নের বৃত্তান্ত লিখিতে হয়৷'[৭] বস্তুত 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থার বর্ণন' প্রবন্ধে এই স্বীকারোক্তি আসলে নীলকর ও নীল চাষের ভয়াবহতাকে নির্দেশ করেছে।

উনিশ শতকে বাঙালির কৃষক জীবনচর্যা নিয়ে আলোচনা সমূহের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গদেশের কৃষক' (১৮৭২) প্রবন্ধটি সবচেয়ে চর্চিত৷ প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও অসামান্য পর্যবেক্ষণের নিদর্শন 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধ৷ 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি', 'জমীদার', 'প্রাকৃতিক নিয়ম' ও 'আইন'— প্রাবন্ধিক এই চারটি পরিচ্ছেদে হাসিম শেখ, রামা কৈবর্ত্তদের জীবনাবস্থার ভূত-ভবিষ্যতকে বর্ণনা করেছিলেন দেশকালের প্রেক্ষিতে৷ প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে দেশের শ্রীবৃদ্ধির বাস্তব সারবত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি' অংশে৷ প্রাত্যহিক জীবন ধারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের দুর্দশায় তিনি ব্যথিত। দেশের শ্রীবৃদ্ধি যে আসলে ওই মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীর উন্নতি নয়, একথা প্রাবন্ধিক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন—

> "সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি, কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয় শত নিরানব্বই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমন শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে, তুলুক; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে, আমি কাহারও জয় গান করিব না।"[৮]

ঔপনিবেশিক শাসন নীতির প্রত্যক্ষ অঙ্গ জমিদারি ব্যবস্থা কৃষকদের উন্নতি সাধনের পথে প্রধান অন্তরায় একথা প্রাবন্ধিক স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন 'জমীদার' নামক পরিচ্ছেদে। প্রসঙ্গত জমিদারি ব্যবস্থাকে সমান তালে ইন্ধন যুগিয়েছিল ব্রিটিশ প্রশাসন৷ এই জমিদারদের ভূমিকা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের অভিমত—

> "জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী৷ ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমিদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোটো মানুষকে ভক্ষণ করে।"[৯]

সমগ্র উনিশ শতকে বাঙালির কৃষক জীবনচর্যায় জমিদারদের স্বরূপ উদঘাটনের ভূমিকা পালন করেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচ্য প্রবন্ধ। তবে মহাজনী জমিদারি শোষণের থেকে যে মোটা অর্থ রাজস্ব রূপে কোম্পানির হস্তগত হয়েছিল। তার হিসেব নিকেশ দিলেও আমলা বঙ্কিমচন্দ্র কোম্পানির প্রসঙ্গে নীরব। আবার জমিদারদের শুধুমাত্র সমালোচনা করলে যদি তাঁদের রোষানলে পড়তে হয়, তাই জমিদার উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা— 'আমরা জমীদারের দ্বেষক নহি।'[১০]

কৃষকদের দুরবস্থা বর্ণনায় তৃতীয় কারণ রূপে প্রাবন্ধিক 'প্রাকৃতিক নিয়ম'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষে উর্বর ভূমিতে শস্য উৎপাদনের খামতি না থাকলেও অধিকাংশ কৃষিজীবী মানুষেরই নুন আনতে পান্তা ফুরাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই অবস্থার কারণ অনুসন্ধানে তিনটি বিষয়কে মূলত নির্দেশ করেছেন— দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব। তিনটি বিষয় একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। লক্ষণীয় বিষয় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষিজীবী, শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অধঃপতনের সূচক

যে আরও ঊর্দ্ধগতি হবে, সেই ভবিষ্যৎবাণী প্রাবন্ধিক বহু পূর্বেই করেছিলেন। যার বাস্তবায়ন বর্তমান ভারতে আজও ঘটে চলেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'আইন'। প্রাবন্ধিক 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি' অংশে এই আইনের স্বরূপ নির্দেশ করেছিলেন— 'আইন সে একটা তামাসা মাত্র— বড় মানুষেই খরচ করিয়া, সে তামাসা দেখিয়া থাকে।'[১১] সমগ্র ভারতবর্ষের কৃষক সমাজ আইনের সৌজন্যে তামাসার সাক্ষী থেকেছে কোম্পানির শাসনকালে। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ শাসকের এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কিন্তু সেখানে সাধারণ কৃষকদের কতটা লাভ হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক ও সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র এই আইন প্রণেতা অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসকদের কৃতিত্বকে তুলে ধরেছেন—

> "প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী; জমীদারেরা কস্মিনকালে কেহ নহেন কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্ণওয়ালিশ যথার্থ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোন লাভ হইল না। ইংরেজ-রাজ্যে বঙ্গ দেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র— কস্মিন কালে ফিরিবে না। ইংরেজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী; কেন না, এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী।"[১২]

বস্তুত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র কর্মজীবনে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহুবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি। যার ফল ভুগতে হয়েছিল সম্পূর্ণ রূপে কৃষকদেরকে। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে একাধিকবার আইন প্রয়োগ ও পরিবর্তন হয়েছিল এই উনিশ শতকে। কিন্তু বাস্তবে যে কৃষিজীবী সম্প্রদায় জমিদার ও শাসকের জাঁতাকলে প্রতি মুহূর্তে শোষিত নিপীড়িত হয়েছে, হাসিম শেখ, রামা কৈবর্ত্ত, পরাণ মণ্ডলদের জীবন পরিণতি তারই প্রমাণ। বস্তুত 'জমিদার অ্যান্ড দি রায়ত', 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থার বর্ণন' কিংবা 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে কৃষকদের দুরবস্থার চিত্রই বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। তবে এই কৃষকরা চিরকাল এই শোষণ সহ্য করেনি। আমরা দেখেছি উনিশ শতকে এই কৃষকরাই নীল বিদ্রোহে গড়ে তুলেছে। প্রসঙ্গত স্বাধীনতা-উত্তরকালের সময়পটে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো ঔপন্যাসিকরা তাঁদের রচনাকর্মের মধ্যে দিয়ে নীল চাষ ও নীল বিদ্রোহের দিনগুলিকে সজীব করে তুলেছেন।

(৩)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) উপন্যাসে সময়ের সচলতা ও তার প্রতিক্রিয়া বারে বারে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। *পথের পাঁচালী* (১৯২৯) থেকে *ইছামতী* (১৯৫০) উপন্যাস যেন তারই দৃষ্টান্ত। জীবদ্দশায় প্রকাশিত লেখকের শেষ উপন্যাস *ইছামতী*। নদী তীরবর্তী গ্রামবাংলার জনজীবনের আখ্যান হয়ে উঠেছে *ইছামতী*। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শাসকের সুদৃঢ় শাসন ব্যবস্থায় অবিভক্ত বাংলার গ্রামীণ কৃষকদের জীবন তরঙ্গ আন্দোলিত হয়েছিল নীলকরদের আবির্ভাবে। বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিঘার পর বিঘা জমিতে ধান, পাট কিংবা রবিশস্য ফসলের জায়গা দখল করেছিল নীল নামক রঞ্জক দ্রব্যের গাছ। নীল চাষের কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছিল এই গ্রামবাংলা। তৎকালীন গ্রামীণ জনপদের উত্থান পতনের মূলে নীলকর এবং নীল চাষ ভীষণভাবে দায়ী— এই ইতিহাস সম্পর্কে আমরা সকলেই কমবেশি অবগত। তবে *ইছামতী* উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা ও তার আবশ্যিক শর্তগুলিকে মান্যতা দিয়ে। তাই এই উপন্যাস নির্মাণের অপরিহার্য উপাদান হয়ে দেখা দিয়েছে ইতিহাস চেতনা। ইতিহাস চেতনার নিগূঢ় উপাদানগুলিকে সামনে রেখে *ইছামতী* উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাসের অবতলে আলোকপাত করলে দেখতে পাব ঔপনিবেশিক শাসকের শাসন পদ্ধতি, ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও তার রূপান্তর, রাজস্বের আইনগত বিবর্তন, জমিদার, নীলকর, দেওয়ান, গোমস্তা, আমিনদের সক্রিয়তা এবং সর্বোপরি রায়ত বা কৃষকদের উত্থান-পতন। সব মিলিয়ে *ইছামতী* হয়ে উঠেছে জমি-জিরেত ও নীল বিদ্রোহের আখ্যান।

ইছামতী উপন্যাসের কাহিনি মধ্যে বারে বারে নীলকুঠি ও তার কারবার পরিচালনা কথা প্রাসঙ্গিক হয়ে দেখা দিয়েছে। মোল্লাহাটি নীলকুঠি,[১৩] পাটনা জেলার নারাণগড় নীলকুঠির[১৪] উল্লেখ পায় *ইছামতী* আখ্যানে। কোম্পানির বাণিজ্য বিস্তারে কেন্দ্রস্থল ছিল এই নীলকুঠিগুলি। বস্তুত উনিশ শতকে এই নীলকুঠিগুলি পরিচালনায় নীলকর সাহেব ও দেশীয় নেটিভদের যৌথ উদ্যোগ লক্ষ করা গিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য *ইছামতী* উপন্যাসেও দেখি নীলকুঠির

বড়োসাহেব শিপ্‌টন্ নীলকুঠি চালনার জন্য ভরসা করেছে মোল্লাহাটি নীলকুঠির দেওয়ান রাজারাম রায়ের উপর। পাঁচপোতা গ্রাম নিবাসী দেওয়ান রাজারাম রায় কুশলী ব্যক্তি, যিনি দীর্ঘদিন ধরে নীল চাষের বিস্তার উদ্দেশ্যে সমস্ত ক্ষমতাকে প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োগ করেছে—

> ‘‘কোনো প্রজার জমিতে জোর করে নীলের মার্কা মেরে আসতে হবে। রাজারাম দুর্ধর্ষ দেওয়ান, প্রজা কী করে জব্দ করা যায় তাঁকে শেখাতে হবে না। আজ আঠারো বছর এই কুঠিতে তিনি আছেন, বড় সাহেবের প্রিয়পাত্র হয়েচেন শুধু এই প্রজা জব্দ রাখবার দক্ষতার গুণে।’’[১৫]

এই দক্ষতার গুণে দেওয়ান রাজারামের প্রভাব প্রতিপত্তির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। তালুক, বিষয়, ধানীজমি যা আছে, একটা বড় সংসার চলে। জমিদারির আয় বছরে-তা তিনশো-চারশো টাকা। রাজার হাল। স্বভাবতই দেওয়ান রাজারামের সক্রিয়তার হাত ধরে উনিশ শতকের গ্রামবাংলায় নীল চাষের রমরমা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

নীল চাষ, নীলকুঠির দেওয়ানদের সক্রিয়তার অপরপ্রান্তে সাধারণ কৃষকদের উপস্থিতি চোখে পড়ে। *ইছামতী* উপন্যাসের কাহিনির মধ্যে কৃষকদের জীবনচর্যার একটি সামগ্রিক চিত্র উঠে এসেছে। যে কৃষকদের গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র উপায় অবলম্বন তার চাষের জমিটুকু সেখানেও রাজারাম দেওয়ান, নীলকর সাহেবদের প্রবল আধিপত্য লক্ষণীয়। নীল চাষে অনিচ্ছুক চাষিদেরকে শায়েস্তা করার জন্য নীলকুঠির চুনের গুদামে আটকে রাখা হয়। গ্রামীণ জনপদগুলির দণ্ডবিধানে নীলকর ও নীলকুঠির সিদ্ধান্তই শেষ কথা। ইছামতী তীরবর্তী গ্রামগুলিতে সমান্তরাল শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে নীলকরদের সৌজন্যে। কোম্পানি শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় নীলকর হয়ে উঠেছে স্থানীয় শাসক ও বিচারক। নীলকুঠির কোর্টের বিচারে হলা পেকের তিন বৎসর জেল হয়েছে।[১৬] এই ক্ষমতাধর নীলকরদের বিরুদ্ধে তবু মাঝে মধ্যেই শোনা যায় অসন্তোষের সুর তথা কৃষকদের বিদ্রোহী চেতনা। রসুলপুর, রাহাতুনপুরের চাষিরা জমিতে নীল বুনতে অস্বীকার করেছে। নীলের দাগ মারতে গিয়ে প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছে নীলকুঠির কর্মীদের। যদিও রাহাতনপুরের কৃষকদের নীল চাষের বিরোধিতার ফল হাতেনাতে পেতে হয়েছে—

> ‘‘পরদিন সকালে চারিধারে খবর রটে গেল রাত্রে রাহাতুনপুর গ্রাম একেবারে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েচে। বড় বড় চাষিদের গ্রাম, কারও বাড়ি বিশ-ত্রিশটা পর্যন্ত ধানের গোলা ছিল-আর ছিল ছ’চালা আটচালা ঘর, সব পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েচে। কী ভাবে আগুন লেগেছিল কেউ জানে না, তবে সন্ধ্যারাত্রে ছোটসাহেব এবং দেওয়ানজি রাহাতুনপুরের বড় মোড়লের বাড়ি গিয়েছিলেন; সেখানে প্রজাদের ডাকিয়ে নীল বুনবে না কেন তার কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন। তারা রাজি হয়নি। ওঁরা ফিরে আসেন রাত এগারোটার পর। শেষরাত্রে গ্রামসুদ্ধ আগুন লেগে ছাইয়ের ঢিবিতে পরিণত হয়েছে। এই দুই ব্যাপারের মধ্যে কার্যকারণ-সম্পর্ক বিদ্যমান বলেই সকলে সন্দেহ করচে।’’[১৭]

তবে সাধারণ কৃষকদের নীল চাষের প্রতি অনীহার মূল কারণ হলো তৎকালীন সময়পটে অর্থনৈতিক দিক থেকে নীল চাষ মোটেও লাভজনক ছিল না। অপরদিকে অর্থনৈতিক মুনাফার সমস্তটায় আত্মসাৎ করেছে নীলকর সাহেব তথা বণিক সমাজ। নীল চাষের অনীহার মূল কারণ ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে আমরা *ইছামতী* উপন্যাসের বড়োসাহেব এবং হিংনাড়া অঞ্চলের সাধারণ কৃষক ছিহরির মধ্যে কথোপকথনের প্রতি আলোকপাত করতে পারি—

> ‘‘বড়সাহেব ছিহরি সর্দারকে বললে-টোমার মতলব কী আছে?
> —নীল মোরা আর বোনব না সায়েব। মোদের মেরেই ফেলুন আর যে সাজাই দ্যান।
> —ইহার কারণ কী আছে?
> —কারণ কী বলব, মোদের ঘরে ভাত নেই, পরনে বস্তর নেই ঐ নীলির জন্যি। মা কালীর দিব্যি নিয়ে মোরা বলিচি, নীল আর বোনবো না।
> —কি পাইলে নীল বুনিটে ইচ্ছা আছে?
> —নীল আর বোনব না, ধান করব। যত ধানের জমিতি আপনাদের আমিন গিয়ে দাগ মেরে আসবে, মোরা ধান বুনতি পারিনে। আপনারা নিজেদের জমিতি লাঙল গরু কিনে নীলের চাষ করো-কেউ আপত্য করবে না। প্রজার জমি জোর করে বেদখল করে নীল করবা কেন সায়েব?
> —টোমারে পাঁচশো টাকা বকশিশ দিব। তুমি নীল বুনিটে বাধা দিয়ো না। প্রজা হাট করিয়া ডাও।

—মাপ করবেন সায়েব। মোর একার কথায় কিছু হবে না। মুই আপনারে বলচি শুনুন, তেরোখানা গাঁয়ের লোক একত্তরে হয়ে জোট পেকিয়েচে। ভবানীপুর, নাটাবেড়ে, হুদো-মানিককোলির নীলকুঠির রেয়েতেরাও জোট পেকিয়েচে। হাওয়া এসেচে পুবদেশ থেকে আর দক্ষিণ থেকে।"[১৮]

বস্তুত হিংনাড়া অঞ্চলের সাধারণ কৃষক ছিহরিই কৃষকদের অসন্তোষ ও তাদের ঐক্যের কথা নীলকর সাহেবের কানে পৌঁছে দিয়েছিল। আমরা দেখব এই ঘটনা অনুষঙ্গের সূত্রে *ইছামতী*-র কাহিনির মধ্যে ক্রমশ নীল চাষিদের প্রতিরোধ আরও জোড়ালো থেকে জোড়ালোতর হয়েছে। উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ এবারে যেন ক্রমশ গণচেতনামুখী স্বরকে ধরতে চেয়েছে। বস্তুত ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য আখ্যানে নীল বিদ্রোহের ঘটনাবহুল ইতিহাস পরম্পরার সজীব উপাদানগুলিকে ব্যবহার করেছেন কৃষকদের বিদ্রোহ চেতনার প্রেক্ষিতে। ইতিহাসের অক্ষরেখায় নীল চাষিদের গণমুখী ভাবধারার প্রবল উপস্থিতির পূর্বে নীলকরদের নিপীড়নের সংরূপকে আত্মস্থ করতে হয়েছিল সমগ্র কৃষক সমাজকে। নিপীড়নের সংরূপ বিদ্রোহের যেন আত্মপ্রস্তুতির স্বরূপ ছিল। উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণে ঔপন্যাসিক এই প্রস্তুতিকে সযত্নে তুলে ধরেছেন। তবে এর পরবর্তী পর্যায়ে কৃষকদের বিদ্রোহ চেতনা ও তার প্রতিক্রিয়া আখ্যানের মূল চালিকা শক্তি হয়ে দেখা দিয়েছে।

ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষকদের বিদ্রোহ চেতনা ও তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন আলোচ্য আখ্যানে। ঔপনিবেশিক বাংলায় নীলচাষের সম্প্রসারণে নেটিভ দেওয়ান, আমিনদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। উপন্যাসের কাহিনি পরম্পরায় দেওয়ান রাজারামের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ক্রমশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। নীলকরদের সমর্থনে এই ক্ষমতার প্রয়োগ সে নিজ দেশের সাধারণ কৃষকদের উপরই করেছিল। নীল চাষের জন্য হত্যা করতেও পিছু পা হয়নি রাজারাম। তাই বিদ্রোহের উত্থানপর্বে নীল বিদ্রোহীদের কাছে অত্যাচারের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়িয়েছে অত্যাচারী রাজারাম দেওয়ান। এই অত্যাচারের ফল তাঁকে হাতেনাতে পেতে হয়েছে নীল বিদ্রোহের উত্থানপর্বে। ষষ্ঠী তলার মাঠে দাঙ্গায় নিহত রামু বাগ্‌দির বড়ো ছেলে হারু, তার শালা নারাণ বড়ো সর্দার রাজারামকে হত্যা করেছে।[১৯] *ইছামতী* উপন্যাসে রাজারাম হত্যার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত অর্থে নীল বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। এরপর কৃষকদের বিদ্রোহমূলক কর্মসূচির গ্রাফ ক্রমশ উর্ধ্বমুখী হয়েছে আখ্যানের কাহিনি পরিসরে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য উপন্যাসে কৃষকদের বিদ্রোহ চেতনার অভিমুখ নির্দেশের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন। ঔপনিবেশিক শাসন, সময়ের অসঙ্গতি, শাসক-নেটিভ সম্পর্কের সীমা অতিক্রম করে কৃষকদের জীবনচর্যা ও বিদ্রোহ আখ্যানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। কৃষক নিপীড়নের রক্তাক্ত প্রেক্ষাপটেই কৃষকদের প্রতিরোধের ইতিহাসকে ক্রমপর্যায়ে তুলে ধরেছেন লেখক—

১."নীল বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেল সারা যশোর ও নদীয়া জেলায়। কাছারিতে সে খবরটা নিয়ে এলো নতুন দেওয়ান হরকালী সুর।"[২০]

২."তিন দিন পরে বড় সায়েবের মেম নীলকুঠির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কুলতলার ঘাটে বজরায় চাপল।"[২১]

৩."নীলবিদ্রোহ তিন জেলায় সমান দাপটে চলল। ... তিন জেলার বহু নীলকুঠি উঠে গেল দু'বছরের মধ্যে। বেশির ভাগ নীলকর সাহেব কুঠি বিক্রি করে কিংবা এদেশি কোনো বড়লোককে ইজারা দিয়ে সাগর-পাড়ি দিলে। দু'-একটা কুঠির কাজ পূর্ববৎ চলতে লাগল, তবে সে দাপটের সিকিও ভাগ কোথাও ছিল না।"[২২]

৪."নীলকর সাহেবদের বিষদাঁত ভেঙে গিয়েছে আজকাল। আশপাশে কোনো নীলকুঠিতে আর সাহেব নেই, কুঠি বিক্রি করে চলে গিয়েছে। দু'একটা কুঠিতে সাহেব আছে, কিন্তু তারা নীল চাষ করে সামান্য, জমিদারি আছে— তাই চালায়।"[২৩]

উদ্ধৃতিকৃত বয়ানের প্রেক্ষিতে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, নীল বিদ্রোহের প্রবল আধিপত্যের সামনে নীলকরদের সাম্রাজ্য খড়-কুটোর মতো ভেঙে পড়েছিল। নীলকরদের পরাজয়, নীলকুঠির ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা, নীলকরদের দেশে ফিরে যাওয়া, শাসকের নীল কমিশন গঠন, বাঙালি বিদ্বৎসমাজের অগ্রণী ভূমিকা সহ একাধিক কর্মসূচির মূল কারণ নীল চাষিদের বিদ্রোহী সত্তার প্রবল উপস্থিতি। ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষকদের বিদ্রোহী সত্তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে দেখিনি ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাস নির্মাণে। তবে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার হাত ধরে কৃষক বিদ্রোহের সমূহের গুরুত্ব

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে বিদ্যায়তনিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে। কৃষকদের বিদ্রোহ চেতনা এবং বিদ্রোহের সাফল্য ব্যর্থতাকে কেবলমাত্র আর পাঁচটা সাধারণ ঘটনাপ্রবাহ বলে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাকে সমূলে প্রত্যাখ্যান করেছে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার প্রবক্তারা। তাঁরা রাজনীতি, অর্থনীতি সর্বোপরি ক্ষমতার বিন্যাসের প্রেক্ষিতে কৃষক বিদ্রোহকে দেখতে চেয়েছেন। যেখানে নীলকর, জমিদার, মহাজন, সরকার এবং কৃষকদের সম্পর্কের নতুন সমীকরণ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় *ইছামতী* উপন্যাসে নীল বিদ্রোহের যে বর্ণনা তুলে ধরেছেন কাহিনি পরম্পরায়, তাকে এই আলোচনায় ক্রমপর্যায়ে নির্দেশ করার মূল কারণ হলো— নীল বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া গ্রাম-জীবনকে কীভাবে আন্দোলিত করেছিল তার সংরূপটি সরজমিনে প্রত্যক্ষ করা। নীল বিদ্রোহের পূর্ব সময় পর্যন্ত ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে সঞ্চালক শক্তি ছিল নীল চাষ। এই নীল চাষের উপর ভর করে ঔপনিবেশিক শাসক, বণিক সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। অপরদিকে গ্রামজীবনে কৃষকদের জীবনযাপনের মান ছিল ভয়ঙ্কর অনুন্নত। তাই নীল কৃষকদের বিদ্রোহের অভিঘাতে সমূহ পটপরিবর্তনের গুরুত্বকে কেবলমাত্র পেশাগত জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ছিল না, আসলে তার শিকড় নিহিত ছিল ঔপনিবেশিক রাজনীতি, অর্থনীতির বিস্তীর্ণ পরিসরে—

> ‘‘ঔপনিবেশিক ভারতের গ্রামজীবনে সেই সম্পর্কের মূল কথা জমিদার, মহাজন ও সরকার— এই ত্রিশক্তির সঙ্গে কৃষকের ক্ষমতাগত সম্পর্ক। সেই সম্পর্কই অর্থাৎ রাজনীতিই ঔপনিবেশিক আমলের অর্থনীতির প্রধান ধ্রুবগুণ।’’[২৪]

(৪)

উনিশ শতকের নীল বিদ্রোহকালীন অস্থিরতা ও কৃষকদের গণজাগরণের বহুমাত্রিক পরিসর একাধিক উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠলেও প্রতিটি নির্মাণ স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্রতার এক উজ্জ্বলতম নিদর্শন দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৯১৭-১৯৯৫) *নীল ঘূর্ণি* উপন্যাস। *নীল ঘূর্ণি* প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের শারদীয়া *কিশোর ভারতী* পত্রিকায়।[২৫] শুরুতে কিশোরদের জন্য লেখা হলেও এই আখ্যান পরবর্তীতে বহুবিধ সংস্কারের মধ্যে দিয়ে হয়ে উঠেছিল এক সিরিয়াস উপন্যাস প্রকরণ। যার মধ্যে নিহিত লেখকের ব্যক্তিগত আদর্শ, ইতিহাস চেতনা, কৃষকদের জীবনচর্যা সর্বোপরি গণজাগরণের নান্দনিক অভিজ্ঞান। এই উপন্যাস নির্মাণের মূল ভিত্তিস্তর উনিশ শতকের নীল বিদ্রোহ। উপন্যাস নির্মাণ সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

> ‘‘ব্রিটিশ শাসনের গোড়া থেকেই তার শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাঁরা নিরলস বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন রেখেছিলেন, তাঁরা হলেন বাংলার বীর কৃষক-সন্তান। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ যে দুর্জয় প্রতিরোধের সংগ্রাম তাঁরা চালিয়েছিলেন অব্যহিত ধারায়, ‘নীলবিদ্রোহ’ তারই এক সার্থক পরিণতি। এই উপন্যাসে অমর সেই বিদ্রোহী কৃষক-আত্মার অনমনীয় দৃঢ়তার প্রতীক হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি কাশীনাথ ও বুলন ফকিরকে বা ফকিরদাদুকে।’’[২৬]

লেখকের বক্তব্যের সূত্র ধরেই বলতে পারি— আলোচ্য আখ্যানের মূল স্বর নীল বিদ্রোহের ঘটনাবহুল পর্ব ও তার প্রতিক্রিয়ার ব্যঞ্জনাময় ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত। উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় বাঙালি কৃষকদের বিদ্রোহী চেতনার উজ্জ্বলতম নিদর্শন নীল বিদ্রোহ নিয়ে একাধিক উপন্যাস রচনা হলেও *নীল ঘূর্ণি* আখ্যানের আবেদন চিরস্থায়ী হয়ে উঠেছে মূলত ক্রান্তিকালীন সময়ে বাঙালি মুসলমান ফকির এবং হিন্দু যুবক কাশীনাথের অন্তহীন জীবনীশক্তির সমাবেশে। ঔপনিবেশিক শাসনকালে এদেশীয় দুই বিদ্রোহী বাঙালিকে কেন্দ্র করে কালাতীত সময় পরিসরের ইতিহাস *নীল ঘূর্ণি* উপন্যাসের কথাবস্তু হয়ে দেখা দিয়েছে।

উপন্যাসের শুরুতে দেখি যুবক কাশীনাথ সর্দার জঙ্গলপুরীতে আশ্রয় নিয়েছে নীলকরদের তাণ্ডব থেকে পরিত্রাণ পেতে। তবে কাশীনাথ তাঁর পিতা কালীনাথের উপর আক্রমণকারী নীলকুঠির লাঠিয়ালদের হত্যা করার পরই বাড়ি ছেড়েছে। নিঃসঙ্গ কাশীনাথের কথা শোনার জন্য প্রয়োজন ছিল তাঁর দোসরের। যে যুবক কাশীনাথের সংকট সম্ভাবনাকে দেখবে সংবেদশীল চোখে। অতঃপর গহীন জঙ্গলে যে বৃদ্ধের সঙ্গে কাশীনাথের আলাপ হয়, ঘটনাক্রমে সেও নীলকরদের নিকট চক্ষুশূল। তাই কাশীনাথ ফকিরকে উদ্দেশ্য করে বলেছে—

> ‘‘নীলকররা তো তোমার ওপর বিষম খাপ্পা, পেলেই খুন করে ফেলবে। ইংরেজ সরকারও ঢোল-সহরৎ করে জানিয়ে দিয়েছে, তোমায় জ্যান্ত বা মরা যে ধরে দিতে পারবে, তাকে দু-হাজার টাকা

বকশিস দেবে।"[২৭]

কাহিনির প্রারম্ভিক লগ্নেই দুই নীলকর বিরোধী ব্যক্তির কথোপকথনের মধ্যেই স্পষ্ট আখ্যানের ভবিষ্যকথন কী হতে চলেছে! নীলকরদের প্রতি ক্ষিপ্ত যুবক কাশীনাথের মধ্যে অবিমিশ্র আবেগ ও প্রতিশোধ স্পৃহা বিদ্যমান। আখ্যানের মূল স্বর হয়ে উঠেছে নীলকরদের বিরোধিতা। তবে সেই বিরোধিতার অন্তঃবয়ান আসলে আমৃত্যু বিদ্রোহেরেই নামান্তর। তাই কাশীনাথ বলতে পারে— 'নীলকর, নীলকর! যতদিন বাঁচব, আমি থাকব তোদের চিরশত্রু, তোদের পোষা কুত্তাদের খতম করাই আমার কাজ।'[২৮] উপন্যাসের ঘটনাক্রম ও তার ধারা বিবরণীতে নীলকরদের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের প্রসঙ্গ জায়গা করে নিয়েছে স্বতঃসিদ্ধ রূপে। তবে এই গ্রামবাংলায় নীলকরদের জাঁকিয়ে বসার মূলে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় লাভ-ক্ষতির হিসাব দায়ি। উপন্যাসের কাহিনি মূলত সেই দিকেই এগিয়েছে। কাশীনাথ ও ফকিরের আলাপচারিতাকে সামনে রেখে আখ্যানকার যেন ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় এদেশীয় জনজীবনের সুপরিকল্পিত অবক্ষয়কে নির্দেশ করতে চেয়েছে। এই অবক্ষয়ের সাক্ষী বাংলা তথা সমগ্র ভারতভূমি। অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক এবং সর্বোপরি সাধারণ ব্যক্তি জনমানসে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার যে কাঠামো গড়ে উঠেছিল, তাকে কেন্দ্র করেই *নীল ঘূর্ণি* আখ্যানের কাহিনি বিস্তার লাভ করেছে। তাই বিদ্রোহের পূর্বে অবদমনের নির্ধারিত শর্তগুলি নান্দনিক সম্পৃক্ততায় ভিড় করেছে কাহিনি রূপে। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো যে, আখ্যানের মূল স্বর যেহেতু কৃষকদের বিদ্রোহী চেতনা ও তার ক্রমপরিণতি, সুতরাং সেই ক্রমপরিণতির পিছনে যে অবদমনের সূচক বিদ্যমান— তাকেই লেখক সুচারু ভঙ্গিতে নির্দেশ করতে আগ্রহী। কৃষক এবং নীলকর-শাসক সম্পৃক্ততার অভিনিবেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অবদমনের ঘটনাক্রমকে সামনে রেখে। আলোচ্য *নীল ঘূর্ণি* আখ্যানে যুবক কাশীনাথের সামনে ফকির সেই নিদারুণ অবদমনকেই ব্যক্ত করেছে নির্মোহ ভঙ্গিতে—

> "ফকির বলে চলে, — তুই তো আর আদালতে যাসনি, গেলে এক আজব ব্যাপার দেখতে পেতিস। কোনও রায়ত হয়তো নাচার হয়ে নীলকর সাহেবের অত্যেচারের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করেছে। মামলার শুনানির সময় দেখা গেল, রায়ত বাদী বা ফরিয়াদী হয়েও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, আর নীলকর বিবাদী বা আসামি হয়েও হাকিমের পাশেই চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। হাকিম তার সঙ্গে হেসে-হেসে গুজগুজ-ফিসফিস করছে। তারপর রায় বেরোলে দেখা গেল, নীলকর নির্দোষ, যত দোষ রায়তের। তার হয়তো ছ'মাসের জেলই হয়ে গেল।"[২৯]

বস্তুত নীলকরদের এই অত্যাচার সাংগঠনিক রূপ নিয়েছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে। ঔপনিবেশিক শাসকের ইন্ধনেই গ্রামবাংলায় নীলকরদের প্রবল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। আইন, বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা কার্যত প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছিল নীলকরদের সক্রিয়তার কাছে। এই নিদারুণ বাস্তবতাকে মান্যতা দিয়ে *নীল ঘূর্ণি* উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ফলে নীলকরদের অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা কীভাবে বীভৎস রূপ নিয়েছিল তারই ভাষ্য হয়ে উঠেছে আলোচ্য আখ্যান। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, আখ্যানকার ফকিরকে সামনে রেখে নীল বিদ্রোহের পূর্বে গ্রামবাংলার সম্ভাব্য বাস্তবতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

নীল ঘূর্ণি আখ্যানে অভিজ্ঞ ফকির সাবলীল ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে রায়তদের নিদারুণ ভঙ্গুর, ক্ষয়িষ্ণু জীবনচর্যার সংরূপ। *নীল ঘূর্ণি*-র কথনবিশ্বে এই প্রবাহমানতা আসলে লেখকের মনোভঙ্গির দ্যোতক হয়ে উঠেছে। আখ্যানকার ফকিরকে সামনে রেখে 'রায়ত-নীলকর'— এই বৈপরীত্যপূর্ণ সম্পর্কের ইতিবৃত্তকে নির্দেশ করেছেন অসাধারণভঙ্গিতে—

> "যেদিন থেকে ইংরেজ এ দেশের রাজা হয়ে বসেছে, সেইদিন থেকেই তো চাষি রায়তদের কপালে এইটা ঘটে আসছে। সাধারণত যা ঘটে তা হল, আদালতে রায়ত একজন সাক্ষীও হাজির করতে পারে না। কী করেই বা পারবে? নীলকর তার নিজেদের গুদোমে বা ফাটকে আটক করেছে, আর নয়তো এমন মার মেরেছ যে, তারা আর আদালতমুখো হতে পারেনি। আর অন্য দিকে নীলকরের পক্ষে একের পর এক সাজানো সাক্ষী বলে গেল, নীলকর নির্দোষ, তার মতো দয়াবান লোক আর হয় না, ওই রায়তটাই যত নষ্টের গোড়া, সে নীলের দাদন নেয়নি, কুঠির পেয়াদাকে ঠেঙিয়েছে,

> আমিনকে তাড়া করেছে, অন্য রায়তদের নীলচাষের বিরুদ্ধে খ্যাপানোর চেষ্টা করেছে, এমনি আরও কত সাংঘাতিক সব অভিযোগ।"[৩০]

নীলকরদের সামনে সাধারণ রায়তদের অসহায় অবস্থার করুণ স্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে উপরিউক্ত বয়ান মধ্যে। আলোচ্য আখ্যান পাঠের সূত্র ধরে এই অসহায়তার খণ্ড চিত্রগুলিকে কাহিনি পরম্পরা অনুসারে সাজালে পাওয়া যাবে নীলকরদের অত্যাচারের এক অখণ্ড বিশ্ববীক্ষা। মূলত আলোচ্য কাহিনির শুরু থেকেই নীলকরদের অবদমন প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে যুবক কাশীনাথের নিঃসঙ্গতা জীবনের সূত্রে। ঐতিহাসিক গবেষণালব্ধ গ্রন্থের প্রতি আলোকাপাত করলেই চোখে পড়বে এই অবদমনের নিবিড় বিবরণ—

> "The cold, hard and sorbid who can plough up grain fields, kidnap recusant rayets, confine them in dark holes, beat and starve them into submission, which things have sometimes been done, can give no moral guarantee of his capability of filling up a blank paper and turning it to his pecuniary profit."[৩১]

এই নিপীড়নের ইতিহাসকে মান্যতা দিয়েই আখ্যানের ভবিষ্যকথন গড়ে উঠেছে। *নীল ঘূর্ণি* আখ্যানে বর্ণিত নীলকর এবং রায়ত সম্পর্কের অভিনিবেশ আসলে ইতিহাসের ভিত্তিভূমিকে অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছিল। তাই রায়তদের প্রতি নীলকর অত্যাচারের ভীষণ বাস্তব। আবার কৃষকদের বিদ্রোহ চেতনার আয়ুধ কথাও তেমনই অধিক সত্য হয়ে উঠেছে উপন্যাসের কাহিনি পরম্পরায়। কৈলাসপুর গাঁয়ের সঙ্গতিপূর্ণ রায়ত গোবর্ধন হাজরা নীল চাষে অসম্মতি প্রকাশ করলে ভালুকপোতা নীলকুঠির সাহেব হিল্‌স ও কার্লো তাঁর বাড়ি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে সেই কার্যে গিয়ে নীলকরদের প্রবলভাবে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই বিরোধিতায় আসলে ভাবী প্রত্যাঘাতের শুভ সূচনা ছিল। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়াকে সযত্নে তুলে ধরেছেন আখ্যানকার। এই ঘটনার অভিঘাত সম্পর্কে কার্লো সাহেবের বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ— 'কার্লো হকচকিয়ে যায়: এ কী ব্যাপার! নীলকরের লোকদের ওপর হামলা! এ যে তার উর্ধ্বতন সাত পুরুষেও কখনও ভাবতে পারেনি।'[৩২] বস্তুত এই ঘটনা পরিসর গ্রামবাংলায় প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। আখ্যানের কাহিনি পরম্পরায় লেখক নীলকরদের প্রতি সাধারণ রায়তদের অসন্তোষের কথা তুলে ধরেছেন। কাশীনাথের দলে একে একে যোগ দিয়েছিল কামালুদ্দিন, কেশব, পাঁচু শেখ, ছিদাম, হরিচরণ, কামাল ও বৃন্দাবন। যারা ব্যক্তিজীবনে প্রত্যেকে নীলকরদের অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কাশীনাথদের প্রথম বড়ো সাফল্য ছিল ভালুকপোতা নীলকুঠির নায়েব দানী ঘোষের হত্যা। আখ্যানকার এই হত্যাকে নিদারুণ ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। হত্যার ভয়াবহতা এবং তা নিয়ে রায়তদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনাময় উপস্থিতি লেখকের বর্ণনায় বিশেষভাবে জায়গা করে নিয়েছে—

> "বিষম কাণ্ড! রায়তদের মধ্যে তাই চরম উত্তেজনা। যা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, তাই ঘটেছে।
>
> নায়েব দানী ঘোষ খুন!
>
> দারোয়ান চারজন খুন!
>
> আর—আর রায়তদের কাছে যা মস্ত বড় খবর— জমিজমা-সম্পত্তির যাবতীয় দলিল-দস্তাবেজ, খাতকদের খত, বন্ধকী তমসুক সব পুড়ে ছাই!"[৩৩]

এই হত্যার মূলে স্বয়ং কাশীনাথ দায়ি সেকথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আসলে আখ্যানের মধ্যে ক্ষমতাহীন থেকে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা চোখে পড়ে। তাই একদা পিতৃ-মাতৃ হারা নিঃসঙ্গ কাশীনাথের মতো সাধারণ কৃষক পূর্ব-প্রস্তুতি এবং ঐক্যের জোড়ে দানী ঘোষের মতো প্রবল প্রতাপশালী নায়েবকে হত্যা করতে পারে। একই সঙ্গে প্রতিরোধ, বিদ্রোহের ফলে চলমান ক্ষমতার রদবদল তথা প্যারাডাইম শিফট-এর সমীকরণ নির্দেশে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন লেখক—

> "নিজের হাতে কাশীই খুন করেছে তাকে। তখন সে বলেছিল — এমনি করে মা-বাবার মৃত্যুর শোধ তুলব, রায়তদের ওপর অত্যাচার-খুন-রাহাজানির বদলা নেব। এমনি করেই নিপাত করব নীলকর শয়তানদের আর তাদের পোষা কুত্তার দলকে।"[৩৪]

'বদলা নেব', 'নিপাত করব' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে কাশীনাথের এই বক্তব্য যেন এক অন্য মাত্রা লাভ করেছে। কাশীনাথের নেতৃত্বে নীলকর ও তার সহযোগীদের পরাভূত হওয়ার ঘটনায় গ্রামীণ সমাজে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি

করেছিল সাধারণের মনে। যদিও গ্রামবাংলায় নীলকরদের নিরঙ্কুশ দাপট রাতারাতি পরিবর্তিত রূপ নেবে এমনটা ভাবা খানিকটা কষ্টসাধ্য। কারণ তারা আসলে ঔপনিবেশিক শাসক অনুমোদিত ক্ষমতাসীন শ্রেণি। তাই কেবলমাত্র প্রত্যাঘাতের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় নীলকরদের অবস্থান বিলুপ্ত হয়নি বরং গ্রামবাংলায় ক্ষমতাসীন নীলকরদের প্রবল আধিপত্যের কথা কাহিনি বিন্যাসে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তাই *নীল ঘূর্ণি* আখ্যানের কাহিনি পরম্পরায় নীলকরদের প্রবল আধিপত্য লক্ষণীয়।

নীল ঘূর্ণি-র কাহিনি মধ্যে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধতার কথা, বিদ্রোহী চেতনার সুনিপুণ বর্ণনা ভিড় করেছে। বিদ্রোহের প্রাক্ মুহূর্তে গ্রামবাংলার ছবিটি কীভাবে বদলে গিয়েছিল, তারই নিবিড় বয়ান আলোচ্য আখ্যানের কাহিনি হয়ে উঠেছে। আখ্যান নির্মাণ কৌশলের প্রতি আলোকপাত করলে দেখব, নীলকরদের অত্যাচারের সামনে রায়তদের বিদ্রোহী চেতনার নান্দনিক বয়ান স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ রূপে ধরা দিয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে তাঁদের ঐক্যের ছবিটি। কৃষকদের বিদ্রোহী চেতনার পথ ধরেই *নীল ঘূর্ণি* আখ্যানের কাহিনি পরিণতির দিকে এগিয়েছে। এই বক্তব্যের সমর্থনে আলোচ্য উপন্যাসে বর্ণিত কৃষকদের সংঘবদ্ধতার সংরূপটি তুলে ধরতে পারি—

১.''পদ্মমণি আবার বললে,—ভাই, মনে রাখবেন, লড়াইয়ে আমরা মোটেই একা নই। যা খবর পাচ্ছি, দেশের আর সব এলাকায়ও রায়তরা আমাদের মতন নীলকরদের বিরুদ্ধে জোট বাঁধছে। আর ভালুকপোতার খবর তো আপনারা ভালো করেই জানেন। সেখানে রায়তদের মনে কাশীনাথ সর্দারের মান-ইজ্জত আজ দেবতার সামিল। না, শুধু সেখানকার রায়তদের মনেই নয়, আমাদের মনেও তাঁর সেই আসন। তাঁর পথ ধরেই আমরা এগোচ্ছি।''[৩৫]

২.''গোটা বাংলাদেশ যেন অগ্নিগর্ভ। গ্রামাঞ্চল জুড়ে লক্ষ-লক্ষ নীলচাষীদের। মধ্যে ধূমায়িত হচ্ছে নীলকরদের বিরুদ্ধে এতকালের পুঞ্জীভূত ঘৃণা, বিদ্বেষ ও আক্রোশের আগুন। শুকনো বারুদ যেন। ভালুকপোতা অঞ্চলের খবর সে বারুদে তাপ সৃষ্টি করছে। আর তার ফলে কোথাও তা সময় সময় দপ করে জ্বলে উঠছে, কোথাও জ্বলছে ধিকিধিকি।''[৩৬]

৩.''দিনে-দিনে গ্রাম বাংলার চেহারা পালটে যাচ্ছে। মারমুখী চাষিরা ফাঁকে পেলেই নীলের লোকদের আর জ্যান্ত ফিরে যেতে দিচ্ছে না। ভালুকপোতা কুঠি অঞ্চলে নীলের আবাদ কমতির দিকে। বিভিন্ন এলাকায় চাষিরা সুযোগ পেলেই নীলের চাষ বন্ধ করছে।''[৩৭]

৪.''শত-শত কণ্ঠের ক্রুদ্ধ গর্জনে আকাশ-বাতাস কেঁপে ওঠে: জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও নীলের গুদোম। মাটিতে মিশিয়ে দাও ওদের কয়েদখানা। খতম করো নীল কুত্তাদের! ইতিমধ্যে হাজারো কণ্ঠের ভৈরব গর্জন শুনে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে অগুনতি মানুষ ছুটে এসেছে। আসছে এখনও—কাতারে-কাতারে।''[৩৮]

৫.''নীল ঘূর্ণি। বাংলা দেশ জুড়ে নীলের সর্বগ্রাসী ঘূর্ণিঝড় উঠতে আর বুঝি দেরি নেই। দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে কানে আসছে তার দূরাগত ভয়াল গুড়গুড় আওয়াজ আর চাপা গর্জন।''[৩৯]

৬.''দু-দিন যেতে না যেতেই কার্লোর কাছে খবর এল-কাশী ও ফকিরের নেতৃত্বে গোটা তল্লাটের নীলচাষিরা সভা করে ঠিক করেছে, এখন থেকে নীলের চাষ সম্পূর্ণ বন্ধ, কোনও জমিতে তারা আর নীল বুনবে না। বুনবে ধান কলাই তামাক ও অনান্য ফসল। শুধু তাই নয়, সদর কুঠি আক্রমণ করার এবং নীলের গোলা ও কারখানা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়ারও মতলব করেছে তারা।''[৪০]

প্রসঙ্গত *নীল ঘূর্ণি* উপন্যাসের কাহিনি মধ্যে কৃষক বিদ্রোহের যে কাঠামো লক্ষ করা গিয়েছে তাকে স্তর অনুসারে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব, বিদ্রোহের ধারাবাহিক পূর্ব-প্রস্তুতি থেকে শুরু করে পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়নের নিবিড় বর্ণনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসে কৃষক বিদ্রোহের এরূপ বর্ণনা সাধারণত লক্ষ করা যায় না। অধিকাংশ সময়েই কৃষক বিদ্রোহের ক্ষেত্রে তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ততাকে তুলে ধরা হয়। কৃষকদের আবেগ অনুভূতিকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে প্রথাগত ইতিহাসবিদরা। যেখানে বিদ্রোহী কৃষকদের মিটিং, মিছিল, পঞ্চায়েত প্রভৃতি কার্যক্রমের কথা সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি এলিট শ্রেণির ঐতিহাসিকরা। তবে এই ইতিহাস চর্চায় ছেদ পড়েছে বিশ শতকের দ্বিতিয়ার্ধ থেকে। নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চায় ভারতীয় উপমহাদেশে কৃষকদের বিদ্রোহ পরিকল্পনায়, প্রস্তুতিকে সমান গুরুত্বের সঙ্গে দেখার চেষ্টা লক্ষ করা গিয়েছে। নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার প্রধান প্রবক্তা রণজিৎ গুহ (১৯২৩-

২০২৩) তাঁর *এলিমেন্টারি আসপেক্টস অফ পেজান্ট ইনসার্জেন্সি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া* (১৯৮৩) গ্রন্থটিতে বলতে চেয়েছেন—

> "কৃষক বিদ্রোহকে কতকগুলি অর্থনৈতিক শর্ত দিয়ে সরাসরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আপাতদৃষ্টিতে যে বিদ্রোহকে মনে হয় আকস্মিক, কিছু অবাস্তব কল্পনার দ্বারা চালিত, আসলে তা কিন্তু এই অর্থে 'স্বতঃস্ফূর্ত' নয়। তার পিছনে থাকে প্রস্তুতি, সংগঠন, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের নির্দিষ্ট একটা ছক। এই ছক নিহিত রয়েছে কৃষকচেতনায়। বিদ্রোহের উদ্দেশ্য, তার অলীক চরিত্র, এবং রাজনৈতিক পরিণতি হিসেবে তার অনিবার্য ব্যর্থতা, এ-সবেরই যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে কৃষক চেতনার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে, অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য/বৈপরীত্যের দ্বান্দ্বিক রূপটিতে।"[৪১]

বস্তুত *নীল ঘূর্ণি* উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণে কৃষকদের বিদ্রোহী চেতনার যে সূচনা, বিস্তার, ক্রমপরিণতির পরিকল্পনামূলক বর্ণনা উঠে এসেছে তার সঙ্গে বেশ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় নিম্নবর্গের ইতিহাসের চর্চার মূল তত্ত্বের। তবে প্রসঙ্গ অনুসারে বলতে হয় ঔপন্যাসিক দীনেশচন্দ্র সেন কোনো তত্ত্বকথাকে কেন্দ্র করে *নীল ঘূর্ণি* আখ্যানের কাহিনি নির্মাণ করেছেন— এমনটি কিন্তু আদৌ নয়। তিনি আলোচ্য আখ্যানে কৃষক বিদ্রোহের কতগুলি প্রবণতাকে সামনে রেখে কাহিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন। নির্দিষ্ট রূপে সেখানে তিনি নীল বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটকে বেছে নিয়েছেন। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস চেতনায় নীল বিদ্রোহের সমস্ত উপাদানকে ব্যবহার করে তিনি নীল বিদ্রোহের দেশ কালের সাধারণ জনমানসের কথা বলতে চেয়েছেন। আর তাই কোনো বহুল প্রচলিত বিদ্রোহী নেতার ব্যক্তি-জীবন আখ্যানের ভর কেন্দ্র হয়ে ওঠেনি, সাধারণ বিদ্রোহী যুবক এবং অভিজ্ঞ বৃদ্ধ *নীল ঘূর্ণি*-র কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে।

(৫)

উনিশ শতকের নবচেতনার কর্মযজ্ঞের পাশাপাশি নীল বিদ্রোহের সরব উপস্থিতি ও তার প্রতিক্রিয়া সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৪-২০১২) *সেই সময়* (১ম খণ্ড-১৯৮১, ২য় খণ্ড-১৯৮২) উপন্যাসে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। নীল বিদ্রোহের অনুষঙ্গে কৃষক সমাজ, জমিদার শ্রেণি ও জমিদারির সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলির জীবনচর্যার একটি গোটা চিত্র উপন্যাসের কাহিনি পরম্পরায় উঠে এসেছে। উক্ত অনুষঙ্গগুলি কাহিনির নির্ণায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করেছে। নির্দিষ্টভাবে বলতে হয় উপন্যাস নির্মাণের আবশ্যিক শর্ত হয়ে দেখা দিয়েছে কৃষক বিদ্রোহ ও তার ইতিহাস। *সেই সময়* উপন্যাসের কাহিনি অভ্যন্তরে নীল বিদ্রোহের বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা প্রবাহের সূত্রপাত ও ক্রমপরিণতিতে মধ্যমণি হয়ে উঠেছে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র গঙ্গানারায়ণ। জমিদার রামকমল সিংহের দত্তক পুত্র যুবক গঙ্গানারায়ণকে সামনে রেখে *সেই সময়* উপন্যাসে নীল বিদ্রোহের ঘটনা পরম্পরা বিস্তার লাভ করেছে।

উপন্যাসের শুরুতেই দেখতে পাই নব্য জমিদার রামকমল সিংহ বাবুয়ানায় ব্যস্ত। আর তাই রামকমলের সাংসারিক কিংবা জমিদারির সকল কাজে বিধুশেখরের মতামতই শেষ কথা ছিল। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) ব্যবস্থার সৌজন্যে উনিশ শতকে গড়ে ওঠা নগর কলকাতায় থেকেই জমিদারি তদারকির কাজ সম্পন্ন করেছে বিধুশেখর। যার ফলে কুষ্টিয়ার ভিনকুড়ি গ্রামের চাষি ত্রিলোচন পরপর দু'বছর আকালের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত থেকে এবং শেষ পর্যন্ত বসতি বাড়ি হারিয়ে কলকাতায় নিজেদের জমিদারকে খুঁজতে বেরিয়েছে। কারণ— "ত্রিলোচন দাস জানতেই পারিনি কবে তার জমিদার বদল হয়ে গেছে।"[৪২] ত্রিলোচনের জমি হারানোর মূলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তী ভূমিরাজস্ব নীতিই মূল দায়ি। নতুন জমিদারি ব্যবস্থার ফলে ত্রিলোচন দাসের মতো সাধারণ চাষির অবস্থানগত পরিচয় আলোচনার স্বার্থে তুলে ধরলাম—

> "এবার সে দেখলো নতুন একজন নায়েবকে এবং সঙ্গে নতুন পাইক বরকন্দাজদের। এবং সে শুনলো যে তাকে তিনগুণ খাজনা দিতে হবে। সে ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলো না। তাদের গ্রামে দু-পাঁচঘর বামুন কায়েত ছাড়া আর সবাই চাষী। সব চাষীরই এক অবস্থা। কেউ কিছুই বুঝলো না। খাজনা না পেলে পাইক-বরকন্দাজরা জোরজুলুম করে লোকের ঘর থেকে ঘটিবাটি কেড়ে নিতে লাগলো। ত্রিলোচন দাসের ঘরে সেরকম বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না বলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো তার বাড়িতে। সেই আগুনের পাশে দাঁড়িয়েই নায়েবমশাই তামাক টানতে লাগলেন।

ত্রিলোচন তার পা ছুঁতে গেল, তিনি পা ছাঁটা দিয়ে বললেন, আরে ছুঁসনি, ছুঁসনি। ব্যাটা ভগবানকে ডাক গিয়ে। ভগবান ছাড়া কেউ তোদের আর বাঁচাতে পারবে না।"[৪৩]

প্রথাগত জমিদারি ব্যবস্থার অবক্ষয়ের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির কঙ্কালসার চেহারাটি আত্মপ্রকাশ করেছিল নতুন জমিদারি ব্যবস্থার দিনগুলিতে। তাই কুষ্টিয়ার ভিনকুড়ি গ্রামের সাধারণ কৃষক সর্বস্ব হারিয়ে সপরিবারে কলকাতার রাজপথে নিজ জমিদারের স্বরূপ কল্পনা করার চেষ্টা করেছে। ত্রিলোচনের এই নগর কলকাতায় আসার মূল উদ্দেশ্য হলো, জমিদারের কাছে খাজনা মুকুবের প্রার্থনা জানানো। কারণ একমাত্র জমিদারবাবুর কৃপাদৃষ্টির ফলে ত্রিলোচনার মতো কৃষকেরা বাঁচতে পারে। এই বিশ্বাস নিয়ে ত্রিলোচনের ব্যক্তিমানস কলকাতা শহরে জমিদার বাড়ির পরিবেশ কল্পনা করতে থাকে। ঔপন্যাসিক ত্রিলোচনের জমিদার দর্শনের অভীপ্সার সূত্রে সময়ের বিবর্তন কথাকে নির্দেশ করতে চেয়েছেন। ত্রিলোচনের মানস কল্পনায় জমিদারি সত্তার যে বিগ্রহ রূপ চিরস্থায়ী হয়েছিল, প্রকৃত অর্থে তার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি উনিশ শতকের এই নগর কলকাতায়।

তবে উপন্যাসের কাহিনি ক্রমশ ত্বরান্বিত হয়েছে নগর ছাড়িয়ে গ্রামজীবনের দিকে। জমিদার রামকমল সিংহের মৃত্যুর পরবর্তীতে ইব্রাহিমপুরে প্রজা অসন্তোষের প্রতিকারের জন্য নীলকরদের কাছে নীলের কারবার বেচে দেওয়ার কথা বলে বিধুশেখর। সেখানে গঙ্গানারায়ণ বলে— "দেখি আমি নিজে একবার দেকে আসি।"[৪৪] গঙ্গানারায়ণ যশোরের ইব্রাহিমপুর তালুকে গিয়েছে, যেখানে নীল চাষের জন্য জমি পত্তন নেওয়া আছে। তবে এই নীল চাষেকেই কেন্দ্র করে যাবতীয় সমস্যার সূত্রপাত। নেটিভ জমিদারদের উপর প্রবল আধিপত্য বিস্তার করেছিল নীলকর সাহেবরা। এই প্রবল আধিপত্যকে স্মরণে রেখে বিধুশেখর চান নীলচাষের জন্য পত্তন দেওয়া জমি সাহেবদের কাজে ইজারা দিয়ে দিতে, নীলের বাজার তেজী থাকতে থাকতে দাম বেশ ভালো পাওয়া যাবে। তবে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে গঙ্গানারায়ণ ইব্রাহিমপুরের নীলকর ম্যাকগ্রেগর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। যে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছে প্রজা জামালুদ্দীন শেখের স্ত্রী হানিফার নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার সূত্র ধরে। স্ত্রী হানিফা বিবি অনুসন্ধানে গেলে জামালুদ্দীন শেখ নীলকুঠিতে গেলে তারও আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। নীলকর সাহেবের কীর্তিকলাপ শোনার পরেও গঙ্গানারায়ণের মনে কোথাও সুপ্ত ধারণা ছিল যে, উদ্ভুত সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করলে হয়তো সমস্যার কোনো সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসবে। তবে জমিদার গঙ্গানারায়ণের ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করার শতভাগ দায়িত্ব নিয়েছে নীলকুঠির সাহেব ম্যাকগ্রেগর। ঔদ্ধত্য ও অশালীন আচরণের মধ্যে দিয়ে গঙ্গানারায়ণের জমিদারিসত্তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে নীলকর ম্যাকগ্রেগর। চূড়ান্ত অপমানিত গঙ্গানারায়ণ সংজ্ঞা হারিয়েছে। আখ্যানের কাহিনি বিন্যাসে ম্যাকগ্রেগর সাহেবের এই অশালীন আচরণ, সাধারণ চাষিদের উপর শোষণের ইতিবৃত্ত এবং সর্বোপরি নারীদের সম্মান লুণ্ঠনের অনুষঙ্গ নীলকর সাহেবদের সহজাত গুণাবলীকেই নির্দেশ করে। দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* (১৮৬০) নাটকের কথা নিশ্চয় মনে পড়বে। যেখানে নারীলোলুপ পি. পি. রোগ সাহেব গৃহবধূ ক্ষেত্রমণির সর্বনাশ করেছে পদী ময়রাণীর সাহায্যে। প্রসঙ্গত আলোচ্য আখ্যানে হানিফা বিবির সম্ভাব্য করুণ পরিণতি একই হয়েছে সহজেই অনুমেয়। গ্রামের গৃহস্থ নারী হানিফা বিবি কিংবা তাঁর স্বামী জামালুদ্দীন শেখ সকলের কাছে নীলকুঠি ছিল মৃত্যুকূপসম। তবে সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ম্যাকগ্রেগর কর্তৃক গঙ্গানারায়ণের অপমান। এই অপমানের মূল উৎস অন্বেষণ করতে গিয়ে আমাদের পিছনে ফিরে তাকাতে হয়। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় কোম্পানির ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং সনদ আইনের দৌলতে সাহেবরা বাণিজ্যের জন্য এই কৃষিভূমি বাংলাকে বেছে নিয়েছিল। নীল চাষের জন্য কোম্পানি শাসক একাধিক আইনও প্রণয়ন করেছিল। লর্ড বেন্টিঙ্ক (১৭৭৪-১৮৩৯) -এর আমলে ১৮৩০-এর কুখ্যাত পঞ্চম আইনে দাদন গ্রহণকারী কৃষকের নীল চাষ না করা আইন বিরুদ্ধ ঘোষিত হলে[৪৫] নীলকরদের প্রবল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল এই বাংলায়। শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী দিনগুলিতে নীলের চাহিদা আকাশ ছুঁলে গ্রামবাংলায় ধান সহ অন্যান্য ফসলের জায়গা দখল করেছিল নীল নামক রঞ্জক দ্রব্যের গাছ। এই নীল চাষের সূত্র ধরেই ঔপনিবেশিক শাসকের হাত শক্ত করেছিল এদেশীয় নব্য জমিদার, মুৎসুদ্দির শ্রেণি এবং অবশ্যই নীলকররা। অপরদিকে বংশপরম্পরায় প্রথাগত জমিদারদের আধিপত্য ক্রমশ বিলুপ্ত হতে শুরু করেছিল। আর তাই *সেই সময়* উপন্যাসে জমিদার গঙ্গানারায়ণকে অপমান সহ্য করতে হয়েছে সামান্য একজন নীলকর সাহেবের নিকট। প্রাচীন জমিদারদের ক্ষমতা যেন অস্তমিত সূর্যের ন্যায় ক্রমশ ক্ষীণ হতে শুরু করেছিল। নীলকুঠি থেকে ফিরে এসে কিংকর্তব্যবিমূঢ় গঙ্গানারায়ণের সংজ্ঞা হারানো আসলে প্রাচীন জমিদারের করুণ পরিণতিকেই নির্দেশ করেছে। ইব্রাহিমপুরের সাধারণ কৃষকদের জীবন সংকটের কোনো প্রতিকার

বা সমাধান সূত্র নির্দেশ করতে অপারক গঙ্গানারায়ণের বড়ো অসহায় লেগেছে। এই অসহায়তার বিপরীতে নীলকর সাহেবদের ক্রমবর্ধমান সক্রিয়তার ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নীলকরদের ক্ষমতা, আধিপত্যের সামনে বিদ্রোহী জমিদার সমাজ আসলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। সংজ্ঞা হারানোর পরবর্তীতে গঙ্গানারায়ণ ইব্রাহিমপুর ত্যাগ করে বারানসীর অভিমুখে যাত্রা করেছে।

এই ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ে তথা *সেই সময়* উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনি নির্মাণে মধ্যমণি হয়ে উঠেছে যুবক নবীনকুমার। ইব্রাহিমপুরে গঙ্গানারায়ণের নিরুদ্দেশের পরবর্তীতে সিংহ পরিবারের সমস্ত আশা ভরসা তিনি। সেই নবীনকুমার কৌতূহলী দু'চোখ দিয়ে নিরীক্ষণ করেছে নিজের জমিদারি এলাকাকে। সেই নিরীক্ষণের সূত্র ধরেই উঠে এসেছে ইব্রাহিমপুরের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা। দিবাকর ও নবীনকুমারের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে নীলকরদের দাপাদাপি ও নীল চাষের ভয়াভহতা এবং জমিদারি ব্যবস্থার কঙ্কালসার চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

> "দিবাকর বললো, আর একটুখন অপিক্ষা করুন। ময়না ডাঙ্গার আর দেরি নেই। এ জায়গাটি ভালো নয়কো।
> —কেন, এ জায়গাটি মন্দ কিসের?
> —এখেনে বড় নীলকর সাহেবদের হেঙ্গামা। ঐ যে টিলার ওপর বাড়িটে দেকচেন, ঐটে নীলকুঠি।
> —নীলকুঠি রয়েচে বলে কি এ তল্লাটে মানুষজন যেতে পারবে না? এ আবার কেমন ধারা কতা?
> —আজ্ঞে, নীলকররা বড় অত্যেচার করে। মানীর মান রাকতে জানে না। এখেনকার লোকজন অনেকে ভয়ে পালিয়েচে।
> —কী নাম বললে জায়গাটার? ইব্রাহিমপুর। এখেনে আমাদের জমিদারি আচে না?
> —ছিল, সে সব জমি আমরা নীলকরদের ইজারা দিয়ে দিইচি। ওনাদের অত্যেচারে আর রক্ষে করা গেল না। ভালো আখের খেত ছেল, বড়বাবুর আমলে ইব্রাহিমপুর থেকে বিলক্ষণ মোটা টাকা উশুল হতো, সে সব গ্যাচে, রয়েছে শুধু কুঠিবাড়িটি।
> — সেখেনে কে থাকে?
> —জনাচারেক কর্মচারী রাকা হয়েচে, দেকাশুনো করে।
> —বজরা ভেড়াও, আমি সেই কুঠিতে একবার যাবো।
> —আজ্ঞে হুজুর, ও কতা উচ্চারণ করবেন না। সাধ করে কেউ নীলকরদের কাচ ঘ্যাঁষে? কতায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠেরো ঘা আর নীলকরে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা।"[৪৬]

উনিশ শতকে নীলকরদের আধিপত্য কতদূর বিস্তার লাভ করছিল তারই যেন বর্ণমালা হয়ে উঠছে উপরিউক্ত উদ্ধৃতি অংশ। গঙ্গানারায়ণের নিরুদ্দেশ পরবর্তী সময়পর্বে কলকাতা নিবাসী নবীনকুমারের কাছে জমিদারি বড়োই দুরূহ হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই নবীনকুমার ইব্রাহিমপুরের অলাভজনক কুঠি বাড়িটি বেঁচে দিতে চেয়েছে। এই সিদ্ধান্ত আসলে নীলকরদের প্রতাপের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ সমতুল্য।

তবে *সেই সময়* উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে গঙ্গানারায়ণের প্রত্যাবর্তন আখ্যানকে উদ্দেশ্যমুখী করে তুলেছে। গঙ্গানারায়ণের প্রবাস জীবনে ইব্রাহিমপুরের স্মৃতি উঁকি দেওয়ার মধ্যেই আসলে গঙ্গানারায়ণের প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাই নদীবক্ষে বিন্দুবাসিনীকে হারিয়ে উদ্ভ্রান্ত গঙ্গানারায়ণ শেষ পর্যন্ত ইব্রাহিমপুরেই ফিরে এসেছে। নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছে গঙ্গানারায়ণ। জামালুদ্দীনের পিতাকে গঙ্গানারায়ণ বলেছে—

> "বৃদ্ধের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে শান্তভাবে বললো, আমি তোমার ছেলের সন্ধান করবো বলে কথা দিয়েছিলুম, তারপর আমার কী মতিভ্রম হলো, সে কথা রাখিনি, কিন্তু সেই টানে আমি আবার ফিরে এসিচি।"[৪৭]

প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী সময়পর্বে গঙ্গানারায়ণ দেশের অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করেছে। ততদিনে বাংলাদেশের কৃষিভূমিতে নীল নামক রঞ্জক দ্রব্যের গাছ স্থায়ীভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। জমিতে কুঠিয়াল সাহেবের 'লোভদৃষ্টি পতিত' হয়েছিল।[৪৮] সাধারণ কৃষকদের ভাগ্য নীলের দাদনের নিকট বাঁধা পড়েছে। এমতাবস্থায় ইব্রাহিমপুর সহ গ্রামীণ জনপদে অনিচ্ছুক রায়তের কৃষিজমিতে নীলের দাগ দেওয়ার ঘটনাপ্রবাহ আতঙ্কেরই নামান্তর। এই আতঙ্কের সাক্ষাৎ

প্রতিমূর্তি নীলকর ম্যাকগ্রেগর সাহেব। থমথমে পরিবেশে গঙ্গানারায়ণের সক্রিয়তা নীলকর ম্যাকগ্রেগরের কাছে চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ম্যাকগ্রেগরের শ্যামচাঁদ গঙ্গানারায়ণকে স্পর্শ করলে, গঙ্গানারায়ণ অত্যাচারী নীলকরকে ভূপতিত করেছে। রায়তারাও ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে গঙ্গানারায়ণের। তবে নীলকরদের প্রবল পরাক্রমে ইব্রাহিমপুর ভস্মীভূত ও জনশূন্য হয়ে গিয়েছে। এই বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের রূপ নিয়েছে গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে। গহীন অরণ্যে দিনযাপন করতে হয়েছে প্রতিবাদী গঙ্গানারায়ণ। উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা কিংবা নীলকরদের বাণিজ্য প্রসারে জমিদারশ্রেণি সহায়কের ভূমিকাই পালন করেছে। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী নীল বিদ্রোহ। এই নীল বিদ্রোহে জমিদার শ্রেণির প্রতিনিধি গঙ্গানারায়ণ শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি স্বরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে—

> ‘‘রোমাঞ্চকর কাহিনীর নায়কের মত কোনো ভূমিকা নেবার আদৌ ইচ্ছে ছিল না গঙ্গানারায়ণের, কিন্তু পাকেচক্রে তাকে প্রায় সেরকমই হতে হলো। জঙ্গলের আস্তানা থেকে সে দু-একবার বাইরে বেরুবার চেষ্টা করেই বুঝলো, আবহাওয়া অতিশয় উষ্ণ, চাষীদের সঙ্গে নীল কুঠীয়ালদের সংঘর্ষ লাগছে প্রায়ই। ম্যাকগ্রেগারের চ্যালা-চামুণ্ডারা শিকারী কুকুরের মতন গঙ্গানারায়ণের সন্ধানে চতুর্দিকে শুঁকে শুঁকে ফিরছে, গঙ্গনারায়ণের প্রহারে নাকি ম্যাকগ্রেগরের একটি চক্ষু বিষমভাবে জখম হয়েছে, এর প্রতিশোধ তারা নেবেই। গঙ্গানারায়ণের চেহারার বর্ণনা এবং পরিচয় এ তল্লাটে কারুর আর অজানা নেই। কোনো অপরিচিত গ্রামবাসীও গঙ্গানারায়ণকে দেখলে কাছে এসে মিনতি মাখা কণ্ঠে বলেন, বাবু, আপনে শিগগৈর পালান, আপনেরে ধরতি পাল্লি সাহেবরা আপনের কইলজ্জা টাইন্যে ছিড়ে ফেলবে!’’[৪৯]

তবে জমিদার গঙ্গানারায়ণের বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়ার পরও নীলকরদের প্রবল আধিপত্য ও নিপীড়নের কথা তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। নীল বিদ্রোহের প্রবল প্রতাপের কাছে পরাভূত হয়েছে জমিদার গঙ্গানারায়ণ। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গঙ্গানারায়ণকে রক্তাক্ত হতে হয়েছে। কারাবাসের পরবর্তীতে ফিরে গিয়েছে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ নগর কলকাতার জীবনে। সেই সঙ্গে বদলে গিয়েছে গঙ্গানারায়ণের জীবন দৃষ্টিভঙ্গি। *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকার সম্পাদক হরিশ মুখুয্যের সঙ্গে আলোচনায় গঙ্গানারায়ণ জানিয়েছে— ‘‘কিন্তু লাঠি-বন্দুক নিয়ে নীলকর সাহেবদের সঙ্গে লড়াই করলে কি আর পাড় পাওয়া যাবে? আইনের সুযোগ নিয়ে দাবি আদায় করতে হবে চাষীদের।’’[৫০] শেষ পর্যন্ত গঙ্গানারায়ণ প্রতিবাদের পথ পরিত্যাগ করে আইনি পথ বেঁছে নেওয়ার কথা বলেছে। গঙ্গানারায়ণের পক্ষে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেওয়া কার্যত অসম্ভব ছিল। কারণ প্রকৃত অর্থে নীল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিল সাধারণ কৃষকরা। আর তাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কার্যত *সেই সময়* উপন্যাসে নীলকরদের আধিপত্য, শোষণ এবং প্রতিরোধের কতগুলি প্রবণতাকে তুলে ধরেছেন মাত্র গঙ্গানারায়ণকে সামনে রেখে।

পরিশেষে বলতে পারি *ইছামতী* থেকে শুরু করে *নীল ঘূর্ণি* কিংবা *সেই সময়* উপন্যাসের কাহিনি পরম্পরায় নীল চাষের সঙ্কট সম্ভাবনা থেকে বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আলোচ্য উপন্যাস সমূহের কাহিনি বয়ান, চরিত্র নির্মাণ সবেতেই ঔপন্যাসিকের দীর্ঘ প্রস্তুতু লক্ষণীয়। তাই উপন্যাসের কাহিনি মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসকের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা থেকে নীলকরদের অমোঘ প্রভাবের কথা উঠে এসেছে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসকে মান্যতা দিয়েই। সর্বোপরি নীল বিদ্রোহের গ্রামবাংলায় সাধারণ কৃষক সমাজের অপার ভূমিকা তথা বিদ্রোহী চেতনা উপন্যাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। যা আসলে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষক জীবনচর্যার বাস্তব চিত্র স্বরূপ। প্রতিটি উপন্যাসের কাহিনি স্বতন্ত্র হলেও উনিশ শতকের নীল বিদ্রোহের নান্দনিক সমাপতনের মধ্যে দিয়ে ঔপনিবেশিক আমলে কৃষক জীবনের অন্দর মহলে উঁকি দিতে চেষ্টা করেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো ঔপন্যাসিকরা। এই কারণেই *ইছামতী, নীল ঘূর্ণি, সেই সময়* শুধু উপন্যাস নয় একই সঙ্গে উনিশ শতকের কৃষক জীবনচর্যার নিদারুণ বাস্তব দলিল হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, স্বপন, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ- ২০১৬, পৃষ্ঠা. ১৭২
২. মুখোপাধ্যায়, নির্মাল্যকুমার, *ঔপনিবেশিক বাংলার ভূমিব্যবস্থার রূপান্তর*, পঞ্চালিকা, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ- মে, ২০২৪, পৃষ্ঠা. ২১০
৩. বসু, স্বপন, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৭৪
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, *বাংলা সাময়িক-পত্র (১৮১৮-১৮৬৮)*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, নূতন সংস্করণ- ১৩৫৪, পৃষ্ঠা. ১৩১
৫. মিত্র, প্যারীচাঁদ, *জমিদার ও রায়ত*, সৌমিত্র শংকর সেনগুপ্ত (সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃষ্ঠা. ২৩
৬. ঐ, পৃষ্ঠা. ৫১
৭. ঘোষ, বিনয়, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (চতুর্থ খণ্ড)*, প্রকাশভবন, কলকাতা, তৃতীয় পুণর্মুদ্রণ- ২০১৬, পৃষ্ঠা. ১২৯
৮. বাগল, যোগেশচন্দ্র (সম্পা.), *বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পঞ্চদশ সংস্করণ- ১৪১১, পৃষ্ঠা. ২৫৩
৯. ঐ, পৃষ্ঠা. ২৫৩
১০. ঐ, পৃষ্ঠা. ২৫৩
১১. ঐ, পৃষ্ঠা. ২৫২
১২. ঐ, পৃষ্ঠা. ২৬৫
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *ইছামতী*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ- ২০১৫, পৃষ্ঠা. ১১
১৪. ঐ, পৃষ্ঠা. ১৮
১৫. ঐ, পৃষ্ঠা.৩০
১৬. ঐ, পৃষ্ঠা. ৬৫
১৭. ঐ, পৃষ্ঠা. ৩৯
১৮. ঐ, পৃষ্ঠা. ১৫৫-১৫৬
১৯. ঐ, পৃষ্ঠা. ১৭১
২০. ঐ, পৃষ্ঠা. ১৮৯
২১. ঐ, পৃষ্ঠা. ১৯১
২২. ঐ, পৃষ্ঠা. ২০৪
২৩. ঐ, পৃষ্ঠা. ২০৪
২৪. ভদ্র, গৌতম, চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পাদিত), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ- ২০২০, পৃষ্ঠা. ৪২-৪৩
২৫. চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র, *নীল ঘূর্ণি*, পত্রভারতী, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ- আগস্ট ২০২২, ভূমিকা অংশ
২৬. ঐ, ভূমিকা অংশ
২৭. ঐ, পৃষ্ঠা. ১৭
২৮. ঐ, পৃষ্ঠা. ২২
২৯. ঐ, পৃষ্ঠা. ৩১
৩০. ঐ, পৃষ্ঠা. ৩১
৩১. মুখোপাধ্যায়, নির্মাল্যকুমার, *বাংলার ভূমিব্যবস্থা, জরিপ ও রাজস্বের আইনগত বিবর্তন*, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০২১, পৃষ্ঠা. ৬৯
৩২. চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র, *নীল ঘূর্ণি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১১৭
৩৩. চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র, *নীল ঘূর্ণি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৩৫

৩৪. চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র, *নীল ঘূর্ণি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৩৭
৩৫. চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র, *নীল ঘূর্ণি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৭
৩৬. চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র, *নীল ঘূর্ণি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৯
৩৭. চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র, *নীল ঘূর্ণি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৬৫
৩৮. চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র, *নীল ঘূর্ণি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৭০
৩৯. চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র, *নীল ঘূর্ণি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৭৫
৪০. চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র, *নীল ঘূর্ণি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৭৬
৪১. ভদ্র, গৌতম, চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পাদিত), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৮
৪২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *সেই সময়*, আনন্দ, কলকাতা, সপ্তদশ মুদ্রণ- চৈত্র ১৪২৫ ব., পৃষ্ঠা. ৫৩
৪৩. ঐ, পৃষ্ঠা. ৫৩
৪৪. ঐ, পৃষ্ঠা. ১৬১
৪৫. বসু, স্বপন, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৯৩
৪৬. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *সেই সময়*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৯৮
৪৭. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *সেই সময়*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪৭৮
৪৮. চন্দ, পুলক, *নীল বিদ্রোহ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ- জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা. ৩০
৪৯. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *সেই সময়*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪৮৯
৫০. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *সেই সময়*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫১৪

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1123-1133
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.112

বাণী বসুর উপন্যাসে নারীচরিত্র: আত্মপ্রকাশ, সংগ্রাম ও সমাজদৃষ্টির পুনর্মূল্যায়ন

সৌরভ মুখার্জি, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, ওয়াই. বি. এন ইউনিভার্সিটি, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড, ভারত*

Received: 14.05.2025; Send for Revised: 17.05.2025; Revised Received: 26.05.2025; Accepted: 28.05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The representation of female characters in Bengali novels has undergone significant transformation over time. Traditionally, women were depicted either as icons of purity, objects of desire or passive elements within the narrative. However, in the works of Bani Basu, this conventional portrayal is radically challenged. Her female characters emerge as self-aware, resilient, and assertive individuals who, through their experiences, consciousness, and struggles, seek and often attain a distinct sense of identity. They are not merely literary embellishments but powerful reflections of social and historical realities. From a feminist theoretical perspective, Bani Basu's women are not symbols of oppression but agents of change. Their journey— from the primitive social order to modern urban civilization— encapsulates the broader trajectory of women's quest for selfhood. In her narratives, this evolution is rendered with depth and nuance. As such, her female characters transcend the boundaries of fiction to become vital documents of socio-cultural and historical consciousness. Her novels mark a distinct and original turn in Bengali literature, offering a new lens for understanding gender, identity and resistance.

Keywords: Feminism, Linga Porichoy, Pitritontro, Narir Songram, Naribadi Drishtivônggi, Sahityik Protirodh

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে নারীচরিত্রের ভূমিকা সময়ের সাথে সাথে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। কখনো তারা পবিত্রতার মূর্তি, কখনো ভোগ্যবস্তু, আবার কখনো সমাজ পরিবর্তনের অনুঘটক। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাণী বসু এই ধারাবাহিকতাকে ভেঙে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। তার রচনায় নারী কেবল গল্পের অলঙ্কার নয়, বরং নিজস্ব বোধ, অনুভব ও লড়াইয়ের মাধ্যমে আত্মপরিচয়ের সন্ধান করে।

বাণী বসুর উপন্যাসগুলিতে নারীচরিত্র সময়, সমাজ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নিজেদের নতুনভাবে নির্মাণ করে। এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কীভাবে তার উপন্যাসে নারীচরিত্র আত্মপ্রকাশ, সংগ্রাম এবং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তরের মাধ্যমে উঠে এসেছে।

নারীবাদ (Feminism) একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, যার মূল উদ্দেশ্য নারী- পুরুষের সমতা, অধিকার ও মর্যাদার প্রতিষ্ঠা। এটি কেবল নারীর প্রতি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, বরং একটি বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ডাক। নারীবাদ নারীকে দুর্বল, অক্ষম ও অধীনস্থ ভাবার প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং নারীকে স্বতন্ত্র পরিচয়ে মানবিক মর্যাদার স্থান দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করে।

Gerda Lerner তাঁর "Creation of Patriarchy" গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন যে, পিতৃতন্ত্র একটি সাংগঠনিক কাঠামো— যেখানে নারীকে একটি প্রান্তিক অবস্থানে দাঁড় করিয়ে পুরুষ কর্তৃত্ব কায়েম করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে Simone de Beauvoir-এর "The Second Sex" নারীবাদী তত্ত্বে যুগান্তকারী অবদান রাখে। তিনি বলেন, “Man is defined as a human being and a woman as a female—whenever she behaves as a human being she is said to imitate male,”[১]
অর্থাৎ নারী যখন নিজের স্বতন্ত্র মানবিক পরিচয় তুলে ধরেন, তখন সমাজ তাঁকে পুরুষসুলভ আচরণের দোষ দেয়। এই মন্তব্য নারীর অবস্থান ও আত্মপরিচয়ের সংকটকে গভীরভাবে তুলে ধরে।

নারীবাদী চিন্তাধারার গোড়াপত্তন হয় Mary Wollstonecraft-এর "A Vindication of the Rights of Woman" গ্রন্থে। তিনি নারীকে শিক্ষা ও যুক্তিবোধের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তোলার কথা বলেন, যা পরবর্তী নারীবাদী আন্দোলনের ভিত গড়ে দেয়। নারীবাদ কোনো একক মত নয়, এটি বহুস্তরীয়, বহুমুখী ও বহুপ্রবাহের মেলবন্ধন—যেখানে রয়েছে লিঙ্গ, শ্রেণি, জাতি ও সংস্কৃতিভেদে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণের প্রেক্ষিত।

এই নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বাঙালি কথাসাহিত্যে শক্তিশালীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বাণী বসুর উপন্যাসসমূহে। তাঁর লেখায় নারীর অস্তিত্ব, আত্মপরিচয় ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে গভীর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। যেমন, ‘অষ্টম গর্ভ’ উপন্যাসে মাতৃত্ব, নারীত্ব এবং শরীরী রাজনীতির জটিল সম্পর্ক তুলে ধরেছেন, যেখানে নারী তার নিজের শরীর ও জন্মদানের অধিকার নিয়েই প্রশ্ন তোলে।

বাণী বসুর ‘মৈত্রেয় জাতক’, ‘জন্মভূমি মাতৃভূমি’, কিংবা ‘অশ্বযোনি’ উপন্যাসে বারবার উঠে আসে নারীর অস্তিত্বের প্রশ্ন। তাঁর নারীচরিত্রেরা কেবল ভুক্তভোগী নয়, বরং সংগ্রামী, প্রশ্নকারী এবং অধিকারের দাবি জানানো মানুষ- যাঁরা সমাজের প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে নিজের জন্য জায়গা করে নিতে চায়। এই চরিত্ররা নারীবাদী চিন্তার বাস্তব প্রতিফলন- তাঁরা পুরুষতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে অস্বীকার করে নিজেদের জীবনের নিয়ন্ত্রক হতে চায়।

সার্বিকভাবে বলা যায়, নারীবাদ একটি সামাজিক বিপ্লবের নাম, যা কেবল নারীর স্বাধীনতা ও অধিকার নিয়েই নয়, বরং মানবসমাজকে ন্যায্য, সমানুভূতিসম্পন্ন এবং আত্মিকভাবে সংহত এক কাঠামোতে পুনর্গঠনের আহ্বান জানায়। বাণী বসুর উপন্যাসসমূহ এই আহ্বানকে সাহিত্যিক ভাষায় রূপ দেন, যা পাঠকের মনে ভাবনার উদ্রেক করে এবং নারীর অবস্থান নিয়ে নতুন করে চিন্তা করতে বাধ্য করে।

বাণী বসুর উপন্যাসে নারী চরিত্রগুলির আত্মপ্রকাশ, তাদের জীবনের সংগ্রাম এবং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর উপন্যাসগুলিতে নারীরা বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়েছে, যা তৎকালীন সমাজের নারীদের প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রাচীন সাহিত্যে নারী ছিল পুরুষের ভোগের সামগ্রী, কিন্তু বাণী বসুর লেখায় নারীরা নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচিতি তৈরি করেছে। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রেরা প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ অবস্থানে থেকে জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে। কেউ নেতৃত্ব দিয়েছে, কেউ সমাজের নিয়ম ভেঙেছে, আবার কেউ নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করেছে।

বাণী বসু তাঁর উপন্যাসগুলোতে নারীদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের কথা তুলে ধরেছেন। উদাহরণস্বরূপ, 'খনামিহিরের ঢিপি' উপন্যাসের মাতঙ্গী, মধুরা, এবং রঙ্কার মতো নারীরা আদিম সমাজে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। একইভাবে, 'মৈত্রেয় জাতক' উপন্যাসের নগরশোভিনী, প্রব্রাজিকা এবং দাসীর জীবন তৎকালীন সমাজে নারীদের বিভিন্ন অবস্থার প্রতিফলন ঘটায়।

বাণী বসুর উপন্যাসে নারীরা প্রায়শই সমাজের গতানুগতিক ধারণা এবং প্রত্যাশাগুলির বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান তৈরি করে। তারা শুধু নীরব দর্শক নয়, বরং সক্রিয়ভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এর মাধ্যমে, লেখিকা সমাজে প্রচলিত নারী সম্পর্কিত ধারণাগুলির পুনর্মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন এবং পাঠকদের এই বিষয়ে নতুন করে ভাবতে উৎসাহিত করেছেন।

এই নারীদের জীবনকাহিনি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয়, বরং বৃহত্তর সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের অংশ। বাণী বসুর উপন্যাসে নারীচরিত্রগুলির আত্মপ্রকাশ, সংগ্রাম ও সমাজদৃষ্টির পুনর্মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক অবদান।

'খনামিহিরের ঢিপি' উপন্যাসে আদিম সমাজের নারীরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। তারা সন্তান ধারণ করে, খাদ্য সংগ্রহ করে এবং গোষ্ঠীর নেতৃত্ব প্রদান করে। নারীর শারীরিক সক্ষমতা এবং মানসিক দৃঢ়তা এখানে সমাজের রক্ষক ও চালিকা শক্তি হিসেবে চিত্রিত হয়। তবে সময়ের সাথে সাথে পুরুষতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নারীর সেই ক্ষমতা কেড়ে নেয়।

'খনামিহিরের ঢিপি' উপন্যাসে মাতঙ্গী, মধুরা এবং রঙ্কা এই নারীরা আদিম অরণ্যজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। তারা শারীরিকভাবে বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় ছিলেন এবং গোষ্ঠীর নেত্রী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাদের নেতৃত্বে গোষ্ঠী পরিচালিত হতো, এবং তারা সন্তান জন্ম দেওয়া, যুদ্ধ পরিচালনা করা, শিকারের মাংস বিতরণ করা এবং গোষ্ঠীর তৃষ্ণা নিবারণ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করতেন। এই নারীরা এতটাই শক্তিশালী ছিলেন যে, পুরুষরা তাদের শক্তির উৎস দেখে অবাক হতো। গোষ্ঠীনেত্রী হিসেবে নারীরা শিকার, যুদ্ধ, বিতরণ ও পরামর্শে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। তৎকালীন সমাজে লিঙ্গ বিভাজনের নীতি ছিল না এবং অসমবন্টন ছিল প্রথাবিরুদ্ধ। নারীরা যৌনক্ষুধা তাড়িত হলে বিনা দ্বিধায় পুরুষকে ব্যবহার করে কামনার পরিতৃপ্তি ঘটাতেন। পছন্দের পুরুষকে নিজগৃহে বসবাসের জন্য আহ্বান জানানোর স্বাধীনতা তাদের ছিল। তৎকালীন সমাজে শ্লীলতা- অশ্লীলতা বা নৈতিকতা-অনৈতিকতার স্থান ছিল না; হৃদয়ের সম্মতিই ছিল নারী-পুরুষের মিলনের একমাত্র শর্ত। নারী-পুরুষ উভয়ের ভূমিকাই ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ, এবং গোষ্ঠীর সবচেয়ে শক্তিশালী সদস্যই উচ্চতম পদে আসীন হতেন, লিঙ্গ রাজনীতি সেখানে অনুপস্থিত ছিল। দৈহিক ও মানসিক সক্ষমতাই ছিল যোগ্যতা বিচারের একমাত্র মাপকাঠি, এবং নারীরা তাদের শক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চপদ লাভ করতেন। একদিকে তারা ছিলেন গোষ্ঠীর পরিচালক, পালক ও রক্ষাকর্ত্রী, অন্যদিকে তারা ছিলেন সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা possessed করতেন, যা পুরুষদের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করত।

কবি নজরুল ইসলামের ভাষায়-

"নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনার রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।"[২]

'মৈত্রেয় জাতক' উপন্যাসে গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে । এই উপন্যাসে নারীদের বিভিন্ন বৃত্তি এবং সমাজে তাদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ধাত্রীর জীবিকা ছিল নারীদের গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তিগুলির মধ্যে একটি। রাজপরিবার এবং অভিজাত পরিবারের শিশুরা অঙ্কধাত্রী, মন্ডনধাত্রী ও ক্রীড়াপণিক ধাত্রীর কোলে মানুষ হতো। অঙ্কধাত্রী অর্থাৎ দুধ-মা শিশুদের লালন-পালন করত। মন্ডনধাত্রী শিশুদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে সজ্জিত করত। ক্রীড়াপণিক ধাত্রীর কাজ ছিল শিশুদের সাথে খেলা করা। এদের মধ্যে কেউ স্বাধীন আবার কেউ দাসী ছিলেন, তবে দাসীরা মুক্তি কিনে স্বাধীন হতে পারতেন।

তৎকালীন সমাজে রাজাদের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, যা রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চালে ব্যবহৃত হতো। নারীদের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হতো। বিদ্বান নারীরা সংসারের কাজ শেষ করে শ্রেষ্ঠিকন্যাদের বিদ্যাব্যাস এবং আচার্যার ভূমিকা পালন করতেন। নারীরা গান্ধর্ব বিবাহ করতেন এবং স্বয়ংবরা হওয়ার প্রথাও প্রচলিত ছিল। তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অপুত্রক স্ত্রীদের স্বামীরা ইচ্ছামতো ত্যাগ করতে পারতেন, এবং শাস্ত্র অনুযায়ী, যে স্ত্রী শুধু কন্যাসন্তান জন্ম দিত তাকেও বারো বছর পর ত্যাগ করা যেত।

সমাজে নারীদের অধিকার প্রায় অনুপস্থিত ছিল, তবে অনার্য ও বনবাসী নারীরা তুলনামূলকভাবে স্বাধীন ছিলেন। সেখানে নারী-পুরুষের জন্য একই নিয়ম ছিল এবং বিবাহ-পূর্ববর্তী সহবাস নিন্দনীয় ছিল না। অনার্য নারীরা অপরিচিতদের সাথে সহজে মিশতে পারতেন, যা শিক্ষিত আর্যদের মধ্যে দেখা যেত না।
তিনি বিশাখার জবানিতে বলেছেন-

> "জানো না, কৌমার্যরক্ষার জন্য আমাদের পিতা-মাতা অনুক্ষণ আমাদের প্রহরা দিয়ে রাখেন। জানো না, স্নানাগারে, শয়নকক্ষে পর্যন্ত দাসীরা আমাদের অনুসরণ করে। বিন্দুমাত্র সংশয় হলে স্বয়ং পিতা পর্যন্ত পরীক্ষা করে দেখতে কুণ্ঠা বোধ করেন না যে আমরা প্রকৃতই কুমারী কি না। যতই আদরিণী হই তিষ্য, আমরা, এই সাকেতের, রাজগৃহের, শ্রাবস্তীর, বারাণসীর সর্বত্র যেখানে যে আছি যত নারী, সবাই বন্দিনী। আভিজাত্য একটা ছলমাত্র। সুকৌশলে বন্দিত্ব আমাদের অভ্যাস করিয়ে নেওয়া। স্বর্ণশৃঙ্খলের যন্ত্রণা, আভিজাত্য-সর্পের দংশন-বেদনা যে কী ভাবে হাসিমুখে সহ্য করতে হয়, শ্রেষ্ঠীকন্যা তা জানে।"[৩]

'পঞ্চম পুরুষ' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র হলো এষা খান। এষা নামের এই নারী চরিত্রটি উপন্যাসের অন্যান্য পুরুষ চরিত্রদের সহজেই আকৃষ্ট করে তোলে। উপন্যাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা দেখি, এষার উপস্থিতিতে বিভিন্ন সম্পর্কে এক নতুন মোড় আসে।

অহর্ তার আট বছরের বিবাহিত জীবন এবং সুখের দাম্পত্য ছেড়ে এষার হাত ধরে বেরিয়ে আসতে চায়। নীলম, একজন সফল শিল্পপতি, গান এবং রঙের মাধ্যমে এষার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে। এমনকি, ব্যক্তিহীনতার এক পর্যায়ে পৌঁছানো সীমাও এষার সান্নিধ্যে এসে ফিরে পায় তার আত্মবিশ্বাস।

এষা যেন এক রহস্যময়ী নারী, যার আকর্ষণ এতটাই প্রবল যে পুরুষরা তাদের নিজেদের জীবনের স্বাভাবিক গতিপথ থেকে সরে আসতেও দ্বিধা বোধ করে না। এখানে এষা যেন এক চুম্বক এবং পুরুষেরা তার আকর্ষণে আসা লোহার কণার মতো।

বাণী বসুর 'পঞ্চম পুরুষ' উপন্যাসটি একটি শিক্ষিতা, আত্মনির্ভর, স্বাধীনচেতা নারীর আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং সমাজবদ্ধ নারীর অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এষা খান একজন স্বশিক্ষিত, প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী, যিনি শুধু পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর মুখোমুখি হন না, সেই কাঠামো ভেঙে নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তোলেন।

এই উপন্যাসের অন্যতম মূল বক্তব্য হলো, নারীর নিজস্ব ইচ্ছা, চাওয়া-পাওয়া ও মানসিক প্রস্তুতি ছাড়া কোনো সামাজিক ভূমিকা যেমন মাতৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া চলে না। সমাজ যেখানে নারীর পরিচয়কে প্রধানত স্ত্রী ও মা এই পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়, সেখানে এষা নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি মনে করেন, শুধু শারীরিক প্রক্রিয়া নয়, মাতৃত্ব একটি মানসিক প্রস্তুতির বিষয়, এবং এই প্রস্তুতি না থাকলে তা এক প্রকার শোষণ ও যান্ত্রিকতার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়।

উপন্যাসে বিয়েকে ঘিরে সমাজের যে অর্থনৈতিক ও শ্রমভিত্তিক হিসাব-নিকাশ, সেটিও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মেয়েদেরকে কেবল পণের মাধ্যমে কেনা, বা তাদের শ্রমকে বিনা পারিশ্রমিকে কাজে লাগানো- এই বাস্তবতাকে উপন্যাসে নির্মম ও স্পষ্ট ভাষায় চিত্রিত করা হয়েছে। এষার বিয়ের অভিজ্ঞতায় বোঝা যায়, তার শ্বশুর- শাশুড়ি তাকে গৃহপরিচারিকা ও সেবিকার ভূমিকায় দেখতে চেয়েছিলেন, তার স্বতন্ত্র সত্তাকে স্বীকৃতি দেননি।

উপন্যাসে সমাজের প্রচলিত 'স্বামীনির্ভরতা' বা 'নারী মানেই পুরুষের আশ্রিত' এই ধারণারও সমালোচনা করা হয়েছে। অনেক নারীই নিজেদের স্বামী বা পুরুষ অভিভাবকের সম্পত্তি ভাবতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, যা এক ধরনের সামাজিক মানসিকতা। বাণী বসু এই ধারণার পেছনের শোষণ কাঠামো বিশ্লেষণ করেন এবং নারীর আত্মনির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

এষার চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন, নারী কেবল আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয় না- তার মধ্যে যুক্তি, অভিজ্ঞতা, আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার চেতনা রয়েছে। এষা প্রেমকে অতিক্রম করে নিজেকে খুঁজে পায়, এবং নিজের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। সে জীবনের প্রতি তীব্র কৌতূহল ও বোধ নিয়ে এগিয়ে চলে, কোনো একক সম্পর্ক বা নির্দিষ্ট ভূমিকার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে না।

উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র- মহানাম, অরিত্র, বিক্রম, নীলম, সীমা ও সমিদ্ধাও সমাজের বিভিন্ন অবস্থান, চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করে। তবে উপন্যাসের কেন্দ্রে যে আত্মচেতা নারী- তিনি নারী মাত্রের অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামের এক প্রতীক হয়ে ওঠেন।

সব মিলিয়ে, 'পঞ্চম পুরুষ' একটি সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস, যা নারীর আত্মপরিচয়, স্বকীয়তা ও নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেকে নির্মাণ করার প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। বাণী বসু এই উপন্যাসের মাধ্যমে দেখিয়েছেন, নারী কেবল সমাজের একটি ভূমিকা পালন করে না—সে নিজেই একটি পূর্ণ, আত্মসচেতন, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ, যার চিন্তা, অনুভব ও সিদ্ধান্ত স্বাধীন।

এষা যখন প্রাক্তন প্রেমিক অরিত্রর কাছে বেড়াতে যায় তখন অরিত্রকে সে বলে ওঠে-

> "তোমাকে চাওয়া আমার সম্পূর্ণ নিঃশেষ না হলে আমি আসতামই না অরি। আসতে পারতামই না। তোমাকে চাইলে অপমান, প্রত্যাখ্যান, ব্যবহৃত হবার বেদনা এসব টাটকা ক্ষতের মতো দগদগে থাকত। এসবের খুব স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। তোমাকে আমি সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারছি।... ওই সব অভিজ্ঞতা পেরিয়ে আসতে পেরেছি বলেই তো আমি আমি।... আমি অভিজ্ঞতার জন্য ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, একেক সময় মনে হয় যদি আমার একশোটা মন থাকত তাহলে... জীবনকে গরুষে গণ্ডুষে পান করতে জন্মের পর জন্ম একটা অভিজ্ঞতাকেই উলটে-পালটে দেখতে কেটে যায়। উদ্বৃত্ত তো কখনও থাকে না। সব সময়েই যেন কম পড়ে যায়।"[৪]

এর পরেই এষাকে আবার বলতে শুনি-

> "আমার এই ঐশ্বর্য তবে আমি কাকে দেব? দশ হাতে দান করলেও এ যে শেষ হবার নয়। আমি কি তবে চিরকাল এমনই উদ্বৃত্ত থেকে যাব। চিরটাকাল? এ কেমন নিষ্ঠুর নিয়তি?"[৫]

আরও বলেছে-

> "পুলিশ এবং মিলিটারি ধরো আমাদের সবার রক্ষার দায়িত্বে আছে। তাই বলে কি জনসাধারণকে তারা বস্তু ভাবে, নিজেদের সম্পত্তি ভাবে?নিজেকে স্বামীর বা অন্য কোনও পুরুষের মুখাপেক্ষী ভাবতে মেয়েরা এক ধরনের গৌরব বোধ করে।... নিজেকে স্বামীর সম্পত্তি ভাবতে গর্ব হয়।"[৬]

'গান্ধর্বী' বাণী বসুর এক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, যেখানে সঙ্গীতের জগৎ, নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা, শোষণ ও স্বাধীনতার লড়াই এবং আন্তঃনারী সম্পর্ক একটি গভীর অনুভবের সাথে উপস্থাপিত হয়েছে। "গান্ধর্বী" উপন্যাসটির মূল কেন্দ্রীয় চরিত্র অপালা দত্তগুপ্ত, এক সময়ের বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী, যার বিবাহ পরবর্তী জীবন তাকে সঙ্গীতচর্চা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সংসারের দায়িত্ব, শ্বশুরবাড়ির অবদমন এবং দাম্পত্য জীবনের সীমাবদ্ধতা অপালার শিল্পীসত্তাকে যেন স্তব্ধ করে দেয়। অপালার গানের সাধনা, তার আত্মপরিচয়ের মূলে থাকা সত্তাটি চাপা পড়ে যায় গৃহস্থালির যাঁতাকলে।এই দমবন্ধ অবস্থান থেকে তাকে টেনে বের করে আনে তার গুরুভগিনী ও বন্ধু মিতুল (মিতশ্রী ঠাকুর)। মিতুল শুধু একজন সহচরী নন, বরং একজন সংগ্রামী নারী, যিনি অপালার প্রতি তার স্নেহ, সম্মান এবং দায়িত্ববোধ থেকে তাকে আবার সঙ্গীতের জগতে ফিরিয়ে আনেন। তার উদ্যোগেই অপালা একটি ছায়াছবিতে কণ্ঠদান করেন এবং আবার খ্যাতি ও মর্যাদা লাভ করেন। মিতুল অপালাকে শেখায়– একজন নারীর আর্থিক স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা কতটা জরুরি।অপালার অন্যতর শক্তি হয়ে ওঠে তার মেয়ে টিটু, যে মায়ের দুঃখ, চুপচাপ সহ্য করার অভ্যেস ও আত্মত্যাগকে দেখতে দেখতে বড় হয়েছে। টিটু চায় তার মা যেন নিজের শিল্প ও স্বত্বাকে ভালোবাসে, অন্যদের মতামতের

তোয়াক্কা না করে নিজের ইচ্ছেমতো বাঁচতে শেখে। টিটু মায়ের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতায় নজর রাখে, প্রতিবাদ করে যখন তার মায়ের প্রতিভা ও পরিশ্রমকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা অবহেলা করে। উপন্যাসে অপালার সঙ্গে এক সময়ের সহশিক্ষার্থী ও সহশিল্পী সোহম- এর পুনর্মিলন ঘটে এক সঙ্গীতসভায়। এই পুনর্মিলনে কোনও যৌনতা নেই, আছে সহমর্মিতা, রসাস্বাদনের এক অভিন্নতা, যা অপালার স্বামী শিবনাথের মনে ঈর্ষার জন্ম দেয়। কিন্তু টিটু বুঝতে পারে– অপালা ও সোহমের সম্পর্ক নিখাদ শিল্পীসত্তার মিলন.।উপন্যাসের সংযোজন অংশে প্রকাশ পায় যে কাহিনির কথক আসলে টিটু নিজেই। মা অপালার জীবনের সমস্ত না- বলা কথা, অবদমন, শিল্পযন্ত্রণার নীরব ইতিহাস সে নিজের চোখে দেখে এবং তা লেখার মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়। এইভাবে 'গান্ধর্বী' হয়ে ওঠে এক নারীর শিল্পসত্তা উদ্ধারের কাহিনি—যেখানে দুই নারী, মিতুল ও টিটু, অপালার সহযোদ্ধা, সহচরী এবং স্নেহশীল বন্ধু।

বাণী বসু বললেন -

> "অপালা এখন শ্যাওলা- ধরা ডোবা, বা লবণ হ্রদ, যার ভেতরে ভেতরে সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগের একটা গোপন রাস্তা আছে, কিন্তু অব্যবহারে সেটা বুজে এসেছে।... রবিশংকর। বিলায়েত! ভীমসেন! গিরজা দেবী! বিসমিল্লা! নিখিল ব্যানার্জী! সব, স-ব হারিয়ে গেল জীবন থেকে। খালি এক অন্যমনস্ক বউ দিস্তে দিস্তে রুটি বেলে যায়,... এক অন্যমনস্ক মা ছেলের জামা মেয়েকে পরাতে যায়, মেয়ের বই ছেলেকে পড়াতে বসিয়ে বকুনি খায়, সংসারের নতুন-আসা ধনী ঘরের দুলালী ফর্সা নতুন বউটির সঙ্গে তুলনা ক্রমশই মুখর, আরো মুখর হয়ে উঠতে থাকে।"[৭]

উপন্যাস ‘শ্বেত পাথরের থালা’- য় বাণী বসু একবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল সমাজের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে নারীর বৈধব্যজীবনের নির্মমতা ও বৈষম্যের একটি অসাধারণ ও তীক্ষ্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন। যেখানে নারী-পুরুষ সমতার কথা উচ্চারিত হচ্ছে, সেখানে সমাজের গভীরে এখনও প্রোথিত রয়েছে নারীর প্রতি শতাব্দীপ্রাচীন বৈষম্যমূলক আচরণ।

এই উপন্যাসে বন্দনার চরিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, কীভাবে একজন শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী নারী কেবল বৈধব্যের কারণে সমাজের নির্মম শাসন ও সংস্কারের শিকার হয়। স্বামীর মৃত্যুর পরই তার জীবনে আসে শ্বেতবস্ত্র, একঘেয়ে নিরামিষ খাদ্য, নির্জনতা ও শোকাবহ অনুশাসনের এক অন্তহীন পর্ব। অথচ এই একই শোকের পরিস্থিতিতে একজন পুরুষ কখনও এইসব সামাজিক বিধিনিষেধের মুখোমুখি হয় না। বন্দনার মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন ও অভ্যন্তরীণ দহন উপন্যাসকে দেয় এক গভীর মানবিকতা ও প্রতিবাদী সুর।

বন্দনার প্রশ্নগুলো এই উপন্যাসের মূল বক্তব্য বহন করে- কেন একজন স্ত্রীকে স্বামীর মৃত্যুর পর তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং মৌলিক মানবিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হতে হয়, অথচ একজন পুরুষকে স্ত্রীর মৃত্যুর পর একইভাবে নির্জীব জীবনযাপন করতে বাধ্য করা হয় না? এই দ্বৈত নৈতিকতা এবং বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ওপরেই ঔপন্যাসিক বিদ্রোহ জানিয়ে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

‘শ্বেত পাথরের থালা’ একটি প্রতীক, যা নারীর বৈধব্যজীবনের একঘেয়ে, নিরুৎসাহ ও বৈষম্যমূলক জীবনযাত্রার রূপক হয়ে ওঠে। এ উপন্যাসে বাণী বসু সমাজের বুকে প্রশ্ন তোলেন- সমানাধিকারের দাবিকৃত সমাজে নারীর প্রতি এমন বৈষম্য কেন এখনও বিদ্যমান? এই প্রশ্নের মধ্য দিয়েই লেখিকা নারীর আত্মস্বর, যুক্তিবোধ ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে নতুন আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসেন।

এই উপন্যাস তাই শুধু শোক বা নারী- নির্যাতনের কথা বলে না; এটি এক প্রতিবাদ, এক প্রশ্ন, এক প্রতিরোধ যা নারী পাঠককে যেমন নাড়িয়ে দেয়, তেমনি পুরুষ পাঠককেও সচেতন হতে বাধ্য করে।

একদিন বন্দনার মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে-

> "তার স্বামী বিয়োগের শোক যেমন প্রচণ্ড; শাশুড়ির পুত্র শোকও কি তেমনি প্রচণ্ড নয় তাহলে? স্বামীহারা স্ত্রীর রসনা যদি খাদ্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যাবে বলে লোকে

প্রত্যাশা করে, পুত্রহীনা মায়ের ক্ষেত্রেও তো তাই- ই হবার কথা। আর শুধু মা-ই বা কেন? বাবা? বাবা কি ছেলেকে কম ভালোবাসেন?... বিপত্নীকের দুঃখই বা কম কিসে? আজ যদি অভিমন্যু থাকত, বন্দনা চলে যেত, অভিমন্যুর কি এরকম বুকের শিরছেঁড়া যন্ত্রণা হত না? তার জন্যে কি নিরামিষ হেঁশেল হোত? এমনি আলাদা আয়োজন? আলাদা প্রয়োজন?"[৮]

উপন্যাস 'উত্তরসাধক'- এ বাণী বসু নকশাল আন্দোলন- পরবর্তী বাস্তবতা এবং ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার নিরিখে একটি আদর্শ সমাজ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মেধা ভাটনগর এক সময়ের সক্রিয় নকশাল কর্মী ছিলেন, কিন্তু আন্দোলনের ব্যর্থতা ও লক্ষ্যহীনতার উপলব্ধি থেকে সরে এসে তিনি দশ বছর আমেরিকায় ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে দেশে ফিরে এসে তিনি ইতিহাসের পাঠ শুধু বইয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন।

মেধার উপলব্ধি ছিল, আন্দোলন শুধু আবেগ দিয়ে চলে না, প্রয়োজন সুপরিকল্পনা, নেতৃত্ব, সংগঠনের দৃঢ়তা এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার সক্ষমতা। তাই তিনি মনে করেন, কাগজে-কলমে ইতিহাস লিখে যাওয়ার চেয়ে বাস্তব ইতিহাস গড়ে তোলার চেষ্টা করা আরও জরুরি ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে একজন চিন্তাশীল, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সমাজপরিবর্তকের রূপ দেয়।

এই উপন্যাসে লেখিকা অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে ছাত্রসমাজের ব্যবহার ও অবমূল্যায়নের চিত্র তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে নকশাল আন্দোলন—প্রতিটি আন্দোলনের মূলে ছিল ছাত্রদের প্রাণশক্তি, কিন্তু আন্দোলন ব্যর্থ হলে তার দায়ভার তাদের ওপরেই পড়ে। সমাজ ও রাষ্ট্র তখন তাদের মূল্যায়ন না করে সরিয়ে দেয়। এই বাস্তবতাই মেধার কণ্ঠে উঠে আসে তীব্র হতাশা ও উপলব্ধির রূপে।

উপন্যাসে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল—সমাজের বর্তমান জটিলতা এবং তার মূল কারণগুলোর বিশ্লেষণ। মেধার মতে, আজকের সমাজে অশিক্ষার চেয়েও ভয়ংকর হল কুশিক্ষা। এই কুশিক্ষা ইচ্ছাকৃতভাবে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য, কর্পোরেট লোভের জন্য এবং ক্ষমতার দম্ভ রক্ষার জন্য। ফলে সমাজে বেড়ে চলেছে অসহিষ্ণুতা, বিভ্রান্তি এবং আত্মধ্বংসের প্রবণতা।

এই সমস্ত পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থেকেই মেধা বিশ্বাস করেন, প্রকৃত সমাজ সংস্কার সম্ভব কেবলমাত্র সামগ্রিক শিক্ষা, নৈতিকতা, ইতিহাসচেতনা এবং দায়িত্বশীল নেতৃত্বের মাধ্যমে। 'উত্তরসাধক' উপন্যাসে মেধার চরিত্রটি একজন আত্মানুসন্ধানী, বাস্তববাদী এবং ভবিষ্যতের নির্মাতা হিসেবে গড়ে উঠেছে, যার জীবনদর্শন এবং কাজ সমাজের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের কাছে এক অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে।

এইভাবে, 'উত্তরসাধক' কেবল অতীত নকশাল আন্দোলনের মূল্যায়ন নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য এক বিকল্প পথ নির্মাণের প্রস্তাবও দেয়, যেখানে ইতিহাস শুধুই স্মৃতি নয়, তা হয়ে ওঠে একটি সক্রিয় নির্মাণ প্রক্রিয়া।

মেধাসমস্যহীন সমাজগড়ারজন্যতার বক্তব্য-

"শিক্ষা যদিও কোনও উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত, আমরা জানি আর্থিক উন্নয়ন ছাড়া শিক্ষাও কতদূর ব্যর্থ হতে পারে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থ এই তিনটে আমাদের প্রথম লক্ষ্য।"[৯]

বাণী বসুর 'অষ্টম গর্ভ' উপন্যাসটি বাংলার ইতিহাসের এক বেদনাবিধুর অধ্যায়কে কেন্দ্র করে রচিত, যেখানে মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশভাগের মতো কালান্তক ঘটনাগুলিকে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং গভীর দৃষ্টিভঙ্গিতে চিত্রিত করা হয়েছে। লেখিকা কেবল রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক ঘটনাবলির পরিক্রমা করেননি, বরং সেসব ঘটনার প্রভাব কীভাবে ব্যক্তিমানুষের জীবনে, বিশেষ করে নারীর জীবনে, অসহ্য কষ্ট ও নির্যাতনের আবহ তৈরি করেছে, তা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসের শুরুতেই দেবহুতি নামক চরিত্রের মাধ্যমে নারীর প্রজনন-ভূমিকার এক নির্মম, অথচ দীর্ঘকাল স্বীকৃত সামাজিক বাস্তবতাকে তুলে ধরা হয়েছে। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে অষ্টমবার প্রসব করে তিনটি সন্তানের জন্ম দিয়ে সে দশ সন্তানের জননী হয়- এই সংখ্যা যেন এক প্রতীক হয়ে ওঠে, যেখানে

নারী কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের এক যন্ত্রে পরিণত হয়। তার নিজস্ব ইচ্ছা, চাওয়া- পাওয়া, স্বপ্ন কিংবা স্বাতন্ত্র্যকে সমাজ স্বীকৃতি দেয় না; বরং তাকে মায়ের ভূমিকাতেই আটকে রাখে। লেখিকা এই চিত্রের মধ্যে দিয়ে নারীর শরীর, শ্রম এবং মানসিকতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছেন।

এই নারীবাদী দৃষ্টিকোণ ছাড়াও 'অষ্টম গর্ভ' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে জাতি, ধর্ম ও শ্রেণিভিত্তিক বিভাজনের ফলে সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয়ের করুণ ইতিহাস। মন্বন্তরের সময় বাংলার গ্রামাঞ্চলে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, তা কেবল খাদ্যের অভাব নয়, মানবিকতারও চরম অবক্ষয়ের চিত্র বহন করে। একইভাবে দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে যে ভয়াবহ বিপর্যয় ও ক্ষত সৃষ্টি হয়, তার ছাপ এই উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে নিহিত।

উপন্যাসের মাধ্যমে বাণী বসু দেখাতে চেয়েছেন, সময় যতই বদলাক না কেন, নারীর অবস্থান সমাজে এক গভীর সংকটের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে- একদিকে মাতৃত্বের নামে তার শরীরকে ব্যবহার করা হয়, অন্যদিকে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সংকটে তার উপর নেমে আসে সহিংসতার সবথেকে নির্মম রূপ। দেবহুতির ক্লান্তি, নিঃস্বতা এবং অনভিপ্রেত মুক্তি যেন সেই নারীদের প্রতীক, যারা ব্যক্তিগত স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে সামাজিক ও পারিবারিক চাহিদার সামনে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

সব মিলিয়ে 'অষ্টম গর্ভ' কেবল একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, এটি এক সামাজিক দলিল, যেখানে নারীর অস্তিত্ব, অভিজ্ঞতা ও যন্ত্রণার কাহিনি জড়িয়ে আছে বাংলার ইতিহাসের রক্তাক্ত অধ্যায়গুলির সঙ্গে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়-

> "বিধ্বস্ত জননী ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিন দিনের নিরবচ্ছিন্ন লড়াইয়ের পর প্রথম সুযোগেই নিবিড় ঘুম এসে তাঁকে অধিকার করেছে। স্বপ্নহীন ঘুম। মৃত্যুপম, কিন্তু মৃত্যু নয়। শরীরের প্রতিটি কোষ ঘুমোচ্ছে। তিনি জানেন না তিনি কে, কোথায়। জানেন না তাঁর সাতটি সন্তান আছে এবং এক দফায় আজ তিনি তিন সন্তানের মোট দশ সন্তানের দশভুজা জননী হয়ে গেলেন। আরও জানলেন না বত্রিশ বছর বয়সে নিরবচ্ছিন্ন সন্তান প্রসবের পর এই আজকের লড়াইয়ে তিনি আর সন্তানধারণের ক্ষমতা হারালেন। এইঅকল্পনীয় মুক্তির কথা জানলে হয়তো তিনি আরও আরও ঘুমোতে পারতেন।"[১০]

বাণী বসুর 'অমৃতা' উপন্যাসে সমাজের এক জ্বলন্ত এবং নীরব সহিংসতা- ভ্রূণহত্যা- কে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। উপন্যাসটির কাহিনি নারীর শরীর, অধিকার এবং মাতৃত্বের অনুভবকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও, এটি আসলে এক বড়সড় প্রশ্ন তোলে—নারী কি নিজের গর্ভে থাকা প্রাণের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার রাখে? নাকি সমাজ, পরিবার ও পুরুষতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত সেই অধিকার কেড়ে নেয়?

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অমৃতা একাধারে শিক্ষার্থী, গৃহবধূ এবং সংগ্রামী নারী। তিন বছরের বিবাহিত জীবনে সে কোনো সুখ পায়নি, বরং অনবরত মানসিক নিপীড়নের শিকার হয়েছে। যখন সে গর্ভবতী হয়, তখন তার স্বামী অরিসূদন নিজের সুবিধার কথা চিন্তা করে তাকে গর্ভপাতের পরামর্শ দেয়। কিন্তু অমৃতা এই সিদ্ধান্তকে নৈতিক অপরাধ বলে মনে করে এবং প্রথমবারের মতো সে প্রতিবাদ করে। তার দৃঢ় উচ্চারণ- "কোন অপরাধে তাকে খুন করব?"- এই উপন্যাসের নৈতিক কেন্দ্রবিন্দু। তার ভাষ্য থেকে বোঝা যায়, আইন বা সমাজ যাই বলুক না কেন, একজন মায়ের কাছে গর্ভস্থ সন্তান একটি স্বতন্ত্র প্রাণ, যার জীবন নষ্ট করা একপ্রকার হত্যা।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি সমান্তরাল কাহিনি উঠে আসে- দোলা ও অমিতাভের সম্পর্ক। বিয়ের আগেই দোলা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে অমিতাভ দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে এবং গর্ভপাতের পরামর্শ দেয়। দোলার কষ্ট দ্বিগুণ হয় যখন তার নিজের মা- ও একই পরামর্শ দেয়। কিন্তু দোলা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়—"ওটা

তো টিউমার নয়, একটা বাচ্চা আমার।" এই বাক্যটি কেবল একজন নারীর মাতৃত্ববোধ নয়, বরং সমাজের চরম নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এক আত্মসম্মানী প্রতিবাদের প্রতীক।

'অমৃতা' উপন্যাসে বাণী বসু অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, নারীর গর্ভে থাকা সন্তানকে কেবল শারীরিক বোঝা কিংবা সামাজিক বিপদ হিসেবে দেখার প্রবণতা আজও সমাজে বহাল রয়েছে। লেখিকা প্রশ্ন তুলেছেন—শুধু নারীই কি এই সিদ্ধান্তের বোঝা বইবে? পুরুষের দায়িত্ব কি কেবল পরামর্শদাতা হয়ে থাকা? এইসব প্রশ্নের মাধ্যমে উপন্যাসটি নারীর স্বাধিকার, মাতৃত্ব এবং মানবিক মূল্যবোধকে এক নতুন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে।

সার্বিকভাবে 'অমৃতা' একটি প্রতিবাদী কণ্ঠ- যেখানে নারী তার মাতৃত্ব, শরীর ও অনুভবকে ঘিরে সমাজের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্পষ্ট উচ্চারণ করে। এটি এক সামাজিক ও নৈতিক সচেতনতার উপন্যাস, যা পাঠককে শুধু কাঁদায় না, ভাবতেও বাধ্য করে।

দোলা প্রতিবাদ জানিয়ে বলে-

> "মা, ওটা তো টিউমার নয়, একটা বাচ্চা আমার... আমার মা ওরা ছেলে মা, বোঝে না এ সবের ইমপর্ট্যান্স, ফিলিং নেই।"[১১]

কবি নজরুল ইসলামের ভাষায় -

> "খেয়ালের বশে তাদের জন্ম দিয়েছে বিলাসী পিতা
> লব কুশে বনে ত্যাজিয়াছে, রাম পালন করেছে সীতা"[১২]

বাণী বসুর 'খারাপ ছেলে' উপন্যাসটি আমাদের সমাজে লুকিয়ে থাকা এক গূঢ় এবং অন্ধকারময় সত্যকে—গণিকালয় ও তার সঙ্গে যুক্ত পুরুষতান্ত্রিক ভণ্ডামিকে— খুলে দিয়েছে নির্মম বাস্তবতায় ও তীক্ষ্ণ নৈতিক দৃষ্টিতে। এই উপন্যাসে নারী শুধু নিজেই অবমানিত নয়, বরং আরেক নারীর জন্য সে দাঁড়ায়— এ এক বিরল উদাহরণ।

উপন্যাসে দেখা যায়, নিখিল, এক শিক্ষিত সমাজভুক্ত ব্যক্তি, যৌনকর্মী বনমালা রাহার সঙ্গে গোপনে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সন্তানও জন্ম দেয়। কিন্তু বনমালা ও তার সন্তানের কোনো সামাজিক স্বীকৃতি নেই। এই অবস্থায়, নিখিলের স্ত্রী জিনা কেবল নিজের অপমান ও ক্ষতির প্রতিকার চায় না, বরং বনমালার মতো সামাজিকভাবে অস্বীকৃত নারীর অধিকার ও মর্যাদার পক্ষেও দাঁড়ায়। তার জোরালো দাবি—"বনমালাকে বিয়ে করতে হবে, স্বীকার করতে হবে সেই নারী এবং তার সন্তান আপনার নিজের।" এখানে জিনার ন্যায়ের চাহিদা শুধু প্রতিহিংসা নয়, বরং এক নৈতিক এবং সামাজিক প্রতিবাদ।

এই উপন্যাসে লেখিকা আমাদের সমাজের সেই কদর্য মুখোশটি সরিয়ে দেন, যেখানে স্ত্রী ও গণিকা উভয়ই পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার শিকার। একদিকে, সমাজের বুকে শুদ্ধতার প্রতিমা হিসেবে স্ত্রী, অন্যদিকে লালসার উপকরণ গণিকা- কিন্তু পুরুষের জন্য কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বাণী বসুর জিজ্ঞাসা স্পষ্ট— "যদি নারীদের পবিত্রতার পরীক্ষায় নামতে হয়, তবে পুরুষদের ক্ষেত্রেও কেন নয়?" লেখিকা প্রশ্ন করেন— নারীদের এক পুরুষের প্রতি অনুগত থাকা যদি ধর্ম হয়, তবে পুরুষদের ক্ষেত্রেও তা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত নয় কি?

এই উপন্যাসে নারীর ভূমিকা শুধু দুর্ভোগে ভোগা নয়, বরং প্রতিবাদে বলিষ্ঠ। জিনার চরিত্র এই প্রজন্মের নারীদের সামনে এক সাহসী আদর্শ— যেখানে নারী শুধুই সহ্য করার প্রতীক নয়, বরং বিচার ও ন্যায়ের দাবিদার।

বিচারহীন সমাজে যেখানে গণিকা কেবল ভোগের সামগ্রী, সন্তান কেবল আবর্জনা, সেখানে 'খারাপ ছেলে' এক সাহসী কণ্ঠস্বর— যা বলে, ভোগের পরেও কাউকে 'মানুষ' হিসেবে দেখার দায়িত্ব এড়ানো যায় না।

সার্বিকভাবে, এই উপন্যাসে বাণী বসু দেখিয়েছেন- নারীর লাঞ্ছনা শুধু তার নিজের নয়, সমাজেরও ব্যর্থতা। আর সেই সমাজকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করে একজন বিবেকবান নারীই।

> "যুগের পর যুগ অসহায় নারীকে বহুভোগ্যা করেছে বহুলোভী কামুক। ভোগ করে উচ্ছিষ্ট ভাঁড়ের মতো ফেলে দিয়েছে। সমাজ-বেষ্টনীর ভেতরে স্ত্রী, বাইরে গণিকা। কাউকেই তার প্রাপ্য দেয়নি অথচ নিয়ে গেছে তাদের কাছ থেকে সমস্ত সুখ। সুসজ্জিত শৃঙ্খলাবদ্ধ বিধিবদ্ধ সামাজিক জীবনের সুখ-শান্তি-জৌলুস, আবার স্বৈরাচারের নিষ্ঠুর মজা। সন্তান উৎপাদন করেছে গণিকালয়ে, তারপর নামহীন, পরিচয়হীন তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে পৃথিবীর আঁস্তাকুড়ে। এর জন্য অনেক করুণার অশ্রু বর্ষিত হয়েছে, আহা-উচুতে ভরে গেছে পৃথিবী। কিন্তু বিচারের কথা কেউ কখনও ভাবেনি। ব্যভিচারী নারীকে অক্লেশে শাস্তি দিয়ে গেছে সমাজ। ব্যভিচারী পুরুষের জন্যে ক্ষমা, ভয়, প্রশ্রয়, বড় জোর একটু ঘৃণা। পুরুষেরা তো বহুচারী হয়েই থাকে। আহা। প্রকৃতিই এমন করে তৈরী করেছে এই বেচারা শক্তিমানদের।"[১৩]

কবি নজরুল ইসলামের ভাষায় -

> "সেদিন সুদূর নয়
> যে-দিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্পে স্বামীকে পাঠানো চিঠির মাধ্যমে মৃণালদ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলে, "আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না।"[১৫]

বাণী বসুর উপন্যাসে নারীচরিত্রের উপস্থাপনা সময়ের পরিবর্তন ও সংগ্রামের ইতিহাসকে তুলে ধরে। তারা কেবল নিপীড়নের নিদর্শন নয়, বরং পরিবর্তনের শক্তি। আদিম সমাজ থেকে শুরু করে নগরসভ্যতা এবং আধুনিক নগরজীবন পর্যন্ত নারীর আত্মপরিচয় সন্ধানের এই যাত্রা তার লেখায় গভীরভাবে রূপায়িত হয়েছে। নারীচরিত্রের আত্মপ্রকাশ, সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার এই প্রতিচ্ছবি বাংলা উপন্যাসে এক নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে। বাণী বসুর নারীচরিত্রসমূহ কেবল সাহিত্যের নয়, ইতিহাস ও সমাজ-চেতনারও গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন -

> "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
> কেন নাহি দিবে অধিকার
> হে বিধাতা?
> নত করি মাথা
> পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
> ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
> দৈবাগত দিনে।"[১৬]

বাণী বসুর উপন্যাসে নারীচরিত্র কেবলই একক ব্যক্তি নয়, বরং একটি সময়, একটি সমাজ ও একটি আত্মসন্ধানী চেতনার প্রতিচ্ছবি। তারা নিপীড়নের প্রতীক নয়, বরং প্রতিরোধ ও পরিবর্তনের প্রতিমূর্তি। এই চরিত্রগুলো সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেদের অস্তিত্ব নির্মাণ করে, আর সেই পথচলায় তারা কখনো বেদনাহত, কখনো সাহসী, আবার কখনো বিপ্লবী। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বাণী বসুর রচনায় নারীর আত্মপ্রকাশ, স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের যে অভিপ্রায়, তা বাংলা সাহিত্যকে একটি নতুন দিগন্তে পৌঁছে দেয়। তার সাহিত্যে নারী শুধু গল্পের চরিত্র নয়— তিনি এক ভাষ্যকার, এক ইতিহাস, এক সত্য। এই সত্যই বাংলা উপন্যাসে নারীর অবস্থানকে নতুন তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা দিয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, প্রণব কুমার, সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষায় লিঙ্গ প্রসঙ্গ, রিতা পাবলিকেশন, ২০১৯, পৃ. ২১৩
২. আলি, রমজান, নজরুলের কয়েকটি কবিতা, সদ-উ-তন প্রকাশনী, বর্ধমান, ফাল্গুন ১৪১৪, পৃ. ২৪
৩. বসু, বাণী, মৈত্রেয় জাতক, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৭, পৃ. ৬৩
৪. বসু, বাণী, দশটি উপন্যাস, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৬, পৃ. ২৪৩
৫. তদেব, পৃ. ২৭১
৬. তদেব, পৃ. ২৩৯
৭. বসু, বাণী, গান্ধর্বী, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৭, পৃ. ১৩২
৮. বসু, বাণী, শ্বেত পাথরের থালা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৭, পৃ. ৩২
৯. বসু, বাণী, দশটি উপন্যাস, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৬, পৃ. ২৮২
১০. বসু, বাণী, অষ্টম গর্ভ, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫, পৃ. ৯
১১. বসু, বাণী, দশটি উপন্যাস, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৬, পৃ. ৯৪৭
১২. আলি, রমজান, নজরুলের কয়েকটি কবিতা, সদ-উ-তন প্রকাশনী, বর্ধমান, ফাল্গুন ১৪১৪, পৃ. ২৪
১৩. বসু, বাণী, খারাপ ছেলে, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫, পৃ. ১১৫
১৪. আলি, রমজান, নজরুলের কয়েকটি কবিতা, সদ-উ-তন প্রকাশনী, বর্ধমান, ফাল্গুন ১৪১৪, পৃ. ২৫
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, স্ত্রীরপত্র, গল্পগুচ্ছ, সাহিত্যম্ প্রকাশনী, ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা–৭৩, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৬১৪
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1134-1139
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.113

শিরোনাম : তারাশঙ্করের গল্পে একাল-সেকাল

অমিত মুর্মু, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.05.2025; Accepted:25 .05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Time is always changing. This time flows at its own pace towards its desired goal. Where the memories of the past are mixed with the present and moving towards the future, its meaning seems to be. Where good and bad, happiness and sorrow honor and pride, everything seems to be mixed in the stream of this time. In this flow, the stream of new time comes again and establishes a relationship with the old. In this way, the game of time continues in a cycle. Through this discussion, an attempt will be made to see how the storyteller Tarashankar Banerjee has tried to capture two times in his short stories. An attempt has been made to explore this era and the era through his selected stories. Where Tarashankar has presented the acceptability of the new through the emergence of its acceptance and the irrelevance of the old before the reader through contradiction. He has tried to explore the country, time, person and moving history in stories like 'Jalsaghar', 'Khajanchibabu', 'Pitaputra', 'Maydanab', 'Bisphoran', 'Poushalakshmi', 'Jatayu' and 'Jammantar'. The discussion will attempt to analyze the stories keeping in mind the author's strong sense of that deep time consciousness. Where the dazzling splendor of the past smiles a smile of contempt in front of the dilapidated skeletal form of that time. And taking this insult, contempt and humiliation in his heart, he has left the new on the old path. And to definitely welcome this arrival of the new, leaving the old behind in the path of time, the author has arranged flower offerings on both sides of the path.

Keywords: Landlord, Conflict, New and old, Change

> "সে কালকে শ্রদ্ধা করি, প্রণাম করি, তাঁর মহিমার কাছে আমি নতমস্তক, তার ত্রুটি বিচ্যুতি, অপরাধ, তার স্খলন আমি সবই জানি আমার পৈতৃক চরিত্রের ত্রুটির মত।"[১]

কাল সম্পর্কে তাঁর এই অনুভূতি তিনি আমাদের জানাচ্ছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মকাল উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে। তারাশঙ্কর তাঁর পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে অনেক অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছেন। কারণ, তাঁর পিতার বিদ্যার প্রতি গভীর অনুরাগ, তারাশঙ্করের সাহিত্য জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বলা বাহুল্য, পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই সেকাল এবং নিজের কালকে প্রত্যক্ষ করেছেন গল্পকার। তাই তারাশঙ্করের সাহিত্যমানস ও রচনাশৈলী এই বিচিত্র প্রেক্ষাপটে পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর আবির্ভাব সেকাল ও একাল এর সন্ধিলগ্নে। এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন থাকে যে, কাল-কালান্তরের সম্পর্কে তারাশঙ্করের অবস্থান কোথায়? এখানে আমরা তাঁর স্মৃতিকথা 'আমার কালের কথা' থেকে এ প্রশ্নের উত্তর পেতে পারি। কাল-কালান্তরকে তারাশঙ্কর দেখেন এই চোখে-

> "আমার কালের কথা মনে করতে গেলেই মনে পড়ে আমার কালের সে কালকে। ধরাশায়ী বিশালাকায় ঘনপল্লব বনস্পতি। মনে ভেসে ওঠে আমার পিতার শব দেহের কথা। শালপাংশু মহাভুজ, লৌহকপাটের মত বুক, প্রশস্ত ললাট, ললাটে সারি সারি চিন্তাকুল বলিরেখা। গভীরদৃষ্টি মানুষটির জীবন প্রতিচ্ছবি মনে পড়ে না। মনে পড়ে কঠিন হিম শীতল দেহ, অর্ধনিমীলিত স্থির শূন্যদৃষ্টি চোখ, নিথর হয়ে পড়ে আছেন, ধ্যানস্থ হয়ে গেছেন যেন অন্তরের ধ্যানে। এই আমার সে কালের ছবি। তাই সে কালকে আমি শ্রদ্ধা করি। প্রণাম করি, তাঁর মহিমার কাছে আমি নতমস্তক।"[২]

তিনি 'কালের লীলা' বর্ণনায় বিশেষ আগ্রহবোধ করেছেন, 'কালান্তরের রূপমহিমা' তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর ছোটগল্পে। তিনি কাল থেকে কালান্তরের দিকে পথ চলেছেন। তাই তাঁর সাহিত্যের আকরভূমি হয়ে উঠেছে দেশ-কাল-পাত্র।

অষ্টাদশ-উনবিংশ-বিংশ-শতাব্দীর পটভূমিকায় তারাশঙ্কর লিখেছেন নানা গল্প-উপন্যাস। তার প্রত্যেকটির মধ্যে ধৃত রয়েছে কাল থেকে কালান্তরজয়ী ব্যক্তি ও সমাজের, পট ও পটবিধৃত পাত্রের রূপ থেকে রূপান্তরের যাত্রার নানা যন্ত্রণা, নানা মোচড়। 'Every age is an age of transition'-প্রত্যেক যুগ একই সঙ্গে উপসংহার ও উপক্রমণিকা-প্রত্যেক যুগের মধ্যে আছে জয়মান ভাবীকালের প্রসবার্তি। ইতিহাসের এই সূত্রকে সাহিত্যে তারাশঙ্করের মতো আর-কেউ ব্যবহার করতে পারেনি। তাই তিনি দেশ-কাল-ব্যক্তি এবং চলিষ্ণু ইতিহাসকে অন্বিত করে দেওয়ার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দেশ এবং কাল, টাইম এবং স্পেস সম্বন্ধে তারাশঙ্করের চেতনা তাঁর স্বভূমি এবং সজাগ স্বাভিজ্ঞতার দান। তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে কালের অনুসারী না হতে পারলে তিনি কালজয়ী সাহিত্যিক হয়ে উঠতে পারবেন না। তাই তিনি কালকে অনুসরণ করে গেছেন বরাবরই।

তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যে বৈপরীত্যের সহাবস্থান খুব সুন্দরভাবে তুলে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর আবির্ভাবের একটু আগে থেকেই মানুষের সুপ্ত জীবনবৃত্তি বা যৌন কামনা বাসনার গল্প লেখা শুরু হয়েছে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রমুখ গল্প লেখকদের হাত ধরে। কিন্তু জান্তব বৃত্তির সঙ্গে মানুষের আত্মিক ক্ষুধা, হিংস্রতার সঙ্গে সারল্য-এই জাতীয় বৈপরীত্যের সহাবস্থান তারাশঙ্করের গল্পে আমরা লক্ষ করি। মানুষের ভিতরকার এই বিপরীত স্বভাবের অস্তিত্ব সম্পর্কে তারাশঙ্কর সচেতন হয়ে ওঠেন এবং সেই সচেতনতাই গল্পের ক্ষেত্রে তার স্বাতন্ত্রকে স্পষ্ট করে। তারাশঙ্করের গল্পে চলিত ভাষা ও সাধু ভাষার সংমিশ্রণে চরিত্ররা যেন আরও বেশি জীবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। চরিত্রগুলি অধিকাংশই তাদের অঞ্চল ভেদে চলিত ভাষায় কথা বলে কিন্তু স্বয়ং তারাশঙ্করের ভাষা সাধু ভাষা। এক্ষেত্রে তিনি বেছে নিয়েছেন রাঢ় অঞ্চলকে। মূলত এই অঞ্চলের নিম্নবর্গ মানুষ যেমন তাঁর সাহিত্যে উঠে এসেছে ঠিক সমান্তরালে উঠে এসেছে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের সেই সমস্ত মানুষদের কথা যারা নিজেদের বংশ গৌরবে গৌরবান্বিত হয়েও মাথা নত করেছে কালের সেই নির্মম আঘাতের কাছে। যার ফলস্বরূপ দেখা দিয়েছে নাটকীয়তা। তাই তাঁর বহু গল্পে মানসিক দ্বন্দ্বের বহির্মুখী প্রকাশ স্পষ্ট। 'জলসাঘর'-এর বিশ্বম্ভর রায় তার মর্মান্তিক আত্মপীড়নে সাধের তুফান ছুটিয়েছেন কশাঘাতে। ফিরে এসে চাবুক বসিয়েছে জলসাঘরের দরজায়। 'তিনশূন্য' গল্পের বীভৎস ভিখারী কামনার তাড়নায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে লালসা মেটাতে। আবার 'তারিণী মাঝি' গল্পে তারিণী মাঝি বন্যার স্রোতে নিছক অস্তিত্বের তাড়নায় স্ত্রী সুখীর গলা টিপে ধরেছে। এইরকম নাটকীয়তা আমরা অন্যান্য গল্প গুলিতেও লক্ষ করি। এই নাটকীয়তার জন্য তারাশঙ্করের গল্পগুলি আরও চমকপ্রদ হয়েছে।

এবারে দেখা যাক তাঁর গল্পে দ্বন্দ্ব কীভাবে এসে উপস্থিত হয়েছে, কীভাবে কালের প্রভাবকে তিনি একালের পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, কীভাবে তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে কালের প্রবাহকে ব্যক্তি চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধু ব্যক্তি চরিত্র বললে ভুল হবে, পশু চরিত্রের মাধ্যমেও সেই কালের প্রভাব বা প্রবাহকেও দেখিয়েছেন। যে সমস্ত গল্পে কালের দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে এসেছে সেই গল্পগুলি নিম্নে আলোচিত হল।

'জলসাঘর' তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। এটি রায়বাড়ি অর্থাৎ জমিদার বাড়ির গল্প। অবক্ষয়ী সামন্ত্রতন্ত্রের গল্প এটি। বিশ্বম্ভর রায় এক পড়ন্ত জমিদার। পড়ন্ত জমিদার বাড়ির পরিবেশটুকু অঙ্কনে তারাশঙ্কর অসম্ভব

মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। জমিদারতন্ত্রের ক্রম অপসৃতমানতার কালে সমাজে মানুষের শ্রেণিগত অবস্থানের পুরানো নক্সাই যে ভাঙচুর এবং রদবদল ঘটেছে, সমাজ-সচেতন শিল্প দৃষ্টির অধিকারী তারাশঙ্কর স্বাভাবিকভাবেই তার দিকে ঝুঁকেছেন। নিজে পড়তি জমিদার বংশের সন্তান হওয়ার সুবাদে এই সমাজ পরিবেশের দ্বন্দ্বকে ভেতর থেকে অনুভব করার আরেক সুযোগ ছিল তাঁর। তাঁর কথায়-

> ''সমাজতন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দু'চোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।''[৩]

একালের নতুন ব্যবসাদার ধনী মহিম গাঙ্গুলির সঙ্গে রায় বংশের সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভর রায়ের পরোক্ষ প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই যেন তারাশঙ্কর সেকাল এবং একালের প্রতীক হিসাবে দুজন প্রতিনিধিকে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। শেষে বিশ্বম্ভর রায়ের পরাজয় যেন একালের কাছে সেকালের পরাজয় স্বীকার করাকেই স্বীকৃতি দেয়। অন্যদিকে, 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার' গল্পে সরকার মশাইদের পাঁচ পুরুষ পূর্বের জমিদারির আজ শোচনীয় অবস্থা। রামেন্দ্রের মামা এই পূর্বপুরুষের জমিদারীকে কিছুতেই হাত ছাড়া হতে দেবেন না বলেই নিজে প্রজাদের কাছে গিয়ে খাজনা আদায় করেন। পুরনো আমলের যে নিয়ম কানুন সেসমস্তকে মেনে পূর্বপুরুষের খাজনা আদায়ের পদ্ধতিকে সামনে রেখে মানুষের সামনে উপস্থিত হলে এতেও মানুষের অপমান ও বিদ্রুপ শুনতে হয় তাকে। তাকে 'কাগজ বাবু' বলে সম্বোধন করতেও ভয় পায় না মানুষ। সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে এখন কেউ আর সরকার মশাইকে ভয় পায় না। সবাই সরকার মশাইয়ের উপর কথা বলার মতো সাহস পেয়ে গেছে। আসলে পরিবর্তমানতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষও যেন নতুনকেই গ্রহণ করতে চাইছে। তাই উঠতি জমিদারদের কাছে তারা যেন বিশেষ করে নিজেদেরকে উজার করে দিচ্ছে। তাই যখন সরকার মশাই খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের কাছে রওনা দেন তখন মাঝপথে দেখা হয় মিত্তিরদের জমিদারদের নায়েবের সঙ্গে। যেহেতু মিত্তিরদের খাজনা থেকে উপার্জন সরকার মশাইদের থেকে বেশি। তাই প্রজারাও তোয়াজ করে চলে মিত্তিরদের। তাই সরকার মশাইকে আমল না দিয়ে মিত্তির বাড়ির কাছারিতে সবাই গিয়ে জড়ো হয়। কারণ হিসাবে নন্দলাল জানায়-

> "বসেন গো কত্তা। বাবুদের ডাকে সবাই আসবে-আপনার কাজও হয়ে যাবে। আর তো মোড়লদের ঘরে কেউ আসবে না। ডাকতে গেলে বলবে-আজকে যেতে পারছি না-হয়তো এবারে দিতেই লারব।"[৪]

সুতরাং বোঝায় যাচ্ছে সাধারণ মানুষ তাদেরকে আর মান্যগণ্য করে চলছে না। সরকার মশাই যতরকমভাবে গোষ্ঠ পালকে ভয় দেখাতে যাক না কেন সে কিন্তু আর ভয় পায় না। এমনকি তার নামে নালিশ করা হবে বললেও সে কিন্তু ভয় পায়নি। এমনই ঔদ্ধত্য যে সরকার মশাইয়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই সে কাছারি ছেড়ে চলে যায়। ভরা কাছারিতে সেদিন সরকার মশাই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে সেসছিলেন। তার ভাগ্নে রামেন্দ্রর বাড়ি ফেরা কে কেন্দ্র করেও তৈরি হয় একটা দেখিয়ে দেওয়ার মানসিকতা। তাই ভাগ্নেকে আনতে গিয়ে তার সঙ্গে অল্প জিনিস দেখে সরকার মশাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে আর বাকি জিনিস কোথায়? রামেন্দ্র জানায় সে এই গুটিকয়েক জিনিসই এনেছে। কিন্তু তার মামা নিরাস হয়ে উল্টো কথাই তাকে জানায়-

> "আনতে হয় রে-জিনিস পত্র কিছু বেশিই আনতে হয়। আমাদের হল পুরোনো বনেদী ঘর-পাঁচজন দেখে-দুটো আশাও করে।"[৫]

আর এই বনেদী বাড়ির মানসম্মান, আভিজাত্য বজায় রাখতে গিয়ে অস্বাভাবিক রকমভাবে মানুষের কাছে হেয় হতে হয়। আর সেটা সহ্য করতে পারে না রামেন্দ্র। তাই একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বে বলে বাড়িতে ফিরে এসে যখন মামার সামনে দাঁড়ায় তখন মামা তাকে জানায়-

> "তুই বড় হয়েছিস, আমারও ধর বুড়ো বয়স-খরচ আমি বেশি করবো না-আমাকে কাশীতে পাঠিয়ে দে।"[৬]

শেষ পর্যন্ত সরকার মশাই তার জমিদারী, আভিজাত্য ও বংশ গৌরব ত্যাগ করে। যেন এই নতুন সমাজ ব্যবস্থায় সে অপাংতেয় হয়ে উঠেছে। তাই মানুষ যেন তাকে আর গ্রহণ করতে পারছে না। আর যেটুকু গৌরব অবশিষ্ট আছে সেটা নিয়ে কাশীতে চলে যেতে চেয়েছে।

'খাজাঞ্চিবাবু' গল্পে মানভূমের ফায়ার ব্রিক্‌স কারখানার খাজাঞ্চিবাবুর বিদায় দৃশ্যটি একেবারেই অনাড়ম্বর বলেই তা আরও বেশি চিত্তস্পর্শী হয়েছে। কালের পরিবর্তন হয়, পুরনো পদ্ধতির বদলে আসে নতুন পদ্ধতি। কারখানাতেও নতুন জিনিস আনা হয়েছে, নতুন দিনের নতুন নিয়মের কাছে তাই সে বাতিল, সে অযোগ্য, তাই তাকে চলে যেতে হবে। কিন্তু চলে যেতে বলাটা যতটা সহজ, চলে যাওয়া ততটা সহজ নয়; কঠিন, অনেক মর্মবিদারী। এখানে তারাশঙ্কর যেন দেখালেন যতই আমরা কালের বিরুদ্ধে দাঁড়াই না কেন পরাজয় নিশ্চিত। খাজাঞ্চিবাবু তারই বার্তাবাহক।

আরও একটি গল্প 'পিতা-পুত্র'-তেও তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে দুটি প্রজন্মের মানুষের মানসিক চিন্তাভাবনা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ করবার বিষয় তারাশঙ্কর এখানে সরাসরি কালের প্রসঙ্গ আনলেন না। বদলে ভিন্ন দুটি মানুষকে তুলে ধরলেন শিবশেখর আর শশীশেখরকে। যেখানে পুত্র পিতার পরামর্শ মানতে চায় না আর পিতাও তার সিদ্ধান্তে অনড়। গল্পের শশীশেখর পিতা শিবশেখর সম্পর্কে বলে-

> "পরাধীনতার জন্য এমন মনোভাব হয়েছে যে, প্রাচীন পণ্ডিত ভুল বললেও তাঁর প্রতিবাদ করাটা পর্যন্ত অন্যায়ের তালিকাভুক্ত হয়ে পড়েছে।"[৭]

-এর থেকে প্রমাণ হয় যে পিতা-পুত্রের মধ্যে একপ্রকার মানসিক দ্বন্দ্ব চলছে। এই রকমই আর একটি গল্প 'গবিন সিংয়ের ঘোড়া' সেখানেও তারাশঙ্কর সরাসরি কালের প্রসঙ্গ আনেনি। প্রতীক হিসাবে দেখিয়েছেন দুটি জীবকে, একদিকে গবিন সিংয়ের ঘোড়া প্রবীণ আর অন্য দিকে গবিন এর ছেলে নবীন। এদের নাম দেখেই আমরা কিছুটা দ্বন্দ্বের আভাস পাই। নবীনের শ্বশুরবাড়িতে ঘোড়ার সামনে দাঁড়িয়ে যখন প্রবীণকে পুণ্যছত্রীদের ঘোড়াটা সজোরে পিছনের পা দিয়ে লাথি মারলো তখন-

> "প্রবীণের হুংকারের আধখানা মুখেই রয়ে গেল-সে চিৎ হয়ে উলটে পড়ে গেল।"[৮]

এখানে প্রবীণের চিৎ হয়ে পড়ে যাওয়াটাকে লেখক যেন দেখালেন নবীন কালের কাছে প্রবীণ এই ভাবেই হেরে যায়। কালের লীলা বড়ো নিষ্ঠুর তাই তাকে স্বীকার করে নেওয়াটাও কষ্টের।

তারাশঙ্করের এমনি আর একটি গল্প হল 'ময়দানব'। ময়দানব গল্পের প্রধান চরিত্র ফণি মিস্ত্রী। সে ফায়ার ব্রিক্‌স কারখানায় খুবই অল্প বয়স থেকে কাজ করছে। তার সঙ্গে কারখানার এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কারখানা হয়ে উঠেছে তার একান্ত নিজের। কিন্তু হটাৎ করে তার এই স্বাভাবিক জীবনে নতুন মোড় আসে। তাকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়। সে ভাবে, তাকে আবার ফিরিয়ে নেওয়া হবে কিন্তু সেরকম কিছু হয় না। তারাশঙ্কর এখানে অসাধারণ দক্ষতার সাথে গল্পের অন্য আরেকটি চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে-'ফনি মিস্ত্রী-কালও ছিলো'। অর্থাৎ কালও ফনি মিস্ত্রী ছিল কিন্তু আজ নেই। কাল যেন তাকে আর স্বীকার করছে না। এখানে যেন কোথাও ফনিকে কাল অস্বীকার করছে, অস্বীকার করছে নতুন কারখানার ম্যানেজের, নতুন কারখানার নতুন শেড ও কারখানার বৈদ্যুতিক আলো। তাই লেখক আমাদেরকে বার বার করে বলেছেন-'কাল ছিল', অর্থাৎ আজ নেই। কালের চরিত্র যেহেতু চলিষ্ণু তাই ফনির অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। আরও স্পষ্ট করে বললে হয় যে তার আর কোন অস্তিত্বই নেই। আবার গল্পের সিংগী নামের আর এক চরিত্রের উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, তাদের নতুনের কাছে পুরোনো ফনির দাম নেই-

> "সভার মধ্যে সেই ছোঁড়া দুলু সিংগী, যাকে সে হাতে করে মানুষ করেছে—সেই তাকে 'বুড়ো', 'বাতিল', 'সেকেলে' লোক বলে গাল দিল।"[৯]

আমরা আগেও দেখেছি পরিবর্তমান কাল প্রবাহে বর্তমানের সঙ্গে অতীতের যোগসূত্র রচনায় সুদক্ষ তারাশঙ্কর চলমান কালেরই সহযাত্রী কথাকোবিদ। ছেচল্লিশ এর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় ছিন্নভিন্ন মহানগরীর একটি প্রতীকী ছবি তিনি আঁকলেন 'বিস্ফোরণ' গল্পের মধ্যে দিয়ে। রামতারন এই গল্পের মূল চরিত্র। বিগত কালের প্রতিনিধি হিসাবে লেখক তাকে তুলে ধরেছেন আমদের সামনে এবং শেষে এর পরিণতি আমরা দেখতে পাই।

'পৌষলক্ষ্মী' নামে বিখ্যাত গল্পটিতে চাষি মুকুন্দ পালের সঙ্গে জোয়ান চাষি শ্রীকৃষ্ণ পালের প্রতিদ্বন্দ্বীতার কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। গল্পটির মধ্যে মুকুন্দলাল ও শ্রীকৃষ্ণকে যেন দুই কালের প্রতিনিধি হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। গল্পে মুকুন্দলালের যৌবনের কালের কথা বিভিন্ন প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। কিন্তু বর্তমানে মুকুন্দলাল অক্ষম

তাই তিনি হতাশাগ্রস্থ। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণ পাল এ যুগের জোয়ান চাষি, শ্রীকৃষ্ণ পাল নানারকম রঙ্গ, ব্যঙ্গ করতেও ছাড়েনি মুকুন্দলালকে। কারন, মুকুন্দলাল আর আগের মত চাষের জমিতে খাটতে পারে না তার বয়স বেড়েছে, সে এখন পুরনো হয়ে গেছে। তাই বার বার সে শ্রীকৃষ্ণের কাছে অপদস্ত হয়েছে। এ ভাবেই এই 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পে তারাশঙ্কর দুটি চরিত্রকে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন কালের প্রতীক হিসাবে।

রামায়ন-মহাভারতের প্রসঙ্গ যে একালের ছোটগল্প রচনায় সার্থক রূপকল্প হয়ে উঠতে পারে তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'জটায়ু' গল্পটি। ১৯৪৭ সালের পরবর্তী কালের ঘটনা। ভারত বিভাজনের ফলে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ লেগেই আছে। সেই কালের প্রেক্ষাপটে তিনি দুটি চরিত্রকে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। একটি হল কালাগোঁসাই আর জটা পাগলা। কালাগোঁসাই কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে রূপধারণ করে নিজের জীবিকানির্বাহ করে। তার যেটা চাই সেটা না পেলে সে সাধারন মানুষের উপর অত্যাচার করে। আর অন্য দিকে জটা পাগলা। সে জন্ম পাগল। গল্পের শেষে আমরা দেখতে পাই যে কালাগোঁসাই আর জটা পাগলার লাশ পাশাপাশি নিথর হয়ে পড়ে আছে এই ভাবে গল্পটির সমাপ্তি ঘটেছে।

এরকমই আরও একটি গল্প হল 'জন্মান্তর'। জন্মান্তর গল্পের পূর্বনাম ছিল 'হৌমবতীর প্রত্যাবর্তন'। হৌমবতী বলরাম চাটুয্যের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। নিঃসন্তান বালবিধবা এই মেয়েটি যেন আগুনের মতই সারাজীবন জ্বলে পুড়ে ছাই হয়েছে। স্বামী ছিলেন প্রতাপান্বিত গ্রাম শাসক, জমিদারীর অহংকার কম ছিল না। স্বামীর স্বভাব ও সম্পত্তিতে অধিষ্ঠাত্রী হয়ে হৌমবতী কারো ভাষায় 'খণ্ডরানী', কেও বলে 'রানীদুর্গা', কেও 'ঝাঁসিররানী'। কিন্তু কালের পরিবর্তন চলছে অব্যাহত গতিতে। ১৯৬১ সালের জমিদারী বিলোপ আইন পাশ হয়ে গেল। এই লক্ষ্মীছাড়া দেশ ছেড়ে হৌমবতী চলে যাবেন বৃন্দাবন। সংসার বৈরাগ্যের আরেকটি কারণ ছিল, সতিনের ছেলে নিলু। উৎশৃঙ্খল নিলু আচার ব্যবহারে কালাপাহাড়। সে হৌমবতীর সহ্য সীমাকে শেষ সীমায় নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিষয় আশয় সব নিলুকে বুঝিয়ে দিয়ে যখন তিনি আসক্তিমুক্ত হবেন এমন সময় তার চোখে পড়ল চার বছরের একটি কচি শিশু। নিলু-রই ছেলে যেন তারই শিশুমূর্তি। ওই শিশু মুখ খানিকে দেখে আজীবন সন্তান বুভুক্ষ বিধবার জন্মান্তর হল।

পরিশেষে বলায় যায়, মূলত অভিজ্ঞতাই তারাশঙ্করের লেখক চরিত্র তৈরী করেছিল। বিচিত্র, ব্যাপক, অথচ খুবই বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা। সামন্তযুগ ও শিল্পায়নের সন্ধিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধওোর বাংলাদেশের পটভূমিতে দাড়িয়ে তারাশঙ্কর জীবনের যে দ্বান্দ্বিক চেহারাটিকে লক্ষ করেছেন, মনে হয় তারই টানে তার গল্পে সময়-বদলের প্রকাশ কৌশলটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এসে পড়েছে। অতীত ও বর্তমানের বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব বা টানাপোড়েনে তার বহু গল্প এক বিদীর্ণ মানসিক সত্তাকে তুলে ধরেছেন। তারাশঙ্কর জানতেন দুয়ারে বাঁধা হাতির দিন গেছে, মোটর গাড়ির গতির কাছে হার মানতে বাধ্য ওই কালের গজেন্দ্রগমন। সময় ও সমাজ সচেতন শিল্পী সেই পুরনো কালের জন্য হতাশ্বাস ফেললেও এই নতুন কালের ছবি আঁকায় ক্লান্ত। আসলে বংশানুক্রম এবং দেশ-কালে সংস্থিত থেকেও তারাশঙ্কর সার্বভৌম মানবমুক্তির মহৎশিল্পী-কূলধর্মে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ ভূস্বামী কিন্তু শীলধর্মে মানবশিল্পী। সহজ-সাধনের কবি চণ্ডীদাস একদিন যে প্রসঙ্গে 'সবার উপরে মানুষ সত্য'-এই মতবাদ প্রচার করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গকে অক্ষুন্ন রেখে তারাশঙ্করের সাহিত্য সম্পর্কে বলা যায়,-'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

তথ্যসূত্র:

১। মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার ও রায়, জ্যোতিপ্রসাদ (সম্পাদিত), ছোটগল্প : বিকাশ, পরিণতি ও উপলব্ধি, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১০৮

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৫৬

৩। দাশ, উদয়চাঁদ (সম্পাদিত), ছোটোগল্পের বর্ণালি: কথা থেকে শৈলী, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০০৭, আশ্বিন, ১৪১৪, পৃ. ৯৮

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, হারানো সুর, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬২, পৃ. ৮৭

৫। তদেব, পৃ. ৮৫

৬। তদেব, পৃ. ৯২
৭। ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পাদিত), তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ প্রকাশনী, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ ২০১১, পৃ. ২২৯
৮। তদেব, পৃ. ৬২
৯। তদেব, পৃ. ৪২১

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1140-1146
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.114

দেবব্রত দেবের গল্প: বহুমাত্রিকতার অন্য স্বর

সায়ন মণ্ডল, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 05.05.2025; Accepted: 14.05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Debabrata Deb is a distinguished writer of Bengali literature. He is primarily a storyteller, focusing on short stories and novels. His stories highlight the economic and political issues of Tripura, along with the lives and livelihoods of its inhabitants. Along with the themes of his short stories, the narrative style, choice of words, and sentence construction are significant aspects. These elements effectively bring his short stories to life. The Ground reality of Tripura people depicts in Bengali literature of Tripura. This scenario is different from Bengali literature of West Bengal and Bangladesh or which is called mainstream Bengali literature. Several complex historical and socio-political issues are deeply intertwined with the history of Bengalis in the state of Tripura- such as the refugee crisis, the Partition of India, migration, and identity conflicts. These developments brought about significant social, cultural, and demographic upheaval in the region. The impact of these issues is not only evident in the historical landscape of Tripura but also finds powerful expression in its literary narratives. In this context, the stories of Debabrata Deb vividly portray these turbulent times, capturing the emotional and existential struggles of displaced communities and reflecting the broader socio-political shifts in Tripura's evolving identity.

Keywords: Tripura, Short stories, Debabrata Deb, Partition, Livelihood, Crisis, Identity, Border, Land

উনিশ শতকে আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্য যখন সাবালক হয়ে উঠছে, তখন বাংলা গদ্য সাহিত্য রচনার পরিসীমাটা ঠিক কতটা ছিল? এই কথা বলার কারণ এই একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে দাঁড়িয়েও আমরা দেখব বাংলা সাহিত্যের রাজত্ব কতকটা শাসিত হয় মহানগর কলকাতাকে কেন্দ্র করে। অথচ বাংলাসাহিত্য রচনার পরিসীমাকে যদি সঠিক পরিমাপে মাপতে যায় কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ এমনকি বাংলাদেশ রাষ্ট্র ছাড়িয়েও তার পরিসীমা বাড়তে থাকবে। এর কারণ অবশ্য আছে, এবং এর একটি বড় কারণ বোধহয় দেশভাগ ও ১৯৭১- এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। একটু মোটা দাগে চিহ্নিত করণ করলে এমনটাই করা যায়। কেননা এই দুটি কারণে বাঙালির ছড়িয়ে পড়া ও বাঙালি জীবনে সংকট ভীষণভাবে দেখা দিয়েছিল। বর্তমান প্রবন্ধে এই ইতিহাস বর্ণনার কিঞ্চিত প্রয়োজন আছে। কেননা এই প্রবন্ধের বিষয় গল্পকার দেবব্রত দেবের গল্প, তিনি উত্তর-পূর্ব ভারতের ‘সেভেন সিস্টার্স’ চিহ্নিত রাজ্য ত্রিপুরার অধিবাসী। সুতরাং তাঁর গল্পের আলোচনায় তাঁর

যাপন ভূমির ইতিহাসের অবতারণা প্রয়োজন। ত্রিপুরার অবস্থান বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চট্টগ্রামের পাশেই, অর্থাৎ অবিভক্ত বাংলার সঙ্গে ত্রিপুরার সংযোগ কতটা ছিল আমরা অনুমান করতে পারি সহজেই। এছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের শেষ মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের রবীন্দ্রনাথ প্রীতি সর্বজনবিদিত, এছাড়া তিনিই বোধহয় প্রথম রাজা যিনি দেশবিভাগের উদ্বাস্তু বাঙালির জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেন।[১] ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি দেশবিভাগ ও **১৯৭১**- এর মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় ছয় লক্ষ বাঙালি উদ্বাস্তু, শরনার্থী মানুষের সমাগম ঘটে। জানা যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে ত্রিপুরার অধিবাসীর তুলনায় শরনার্থীর সংখ্যা বেশি ছিল।[২] সুতরাং এই রাজনৈতিক, সামাজিক দুই দিক থেকেই ত্রিপুরার ভূমিতে সংকট দেখা গেছে বারংবার। গল্পকার দেবব্রত দেবের গল্পে সামাজিক থেকে রাষ্ট্রনৈতিক সংকট সবকিছুই উঠে এসেছে, ক্রমান্বয়ে বিষয়গুলি আলোচনা করবো।

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান সংস্থাপনের জন্য মানুষ একটি নির্দিষ্ট জীবিকার প্রয়োজন অনুভব করেছিল সভ্য হওয়ার সঙ্গে। স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ করা বা বেঁচে থাকা মানুষের যখন লক্ষ্য, তখন বেঁচে থাকার রসদ আপনা- আপনি আসে না এই সত্য। এই উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করে নিয়েছে বিচিত্র জীবিকার। গল্পকার দেবব্রত দেব দুটি কাহিনি নির্মাণ করেছেন এমনই এক বিচিত্র জীবিকাকে কেন্দ্র করে, যদিও কাহিনি শুধু যে একটি জীবিকার পরিচয় দেয় এমন নয়। সে কাহিনিতে প্রবেশের পরের কথা। যাইহোক গল্পদুটি যথাক্রমে 'বিবাদ ভূমি' ও 'প্রত্যন্ত'।

আমরা প্রথমেই নজর দেব 'বিবাদ ভূমি' গল্পটির দিকে। কাহিনিতে প্রবেশের পূর্বে পাঠকের অবশ্যই উচিত নামকরণটি লক্ষ্য করা, অভিধান বলছে বিবাদ শব্দের অর্থ ঝগড়া, কলহ প্রভৃতি। সুতরাং এমন একটা কল্পনা করা যেতে পারে যে ভূমিখণ্ড কলহের সৃষ্টি করে বা যে ভূমিখণ্ডে কলহ প্রধান সেই ভূমিখণ্ডের কাহিনি এটি। আসলে ভূমির একটি পরিচয় তৈরি করে দেয় রাষ্ট্রযন্ত্র, সেই পরিচয়ে চিনে নেওয়া যায় তাকে। কিন্তু সেই ভূমির মানুষের পরিচয় নির্ধারণ কে করতে পারে? এই কাহিনির চরিত্রগুলি এমনই এক ভূখণ্ডের জনতা যে ভূখণ্ডকে কোনও রাষ্ট্র করায়ত্ত করেনি অথবা করতে পারেনি। অর্থাৎ এই ভূখণ্ডের মানুষও কোনও রাষ্ট্রের অধিকারে পড়বে না। গল্পের চরিত্র 'দাদ্দু' তাই অন্য সবাইকে মনে করিয়ে দিতে বলে—

> "এখানে তেমন কোন সম্পর্ক নেই যা ধুলে হাসি হয়, কান্না হয়, ক্ষোভ হয়, ভক্তি হয়, প্রেম হয়, পরিণতি হয়। এসবের কিছুই নেই এখানে।এটা, কোন দেশ না, শহর না, গ্রাম না, পাড়া না, আমরা সুমারিবর্জিত। শুধু আদম। বেঁচে থাকাই আমাদের একমাত্র পরিণতি।একমাত্র হাসি, কান্না,ক্ষোভ, সংশয়, ক্রোধ,প্রেম—এসবের আকর। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনটাই অমোঘ।"[৩]

ভয়ঙ্কর পরিচয় জ্ঞাপনে শিহরিত হয়ে উঠবে পাঠক। এমনই এক জনগোষ্ঠী, তাঁদের বেঁচে থাকার জীবন সংগ্রাম, জীবিকা এই গল্পের প্রতিপাদ্য।

চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই গল্পের কাহিনিতে প্রবেশ করলে আমরা প্রথমেই দেখি এই জনগোষ্ঠীর নেতা এক বৃদ্ধ, গল্পের ভাষায়—

> "...যে এই লোকটা যে সত্তরের ওপাশে গড়ানো কিন্তু থু-থু যার এখনও প্রচুর মজবুত তার কথাই এখানে আইন,"[৪]

সেই বৃদ্ধ একটি পাথরের চাঁইয়ের উপর বসে ট্রানজিস্টারে কিছু শোনার চেষ্টা করছে এবং গোষ্ঠীর জনসংখ্যার খোঁজ নিচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায় গোষ্ঠীর জনসংখ্যার একজন কমে গেছে, কারণ গত রাতে গোষ্ঠীর 'হারাণ' নামক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে রাত পাহারাদারের প্রহারে। ক্রমে পাঠক জানতে পারে এই মৃত্যুর

জন্য হারাণ মরে গিয়ে গোষ্ঠীর কাছে হয়ে উঠেছে 'চার পাত্তি'। এই গোষ্ঠীর মানুষের কাছে মৃত্যু আসলে শোক নিয়ে আসে না, গোষ্ঠীর কারও মৃত্যু হলে গোষ্ঠী নেতা খোঁজ নেন গোষ্ঠীর নারীরা কয়জন অন্তঃসত্ত্বা আছে, কয়জন রজঃস্বলা আছে। অর্থাৎ শুধু শূন্যস্থান পূরণ, সমতা বজায় রাখা। এমনকি যৌনমিলন, কার গর্ভে কার সন্তান জন্মাছে সমাজের এই নিয়মের মধ্যেও পরে না তাদের জীবন। গোষ্ঠীর কেউ মারা গেলে গোষ্ঠীর মানুষ তাকে লবণ দিয়ে মাটির গর্ভে শুইয়ে দিয়ে আসবে এবং একমাস পর মাটি খুঁড়ে কঙ্কাল তুলে এনে বেচে দেবে চার পাত্তির বিনিময়ে। এই গোষ্ঠীর এই একটি বিচিত্র জীবিকা। কাহিনিতে এটিও উল্লেখ থাকে যে, যেহেতু তারা কোনও রাষ্ট্রের নাগরিক নয়, সেহেতু তাদের মৃতদেহের উপর রাষ্ট্রের কোনও অধিকার নেই। যতদিন তারা বেঁচে আছে তারা হারান, সুবল অথবা দুলাল কিন্তু মৃত্যু ঘটলে শোক পালনের পরিবর্তে গোষ্ঠীর বাকিদের কাছে তারা হয়ে ওঠে তিনপাত্তি, চার পাত্তি। গোষ্ঠী নেতা দাদ্দু বলে—

> "বিবাদ-ভূমির মানুষ তুমি,একথা প্রাণপনে মনে রাখতে রাখতেই তোমার মৃত্যু ঘটবে টেম। তখন সোয়াসের লবণের পাহারায়,একটি মাস তোমাকে রাখা হবে।তুমি হবে তিনপাত্তি।এই বিবাদ-ভূমির এপাশ-ওপাশ যে কোন পাশ থেকেই তোমার খরিদ্দার আসতে পারে। তোমার যত্নে বয়ন করা দুঃখমালা কেউ দর দিয়ে, দরদ দিয়ে কিনবে না- কিনবে তোমার চৌষট্টি-তন্ত্র সার।"[৫]

নো ম্যানস ল্যাণ্ডের মানুষদের জীবনের এক ভয়ঙ্কর বাস্তবতার ছবি এটা।

শুধু এটুকুই নয় এই গল্পের সংলাপের ছত্রে ছত্রে শিষ্ট অথচ শানিত বাক্যবাণ সবসময় সজাগ রাখে পাঠককে কাহিনির পটভূমি ও চরিত্রদের অবস্থান সম্পর্কে,

> "এই দেশ-বর্জ্য সংহতির মূল কথাই হল ঐক্য। ঐক্যই জনবল ধরে রাখতে পারে। এই সত্য দেশ বা জাতি হলে মনে রাখতে হয় না। কিন্তু বিবাদ-ভূমির বাসিন্দারা, ঐ একটি কথাই মনে রাখে। ফলে, কোন মেয়েছেলের গর্ভে কার সন্তান জন্মাল সে খবর এখানে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবার মতন একটি বস্তু ছাড়া কিছু না। এখানকার আদমেরা শুধু একটা কথাই জানে জন্ম-ঘর ফাঁকা ফেলে রাখা এক সুতীব্র গুনাহ।"[৬]

অথবা রাষ্ট্র-রাষ্ট্র খেলার হাতিয়ার হয়ে ওঠে যখন জনগোষ্ঠী বা রাষ্ট্র যখন ব্যবহার করে তাদের বাঁধ নির্মাণে বা ধ্বংসে। তারা সবকিছু জেনেও শুধুমাত্র বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহের জন্য কাজ করে যায় নিষ্ঠার সঙ্গেতাঁদের নিষ্ঠায় এতটুকু ফাঁক তারা রাখে না, নিজেদের সৃষ্টি ভাঙার বরাত যখন তারাই পেয়ে যায় তখন দৃঢ় কণ্ঠে বলতে শুনি—

> "না, যখন গড়ি তখন গড়ার গর্ব খর্ব করি না আমরা। ভাঙার সময়ও তাই। আমাদের হাতুড়ি হাতির থেকেও শক্তি ধরে তখন। কারণ, আমরা তোমাদের মতো দেশজ নই। দেশজ'র মতো আমরা পরস্পরের হন্তারক না, আমরা জীবনের জন্যেই বিধ্বংসে বিশ্বাস করি। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিবাদের বশে নির্জ্জানকে ধ্বংস করি না।"[৭]

এই গল্পে গল্পকারের শিষ্ট, শানিত বাক্যবাণ লক্ষ্য করার মতো। শুধু প্রান্তসীমার একটি গোষ্ঠীর জীবন সংগ্রামের কাহিনি এই গল্প নয়। রাষ্ট্র, রাজনীতির রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের আদিম দিকগুলিও সুচারুভাবে কাহিনিতে নির্মাণ করেন লেখক। শুধুমাত্র ভাবিত হওয়ার কোমলতার স্তর নয়, তীব্র সচেতনতা আছে এই গল্পের ভিতর।

'বিবাদ ভূমি' গল্পে আমরা যে জীবিকার কথা পাই 'প্রত্যন্ত' নামক গল্পেও গল্পকার একইরকম জীবিকার কথা বলেন। কাহিনির কিছু ভিন্নতা থাকলেও 'প্রত্যন্ত' নামক গল্পেও বেঁচে থাকার সংগ্রামের চিত্র পাই। এই গল্পের পটভূমি 'বিবাদ ভূমি' গল্পের পটভূমির কাছাকাছি, নো ম্যানস ল্যান্ড, বর্ডার এলাকার কাছ থেকে আমরা এসে পড়ি শহর প্রান্তের রিফিউজি কলোনিতে, বর্ডারের কাছেই। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নটু, তার সঙ্গে রয়েছে আবু, দিলুপ্রভৃতিরা। তাদের জীবিকা লাশ পচিয়ে বা মাটির গর্ভ থেকে বেআইনি ভাবে গলিত শব তুলে এনে তার কঙ্কাল বর্ডারের ওপাশে চালান করা। এই কাজে তাদের আড়কাঠি আছে শিবু হোমগার্ড, যে সন্ধান দেয় এবং জামাল যে কঙ্কাল কিনে বর্ডার পার করে নিয়ে যায়। কাহিনিতে পাঠক প্রবেশ করে, জানতে এই রিফিউজি কলোনির বাসিন্দারা নিতান্ত পেটের দায়ে অর্থাৎ সেই বেঁচে থাকার তাগিদে এই বেআইনি বা পৈশাচিক কর্মকাণ্ড যুক্ত হয়েছে। কাহিনি এক রিফিউজি কলোনির মানুষদের প্রত্যন্ত জীবন নিয়ে। শুধু কঙ্কাল পাচারের জীবিকায় নয়, নিজের শরীরের রক্ত বেচে পেট চালানোর কথাও শুনতে পাওয়া যায় গল্পে। যাইহোক ভিন্ন ভিন্ন সময় বর্ডার পেরিয়ে রিফিউজি হয়ে ওঠা নটু, আবু, দিলুরা জড়িয়ে পড়ে 'খাঁচা পাচারের' কাজে, অর্থাৎ শব দেহকে লবণ চাপা দিয়ে রেখে পরবর্তীতে তা থেকে আঁশ-মাংশ ছাড়িয়ে কঙ্কাল বের করে চালান দেওয়া। প্রথম ভয়ে ভয়ে শুরু করলেও ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নটুর দল। আড়কাঠি শিবু ও পাচারকারী জামালের সাহায্যে ক্রমশ তারা কড়কড়ে নোটে অর্থাৎ বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কাহিনি ক্রমে দেখি একসময় শিবু হোমগার্ডের বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়তে পড়তে কোনওক্রমে বেঁচে যায় নটুর দল, অথচ তারা টের পেয়েছিল তাদের এই কর্মকাণ্ডের ভাগ হাসপাতাল,বিএসএফ সকলেই অংশীদার, কঙ্কালের চোরাচালানে সকলেই লভ্যাংশ নিয়ে থাকে। যে রাতে শিবুর বিশ্বাসঘাতকতায় বিপর্যস্ত হয়ে নটুর দল সে রাতে ঘরে ফেরার মুখে তারা জানতে পারে নটুর বৃদ্ধ বাবা মারা গেছে। এখানেই দেখি গল্পের চমক, ঘরে ফেরার মুখে নটু ও তার দুই সঙ্গী আবু ও দিলু নটুর বাবার মৃত্যু খবর পেয়ে লাশের অধিকার দাবি করে। অর্থাৎ, নটুর বাবার শব পচিয়ে কঙ্কাল পাচার করার কথা বলে। শোকে বিহ্বল নটু আক্রোশে জ্বলে ওঠে। কিন্তু সঙ্গী আবু মনে করিয়ে দেয়— "পকেট খাইল্যা রে নটুদা। পেট কাইল্যা..."[৮] হঠাৎ যেন আবেগ, বিহ্বলতা ছাপিয়ে নটুর কাছে প্রকট হয়ে বাস্তব। নটু রাজি হয়ে যায় আবু, দিলুর প্রস্তাবে। নিজের বাবার শব পচিয়ে কঙ্কাল পাচার করতে।

এই গল্পেও গল্পকার দেখান বর্ডার এলাকার রিফিউজি মানুষের অসহায় অবস্থা,তাদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের রূঢ় বাস্তবতা।কীভাবে রক্ত বেচে, নিজের পিতার কঙ্কাল পাচার করে রসদ সংগ্রহ করে মানুষ।বর্ডার এলাকার রাজনীতি, প্রশাসনিক ব্যবস্থাও এই গল্পে স্পষ্ট।

গল্পকার দেবব্রত দেবের একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প 'বংশলতিকা', এটি তাঁর 'পিতৃঋণ' গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত। আমরা যারা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলানাপোতা আবিষ্কার' পড়েছি তারা 'বংশলতিকা' গল্পের ভাববাচ্যে কথন সহজেই ধরতে পারবো বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের উক্ত গল্পকে মনে করাবে। 'বংশলতিকা' গল্পটি পাঠ করতে গিয়ে দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি আগ্রহ বাড়িয়ে দেয় সেটি এই গল্পটির কাব্যিক গদ্য, উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে এরকম—

> "এইভাবে শরৎকাল একসময় পার হয়ে যাবে। আরও এক শরৎ। সূর্যের গনগনানি কমবে একটু একটু করে। নদীর জলে আকাশের লাজুক লাজুক ছায়া, টুকরো টুকরো সাদা মেঘের ভাসাভাসির ছবি খেলা করতে শুরু করবে।"[৯]

বা,

> "ওই গাছগুলোর সামনে বসলে মনে হত- যা হয়েছে এখন পর্যন্ত সবই তো স্বাভাবিক। স্বাভাবিক না- হলে ওই গাছেরা কি সুন্দর একদিকে সব শাখা- প্রশাখা পত্র পল্লব উড়িয়ে বেশ আছে তো- কী করে থাকে। অন্য গাছেদের মতই মাটি থেকে জল, খাদ্য, মাটির গভীরে শিকড়, ছাল- বাকল, নাইট্রোজেন- সবই নিয়ে দাঁড়িয়ে- গাছের মতো উদাস অনন্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াহীন প্রাকৃতিক নিয়ম- কানুনের মধ্যে ঠিক যেমনটি তার অবস্থান হওয়া উচিত..."[১০]

উক্ত উদ্ধৃতিগুলির বিষয়ভিত্তিক ব্যঞ্জনা আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত কাব্যিক ব্যঞ্জনা রচনা করে। এই গল্পের কহিনি বা বিষয়বস্তুতে যাওয়ার পূর্বে গঠন সম্পর্কে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। এই গল্পের কাহিনির চলন ঠিক সোজাসাপ্টা বা ঘটনার পরম্পরা ঠিক সরল নয়। গল্পটি শুরু হয় গল্পের মূল চরিত্র নিবারণ রায়ের চিঠি লেখা নিয়ে এরপর ধীরে ধীরে কখনও বর্তমান, কখনও ইতিহাস বা অতীতে কাহিনির ঘোরাফেরা এবং এই সূত্রগুলিকে যথাযথ বয়ন করেন গল্পকার।

গল্পের কাহিনি মোটামুটি নিবারণ রায়কে নিয়ে, পূর্বে উল্লেখ করেছি গল্প শুরু হচ্ছে নিবারণ রায়ের তার পুত্রদের চিঠি লেখার মধ্যে দিয়ে। গল্পে অহেতুক চরিত্রের বাড়াবাড়ি নেই, এমনকি গল্পকার নিজে সূত্রধারের মতো গল্পে প্রবেশ করে সে কথা বলেও যাচ্ছেন। কাহিনিতে প্রথমে আমরা দেখি নিবারণ রায় চিঠি লিখছেন তাঁর তিন ছেলেকে, তিনটে চিঠির বয়ান একই, শুধু গন্তব্য ভিন্ন। সেই চিঠিতে বর্তমান এক পরিস্থিতির উল্লেখ, সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারার মতো বৈষয়িক বিষয়ের কথা এবং একটি বংশলতিকা নির্মাণের কথা বলা হচ্ছে। এরপরেই গল্পকার আমাদের নিয়ে চলেন অতীতে, তবে এই অতীত একেবারে ইতিহাস নয়, প্রথম অধ্যায়ের এই ইতিহাস নিবারণ রায়ের 'নিবারণ রায়' হয়ে ওঠার ও পটভূমিতে প্রতিষ্ঠা করার কাহিনি। পাঠক জানতে পারেন অরুণাচল প্রদেশের কোনও এক অরণ্য প্রদেশে গিয়ে নিবারণ রায়ের ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটে, সেখানে উপজাতীয় এক অরণ্য কন্যাকে বিবাহ করেন এবং সেই স্ত্রীর সম্পত্তিই তার ভাগ্য পরিবর্তনের কারণ। এরপর দীর্ঘ বর্ণনায় রয়েছে কীভাবে অরুণাচল প্রদেশ থেকে স্ত্রীর মৃত্যুর পর শহরে চলে আসা, রায় পদবী গ্রহণ, স্থানীয় এক ক্লাবকে খয়রাতি টাকা দিয়ে পিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে পাঠাগার নির্মাণ এবং এই সূত্র ধরেই রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট প্রভৃতি করে নেওয়া। অর্থাৎ বোঝা যায় অরুণাচল প্রদেশ থেকে শিকড়হীন নিবারণ ক্রমে অর্থের জোরে গল্পের পটভূমিতে শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে ক্রমে ক্রমে হয়ে ওঠেন 'নিবারণ রায়'। গল্পের এই প্রথম অধ্যায়েই ময়না নামে এক বালিকা ও তার মা সুনীতির সঙ্গে নিবারণ রায়ের একটি সম্পর্কের কথা বলেন, এই সূত্র স্মরণ করা উচিত পুত্রদের কাছে পাঠানো চিঠিতে নিবারণ রায় স্বয়ং উল্লেখ করছেন এদের কথা—

> "...তাঁতিপাড়ার অমূল্য, যে আমাদিগকে বিভিন্ন সময় জন-খাটিয়া, গরু দোহাইয়া, মজুরী করিয়া উপকৃত করিয়াছে তাহার গতে তাহার বউ সুনীতি এবং কন্যা ময়না আমার সঙ্গে রহিয়াছে। ময়নাকে তোমরা নিজের ভগিনী হিসেবে গণ্য করিতে পার (না-ও পার)।"[১১]

অর্থাৎ কিনা ময়না ও তার মাকে বংশলতিকায় স্থান দেওয়ার একটি প্রবণতা দেখা যায়। আরেকটু সচেতন হওয়া প্রয়োজন এই কারণে নিবারণ রায়ের এই বক্তব্যের মধ্যে তার শিকড় বিস্তারের ইচ্ছেটা প্রকাশ পাচ্ছে।

এরপর চলে আসতে হয় গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। এই পরিচ্ছেদ নিবারণ রায়ের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হয় তার সুদূর ব্যক্তিগত ইতিহাস।এই পরিচ্ছেদে এসে পাঠক জানতে পারে মাইজা রায়ের (নিবারণ রায়ের উপজাতি পত্নী) সঙ্গে নিবারণ রায়ের বিবাহ সংক্রান্ত ঘটনাবলি, তার তিন সন্তানের জন্মবৃত্তান্ত, সম্পত্তি প্রাপ্তি এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ নিবারণ রায়ের জন্ম ইতিহাস। নিবারণ রায় যে অনাথ, এক ধর্ষিতা ষোড়শী জননীর

সন্তান সেই সব ইতিহাস এই পরিচ্ছেদে নিবারণ রায় নিজেই ব্যক্ত করেন। কীভাবে জন্মের পর থেকেই শিকড়হীন হয়ে ঘুরতে ঘুরতে থিতু হওয়ার চেষ্টা করেছেন বা বলা ভাল শিকড়ের সন্ধান করেছেন সেটা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পরিষ্কার হয়। এটাও বোঝা যায় নিবারণ রায় কেন বংশলতিকা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন।পৃথিবীর বুকে যেন নিজের চিহ্ন রেখে যেতে চাইছেন। নিবারণ রায় বলেন,

> "অনেকের মত আমার মা ওই নিকেতনে- তখন হয়ত নাম ছিল রিলিফ ক্যাম্প- সতেরোতে প্রবেশের দ্বারে পৃথিবীর বুকে আমার যাত্রাপথের সূচনা করে দিয়ে গিয়েছিলেন।"[১২]

গল্পকার নিজের যাপন ভূমির সমস্যা, সমসাময়িক বিষয় বস্তু স্বাভাবিক এড়িয়ে যেতে পারেন না। কখনও সরাসরি কখনও বা কাহিনির মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাবে এসে পড়ে। দেবব্রত দেবের গল্পের আলোচনায় যে গল্পের উল্লেখ প্রয়োজনীয় তার মধ্যে অন্যতম 'বিবর্জিত উপকথা' ও 'শনাক্ত' গল্প দুটি। গল্প দুটির পাঠে আমরা বুঝতে পারি পটভূমি লেখকের যাপন ভূমি ত্রিপুরা এবং গল্পের সামাজিক সমস্যা ওই ভূমির সঙ্গে সন্নিবেশিত। বিষয়গত ভাবে গল্পদুটির বৈসাদৃশ্য আছে একথা প্রথমে স্বীকার করে নিতেই হয়। প্রথমটির মধ্যে যে ইতিহাস বা সমস্যার সন্ধান পাওয়া যায় সেটা সমাজ থেকে ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে পরিণতি পেয়েছে। দ্বিতীয়টির কাহিনি অনেকটাই ব্যক্তি কেন্দ্রিক।

যাইহোক 'বিবর্জিত উপকথা' গল্পটি সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। গল্পটির কেন্দ্রে রয়েছে বিন্দুলক্ষ্মী, অভিরামও শরদিন্দু। এখানে অভিরাম রিয়াং ও তার স্ত্রী বিন্দুলক্ষ্মী উপজাতি ভুক্ত, অপরদিকে শরদিন্দু বাঙালি। শরদিন্দু ও অভিরামের মধ্যে আবাল্য বন্ধুত্ব, পড়াশোনা থেকে শুরু করে রাজনীতি সবকিছুতেই অভিরামের সঙ্গী বন্ধু ভ্রাতৃপ্রতীম শরদিন্দু। তাদের বন্ধুত্ব আসলে একটি সম্প্রতি সৌহার্দ্যের প্রতীক। তাদের দুইজনের মধ্যে সম্পর্ক এতটাই কাছের যে শরদিন্দুর মা কিম্বা বিন্দুলক্ষ্মী সকলেই সহোদর ভাবতে দ্বিধা করে না। বিন্দুলক্ষ্মীর চিন্তায় কাহিনিতে উঠে আসে—

> "হাঁটতে হাঁটতে হাসি পেল বিন্দুলক্ষ্মীর যা-সব মজা করে শরদিন্দু। তা দেওর বলতে তো ওই একজনই। আর কে-ই বা করবে।"[১৩]

অথচ কাহিনির মধ্যে প্রবেশ করে আমরা বুঝতে পারি সমাজের স্তরে স্তরে লুকিয়ে রাখা আছে বিদ্বেষের বিষ, জাতিগতভাবে চিনিয়ে দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করার প্রবণতা। কখনও বাঙালি বিদ্বেষ, কখনও উপজাতি বিদ্বেষ। পড়াশোনায় শরদিন্দুর থেকে কিঞ্চিত পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও অভিরামের চাকরি পেয়ে যাওয়ার কারণ হিসাবে অভিরামের 'রিয়াং' উপজাতি হওয়াকে দেখে। অপরদিকে উদ্বাস্তু হিসাবে বাঙালির 'ঘরবৃদ্ধি' বা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে ভালভাবে নেয় না উপজাতি সমাজ। ক্রমান্বয়ে কাহিনিতে নেমে আসে সংকট, বিন্দুলক্ষ্মী ধর্ষিত হয়, এই ঘটনা যেন আরও বেশি করে বিভাজনকে স্পষ্ট করে। কাহিনির শেষে বাস্তু ছেড়ে চলে যাওয়া অভিরামের পরিবারের চলে যাওয়া আটকাতে পারে না আবাল্য বন্ধু শরদিন্দু। অথবা চেষ্টাও করে না, তার ভিতরের দ্বিধা ক্রমশ পর্যবসিত হয় হতাশায়। বাস্তব সংকট এভাবেই গল্পে তুলে আনেন গল্পকার।

অপরদিকে 'শনাক্ত' গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে বর্তমান পুলিশের ওসি বীরেশ্বর দাশগুপ্ত, তার অতীত স্মৃতির কোলাজ ও বর্তমান অবস্থান নিয়েই এই গল্প। বীরেশ্বরের স্মৃতি বারবার আসে যৌবনের রাজনীতির স্মৃতি, বন্ধুত্ব প্রভৃতি। অথচ বর্তমান অবস্থানে সে যেন সেই অতীতকে স্বীকার করতে চায় না। বর্তমান পেশার উচিত-অনুচিতের দ্বন্দ্বে ভোগে সে। মুক্ত দুনিয়ার স্বপ্ন দেখা বীরেশ্বর এখন পেশাগত কারণে নিজের বিবেককে আচ্ছন্ন করে রাখে। আসলে দুই অস্তিত্বের শনাক্তকরণ এই গল্পের মূল প্রতিপাদ্য।

কোনও গল্পকারের সমগ্র গল্পের মধ্যে বিষয়গত মিল খুবই কমই থাকে কিন্তু লেখনীর বিশিষ্টতার কারণে লেখক নামহীন গল্পকেও চিনে নেওয়া। দেবব্রত দেবের গল্পগুলিও নিজস্ব বিশিষ্টতায় সমুজ্জ্বল। গল্পকারের গল্পে যে বিষয়গুলি লক্ষণীয় তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে বলিষ্ঠ সংলাপ ও বাক্যের গঠন। 'বিবাদ ভূমি' গল্পের সংলাপ পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পরিবেশ, চরিত্র অনুযায়ী কখনও কখনও সংলাপ বেমানান মনে হলেও, সংলাপের বলিষ্ঠতা, শাণিত ভঙ্গি পাঠকের ভাবনার জগতে কষাঘাত করে। এই ধরনের বাক্য বাংলা ছোটগল্পের বিস্তৃত পটভূমিতে কমই চোখে পড়ে। এর সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করতে গল্পের কথনরীতির ভিন্নতার কথাও। 'বংশলতিকা'- র ভাববাচ্যের রীতির থেকে 'বিবর্জিত উপকথা' কথন রীতির পার্থক্য শুধু চোখেই পড়ে না, যথাযথ মনে হয়। এছাড়াও উল্লেখ করতে হয় গল্পকার যেভাবে যাপনভূমির বিভিন্ন সমস্যা, রাজনৈতিক খেলা, রাষ্ট্রযন্ত্রের কলে মানবিকতার হত্যা প্রভৃতি বিষয়গুলি। এসব কারণেই দেবব্রত দেবের ছোটগল্প শুধু ত্রিপুরার সাহিত্যে নয় সমগ্র বাংলা সাহিত্য জগতে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, বিমল(সম্পা), দেশ ভাগের গল্প: ত্রিপুরা, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা ৮
২. চক্রবর্তী,বিমল(সম্পা), দেশ ভাগের গল্প: ত্রিপুরা, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা ৭
৩. দেব, দেবব্রত, পিতৃঋণ, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, জানুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা ৬৭
৪. পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা ৬৭
৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৮
৬. পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা ৭০
৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৯
৮. দেব, দেবব্রত, মাটি ও অন্যান্য গল্প, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা ৮০
৯. দেব, দেবব্রত, পিতৃঋণ, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, জানুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা ৭২
১০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৬
১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৩
১২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৮
১৩. দেব, দেবব্রত, অন্তস্থল, স্রোতপ্রকাশনা, ত্রিপুরা, মার্চ ২০০৮, পৃষ্ঠা ৫২

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1147-1152
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.115

সমরেশ বসুর ‘আদাব’ ও কণা বসু মিশ্রের ‘দু-বাংলার মাটি’-তে দেশভাগের অভিঘাত: তুলনাত্মক অধ্যয়ন

ইপ্সিতা দেব, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম , ভারত*

Received: 22.05.2025; Accepted: 28 .05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstarct

Partition is a huge history left for every Bengali. In the literary arena, different writers have presented pieces of that history in different ways. Through that presentation, the truth of the common people, the cries of those who lost their land, the autobiographies of the humiliated people, etc. have emerged. In the country where Rabindranath Tagore had free rein, the description of how his predecessors lived together in unity is scattered throughout most of the two stories. The partition, due to which people were uprooted from their roots, the people who spent day and night trying to explore themselves and their land, has become the subject of the stories of the two writers. Two widely discussed stories in the literary arena, one of which is 'Adab' written by Samaresh Basu and the other is 'Du-Banglar Mati' written by Kona Basu Mishra, have thoroughly analyzed these uprooted people, the characters in the stories written by the storytellers have emerged as spokespersons for some of the people who still break down in tears when reminiscing about the painful hearts of those who have lost their relatives. The main purpose of the discussion is to explore what the consequences of the partition have become for the current generation and at the same time; to find out from which source the two stories have merged into one estuary. Even after so many years of partition, does that pain still remain in the hearts of those who have lost their land? Is partition only a memory of today's old people, has the new generation come a long way by breaking such a web of illusion? Moreover, in both stories, we will try to find a unique dimension of friendship and our exploration is there.

Keywords: partition, Burning, Uprooting, Soul-searching, Cemembrance, Barbed wire, Politics, Religious differences, Loss of relatives, Friendship

রাজনীতি যখন মানুষের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করে তখন তাদের কাছে সমস্ত শাশ্বত এবং ভালো পংক্তি অর্থহীন হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ তখন তাদের কাছে হয়ে ওঠে তুরুপের তাস। যেসমস্ত কারণে আমরা দেশভাগের মতো একটি বিভৎস ঘটনার সাক্ষী হয়েছি তারও মূলে রয়েছে রাজনীতি এবং রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষ। যারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির হেতু অখন্ড ভারতবর্ষকে দ্বিখন্ডিত করেছে। যার ফল আজও ভোগ করে যাচ্ছে সাধারণ মানুষ। সেই সময় থেকে শুরু করে চলতি সময় পর্যন্তও মানুষকে নানা সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। কিছু রাজনৈতিক দলের আসল উদ্দেশ্য যখন রাষ্ট্র গঠন ছেড়ে দিয়ে আখের গোছানো হয়ে ওঠে তখনই বাণের জলের মতো ভেসে যেতে থাকে সাধারণ মানুষের আবেগ-অনুভূতি, মান-সম্মান, ঘর-বাড়ি, আপনজন-পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি।

আমরা যুগ-যুগ ধরে দেখে আসছি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা নিজেদের স্বার্থ পূরণের তাগিদে অতি সাধারণ জনগণের মনে ধর্মের নামে দ্বন্দ্ব ঢুকিয়ে দেয়। এবং তাদের মগজ ধোলাই করে দু-পক্ষকে একে-অপরের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত

করে। এর ফলে তৈরি হয় ধর্মকে কেন্দ্র করে দু-পক্ষের মধ্যে দলাদলি, দাঙ্গা ইত্যাদি এবং দু-পক্ষের এই অমানবিক আক্রমণের লাভ উঠিয়ে রাজনীতিবিদেরা তাদের স্বার্থ আদায় করে। নিজেদের ক্ষমতার লোভে বশীভূত হয়ে তারা উজাড় করে ফেলে বস্তির পর বস্তি গ্রামের পর গ্রাম। মানুষে মানুষে মেতে উঠে সংহার লীলায়। আর এসব ধর্ম নামক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকে প্রশ্রয় দেয় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এবং খবরের কাগজ। এধরনের ধার্মিক ভেদা-ভেদের ফলে দানা বাঁধে মানুষে - মানুষে অবিশ্বাস, সন্দেহ, ভয়।

একই ভাবে হিন্দু - মুসলমানের ধার্মিক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে সমরেশ বসুর রচিত 'আদাব' গল্পে আমরা শুনতে পাই এক রাতের একটি কাহিনি। যেখানে কাহিনির সূচনা হয় আত্মগোপনের মধ্যে দিয়ে। একজন মুসলমান মাঝি এবং একজন হিন্দু সুতা কলের কারিগর মিলিটারি টহলদারি থেকে আত্মগোপন করতে করতে হঠাৎই একে-অপরের মুখোমুখি এসে পড়ে নিজেদের অজান্তেই। আমরা গল্পে দেখি যে সন্দেহ, অবিশ্বাসের জেরে দুজনেই নিজেদের ধর্ম গোপন করে যায় এবং দুজনের মনেই বিপরীত পক্ষের মানুষটিকে নিয়ে আতঙ্ক দানা বাঁধতে থাকে। রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা সৃষ্ট এই ধর্মীয় ভেদাভেদের ফলস্বরূপ মানুষ হয়ে উঠেছে মানুষেরই শত্রু। একাধারে যেমন ১৪৪ ধারার সুযোগ পুলিশ দিগ-বিদিগ শূন্য হয়ে গুলি চালিয়ে সাধারণ মানুষ মারছে ঠিক তেমনি অন্য দিকে ধর্মের নামে কেতন উড়িয়ে মানুষ মারছে মানুষকে। এই 'আদাব' গল্পের কাহিনি দুজন ভিন্ন ধর্মী মানুষ এবং একটি সময় ও সমাজকে কেন্দ্র করে রচিত। এই সামাজিক এবং রাজনৈতিক কু-চক্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক দুটি ব্যক্তির মধ্যে যখন প্রথম চোখাচোখি ঘটান তার ব্যাখায় প্রবেশ করলে আমরা দেখি যে,

> "স্থির চারটে চোখের দৃষ্টি ভয়ে সন্দেহে উত্তেজনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। উভয়ে উভয়কে ভাবছে খুনী। চোখে চোখ রেখে উভয়েই একটা আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে থাকে, কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোন পক্ষ থেকেই আক্রমণ এল না। এবার দুজনের মনেই একটা প্রশ্ন জাগল - হিন্দু না মুসলমান?"[১]

এই দ্বান্দ্বিকতার গভীরে যদি প্রবেশ করা হয় তাহলে উঠে আসে ক্ষমতার শীর্ষে থাকা সেই রাজনৈতিক স্বার্থন্বেষী মানুষদের নাম। কিন্তু সাধারণ মানুষ সেই গভীরতায় পৌঁছতে পারে না বলেই নিজেদের মধ্যে লড়াই করে বিভাজন তৈরি করে, যার সুযোগ সন্ধান করে নেয় সেই রাজনৈতিক দলগুলো। যেখানে মানুষ থাকত একসময় জাত-পাত ভুলে শুধুই মানুষ হয়ে সেখানে আজ শুধুই ধর্মের নামে হানা-হানি, কাটা-কাটি, মারামারি চলছে প্রতিনিয়ত। এখানে আমরা গল্পে ও একই আচরণের ঝলক দেখতে পাচ্ছি যখন দুটি মানুষ একে-অপরের দিকে তাকিয়ে ভাবে যে সামনের ব্যক্তিটি কোন ধর্মের। অর্থাৎ তাদের কাছে নিজেদের জীবনের চাইতে ধর্ম বড়ো হয়ে উঠেছে। কারণ তাদের মজ্জায় মজ্জায় এই বিষয়টি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে বিধর্মী মানেই শত্রু। এভাবেই সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে অবিশ্বাস বানিয়ে ধর্মের গোড়ামিকে কাজে লাগিয়ে সব সময় ক্ষমতায় থাকা সেই ব্যক্তিগুলো নিজেদের মতলব আদায় করে নেয়।

'আদাব' গল্পের আয়তন ছোট, কাহিনি ও মাত্র একটি নির্জন রাতকে কেন্দ্র করে তবে এই কাহিনির গভীরতা এবং সমসাময়িক সময়ের বর্ণনায় গল্পটি এক অন্য মাত্রা খুঁজে পেয়েছে। গল্পে দেখা যায় মুসলমান মাঝির মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়া কথা শুনে সুতা মজুরের কি অবস্থা হয়। মাঝি যখন দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে বলে ওঠে,

> "- সোহান্ আল্লা! - নেও - নেও - ধরাও তাড়াতাড়ি । .... ভুত দেখার মত চমকে উঠল সুতা মুজর । টেপা ঠোঁটের ফাঁক থেকে পড়ে গেল বিড়িটা।"[২]

অজানা ব্যক্তি হিসেবে মাঝির ওপর যে সন্দেহ ছিল সুতা মজুরের তা আরো বেড়ে যায় যখন সে জানতে পারে মাঝি মুসলমান। সুতা মজুরের অবিশ্বাস্য চোখ মাঝির বগলে থাকা পুটলিতেই আটকে থাকে। তার ধারণা হয় যে মাঝি হয়তো পুটলিতে ছুরি লুকিয়ে রেখেছে। এই যে অবিশ্বাস, সন্দেহ, ভয় এইসব মানুষকে কুঁড়ে খায়। ধর্মের নামে ঘটে চলে এক মারাত্মক নরসংহার যার ভুক্তভোগী হয় সাধারণ মানুষ। সেই সাধারণ মানুষ যাদের ওপর ভর করে ওপরের বড় কর্তারা রাজনীতি চালায় এবং সেই রাজনীতিতে পিষ্ঠ করে এইসব অতি সাধারণ মানুষদের। তৎকালীন সময়কে কেন্দ্র করে রচিত এই গল্পে লেখক অত্যন্ত সাবলীল ভাবে মূল কথাকে তুলে ধরেছেন গল্পের দুই কেন্দ্র চরিত্রের উক্তিতে। আমরা দেখি কাহিনি যতই এগোয় ততই তারা দুজন ধর্মের ব্যবধান ভুলে নিজেদের ভেতরকার সন্দেহ

কাটিয়ে একলহমায় যেন অচেনা-অজানা মানুষ থেকে হয়ে ওঠে একে-অপরের পরমাত্মীয়। ঠিক সেই সময়ের ব্যবহার করে লেখক তাদের মুখে তুলে ধরেছেন কঠিন কিছু সত্য। দুজনের আলোচনার প্রতি আলোকপাত করলে দেখা যায় যে মাঝি একপ্রকার কটুক্তির স্বরে বলে ওঠে,

> "হেই সব আমি বুঝি না। আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কি। তোমাগো দু'গা লোক মরব, আমাগো দু'গা মরব। তাতে দ্যাশের কি উপকারটা হইব?"[৩]

এর প্রত্যুত্তরে সুতা কারিগর বলে ওঠে,

> "কই কি আর সাধে, ন্যাতারা হেই সাত তলার উপুর পায়ের উপুর পা দিয়া হুকুম জারী কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।"[৪]

অর্থাৎ সাধারণ মানুষ এই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ক্লান্ত তারা মৈত্রী চায়, শান্তি চায় কিন্তু তারা চাইলেই তাদের হাতে কিছু নেই তারা অন্যের হাতের পুতুল, ওপরওয়ালা রশি টানছে আর আমজনতাকে তালে তালে নাচতে হচ্ছে। এই ধরনের দাঙ্গার ফলে কত মানুষ যে স্বজন হারা হয়েছে তার হিসেব নেই। কোনো কোনো পরিবারে একমাত্র রোজগার করা ব্যক্তি পুলিশের গুলিতে কিংবা ধর্মীয় হানাহানির জেরে মারা গেছে এর ফলে তার সম্পূর্ণ পরিবার রাতারাতি ভেসে গেছে। এই যে এক কঠিন সত্য তা যেন সমরেশ বসু সমাজের নিম্নস্তরের ভিন্ন ধর্মের দুটি মানুষের মুখে বসিয়ে দিয়ে বোঝাতে চাইছেন যে আসলে সমাজটা কেমন হওয়া উচিত, কিন্তু বর্তমানে সমাজের যা অবস্থা তা অনাকাঙ্ক্ষিত এবং এ কথোপকথনের প্রক্রিয়া এতটাই সহজ-সরল সাদামাটা ভাবে লেখক তুলে ধরেছেন যে কোথাও যেন বারবারন্তের ছোঁয়া মনে হচ্ছে না। একেবারেই আপন মনের তাগিদে অন্তরের বিদ্বেষ থেকে দুটি মানুষ হক কথা তুলে ধরছে সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে।

'আদাব' গল্পে আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় যে একটা সময় দুজনের মধ্যেকার সন্দেহ মিটে গিয়ে এক নিখাদ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ফুটে উঠেছে কাহিনিতে। আমরা দেখি যে মাঝির স্ত্রী-সন্তানের কাছে ফেরার অনেক তাড়া কিন্তু সুতা মজুর তাকে ছাড়তে চায় না। একপ্রকার ভয় তার মনের মধ্যে যেন কাজ করে যে যদি মাঝি ভাইয়ের প্রাণটা বেঘরে যায়, আসলে সে বুঝতে পারে মিলিটারির এই গুলির তাণ্ডব এবং ধর্মের নামে চলমান এ হানাহানি কেড়ে নিতে পারে একটা সহজ সরল প্রাণ যার ওপর নির্ভর করে আছে তার গোটা পরিবার সে না ফিরলে হয়তো তাদের খাওয়া পড়া কোনোটাই সম্ভব নয় এবং তার অনুপস্থিতিতে ভেসে যেতে পারে তার স্ত্রী সন্তান সকলের জীবন সেই আতঙ্ক থেকে মাঝি ভাইকে আটকে রাখার এক অদম্য তাগিদ সুতা মজুরের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তার ভয়কে কাটিয়ে দিয়ে মাঝি যখন রওনা দেয় তখন মাঝির মুখের কথা যেন পাঠক হৃদয়কে আকুল করে তোলে। মাঝি বলে,

> "- পারবো না ধরতে, ডরাইওনা। এইখানে থাইকো, য্যান্ উইঠো না। যাই.... ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা । নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব । - আদাব ।
> - আমিও ভুলুম না ভাই - আদাব।"[৫]

মাঝির এই কথায় সুতা-মজুর যেন এক প্রকার স্থির পাথর হয়ে পড়ে কারণ সে জানে না তার পরবর্তীতে কি হতে চলেছে মাঝির জীবনের সাথে, মাঝি কি সত্যি বাড়ি ফিরে যেতে পারবে এক প্রশ্ন যেন তার মনের মধ্যে বারংবার আঘাত করতে থাকে? তার অন্তর যেন বারবার বলে ওঠে, "ভগবান - মাজি য্যান্ বিপদে না পড়ে।"[৬]

ধর্মীয় ভেদা-ভেদকে ভুলে গিয়ে মানুষে-মানুষে যে এক সম্প্রীতির বার্তা লেখক এখানে এই দুটি চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তা যথার্থ সার্থক। দুজনের আলাপের শুরুতে যে সন্দেহ, ভীতি কাজ করছিল তা পরবর্তীতে যেন মানবতাবাদের এক মোহনীয় রূপ নিয়েছে। ধর্মের মোড়ক সরিয়ে দিয়ে দুজনেই দুজনের মঙ্গল কামনায় নিজেদের আরাধ্যের শরণাগত হয়েছে। গল্পের একেবারে শেষে মাঝি যখন নিজের জীবনের শেষ আদাব ঘোষণা করে দিয়ে মিলিটারির গুলিতে অন্তিম শ্বাস নেয় তখন সুতা-মজুর সব ধর্মের গণ্ডি ডিঙিয়ে যেন এক মসৃণ বন্ধুত্বে মাঝির জন্য চোখের জল ফেলে আর ভাবতে থাকে মাঝির তার স্ত্রী সন্তানের কাছে ফিরে যাওয়া হলো না, না জানি তাদের কি হবে? মাঝির অনুপস্থিতিতে তার সংসারের হাল কে ধরবে? কি হবে তাদের পরিণতি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

এক রাতের মধ্যে তৈরি হওয়া এক নিখাদ বন্ধুত্ব রাত পোহানোর পূর্বেই বিচ্ছেদের রূপ নিল কিন্তু তা যেন এক আত্মিক যোগাযোগে ধর্মের সীমানা পেরিয়ে মানবতাবাদের অসীম আলোয় অবিচ্ছিন্ন থেকে গেল। তবে বিষয়ের গভীরতা

যাচাই করলে 'আদাব' গল্পটি যেমন পাঠক হৃদয়কে চোখে জল আসতে বাধ্য করে তার সাথে সাথে রাজনৈতিক শক্তির ভুল প্রয়োগের ফলে ছন্নছাড়া হয়ে যাওয়া একদল মানুষের মুখে রক্ত উঠে আসার কথাও বলে ।

রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা সৃষ্ট এই ধর্মীয় যুদ্ধে যেমন দুই বন্ধু জন্ম-জন্মান্তরের জন্য আলাদা হয়ে যায় ঠিক সেই জায়গা থেকেই সূত্রপাত হয় দেশভাগের ফলে দুই বন্ধুর পরিণতির কাহিনি নিয়ে ঔপন্যাসিক কণা বসু মিশ্রের উপন্যাস 'দু-বাংলার মাটি'। নয় নয় করে দেশভাগ কাটিয়ে এসেছে অনেকগুলো বছর, কিন্তু সেই বিভাজন রেখা যেন আজও কিছু সংখ্যক মানুষের আর্তনাদের কারণ হয়ে রয়েছে। তৎকালীন সময়ে দলীয় রাজনীতির ভেদাভেদের কারণে ভুক্তভোগী হয়েছে লক্ষাধিক মানুষ, যারা ছিন্নমূল হয়ে নিজেদের সবটা ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। আজও ঠাকুমা-দিদিমার আর্তনাদে ভেসে ওঠে অবিভক্ত বঙ্গদেশের ছবি। এই ধর্মীয় দাঙ্গায় কত লোক প্রাণ হারালো কত নারীর শ্রীলতা হানি হলো তার হিসাব কেউ রাখেনি। কাতারে কাতারে মানুষের মৃত্যু মিছিল ঘটিয়ে দিয়ে দেশটা দ্বিখন্ডিত হলো কিন্তু যারা এই ভূখণ্ডের বিভাজনকে মেনে নিতে পারল না তাদের মধ্যে কারো কারো দেহ এ বাংলায় তো মন পড়ে রয়েছে ওপার বাংলায়, আবার কারো কারো দেহ ও বাংলায় তো মন পড়ে রইল এ বাংলায়। এই দ্বান্দ্বিকতার পটভূমিতেই রচিত 'দু-বাংলার মাটি' উপন্যাসটি।

উল্লিখিত উপন্যাসের সূচনা হয় সবিতাব্রত নামের এক বৃদ্ধ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। যার স্মৃতিচারণে শুধুই ভেসে আসে অবিভক্ত বঙ্গদেশের ছবি। এই সবিতাব্রত বর্তমানে কোলকাতার পার্ক সার্কাসের দিলখুসা স্ট্রিটের বাসিন্দা। ভরপুর সংসার নিয়ে তার জীবন, তবু যেন এক পিছুটান তাকে হামেশাই টানে। তার ফেলে আসা স্মৃতি বাংলার নদী-পুকুর, গাছ-পালা, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি তাকে শুধুই টানে পেছন দিকে। কিন্তু পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে হামেশাই কোণঠাসা করা হয় এইসব বিষয়ে। পরিবারের মতে এ শুধুই তার বার্ধক্যজনিত ভীমরতি। ঔপন্যাসিক তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন যে কিভাবে সবিতাব্রত তার স্বপ্নে অ্যালবামের মতো স্মৃতিগুলো হাতরে বেড়াচ্ছে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় সবিতাব্রতের স্মৃতির পাতার উল্লেখে আমরা দেখি যে,

> "এখন মধ্যরাত। সবিতাব্রত স্বপ্ন দেখছেন। বিলের মধ্যে নৌকা যাচ্ছে। এই নৌকার গলুইত বসে ভাদু। বৈঠা বাইছে। আর আলি বসে আছে আরেকটি গলুইতে। আলির হাতে লগি। সবিতাব্রত বসে আছেন নৌকার পাঠাতন এর ওপর। ওদের দুজনেই জারি গান গাইছে। আলি লগি দিয়ে ঠেলছে জলের তলার মাটি। ওই মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধটা সবিতাব্রতর নাকে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। আহ! কি আরাম। কি আরাম। কি আনন্দ বিলের ধার ঘেঁসে চোল কলমির ঝাড়।"[৭]

স্বদেশের প্রতি এই যে এক অমোঘ টান তা প্রতিটি ছিন্নমূল মানুষের বুকের আর্তনাদ হয়ে ফুটে উঠেছে সবিতাব্রতের মুখে। ভিটে হারা স্বজনহারা সেই মানুষগুলো আজো ডুকরে কাঁদে কাঁটাতার ডিঙিয়ে একটিবার সেই জন্মমাটিতে পা রাখার জন্য। এই ভূমিহারা মানুষদের মুখপাত্র হয়ে উঠে এসেছে উপন্যাসের সবিতাব্রত চরিত্রটি।

আমাদের পূর্বসূরী অর্থাৎ ঠাকুমা-দিদিমাদের মুখে আমরা হামেশাই তাদের ফেলে আসা ভূমির গল্প শুনি যার মাঝে উঠে আসে তাদের ফেলে আসা গ্রাম, ফেলে আসা প্রকৃতির মাধুর্যপূর্ণ সৌন্দর্য, এবং তাদের ঘরবাড়ি ভিটেমাটি তাছাড়া উল্লেখযোগ্য রকমারি রান্নার আস্বাদ, বাকি সব কিছু দেশভাগের ফলে তারা হারিয়ে ফেললেও রান্নাটা যেন ঠাকুমা-দিদিমারা নিজেদের যাপনে এবং স্মৃতিতে ধরে রাখতে চান আর তাই বলে বিভিন্ন রকমের পুরনো রান্নার ঐতিহ্যের গন্ধ আজও ছড়িয়ে পড়ে মা-দিদিমার হেঁসেলে। কিন্তু তাদের ভগ্ন হৃদয়ের কান্না বর্তমান প্রজন্মের কাছে শুধুই রং-চং মাখানো কিছু গল্প মাত্রই হয়ে থেকে গেছে। কিন্তু সেই গোটা একটা প্রজন্মের মন পড়ে রয়েছে অবিভক্ত বঙ্গদেশের কোনো গাঙের পাড়ে অথবা ধানের ক্ষেতে কিংবা প্রকৃতির আরো বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায়। একলহমায় স্বদেশ যখন বিদেশে পরিণত হয় তখন বোধহয় এমনটাই অনুভূতি হওয়া স্বাভাবিক। ঠিক একইভাবে সবিতাব্রতের মনেও এই ধরনের উন্মাদনার প্রকাশ উপন্যাসে দেখা গেছে। যে উন্মাদনাকে পরিবারবর্গ বানানো গল্প মনে করায় সবিতাব্রত তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে,

> "- গপ্প নয় গো গপ্প নয়। আমার ঠাকুরদাদা সত্যিই যে বড় জমিদার ছিলেন। বিশাল দালান। তার হাতে লাঠি। পাকানো ইয়া গোঁফ।"[৮]

এই স্মৃতিকাতরতায় ডুবে থাকতে থাকতে সবিতাব্রত যেন নিজের বয়সের মাত্রা ভুলে সরাসরি পৌঁছে যেতেন নিজের বাল্যকালে, যেখানে নেই কোনো কাঁটাতারের বেড়া, নেই কোনো রাজনৈতিক শক্তির আক্রমণ।

'আদাব' গল্পের মতো 'দু-বাংলার মাটি' উপন্যাসেও রয়েছে দুটি পুরুষ চরিত্র যার একজন হিন্দু আর অপরজন মুসলমান। এই গল্পে দুই বন্ধুর সম্পর্ক বাল্যকাল থেকে। দেশভাগের ফলে যাদের বসতস্থল আলাদা-আলাদা হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে যে আত্মিক টান রয়েছে তার ফলে এই দুই বন্ধু কাঁটাতার পেয়েও নিয়ম মেনে সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ করে। কারণ তাদের কাছে ধর্মের ঊর্ধ্বে গিয়ে বাল্যকালে কাটিয়ে আসা সেই দিনগুলো বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। সবিতাব্রতের সেই মুসলমান বন্ধু আবুতালেবে জন্মসূত্রে এপার বাংলার অর্থাৎ অবিভক্ত বঙ্গদেশের লোক কিন্তু ছোটবেলায় ওপার বাংলায় মামাবাড়িতে বেড়ে ওঠার ফলে সবিতাব্রতের সঙ্গে একই গ্রামের স্কুলে পরতেন। এই যে একসাথে বেড়ে ওঠা দুটো বন্ধুর সবকিছু একলহমায় দ্বিখন্ডিত হয়ে যায় শুধুমাত্র দেশভাগের ফলশ্রুতিতে। একসাথে কাটিয়ে আসা তাদের সেই স্বপ্নীল মুহূর্তগুলো আজ শুধুই কিছু কিছু খন্ডচিত্র মাত্র, যা হাতরে বেড়াচ্ছে সবিতাব্রত এবং আবুতালেব। তবে উপন্যাসে আমরা দেখেছি এই দুই বন্ধুর মধ্যে যোগাযোগ এখনো অব্যাহত রয়েছে, এছাড়াও আমরা দেখেছি যে যখনই এই দুই বন্ধু একসাথে বসেছে তখনই তারা দু-বাংলার পুরোনো স্মৃতি ঝালিয়ে নিয়েছে বরাবরই। দেশভাগের ফলে যে সাধারণ মানুষের কি দুর্দশা হয়েছে তার চিত্র ফুটে উঠেছে এই দুটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। তবে দেশভাগ যেন এই দুই বন্ধুর মনকে আলাদা করে দিতে পারেনি সবিতাব্রতের ঘরে যখন আবুতালেব আসে তখন আমরা দেখি যে বন্ধুর কাছ থেকে সবিতাব্রত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্তমান বাংলাদেশের গ্রাম-শহর, নদী- পুকুর, মানুষজন সবার খবর নিচ্ছেন, তিনি বন্ধুকে প্রশ্ন করছেন,

> "হরতকী বৈরাগীর খবর কি? সেই যে একতারা বাজিয়ে গান গাইত, লালন ফকিরের গান? আবুতালেব বললেন, সে তো মইরা গেছে। তবে তার লগে থাকত রূপসী এক বিবি। হেই অহনও বাইচা রইছে। অহন তার হাতে উঠছে একতারা।"[৯]

এই যে একজন ছিন্নমূল মানুষের নিজের ভিটেমাটির প্রতি কিংবা নিজের গ্রামের মানুষজনদের প্রতি এক অমোঘ টান তা যেন কোনোভাবেই প্রত্যাহার করতে পারছে না সবিতাব্রত কিংবা আবুতালেব। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের শেষ মুহূর্তে এসে যেন সেই অবিভাজ্য বঙ্গদেশের মাটিতে প্রাণ আটকে থাকা প্রতিটি মানুষের চোখে জল এনে দিয়েছেন আবুতালেবের শব্দহীন আকুতির মধ্যে দিয়ে। আমরা দেখেছি আবুতালেব বারংবার এপার বাংলায় ছুটে আসে তার আপনজনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে। এবার আবুতালেবের সাথে বন্ধু সবিতাব্রতও যায় তার বন্ধুর আপনজনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু এই সাক্ষাত যেন সবিতাব্রতকে ভেতর থেকে কাঁদিয়ে ছেড়েছে। ভীষণই বেদনাদায়ক সে দৃশ্য যেখানে আবুতালেব এক কবরস্থলে পৌঁছেছে তার আত্মীয় পরিজনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে তাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করতে, তাদের স্মৃতি রোমন্থন করতে। যে দৃশ্য অনুভবের মধ্যে দিয়ে বন্ধু সবিতাব্রত ভীষণভাবে আবেগিক হয়ে পড়ে।

এই যে দুই বন্ধুর এক আত্মিক টান নিয়ে ঔপন্যাসিক 'দু-বাংলার মাটি' উপন্যাসের রচনা করেছেন তাতে ফুটে উঠেছে দেশভাগের ফলশ্রুতির কিছু অংশ যা সত্যিই এক বেদনার্ত কাহিনি। 'আদাব' গল্পেও একই ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভী কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থে ধর্মের দামামা বাজিয়ে তান্ডব চালিয়েছে মানুষে-মানুষে যার ফলে এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের মানুষকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। সেই জায়গা থেকে যখন সন্দেহ কাটিয়ে দুটি ভিন্ন ধর্মের মানুষ বন্ধু হয়ে ওঠে তখন সরকারি মিলিটারির গুলিতে প্রাণ খোয়ায় মুসলমান মাঝি এবং এখানেই বিচ্ছেদ ঘোষণা হয় দুই বন্ধুর, যারা চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর অন্যদিকে কণা বসু মিশ্রের উপন্যাসে একইভাবে ভিন্নধর্মী দুই বন্ধু দেশভাগের ফলশ্রুতিতে তাদের বসতবাটি আলাদা হয়ে গেলেও অন্তরের টানে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে মাঝে মাঝে আর তখন তারা শুধুই স্মৃতিতে ভাসে। তাই দুটি কাহিনির পাঠান্তে কোথাও গিয়ে যেন মনে হয় 'আদাব' গল্পের সমাপ্তি লগ্নেই সূচনা হয় কণা বসু মিশ্রের 'দু-বাংলার মাটি' উপন্যাসের।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, সমরেশ, 'মরশুমের একদিন', অন্যধারা প্রকাশনী, কলকাতা ৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৮, পৃষ্ঠা - ১৪৯
২. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫১
৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫২
৪. তদেব পৃষ্ঠা - ১৫২
৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫৪
৬. বসু মিশ্র, কণা, 'ছটি উপন্যাস', প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা - ১৬৬
৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৬৮
৮. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯৪
৯. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯৪

আকর গ্রন্থ:

১. বসু মিশ্র, কণা, 'ছটি উপন্যাস', প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৯
২. বসু, সমরেশ, 'মরশুমের একদিন', অন্যধারা প্রকাশনী, কলকাতা ৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৮

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1153-1158
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.116

সৌমিত্র বৈশ্যের গল্পভাঁড়ার: প্রেক্ষিত ব্যক্তি পরিসর থেকে সমাজ জীবন

সুস্মিতা ব্যানার্জী, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম, ভারত*

Received: 12.05.2025; Accepted:14 .05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

A prominent contemplative storyteller of Northeast India is Soumitra Vaishya. He has continuously enriched the literature of this region by writing stories-poems-essays. His unique style of story writing and word weaving style easily set him apart from others. The plot of the story is created from the interrelationship between individual and the society. Most of the characters in storyteller Soumitra Vaishya's stories have created a mysterious atmosphere in the oscillation of reality and imagination of the middle-class mind. Moreover, his story shows the continuous changing form of human life and mind in the socio-economic and political cycle of social life in view of the reality of the country. Moreover, the people living in this region have different real problems, natural and unnatural, one is the struggle of uprooting, two is the flood problem. Naturally, this crisis of ethnicity touches the story of this storyteller. In our article, we will try to reach a clear opinion about the content and narrative techniques of the storyteller Soumitra Vaishya through an analytical discussion of some selected stories.

Keywords: Social life, Individual, Middle-class mind, Socio-economic, Story style

উত্তর-পূর্ব ভারতের একজন বিশিষ্ট মনন প্রধান গল্পকার তথা 'প্রতিস্রোত' এবং 'খ' পত্রিকার একজন শক্তিশালী লেখক হলেন সৌমিত্র বৈশ্য। তিনি একাধারে গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ লিখে এ অঞ্চলের সাহিত্যকে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করছেন। তবে গল্প লেখার তার স্বতন্ত্র ধারা এবং শব্দের বুনন শৈলী তাকে সহজেই অন্যদের থেকে আলাদা করে নেয়। গল্পকার সৌমিত্র বৈশ্য ১৯৬২ সালে শিলচর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশুনা করেছেন বদরপুর এবং শিলচর শহরে। পেশায় কেন্দ্রীয় সরকারের ডাক বিভাগে তিনি কর্মরতা ছিলেন। লেখালেখি করেছেন দীর্ঘদিন থেকে তবে তিনি, নিতান্তই প্রচার বিমুখ লেখক। তাঁর প্রকাশিত দুটি গ্রন্থ হল পলাতক ও অন্যান্য গল্প। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে মানুষের প্রতিনিয়ত মুখোশ পাল্টানোয় সামাজিক সকল নৈতিকতার স্খলনের কথাই ঘুরেফিরে এসেছে তাঁর গল্পে। আমাদের আলোচ্য নিবন্ধে নির্বাচিত কিছু গল্পের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মাধ্যমে গল্পকার সৌমিত্র বৈশ্যের গল্পের বিষয়বোধ ও লেখার বয়ান কৌশল সম্পর্কে এক স্বচ্ছ অভিমতে পৌঁছানোর চেষ্টা করব।

দেশকালীন বাস্তবে মধ্যবিত্ত মনের বাস্তব এবং কল্পনার দ্বিধাদ্বন্দ্বময় ব্যক্তি চরিত্ররাই তার গল্পের মূল বিষয়। মধ্যবিত্ত বিশ্লেষণী মন বারবার জীবনের চুলচেরা বিশ্লেষণে জীবনকে বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে মেলাতে পারে না আর তখনই অদ্ভুত তন্ময়তার ঘোরে আচ্ছন্ন হয় তার গল্পের ঘনঘটা। এক অতি লৌকিক ও বাস্তবের মিশ্রিত আবহে তৈরি রত্নাকরের ভোটার গল্পটিও। সময়ের ঘূর্ণিমান আবর্তে মূল্যবোধের বিনষ্টি, রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারই এই গল্পের মূল আধেয়।

'রত্নাকরের ভোটার' গল্পে গল্প কথকের বয়ানে দেখতে পাই, সমস্ত দেশজুড়ে অদৃশ্য ছায়া মূর্তিগুলো পুতুল নাচায়। তারই কৌশলে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, নাটকের মহড়া, শনিপুজোর চাঁদা, ব্রাইট ক্যারিয়ার টিউটোরিয়াল, এয়াণ্ডিং লটারির টিকিট বিক্রি ইত্যাদি সব চলতে থাকে।

এভাবেই দেশজুড়ে অজস্র রত্নাকর। যারা ক্রমে স্বার্থসিদ্ধি করে নিচ্ছে, কারো দুই ছেলে চাকরি পেয়েছে অথচ পাশের বাড়ির গ্রেজুয়েট ছেলেটি সন্ধ্যায় ক্যারাম খেলে হতাশায় দিন কাটায়, কারো মিউজিক অ্যাকাডেমির জমি-বাড়ি হয়েছে কিন্তু সামনেই কারো ভাইপো ন্যাশনেল ট্রায়াল ক্যাম্পে ডাক পেয়েছে অথচ তরুণ ফুটবলারটির কিডনি অকেজো হয়ে অকালে হারিয়ে যায়। আজকাল শুধু চারিদিকে পুতুল আর পুতুল, কারো কোনো নিজস্ব কণ্ঠস্বর নেই। দস্যু রত্নাকরের মতো এই রত্নাকরের পাপের-দস্যুতার-লুণ্ঠনের দায়িত্ব মা-বাবা-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেউই নিতে চায় না। আর তখনিতো দস্যু রত্নাকর মুনি বাল্মীকিতে পরিণত হয়েছিল ঠিক সেভাবে জীবনের চারপাশের চরম ব্যর্থতা দেখে সেও তার শেষ জবানবন্দি দিতে চায়- সেই অদৃশ্য লোকের নাম যার ইশারায় আমরা নাচি 'ছায়া পুতুলের নাচ'। তাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে তার প্রশ্ন ইচ্ছে করলেই কী দিতে পারত না সবাইকে অনাবিল লাবণ্য, ঘষা কাঁচের মতো ক্ষয়ে ওঠা জীবনেও আনন্দের স্পন্দন কিংবা ঘুষ-দুর্নীতিহীন, বিক্ষোভহীন আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপ্ত ভোরের রোদের মতো একটা দেশ? এই ছোট্ট শহরটাকে পুনরায় বাসযোগ্য করে তুলতে, যাতে মানুষ হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো যায়।

> "যাতে কিনা প্রতিদিনের বেঁচে থাকার তাগিদে ছোটখাটো চাহিদাগুলো মেটাতে কারো কাছে নত হতে না হয়। মাথা নীচু করে প্রসারিত করতে না হয় ভিক্ষা সর্বস্ব হাত- এই সামান্য দাবীটুকুই কী পারত মেটাতে?" [১]

'পরবাস' গল্পটি মূলত লেখক সৌমিত্র বৈশ্যের চাকুরী জীবনে বিভিন্ন অঞ্চলে যাওয়ার সুবাদে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। লেখক নিজেই বাস্তব জীবনে ডাক বিভাগে চাকরি করতেন এবং তার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় গেছেন তাই গল্পে দেখি নতুন পাথরের প্রদেশে অর্থাৎ শহর থেকে অনেক দূরে সমতল ছেড়ে বনাঞ্চল ও পাহাড়ে ঘেরা অফিসে বদলি হয়ে চাকুরী করতে আসা শহুরে বাবু অলকেন্দুর এক নতুন অভিজ্ঞতা। সভ্যতার অন্তর্গত প্রযুক্তি বিদ্যায় পিছিয়ে পড়া মানব জীবনের অভ্যস্ততার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার এক অভিজ্ঞতা।

হেড অফিসে কাজ করা কর্মী প্রত্যন্ত এ অঞ্চলে এসে প্রতি মুহূর্ত অনুভব করে আলো অমলিন সাদা রঙের আলো, চারতলা দূরে কয়েক হাজার স্কয়ার ফুটের অফিসের আলো, টয়লেটের সাদা টাইলস, প্রচুর জল, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ইন্টারনেট ফটোকপি আর ইত্যাদি তার সঙ্গে দুপুরে ক্যান্টিনের সুস্বাদু আহার গল্প কিন্তু এখানে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নাগরিক আনন্দময় জীবন থেকে ছিটকে পড়েছে। কিন্তু অলকেন্দু এভাবেই দিন অতিক্রম করতে থাকে আর ভাবে এই তিন মাস কোন ভাবে অতিক্রম করতে পারলেই সে সেখান থেকে আবার হেড অফিসে চলে যেতে পারবে তাই সে প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা চালিয়ে যায়। দ্রুত এ জীবনের সঙ্গে মিশতে চায় যাতে অলকেন্দু। যত তাড়াতাড়ি মিশবে সেখান থেকে হেড অফিসে ফিরে যেতে পারবে সে। বহমান স্বাভাবিক জীবন স্রোতে যেখানে তার চাওয়ার আছে, পাওয়ার আছে, ভালো লাগা আছে, মিলন আছে, সর্বোপরি একটি সুন্দর জীবন আছে, সেই জীবনে কেউ অসহাগ্রস্ত নয়, লোভী নয়, আগ্রাসী নয় কিন্তু ফিরতে চাইলেও সে ফিরে যেতে পারে না কারণ তার ইচ্ছাতে কিছুই এখানে নিয়ন্ত্রিত নয়। কিন্তু এই অনিশ্চিত জীবন প্রবাহের মধ্যেও জীবনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে এখানে মাইলিংকে ধরে তার জীবনকে নতুনভাবে দেখতে চায়। কিন্তু তারপরও প্রতিমুহূর্তে অলকেন্দুকে টানতে থাকে তার কাঙ্খিত ফেলে আসা সেই হেড অফিস, সেই রঙিন ঝলমলে নগর পরিবেশ যা তাকে পাথরের প্রদেশের এই মনোরম শান্তি পরিপূর্ণ সুন্দরে ভরপুর জায়গাও দিতে পারে না। অলকেন্দু সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সেই অফিসের কর্মরত মেয়ে মাইলিংকে মনে মনে আশ্রয় করে কিন্তু সেই কল্পনা থেকে বাস্তবের মধ্যে গিয়ে যখন সে দাঁড়ায় তখন সেই মাইলিংকে আশ্রয় করে ওঠা তার সেই স্বপ্ন পাথুরে প্রদেশে এসে ধাক্কা লাগে। তাই গল্প লেখক নিজেই বলছেন যে দর্শন আর ইতিহাসের মধ্যে মানুষ এভাবেই পেন্ডুলামের মত দুলছে আবহমান কাল থেকে। এখানে পেন্ডুলামের ধাতবগুলোর বদলে আমরা ফাঁসির দড়িতে ঝুলা একটি মৃতদেহকে স্থাপন করতে পারি। উদাহরণ হিসেবে তিনি নিয়েছেন সাদ্দাম হোসেনকে। ব্যক্তি ও সমাজ, দেশ ও কালের ক্ষেত্রে ইতিহাস ও দর্শন বড় ক্ষমাহীন ও নির্মম। মানুষ তবুও বাস্তবতার মতো নির্মমতাকে অতিক্রম করে যেতে চায়, এক পরম আশ্রয় নেয় সেটা তার কল্পনাও বিশ্বাসের উপর।

অলকেন্দু ভাবে এভাবেও বাঁচা যায় শুধু একটি প্রতীক্ষায়, খুব শীঘ্রই সেখানে থেকে আলোকউজ্জ্বল হেড অফিসে অর্থাৎ তার কাঙ্খিত পরিবেশে চলে যাবে। কিন্তু এরপরেই সদর দপ্তর থেকে একটা চিঠি আসে, কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে তাকে এখনই ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে না। তখনই দেখে বিকেলের রোদ সোনালি হয়ে এসেছে, সবাই চলে গেছে অফিস ছেড়ে, সে দেখতে পায় মাইলিংকে অনেক দূরে যেন একটা বিন্দু। সে ছুটতে থাকে তার পেছনে। এভাবে মরীচিকাকে ধরে বেঁচে থাকা যায় না সেটা অলকেন্দু বুঝতে পারেন না তার জন্যই মরীচিকার পেছনে ছুটতে থাকে এবং ভাবতে থাকে হয়তো সেই মাইলিংকে আশ্রয় করে ট্রান্সফার হয়ে তার কাঙ্খিত জায়গায় একদিন পৌঁছে যাবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সেটা হলো না।

'প্রতীক্ষালয়' গল্পে দেখি আলোকময় ও নিশীথরঞ্জন দুজনই আসন্ন মৃত্যুর মন্থর আগমনের প্রতীক্ষার মধ্যে ফিরে পেয়েছেন নতুন জীবন। যখন দুজনই বেঁচে থাকার সীমাকে উপলব্ধি করছিলেন, সীমার মাঝে অসীমকে অনুভব করতে পারছিলেন না, ভাবছিলেন

> "অসীমতা একটি ধারণামাত্র, সীমাই বাস্তব। যেমন ঘড়ি। বারোটি দাগের সাহায্যে অসীম সময়কে আমরা বাস্তবগ্রাহ্য করে তুলি। রাতের আকাশের তারা দেখে তার মনে হয়, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত, প্রবাহমান সময়ের স্রোতে সে নিতান্তই একটি বালুকণা। কিন্তু তার চেতনার রঙেই তো সময়ের বয়ে যাওয়া। না হলে তো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই নিরর্থক বাতুলতা।"[২]

তখন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মতো সহযাত্রী কাছে পান নি। কিন্তু যখন আলোকময় মিলিটারি দ্বারা উগ্রপন্থীর হাত থেকে মুক্তি পান জীবনের বন্ধ কারাগার থেকে, ঠিক তখনি সাংবাদিকের ফ্ল্যাশগান জ্বলে উঠে চারিদিকে প্রচার আর প্রচার। তাছাড়া সন্ধ্যার নাট্য প্রযোজনা 'প্রতীক্ষালয়' চলাকালীন যখন ছাদ ভেঙে ধসে পড়ে তখনও

> "এক ভিডিয়োওয়ালার কেমেরায় পূর্বাপর ছাদ ধ্বসে পড়ার ছবিটা তোলা ছিল। পরদিন ধ্বংসস্তূপের নীচে পাওয়া যায় ভিডিও ক্যামারাটা। সবকটা নিউজ চ্যানেল সারাদিনই দেখিয়ে গেল সেই ছবি। এই শহরের লোকজন সারাদিনই টেলিভিশনের সামনে প্রতীক্ষা করেছে, কখন দেখাবে সেই মর্মান্তিক ঘটনার ছবি।"[৩]

দেশব্যাপী প্রচার সর্বস্বতার বাজারে আজকাল সবকিছুই পণ্য। প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন চটকদার খবর পরিবেশন চাই তারই প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষা নেই জীবনের সত্যের – বাস্তবের সত্যের, এহেন মানসিক দীনতারই প্রকাশ পায় গল্প অবয়ব জুড়ে।

> "পৃথিবী তার অক্ষরেখার চারিদিকে ঘুরছে না। তাই সময় থমকে গেছে। মাথার ভিতরে কোনো বোধ নেই, অনুভূতি নেই, স্তব্ধ, অসাড় হয়ে আছে অনুভূতিমালা।"[৪]

স্খলিত সময়ের ধ্বংসাত্মক রূপকেই যেন চিহ্নিত করে গল্পকথক। একই ধারার গল্প 'বন্যা ও কয়েকরকমের উদ্বাস্তু' গল্পটি। 'বন্যা ও কয়েকরকমের উদ্বাস্তু' গল্পটি বরাক উপত্যকার ১৯৮৫র বন্যার বাস্তব প্রেক্ষাপটে লেখা। এখানে বন্যায় ত্রাণের সংবাদ শুধুমাত্র খবর হয়েই থেকে যায়। বস্তির লোক, শহতলির - ঝুপরির লোক যারা বন্যায় ক্যাম্পে উদ্বাস্তুর ন্যায় দিন অতিবাহিত করে তারাই রিলিফ পায় না। অপরদিকে মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী ফ্ল্যাটে ভরে ভরে আনে রিলিফের চাল। 'পলাতক' গল্পে দারিদ্র্য গল্পকথক নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যখন সে নতুন জীবনে প্রবেশ করে তখন সে জীবনে শুধু একাকিত্ব অনুভব করে কারণ তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল বই। বইয়ের অক্ষরকে, অক্ষরের ছবিকে, ছবির কথাকে, কথার জগতকে সত্য বলে মানত। কিন্তু প্রতিদিনের যাপনের সাথে এ জগতের একেবারেই মিল পায় না। সে বুঝতে পারে, মানুষেরই জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় কতগুলি সুনির্দিষ্ট যুক্তি পরম্পরায়। অর্থনীতির বহু সিদ্ধান্তই দাঁড়িয়ে আছে মানুষের এই সব যুক্তি পরম্পরার ওপর। যেমন মানুষের মধ্যে আছে সঞ্চয়ের প্রবণতা। এর ফলে মানুষের সঞ্চিত অর্থ অন্যের কাছে সুদে খাটালে গড়ে ওঠে কিছু প্রতিষ্ঠান। মানুষের আচরণের এই সব যুক্তি পরম্পরাকেই আমরা বলি সভ্যতা, বলি জীবনধারা। বড় মানুষ, ছোট মানুষ, ভালো মানুষ, নীচ মানুষ— এসবই বুঝি আমরা যুক্তি পরম্পরার সূত্র ধরে। প্রচলিত এই যুক্তি পরম্পরাকে যদি ভেঙে ফেলে নতুন এক যুক্তি পরম্পরা প্রতিস্থাপিত করা যায়, তখন কিন্তু ভিন্নতর, নতুন এক জগৎ, নতুন সভ্যতা গড়ে তোলা যায়। এভাবে গাণিতিক রাশির ধণাত্মক এবং ঋণাত্মকের মত নিজেরই একটি বিকল্প সত্তা কল্পনা করে; তার নাম দেওয়া যায় হ্যাঁ- আমি, না আমি।

নিজের ভেতর এই দুই আমি'র অবিরত সংলাপ চলে। এইভাবে কল্পনায় ভেসে ওঠে দুইটি সমান্তরাল জগৎ। দু'টিই অস্তিত্বময়, ৰাস্তব। মানুষ তো শুধু বাস্তবেই বাঁচে না, খানিকটা কল্পনায়ও বাঁচে এই দুই আমির মনস্তত্ত্বগত দ্বন্দ্ব অহর্নিশি তাকে কুরে কুরে খায়। সে 'অমলে'র সেই অন্তহীন শৈশবকে, বিশাল পৃথিবীর সেই সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে চায় কিন্তু বাস্তব পরিবেশ তাকে প্রতিনিয়ত ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত করে। এভাবেই তার গল্পে আধুনিক সময়ের সংকটে পড়া বিপন্ন মুখচ্ছবিগুলোই ভেসে উঠে। এই গল্পে অস্তিত্ববাদী নির্মিতির লক্ষণ প্রকট।

এবারে গল্পকার সৌমিত্র বৈশ্যের গল্পের লেখন শৈলীর দিকে যদি একটু তাকাই, তাহলে যে বিষয়গুলি বিশেষ করে চোখে পড়ে তা হল-

১) তার প্রায় প্রতিটি গল্পে গল্পকার যেন স্বয়ং অন্য কোন বিষয় ব্যক্তি বা নিজের জীবনের বা ভাবনার কথা গল্প বলার মতো করে উত্তম পুরুষে প্রায় প্রতিটি গল্পের শুরু করেছেন। যেমন- প্রলাপের দিনলিপি, পরবাস, বাদুড়- মানব গল্পগুলি ইত্যাদি।

প্রতীক্ষালয় গল্পটির শুরু হয়েছিল ঠিক এভাবে-

মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে যে ফিরে এসেছে, সে একটা পিঁপড়ে মারার জন্য এতোটা নৃশংস হয়ে উঠতে পারে, তা আমি ভাবতেই পারছি না।

মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগেই, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে সে ফিরে এসেছে। দোতলার বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। খবরের কাগজ দুটিতেও মৃত্যুরই রঙিন সচিত্র খবর। হাওড়া থেকে দিল্লী যাওয়ার পথে নদীতে রাজধানী এক্সপ্রেস। আজ ৯/১১, মানে আমেরিকায় ধ্বংসলীলাময় দিনটির এক বছর হল।

২) সংবাদ ধর্মী লেখার ন্যায় ছোট ছোট বাক্যে ইনফরমেশন (তথ্য) দেওয়ার ন্যায় অর্থাৎ বিবরণধর্মিতা লক্ষ্য করা গেছে তার বেশিরভাগ গল্প গুলোর মধ্যে। যেমন -প্রলাপের দিনলিপি, পলাতক গল্প।

প্রলাপের দিনলিপি গল্পটিতে দেখি, সংবাদ পত্রের লেখার ন্যায় তারিখ লিখে গল্পে বক্তব্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

যেমন- -

১ জানুয়ারি

আজ নতুন বছরের প্রথম দিন। গতকাল রাতে রীতেশের ওখানে খুব হল্লা হয়েছে। প্রচুর মাল খাইয়েছে। প্রথমে প্রেস, তারপর পত্রিকা- রীতেশ এখন করে খাচ্ছে। বাজারে ওর সম্পর্কে নানা কথা শোনা যায়।

১৩ ফেব্রুয়ারি

এতো দিন কিছুই লিখতে পারিনি। গোপালদার ক্যান্সার ধরা পড়েছে। সেটা ছিল ১৫ জানুয়ারি। গোপালদার ছেলে এসে খবর দিল, গোপালদা বলেছেন একবার টেলিফোনে কথা বলার জন্য। তখনও জানিনা গোপালদার কী হয়েছে। রাত্রে ফোন করলাম ভেলোর স্যাফায়ার লজ এ।

১ মার্চ

আমাকে খুঁজে খুঁজে 'দৈনিক সমকাল'-এর দপ্তরে এলো বস্তার। পনের হাজার টাকা পাওয়া গেছে প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে। আরও দশ আসছে মুখ্যমন্ত্রীর তহবিল থেকে। তবে একটা শর্ত আছে। টাকাটা আনুষ্ঠানিক ভাবে দেওয়া হবে গোপালদার হাতে।

মাত্র চবিবশ ঘণ্টা আগে, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে যে ফিরে এসেছে, সে একটা এপড়ে মারার জন্য এতোটা নৃশংস হয়ে উঠতে পারে, তা আমি ভাবতেই পারছি না।

৩) রাবীন্দ্রিক দর্শনে বাস্তবকে মেলানোর অসীম আগ্রহে গল্পগুলো যেন এক ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে তাই রাবীন্দ্রিক গান, কবিতা ও কথার উল্লেখ বহু লেখায় বিদ্যমান। যেমন- বাদুড়-মানব, প্রলাপের দিনলিপি, প্রতীক্ষালয় গল্প।

যেমন-

i) ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো / পাগল হাওয়া বুঝতে নারে ডাক পড়েছে কোথায় তারে / ফুলের বনে যার পাশে যায় / তারেই লাগে ভালো। (বাদুড়-মানব; পৃঃ ২৭)

ii) 'তোমায় যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে / প্রেম কুসুমের মধুসৌরভে, নাথ, তোমারে ভুলাব হে / তোমার প্রেমে, সখা, সাজিব সুন্দর / হৃদয়হারী, তোমারি পথ রহিব চেয়ে / আপনি আসিবে, কেমনে ছাড়িবে আর / মধুর হাসি বিকাশি রবে হৃদয়াকাশে।' (বাদুড়-মানব; পৃঃ ২৬)

iii) সত্য যে কঠিন। কঠিনেরে ভালোবাসিলাম। সে কখনোই করে না বঞ্চনা। (প্রলাপের দিনলিপি; পৃঃ ৪৯)

iv) 'আজ যদি দীপ জ্বালে দ্বারে
নিবে কি যাবে না বারে বারে?
আজ যদি বাজে বাঁশি গান কি যাবে না ভাসি
আশ্বিনের অসীম আঁধারে
ঝড়ের ঝাপটে বারে বারে?' (প্রতীক্ষালয়; পৃঃ ৩৫)

৪) জীবনানন্দীয় চেতনায় আচ্ছন্ন গল্পকারের প্রায় লেখায় মানব জীবনের নানাপ্রসঙ্গে প্রকৃতি ও মানবের মেলবন্ধন অর্থাৎ নিসর্গ পল্লীপ্রকৃতির জীবন যেভাবে বিভূতিভূষণের রচনাকে এক অন্যমাত্রা দিয়েছে ঠিক একইভাবে প্রকৃতির অমলিন সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মানব জীবনের খুঁটিনাটি নানা দিকের প্রকাশ দেখা যায় সৌমিত্র বৈশ্যের লেখায়। যেমন- পরবাস, প্রতীক্ষালয় গল্প।

৫) গল্পে রয়েছে কালীদাসের প্রভাবাচ্ছন্ন রবীন্দ্রনাথের বলয়কে অতিক্রম করে তার লেখায় এক অন্যধারার উপমার ব্যবহার। সৌমিত্র বৈশ্যের গল্পে যা এক অন্যমাত্রার রহস্য তৈরি করে দেয়; যা ভেদ করে গল্পের মূল বয়ানে যেতে অনেকটা দূর্বোধ্যতা অতিক্রম করতে হয় সাধারণ পাঠককে। এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে করতে হয় জীবনানন্দের সেই বিখ্যাত লাইন 'সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি।' এই কথাকে একটু পালটে যদি বলা যায়, 'সকলেই পাঠক নন, কেউ কেউ পাঠক।' অর্থাৎ সেই বিশেষ পাঠকের প্রয়োজন গল্পের মূল বক্তব্যে পৌঁছোতে। যেমন- বাদুর-মানব, প্রতীক্ষালয়, পরবাস গল্প।

উপমার ব্যবহার

i) অশরীরি ভুতের মত আরো ভূতের মাঝে সে ঘুরে বেড়ায় তখন নোংরা পোশাক থেকে কাঁচা পেঁয়াজের ঝাঁঝের মত অন্ধকার ইঙ্গিত তার মস্তিষ্কের কোষে দপ করে উঠলো অচেতন ঘুমের অতলে ডুবে শুয়ে আছে অপর্ণা। (বাদুড় মানব; পৃঃ ১৩)

ii) ডিমের কুসুমের মত সকালের আলোয় ডুবা পাহাড় টিলা চোখে পড়ে। (পরবাস; পৃঃ ৩৩)

iii) এখানে বর্ষা মন্থর। গাভীন গাইয়ের মত। (পরবাস; পৃঃ ৩৫)

iv) এতদিন ধরে নিজেকে প্রস্তুতি করে নিয়েছে, আসন্ন মৃত্যুর মন্থর আগমনের প্রতীক্ষায়। (প্রতীক্ষালয়; পৃঃ ৪০)

আসলে গল্পকার সৌমিত্র বৈশ্যের গল্পে বেশিরভাগ চরিত্রেরাই মধ্যবিত্ত মননের বাস্তব ও কল্পনার দোলাচলতায় এক রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। তাছাড়াও তার গল্পে দেখা যায় দেশকালীন বাস্তবের প্রেক্ষিতে সমাজ জীবনের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে মানব জীবন ও মননের ক্রমাগত পরিবর্তনীয় রূপ। এ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের প্রাকৃতিক এবং অপ্রাকৃতিক এক ভিন্ন বাস্তব সমস্যা রয়েছে, এক হল ছিন্নমূলের লড়াই, দুই বন্যা সমস্যা। স্বাভাবিক কারণে জাতিসত্তার এই সংকট এই গল্পকারের গল্পকেও ছুঁয়ে গেছে। গল্পকার সৌমিত্র বৈশ্যের মধ্যবিত্ত ব্যক্তি পরিসর থেকে সমষ্টিগত সমাজ জীবনের যাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার আবর্তে বিবরণধর্মী গল্পের একৌশলে কখনও রাবীন্দ্রিক, কখনও জীবনানন্দীয় ভাবনার প্রতিফলন এক নতুন মাত্রার সঞ্চার করেছে।

তথ্যসূত্র:

১) বৈশ্য, সৌমিত্র, 'রত্নাকরের ভোটার', "প্রতিস্রোত", সম্পাদক- সুজিৎ দাস, চতুর্দশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, প্রতিস্রোত, মালুগ্রাম, শিলচর-৭৮৮০০২, আসাম, ১৯৯৭, পৃঃ ১৬

২) বৈশ্য, সৌমিত্র, 'প্রতীক্ষালয়', "প্রতিস্রোত", সম্পাদক- পরম ভট্টাচার্য, সুজিৎ দাস, প্রদীপ কুমার পাল, কমল চক্রবর্তী, বিংশতি বর্ষ, ১ম সংখ্যা, প্রতিস্রোত, মালুগ্রাম, শিলচর-৭৮৮০০২, আসাম, ২০০৩, পৃঃ ৩৮

৩) তদেব পৃঃ ৪২

৪) তদেব পৃঃ ৩৯

আকর গ্রন্থ:

১) মৈত্র, পার্থপ্রতিম, ১৯৮৭, “প্রতিস্রোত”, ২য় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, প্রতিস্রোত মালুগ্রাম, শিলচর-২

২) ভট্টাচার্য, পরম, দাস, সুজিত, পাল, প্রদীপ কুমার, চক্রবর্তী, কমল, ২০০৩, “প্রতিস্রোত”, বিংশতি বর্ষ, ১ম সংখ্যা, প্রতিস্রোত, ‘সৌরভবন’, অম্বিকাপট্টি, শিলচর-৪, আসাম

সহায়ক গ্রন্থ:

১. দাস, ড. নির্মল, উত্তরপূর্বের বাংলা ছোটগল্প বীক্ষণ: এক (পর্ব: ত্রিপুরা), অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, ত্রিপুরা -৭৯৯০০১, জানুয়ারি ২০১২

২. ভট্টাচার্য, তপোধীর, পড়ুয়ার ছোটগল্প, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা -০৯, ২০০৫

৩. সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময়, অসমের বাংলা লিটিল ম্যাগাজিন: ছোটগল্প চর্চার প্রেক্ষাপট ও ক্রমবিকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা -০৯

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1159-1165
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.117

পাঁচের দশকে বাংলা ছোটগল্পে নতুন ধারার আভাস

ড. সুমিতা চক্রবর্তী, *অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
জিতব্রতা গুহ, *গবেষক, সিকম স্কিল ইউনিভার্সিটি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 28.05.2025; Accepted: 30.05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The primary characteristic of fiction is to reflect social reality and to portray the relationship between individuals and society. The decade of the fifties—i.e., the period from 1950 to 1959—was marked by extreme complexity and turbulence in Bengal's social, political, and economic spheres. In post-independence Bengali short stories, the central theme became the precariousness of middle-class life. The subject matter of those stories and the perspectives of their authors were entirely grounded in realism. However, literary trends and the thoughts of writers do not always proceed in a uniform manner. From the mid-fifties onward, some of these writers began attempting to reflect reality in literature from a different point of view. These stories arose out of social reality, but they seemed to form a circle of light and shadow around the most subtle layers—social, political, and psychological. Until then, realism in short stories was present in the atmosphere, subject matter, and crises of the narrative—this realism was a blend of beauty and ugliness, the terrifying and the tender. But from the 1950s onward, some writers began to view reality through the lens of reflection—this reality appeared as an unanswerable question. In the traditional vision of realism, there emerged unconventional projections and new techniques. A new trend thus emerged in the Bengali short stories of the 1950s. Until then, stories used to be centered on plot, with a definite conclusion; Bimal Kar introduced in place of this a more inward-facing sensibility. As a result, his stories did not follow a plot-centric approach, but neither were they entirely devoid of narrative—standing somewhere between the two, he experimented with new forms of storytelling. In 1959, he published a series of booklets under the title Short Story: A New Style. This was somewhat distinct from the conventional norms and methods of accepted short story writing. Even though some of Bimal Kar's stories adhered to traditional or conventional forms, in some of his works, this new perspective on realism can be discerned—for example, in the story Sudhamoy. This new trend of storytelling is discussed here with reference to the stories of four writers: Kamalkumar Majumdar, Dipendranath Bandyopadhyay, Debesh Roy and Sandipan Chattopadhyay.

Keywords: Short story, Realism conventional forms, social reality, Traditional literature, Short Story: A New Style, unanswerable question

সাহিত্য, বিশেষ করে কথাসাহিত্য সবসময়ই সমকালীন সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে। কথাসাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হল সমাজ-বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করা এবং সমাজের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক তাকে তুলে ধরা। পাঁচের দশক অর্থাৎ ১৯৫০ থেকে ১৯৫৯ এই সময় বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত জটিল ও আবর্ত-সংকুল। স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম দশকে বাংলা ছোটগল্পে প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল মধ্যবিত্তের জীবন যাপনের বিপন্নতা। সেই গল্পগুলির বিষয়বস্তু এবং লেখকের দৃষ্টিকোণ ছিল সম্পূর্ণ বাস্তব। কিন্তু সাহিত্যের ধারা, সাহিত্যিকদের চিন্তাভাবনা সব সময় একই ভাবে চলে না।

পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই লেখকদের মধ্যে কয়েকজন ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যে বাস্তবকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করলেন। এই গল্পগুলি সমাজ বাস্তবতা থেকে উঠে এসেছে, কিন্তু সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তর গুলিকে ঘিরে যেন রচনা করেছে আলো-অন্ধকারের এক বৃত্ত। এতদিন ছোটগল্পে বাস্তবতা ছিল গল্পের আবহে, বিষয়বস্তুতে, সমস্যা-সংকটে, সেই বাস্তবতা সুন্দর-অসুন্দর, ভীষণ-কোমলের মিশ্রণ। কিন্তু পঞ্চাশের দশক থেকে কোনো কোনো লেখক বাস্তবতাকে দেখলেন মননের দৃষ্টিতে-এই বাস্তবতা যেন এক উত্তরবিহীন জিজ্ঞাসা। চিরাচরিত বাস্তব দর্শনে দেখা দিল অচিরাচরিত অভিক্ষেপণ এবং নতুন প্রকরণ। পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে 'দেশ', 'পরিচয়', 'নতুন সাহিত্য', 'সাহিত্যপত্র' ইত্যাদি একাধিক পত্রিকায় নতুন ধারায় গল্প লেখা হল, যা পাঠকদের আকৃষ্ট করে তুলল। বাংলা গল্পে এল নতুন ধারা।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে যে নতুন ধারার ছোটগল্প দেখা দিতে লাগল, তার সামগ্রিক মতাদর্শের বিশ্লেষণ দেখা যায়, সেই সময়ের প্রতিষ্ঠিত লেখক বিমল করের সম্পাদিত 'ছোটগল্প: নতুনরীতি' গ্রন্থমালায়। তিনি নতুন নতুন বিষয়, রীতি, ভাব-ভঙ্গিমা নিয়ে যেমন অনুসন্ধান করতেন তেমনই উৎসাহিত করতেন তরুণ লেখকদের। তিনি চল্লিশের দশকে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারি, অনাহার অরাজকতা, রাজনীতির পালাবদল, সাম্প্রদায়িক শক্তির ভয়ংকর তাণ্ডব এবং এরই পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে সাহিত্যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসামান্য সাহিত্যকীর্তি। তাঁরা নিজস্ব ধরনের মধ্যেই বাস্তবের নির্মম কঠোরতাকে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু ছোটগল্পের রূপরীতির দিক থেকে তাঁদের লেখায় ছিল বাস্তব জীবনের স্বাভাবিক চিত্র। এখান থেকেই পৃথক হয়ে গেল নতুনরীতির গল্প-ধারার বৈশিষ্ট্য।

এতদিন গল্পে যে কাহিনি সর্বস্ব নির্দিষ্ট পরিণতি ছিল, বিমল কর তার পরিবর্তে নিয়ে এলেন এক অন্তর্মুখী বোধ। ফলে তাঁর গল্পে কাহিনি সর্বস্ব ব্যাপারটা যেমন এল না, তেমনই পুরোপুরি গল্পহীনতাও থাকল না-এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় দাঁড়িয়ে তিনি গল্পকে নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'ছোটগল্প: নতুনরীতি' নাম দিয়ে একটি পুস্তকমালা প্রকাশ করেন। যা ছিল তথাকথিত নিয়মসিদ্ধ ছোটগল্পের নীতি-পদ্ধতি থেকে কিছুটা পৃথক। নতুনরীতির গল্প প্রসঙ্গে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন:

> "ধারা-বদলের কিংবা নতুন একটা রীতি প্রবর্তনের তীব্র ইচ্ছাতেই যে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা নয়। বরং এর মধ্যে আত্ম আবিষ্কারের একটা প্রচেষ্টা ছিল।... তাঁরা পুরোনোরীতি, প্রকরণ, বিন্যাস এবং বিষয় ত্যাগ করতে চাইছিলেন - বহির্মুখীনতার চেয়ে তাঁদের কাছে স্বাদুতর ছিল নিজেদের অন্তর। তাই তাঁদের লেখায় স্ব-কৃত আত্ম প্রতিকৃতির প্রক্ষেপ ঘটেছিল বারংবার, পাওয়া যাচ্ছিল সমাজ এবং বাস্তবের খন্ডিত দৃশ্যাবলী। মানুষের ভিতরের অতি জটিল সূত্রে অন্তর এবং বাহির গ্রথিত হয় - স্বপ্নে এবং চিন্তায় তার অদ্ভূত প্রকাশ ঘটে।"[১]

বিমল কর এই নতুন রীতির প্রবক্তা হিসাবে সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর নিজের লেখা ছোটগল্প সম্পূর্ণভাবে এই রীতির অনুসারী নয়। তিনি এই নতুন রীতিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন ও পাঠকের সামনে এই রীতিকে তুলে ধরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শচিন দাশ লিখেছেন:

> "গল্পের গদ্যরীতি, তার শৈলী বা ফর্ম এবং আঁকশি বাড়িয়ে ভিতরের অন্তর্নিহিত বিষয়কে নতুন তাৎপর্যে ব্যঞ্জনাময় করে তোলায় তিনি সবসময়ই গল্পকে নানা ভাবে ভেবেছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ও নেমেছেন।"[২]

বিমল করের নিজের লেখা গল্পে প্রথাসিদ্ধ বা পরম্পরা সিদ্ধরীতির অনুবর্তন দেখা গেলেও, তাঁর লেখা কোনো কোনো গল্পে এই নব্য বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ ধরা পরেছে। যেমন: 'সুধাময়' গল্পটি। সুধাময় নামের এক ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতা বোধের গল্প 'সুধাময়'। এছাড়ও বিমল করের 'জননী', 'সোপান', 'অপেক্ষা' গল্পগুলি প্রচলিত ধারা থেকে একটু আলাদা। অন্তরের গভীর অনুভূতির জটিল রহস্যই গল্পগুলির মূল বিষয়, যা ছোটগল্পের ধারা বদলের ইঙ্গিত দেয়।

এই নতুন গল্প ধারার চারজন লেখক কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯), দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৭৯), দেবেশ রায় (১৯৩৬-২০২০), সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০৫)-এর গল্প নিয়ে আলোচনা করা হল।

কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯) বাংলা কথাসাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী লেখক। পাঁচের দশকের শুরু থেকেই একাধিক পত্রিকায় নতুন ধারায় গল্প লেখা শুরু হলেও ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'সাহিত্য পত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদারের 'জল' গল্পটিকে এই ধারার প্রথম গল্প বলা যেতে পারে।

কমলকুমার মজুমদারের 'মল্লিকা বাহার' (১৯৫১) গল্পটি বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গল্প। নারী-পুরুষের বিচিত্র প্রেম, অসম বয়স্ক প্রেম, নারীর শারীরিক মানসিক টানাপোড়েন এবং এইসব কিছুকেই ছাড়িয়ে সমলিঙ্গ-এর প্রতি আকর্ষণ ও প্রেমের বিচিত্র রূপকে তুলে ধরা হয়েছে এই গল্পে। এই গল্পের নায়িকা মল্লিকা। সে প্রেম চেয়েছিল কিন্তু কোনো পুরুষই তাকে সেই প্রেম দিতে পারেনি। মল্লিকা নিজের রূপে নিজেই মুগ্ধ। সে কোনো পুরুষের মধ্যে নয়, 'পুরুষালী দীপ্তি' খুঁজে পেয়েছে তার পরিচিত শোভনাদির মধ্যে:

> "শোভনার এ ব্যবহার বড় আপন বলে মনে হয়, বহুদিনের শোভনাদি। না তা কেন বহু যুগের শোভনাদি, গায়ের রঙ যার হালি মুগের মতই।... গায়ে তার ব্লাউজ নেই - শাড়িটা হাওয়া হাওয়া, মল্লিকা তা নজর করলে।"[৩]

শোভনা সোহাগ করে মালা পরিয়ে দিল, আর চুম্বনে চুম্বনে ভুলিয়ে দিল মল্লিকার না পাওয়া প্রেমের শোক।

এই দুঃসাহসিক সংলাপে বাঙালি পাঠক চমকে উঠলেন। সমাজের বেঁধে দেওয়া রাস্তায় মানুষের মন চলতে পারে না। বিষম লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ যেমন স্বাভাবিক, তেমনই সমলিঙ্গের প্রতিও মানুষ আকৃষ্ট হতে পারে। সেই সময় দাঁড়িয়ে কমলকুমার মজুমদার এই কথাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এখন সমস্ত বিশ্বে হোমো সেক্সচুয়ালিটি এবং লেসবিয়ানিজম খুবই প্রাসঙ্গিক ও স্বাভাবিক। কমলকুমার মজুমদার বহু বছর আগে এই নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে গেছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথাসিদ্ধ স্রোতের দিকে না হেঁটে, বিপরীত দিকে হেঁটেছেন। কমলকুমারের গল্পে শরীর-চেতনা থাকলেও তা শৈল্পিকভাবে সার্থকতা লাভ করেছে। আর এখানেই কমলকুমার মজুমদারের স্বকীয়তা। সেইজন্যই এটি নতুন ধারার গল্প হয়ে উঠেছে।

'মতিলাল পাদরী'(১৯৫৭-৫৮) গল্পটি শুরু হয়েছে গির্জার ভৌগোলিক অবস্থানকে চিহ্নিত করে। এই গির্জায় থাকেন বাঙালি ক্রিশ্চান পাদরি মতিলাল। তিনি প্রতিদিন সকালে গ্রামের দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা করেন তাঁর একটিমাত্র প্রত্যাশা— পূর্ণাঙ্গ ক্রিশ্চান হওয়া। এক আষাঢ় মাসে এক ঝড়-বৃষ্টির প্রেক্ষাপটে মতিলাল পাদরি শুনতে পেলেন 'অস্থির গোঙানির আওয়াজ'। নবজাতককে পৃথিবীতে আনার জন্য এক রমণীর গোঙানি। এই গির্জার ঘরে তথাকথিত নিম্ন সম্প্রদায়ের নারী ভামর সন্তানের জন্ম দিয়েছে। এই সন্তানকে দেবদূত রূপে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি পাদরী মতিলাল। এই ভাবেই মতিলাল পাদরীর যাপিত জীবনে এসে পরে ভামরের সন্তান।

ভামরের ব্যভিচারী জীবন-যাপন দেখে মতিলাল ক্ষুব্ধ হন, তখন শিশুটির পবিত্রতাও ম্লান হয়ে যায়। সেই মুহূর্তেই পাদরি প্রকৃত খ্রিস্টানের মনোভাব থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। পাপীকে তিনি ক্ষমা করতে পারেননি। তাই তিনি ঘন-জঙ্গলে শিশুটিকে রেখে আসার জন্য গেলেন:

> "এই চত্বরটি আরও পরিচ্ছন্ন। আঁঠরালতা উঠে গেছে শালগাছে, নিম্নে গুলঞ্চ আর চারিদিকে দোনার ঝোপ। শিশুপুত্রকে কাঁধ থেকে নামিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে পাদরী দাঁড়লেন। আঙুল মটকাতে গিয়ে কি যেন মনে হল, সেখানে যেন প্রার্থনার কথা ছিল, আঙুল মটকে প্রার্থনাকে ভেঙে দিলেন, তুই-তোকারির সাদামাটা জগৎ থেকে সে প্রার্থনা অনেক দূরে সরে গিয়েছিল।"[৪]

সমগ্র গল্পে এই অংশটি পাঠকের চিত্তকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে রাখে। শিশুটিকে কোলে নিয়ে অরণ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সময়ে পাদ্রির অন্তরের আত্মযন্ত্রণা কোনো ঘটনার মধ্যে দিয়ে নয়, লেখকের ভাষার সূক্ষ্মতায় মূর্ত হয়ে ওঠে। তারপর শিশুটিকে দেখে আসার মুহূর্তে শিশুটির ক্রন্দনরত 'বাব্বা' ডাকে মতিলাল পাদরির মানবিকতা জেগে ওঠে। শিশুপুত্রকে আবার আগের মতো আলিঙ্গন করলেন। মতিলাল পাদরীর হৃদয়ে অন্তর্নিহিত মানবধর্ম জাগ্রত হল- তিনি প্রকৃত খ্রিস্টান হয়ে উঠলেন।

'মতিলাল পাদরী' গল্পটিতে সামাজিক পরিবর্তনের বাস্তবতা ভেদ করে জেগে উঠেছে একটি মানুষের মনের গভীরতা ও সংকট। গল্প শেষে পাঠকের মনের মধ্যে ধরে রাখেন মতিলাল পাদরীর হৃদয়ের ব্যাকুলতাটুকু। এখানেই এই গল্পে নতুনরীতির লক্ষণ ধরা পড়েছে। সমগ্র গল্পটিতে ভাবাবেগের একটি স্তরের পর আর একটি স্তর পর পর আসতে থাকে। অরণ্যের নির্জনতা, পাদরীর ধর্মভাবনা, গ্রামের মানুষের প্রতি তাঁর স্নেহময় আচরণ, ভামরের নবজাতককে দেখে তাঁর গভীর তৃপ্তি, ভামরের ব্যভিচার আবিষ্কারে তার বেদনার্দ্য ক্রোধের অনুভব এবং সবশেষে মানসিক যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে খ্রিস্ট ধর্মের অন্তর সত্যকে স্পর্শ করা— এই স্তরান্বিত উপলব্ধির গঠন শৈলীতেই এই গল্প হয়ে উঠেছে ভিন্ন ধরনের বাস্তবতার ভাষারূপ।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচের দশক থেকেই বিশিষ্ট তরুণ গল্পকার রূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর রচিত গল্পে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার নির্ধারিত ছক অনুসৃত হয়নি। সাহিত্যিক বিমল কর সম্পাদিত "ছোটগল্প নতুনরীতি" গল্পমালায় স্থান পেয়েছিল তাঁর লেখা 'জটায়ু' (১৯৬০) গল্পটি।

'জটায়ু' গল্পের শুরুতেই জানা যায়, নিত্যচরণের হাত ট্রেনের নিচে কাটা যাওয়ায় তার স্ত্রী দুর্গাকে শহরের হোটেলে কাজ নিতে হয়। আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলেও তাদের সংসারে অবিশ্বাস, অশান্তি ছিল না। কিন্তু বর্তমানে তাদের সংসারে অবিশ্বাস সন্দেহ দানা বাঁধে। দেশভাগ ও দাঙ্গার ফলে মানুষের জীবনে যে অভিশাপ, দারিদ্র, আশ্রয়হীনতা দেখা দিয়েছিল; তারই ফলে দুর্গা ও নিত্যচরণের জীবনেও এসেছে অর্থনৈতিক সংকট- যা থেকেই পরস্পরের প্রতি এসেছে সন্দেহ, অবিশ্বাস, ভয়, পাপবোধ, আড়ল করার ইচ্ছা।

অমাবস্যার রাতে কালী পূজায় নিত্যচরণ আগুনের বেড়জালের উপরে নাচবে, নিত্যচরণের এই নাচের ধাপে ধাপে দুর্গার অতীত জীবনের কথা মনে পড়ে যায় দেশেভাগ ও দাঙ্গার ছবি— তার কথকতা করা বাকশিল্পী বাবার চুলে, দাঁড়িতে আগুন লাগলেও পুরাণের কোনো বীর এসে বাবাকে বাঁচায়নি। দুর্গা ও তার মা কে একসাথে জ্বলন্ত বাড়ির সামনে ধর্ষণ করেছিল। এপারে এসে নিত্যচরণের সঙ্গে দুর্গা কলোনিতে সংসার পাতে। নিত্যচরণের অক্ষমতার জন্যই সে হোটেলে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। দুর্গার মনে পড়ে, নিত্যচরণের দুর্ঘটনার দৃশ্য, হোটেলের কেবিনের অপমানের দৃশ্য। বাঁচা আর না বাঁচার দোলাচলতার আত্মহননের মধ্যেও দুর্গার বাঁচার আকাঙ্ক্ষা।

গল্পে নিত্যচরণের নাচের অনুষঙ্গে দুর্গার জীবনের এক একটি পর্ব উঠে এসেছে। নিত্যচরণে নাচ প্রতীকী হয়ে ওঠে। রামায়ণে রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধারের জন্য জটায়ু প্রাণ দিয়েছিল। রাবণের অস্ত্রের আঘাতে জটায়ুর ডানা কেটে গেলেও আমৃত্যু সে সীতাকে উদ্ধারের জন্য লড়ই করেছে। কালীমূর্তির সামনে নিত্যচরণের দুহাত কাটা শরীরটার উদ্যম নাচ দেখে মনে হয়, এই গল্পের দুর্গাকে অশুভ শক্তির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ডানাহীন নিত্যচরণের আগুনের প্রলয় নৃত্য। নিজে আগুন হয়ে চারিদিক পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে উদ্যত। আগুনে পুড়ে তার মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসবে সংগ্রামী দুর্গা ও নিত্যচরণ। সুস্থ ও শুভ পৃথিবীর জন্য মানুষের সংগ্রামী চেতনা জাগ্রত করার এক ইঙ্গিত। রামায়ণের জটায়ু আসলে বিশ শতকের চেতনা সংগ্রামী মানুষ। কালীমূর্তির ভয়ঙ্করতার কাছে যেখানে অন্যায়, পাপ, নতজানু হয়ে যায় সেখানে নিত্যচরণ স্পর্ধায় মাথা তুলেছে। কারণ তার সংগ্রাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তাই পুরাণের আবহে 'জটায়ু' গল্পটি বিশ শতকের সংগ্রামী মানুষের নব্য পুরাণ হয়ে উঠেছে।

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে 'পরিচয়' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চর্যাপদের হরিণী' গল্পটি প্রকাশিত হয়। বিষয়-ভাবনা, ভাষা, গল্পটির পরিকাঠামো বাংলা ছোটগল্পের ধারায় অভিনব সংযোজন। গল্পের নায়ক সুধাময় ইনসমনিয়া ডিসপেপসিয়াগ্রস্ত বেকার, স্লিপ ওয়াকার, এক একত্রিশ বছরের যুবক। যুবকটির চিন্তাভাবনা--- ভ্যান গগ, লেনিন, রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধ, যিশু খ্রিস্ট, বিদ্যাসাগর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়র দ্বারা প্রভাবিত। তার আত্মকথনই গল্পটির শৈলী। সুধাময়ের রাতে ঘুম নেই। সে তখন নিজেকে চেনার চেষ্টা করে। তার মনে হয় রাতের অন্ধকারে কোটি কোটি ঘুমন্ত আত্মার মধ্যে সেই একমাত্র জীবন্ত আত্মা। সমস্ত পৃথিবীটাকে তার সুধাহীন মনে হয়। সে নিজের অস্তিত্বকেও চিনতে পারে না। তাই সে কখনও হয় তেত্রিশ বছরের আবার কখনও তেইশ বছরের যুবক। সে সময় কাটানোর জন্য আদালতে যায়। সে দেখে আদালতে কত ব্যভিচার, কত পাপ প্রকাশ্যে হয়ে চলছে। আবার সে নিজের কথা চিন্তা করে আত্মশান্তি পায়। সুধাময় চিন্তাশীল থাকলেও তার চিন্তা-ভাবনার অসংলগ্নতা তাকে স্নায়বিকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সুধাময় জীবন, সমাজ সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তার মনের কমপ্লেক্স আসলে সমাজ

বাস্তবতা। চর্যাপদের হরিণ-হরিণীর সম্পর্কে তার নতুন ব্যাখ্যায় ধরা পড়ে সে কতটা জীবন ও ভালবাসার প্রতি আস্থাশীল:

> "হরিণ-হরিণী হইল যথাক্রমে Symbol of life ও love। শূন্যতাবাদ আসলে শূন্যতাহীনতা, পরিপূর্ণতা। নৈরাত্মা দেবী হল মানবী। শবর বা হরিণ সেই eternal man।"[৫]

প্রচলিত আঙ্গিকের নিয়মনীতিকে ভেঙে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'চর্যাপদের হরিণী' গল্পটি লিখেছেন। বিষয়- ভাবনা, চরিত্র, ভাষা সমস্ত দিক থেকেই গল্পটি স্বতন্ত্র। প্রাচীন বাংলার চর্যাপদে হরিণীর ইমেজকে দীপেন্দ্রনাথ খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। চারিদিকের আশ্রয়হীনতার মধ্যে নতুন পথের সন্ধানে চর্যাপদের হরিণের মতো হরিণীর সন্ধানে ক্ষিপ্রবেগে ছুটে চলেছে মানবাত্মা। সুধাময়ের ভাবনায় তাই হরিণ হরিণী এসেছে জীবনের শুদ্ধতা খুঁজতে। লেখক আশাবাদী, তাই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও দুঃসহ কলকাতার জীবন ভালোবাসার প্রতীকে রূপান্তরিত হয়ে যায়। 'চর্যাপদের হরিণী' আসলে জীবন অন্বেষার প্রতীক হয়ে ওঠে।

পঞ্চাশের দশকে বাংলা সাহিত্যে যে নতুন গল্প-ভাবনা শুরু হয়েছিল সেই ধারার অন্যতম ছোটগল্প দেবেশ রায়ের 'হাড়কাটা'(১৯৫৫)। এক মিউনিসিপাল মার্কেটে লাইসেন্স প্রাপ্ত কসাই নানকু কাহার। নানকুর দোকানের সামনে মাংস-লোভী ক্রেতা, পাগল, কুকুরের সর্বদা হট্টগোল। সর্বোপরি আছে নানকুর অর্থাভাব। তাই সারাদিন কাজ করে বাড়ি গেলেও শান্তি নেই। তার বউ গাধুলি। সে নানকুর কাছে রুপোর হাঁসুলি কিনে দেওয়ার দাবি করলে নানকু ক্রুদ্ধ হয়ে গাধুলিকে ধাক্কা দেয়। এরপর আসে নানকুর অনুতাপের পালা। তাই নানকু বাড়িতেও বউ গাধুলির জন্য কিছুটা মাংস নিয়ে আসে। বাস্তব জীবনের হতাশা দারিদ্র এবং এই দারিদ্রর সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম নানকুকে পাষাণ খন্ডে পরিণত করেছিল। কিন্তু তার মনের অবচেতনে থাকা জীবন-তৃষ্ণা মানুষের স্বাভাবিক মূল্যবোধকে জাগিয়ে তুলেছে।

পঞ্চাশের দশকে বাঙালি মধ্যবিত্তকে নতুনভাবে জীবনের ভাবনা ভাবতে হয়েছিল। তারই প্রতিফলন দেবেশ রায়ের 'হাড়কাটা' গল্পের নায়ক মিউনিসিপাল মার্কেটের লাইসেন্স প্রাপ্ত কসাই নানকু কাহারের চরিত্রে। এই জীবিকার সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্ত আগে পরিচিত ছিল না। নানকু কাহার একই সঙ্গে নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি, আবার অনেক নানকু কাহারের প্রতিনিধি। লেখক এখানে একটি মানুষের স্থানের বা সময়ের অস্তিত্বের বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। একজন মানুষ তার দেশ-কাল চারপাশের পরিবেশ বৃত্ত নিয়েই একটা আস্ত মানুষ হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে এর আগে মাংস ব্যবসায়ী কসাইয়ের চরিত্র এলেও, সেখানে অস্তিত্বের বাস্তবতা ছিল না, সেই বাস্তবতাকেই লেখক তুলে ধরেছেন। এই বাস্তবতা এক নতুন ধরনের। এই বাস্তবতার বিভিন্ন রং ও নমনীয়তা বাস্তবতার নির্যাস যা জীবনকে নতুনভাবে নির্মাণ করে, এই বাস্তবতা এক অচেনা অভিজ্ঞতার সমবায় গঠিত। দেবেশ রায় এই বাস্তবতা সম্পর্কে লিখেছেন:

> "বাস্তব যেন বহু বিচিত্র আকারে এক প্রান্তর - সেখানে নিজের ছায়া নিজে মাড়নো যায় না। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার সেই আয়াসে বস্তুকে বস্তুর আকারে চিনে নেওয়ার সেই চেষ্টায় কত নতুন প্রকরণ খুঁজে বেড়তে তখন ইচ্ছে গেছে।"[৬]

দেবেশ রায়ের এই ধারার গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম 'দুপুর' ('দেশ' ১৯৫৮) জৈষ্ঠ মাসে একটি পরিবারের পাঁচটি মানুষের দুপুর যাপনের গল্প। মধ্যবয়স্ক স্বামী ও স্ত্রী এবং তাদের তিন ছেলে মেয়ে কিভাবে দুপুরবেলা কাটাচ্ছে তার চিত্র এবং সেই চিত্রকল্পকে আশ্রয় করে লেখক পৌঁছে যান এই পাঁচটি অসমবয়সী চরিত্রের মনোজগতে। কোনো ঘটনা নেই, কোনো পরিণাম নেই, শুধু দুপুর গড়িয়ে বিকেল হওয়া ছাড় অর্থাৎ তথাকথিত গল্প বলতে যা বুঝি এই গল্পে তা অনুপস্থিত। পাঁচটি ভিন্ন ও বিচিত্র মনের ভাবনা টুকরো টুকরো ভাবে যেন আকার পেয়েছে। শরীর-মনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনার সংমিশ্রণে পাঁচজনের কাছে দুপুর আলাদা আলাদা ভাবে ধরা পড়েছে।

'দুপুর' গল্পটিতে পরিবারের পাঁচজনের ভাবনা বিচ্ছিন্ন হলেও তা মিলে যায় একটি বেহালার সুরের সঙ্গে। মাটির বেহালার সুর আস্তে আস্তে দূরে চলে যায়। এইভাবে দুপুরও ধীরে ধীরে বিকেল হয়ে যায়। দুপুর প্রাকৃতিক, সুর মানবিক— এই দুইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আমাদের জীবন। তাদের প্রত্যেকের চরিত্রের সঙ্গে দুপুরের রং ও স্বাদ বদলে গেলেও বিকেলের অস্তরাগে তাদের সমন্বয় ঘটে। এই পাঁচটি চরিত্র যেন আলাদা হয়েও আলাদা নয়। পার্থিব মানুষের মনের বাসনাগুলি প্রত্যেকের পৃথক হলেও পৃথক নয়। 'দুপুর' গল্পে এমনই একটি সর্বজনীনতার আবহ

আছে। সেই আবহ সঞ্চারিত হয় ওই বেহালার সুরে। 'দুপুর' গল্পে এই সুরের ব্যঞ্জনা অসাধারণ এক কবিত্বময়তার সৃষ্টি করেছে।

পঞ্চাশের দশকে বাংলা সাহিত্যে যে ছোটগল্পে নতুনরীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল 'দুপুর' গল্পটি তার অন্যতম উদাহরণ। সমগ্র গল্পটি আলোকচিত্রের মত ভেসে উঠেছে। প্রতিটি বাক্য অনুভূতির জগৎ থেকে উঠে আসা ভাষারূপ, যেন সাবয়বতার রূপ নিয়েছে। এই ধরনের গল্প বাংলা সাহিত্যে খুবই বিরল। এই গল্পটি সম্পর্কে সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন:

> "একটি স্মরণীয় গল্প 'দুপুর'। নির্দিষ্ট ঘটনা-সংবলিত কথাবৃত্ত বর্জন করবার পথে একজন গল্পকার কতদূর এগিয়ে যেতে পারেন তার অন্যতম দৃষ্টান্ত এই গল্প।"[৭]

নতুনরীতির যে ছোটগল্পের ধারা পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাঙালি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেই ধারায় যে অল্প কয়েকজন লেখকের নাম করা যায় তাঁদের অন্যতম অবশ্যই সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৩৩-২০০৫) প্রথম সাড়া জাগানো ছোটগল্প 'বিজনের রক্তমাংস' (১৯৫৯)। এটি বিমল করের "ছোটগল্প: নতুনরীতি" পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় । এই গল্পের নায়ক বিজন। বিজনের শারীরিক অসুস্থতা তাকে স্বাভাবিক জীবন থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। গল্পের শুরু জৈবিক বিষয় দিয়ে এবং শেষ এক্স-রে প্লেট দিয়ে। রক্তমাংসের স্বাভাবিক মানুষ বিজন ধীরে ধীরে অস্বাভাবিক অবস্থায় প্রবেশ করে।

এক বিপন্নতাবোধ সমগ্র কাহিনি জুড়ে। এখানে সেই অর্থে কোনো গল্প নেই। পুরোটাই বিজনের একটি দিনের কার্যকলাপ এবং তার সঙ্গে তার মানসিক চিন্তাচেতনা। কিন্তু লেখক একটির পর একটি যে ছবি গল্পে এঁকেছেন তা পাঠককে স্পর্শ করে। এটাই সময়ের, পৃথিবীর ব্যাধি, সমগ্র মানুষের ব্যাধি। এর থেকে যেকোনো সময় মুক্তি আসতে পারে এই আশায় মানুষ বাঁচে। এক নতুন শিল্পরূপের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির অবসাদ, ব্যাধির আতঙ্ক ইত্যাদি অতিক্রম করে তা সভ্যতার অসুখকে যেন নির্দেশ করে।

'কৃত্তিবাস' পত্রিকার গল্প সংখ্যায় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী'। বিষয়বস্তুর জন্য নয়, কেন্দ্রীয় উপলব্ধির জন্যও নয়, গল্পের রচনাশৈলীর অভিনবত্বের জন্য এই গল্পটি বাংলা সাহিত্যে নতুনরীতির গল্প হিসেবে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। গল্পের কথক উত্তম পুরুষের 'আমি' একটি চরিত্র। কিন্তু তারও নাম বিজন। অপর চরিত্র মায়া। দুজনেই পরিণত যুবক-যুবতী। পরিচয় খুবই সামান্য। কথকের চোখ দিয়েই মায়াকে এবং সমগ্র পরিবেশকে দেখানো হয়েছে।

গল্পটির নামকরণের মধ্যেও রয়েছে অর্থবহ ইঙ্গিত। ক্রীতদাস ক্রীতদাসী কারা? বলাই বাহুল্য কথক সেই ক্রীতদাস আর মায়া ক্রীতদাসী। আধুনিক সভ্যতার স্বপ্নহীন, আশাহীন, মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্গে বধ্য সকল নারী ও পুরুষ তাদের জীবনের কাছে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী।

পাঁচের দশকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা-ছোটগল্পে নতুনরীতির ধারা এক বিশেষ ঘটনা। স্বাভাবিক সমাজ বাস্তবতাকে এখানে তুচ্ছ না করে, অন্তর্গূঢ় এবং মনস্তত্ত্বের বিচিত্র কাটাকুটিতে এক আশ্চর্য নির্মাণ। সেইসঙ্গে দুটি বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসের পর মানব সভ্যতা বিপন্নতার স্বরূপ এই নতুনরীতির গল্পের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে। কিন্তু বেঁচে থাকার প্রাণশক্তিও তুচ্ছ হয়ে যায়নি। এইসব লেখাতেই ভেঙে গেল ঘটনা-নির্ভর, প্লট-প্রধান ছোটগল্পের ধারণা। বাংলা গল্পে উঠে এল মানব মনের জটিলতা আর মানব জীবনের যন্ত্রণাকৃর্ণ বিষাদ। এখান থেকেই বাংলা-ছোটগল্প আরও একধাপ এগিয়ে গেল।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, 'মায়াবী নিষাদ', দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৬

২. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার সম্পাদিত, উর্মি রায়চৌধুরী, শচীন দাশ: 'বিমল কর: সময় অসময়ের উপাখ্যানমালা'; শচীন দাশ: 'বিমল কর: 'ছোটগল্প: নতুনরীতি'; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ; কলকাতা-৯, পৃ: ১২৪

৩. মজুমদার, কমলকুমার, 'মল্লিকা বাহার'; 'গল্প সমগ্র: কমলকুমার' সম্পাদনা: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ, ১৯৯০, কলকাতা, পৃ: ৬৪
৪. মজুমদার, কমলকুমার, 'মতিলাল পাদরী'; 'গল্পসমগ্র: কমলকুমার' সম্পাদনা: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ, ১৯৯০, কলকাতা, পৃ: ৮১
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ, 'চর্যাপদের হরিণী', গল্প সমগ্র; সম্পাদনা অনিশ্চয় চক্রবর্তী; একুশ শতক, জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা, পৃ: ২৫১
৬. রায়, দেবেশ, 'গল্প সমগ্র' প্রথম খন্ড, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯২, পৃ: ৭
৭. চক্রবর্তী, সুমিতা, 'ছোটগল্পের বিষয়ে আশয়', পুস্তক বিপণী, কলকাতা, জুন ২০০৪, পৃ: ৩২০

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1166-1178
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.118

রবীন্দ্রনাটক এবং গুপী-বাঘা ত্রয়ী

অর্ঘ্যদীপ ব্যান্যার্জী, *সরকার অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 21.05.2025; Accepted: 24 .05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Rabindranath Tagore & Satyajit Ray, two legendary personae in area of Art & Culture. There are many similarities we can find between them through their art form & content. In this particular essay we are trying to imply a comparative study on their art & thought process, especially political. State & Nation are the key words here. We have chosen allegorical dramas (mainly) of Tagore and so-called childrens' films (Gupi Bagha Trio) of Ray, as main texts to decode their ironies & allegories in these. Also have highlighted the usage or requirments of this kind of symbolic play work. This kind of exercise is not only for art's sake but also for political reason, but not the sake of typical party politics, here canvas is vast. Both of them are addressed as Humanist (though loosely), so their political view is manifestation of Mankind, and it's also a part of their own philosophy. Here we will discuss the 'Political Philosophy'.

Keywords: Tale, Symbol, State, Nation, Humanism, Interpretation

প্রভাব' শব্দটি বহু ব্যবহারে জীর্ণ। বস্তুত শিল্প অনুকরণ কি না, তা নিয়ে প্রাচীন গ্রিসে কম বাকবিতণ্ডা হয়নি। যদিও এই অনুকরণ প্রকৃতি সংলগ্ন। পরবর্তী সময়ে যখন অনুকরণের পরিবর্তে অনুসরণ ব্যবহৃত হতে লাগল, তখন তা জড়িয়ে গেল ঐতিহ্য এবং পরম্পরার সঙ্গে। এর মধ্যে যেমন পাঠ ও প্রকাশ সূত্রে উত্তরাধিকারীর বার্তা তেমনই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত, সর্বোপরি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও মিশে থাকে। এইবার এল প্রকৃতি থেকে পরিবেশ সংলগ্নতা। বিতর্ক সত্ত্বেও ইয়ুং কথিত সমবেত নিশ্চতনের প্রত্ন ছাঁদকেও সংযুক্ত করা যেতে পারে এর সঙ্গে। ফলত ব্যাপারটিকে প্রভাবের থেকে অন্তর্বয়ান সম্বোধনই অধিক সঙ্গত।

সেই অন্তর্বয়ানের মাধ্যমেই আমরা এখানে দেখতে চাইব দুটি ভিন্ন সংরূপের শিল্পকে। এখানে একইসঙ্গে মিশে গেছে প্রকৃতি ও পরিবেশ সংলগ্নতা। দু'জন শিল্পীর দুটি পরিবারের শিক্ষা রুচি এবং উভয় পরিবারের যোগাযোগও লক্ষণীয়। সুতরাং উত্তরাধিকার সূত্রে পাঠ-ভাবনা বাসা বাঁধে উত্তরসূরির নিশ্চেতনে। তার প্রকাশ ঘটে শিল্পে। এর একটি সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ। রবীন্দ্রনাট্য প্রসঙ্গে 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' ছবির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন –

> "এই ছবিটির উল্লেখ অন্য কারণেও এখানে প্রাসঙ্গিক মনে হয়, কেননা একদিকে যেমন এর বিষয়বৃত্ত থেকে কখনো কখনো মনে পড়ে 'রক্তকরবী'র জাল আর মাঠ, শক্তি আর শান্তির লড়াই, অন্যদিকে তেমনি এর গানে কথা-সুরের আরোপভঙ্গি মনে করিয়ে দেয় রাবীন্দ্রিক গীতিনাট্যগুলিকে।"[১]

আমাদের আলোচনা অবশ্য গীতিনাট্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। উপরন্তু তথাকথিত তত্ত্ব নাটকই আমাদের লক্ষ্য। অন্যদিকে গুপী-বাঘা ত্রয়ী, এর প্রথম ভাগ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর রচনা, সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনা। মধ্য ভাগ সম্পূর্ণ সত্যজিৎ সৃষ্ট এবং অন্তভাগ সত্যজিৎ রায়ের কাহিনি, পরিচালনা সন্দীপ রায়ের। বৃহদর্থে আমরা এই তিনটি ছবিকে একত্রে যুক্ত করেছি।

দুই পরিবারের অন্তর্যোগের ইতিহাস দীর্ঘ। শুধু ব্রাহ্ম হবার কারণেই নয়, এই অন্তর্নিহিত যোগের কারণ নিহিত সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায়। ছোট সত্যজিৎকে রবীন্দ্রনাথের লিখে দেওয়া “একটি ধানের শিষের উপরে / একটি শিশির বিন্দু”র কথা সুবিদিত। এরপরের ঘটনা সত্যজিৎ রায়ের শান্তিনিকেতনের কলাভবনে শিক্ষার্থী হিসেবে যোগদান। শহর ছেড়ে সত্যজিৎ রায় যেতে চাননি প্রথম দিকে।

> “মা’র কাছে শুনেছিলাম রবীন্দ্রনাথের নাকি অনেক দিনের ইচ্ছে আমি কিছুদিন গিয়ে শান্তিনিকেতনে থাকি। আমার নিজের বিশেষ আগ্রহ ছিল না, কারণ কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকি এটা ভাবতে ভাল লাগত না। যাই হোক, শেষটায় তো গিয়ে হাজির হলাম শান্তিনিকেতনে।”[২]

কিন্তু শান্তিনিকেতনে এসে তাঁর যে গভীরতর লাভ হয়েছিল, তা স্বীকার করতেও ভোলেননি।

> “শান্তিনিকেতনে থাকাটা আর এক দিক থেকেও আমার জীবনে খুব কাজে লেগেছিল। আমাদের ক্যাম্পাসের চার দিকেই তো গ্রামের ছড়াছড়ি। স্কেচ করবার জন্যে প্রায়ই তখন আমরা সেইসব গ্রামে চলে যেতাম। আমি শহরে জন্মেছি বড় হয়ে উঠেছিও শহরেই। গ্রাম-বাংলার রূপ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয় ঘটল।”[৩]

নাগরিক সত্যজিতের গ্রামবাংলা দেখা, একি প্রতিফলিত হয়নি অপু ত্রয়ী পর্বে, ইতালির নব্যবাস্তববাদের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও ? নাগরিক রবীন্দ্রনাথের বেলায় যেমন পূর্ববঙ্গে অবস্থান, পরবর্তী সময়ে বোলপুরে। তবে সত্যজিত পাশাপাশি এও বলছেন –

> “শান্তিনিকেতনে থাকার একটা খারাপ দিকও ছিল। সেটা আমি অনুভব করতাম। ১৯৪১ সাল, বিশ্বযুদ্ধ একেবারে আমাদের দোড়গোড়ায় এসে হাজির হয়েছে। অথচ শান্তিনিকেতনে চলছে সেই একই রকমের নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রা ক্যাম্পাসের মধ্যে দৈনন্দিন প্রার্থনাসভা, সংগীত কি নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান – সবই একেবারে নিয়মমাফিক চলছে। চতুর্দিকের বাস্তব ঘটনাস্রোতের সঙ্গে এর কোনও সংগতি আমি খুঁজে পেতাম না।”[৪]

এই নাগরিক লক্ষণ সর্বোপরি যুদ্ধের আবহ হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে কলকাতা ত্রয়ী এবং সর্বোপরি গুপী-বাঘা ত্রয়ীতে। কিন্তু যুদ্ধবিমুখতা কি রবীন্দ্রনাথেরও ছিল না? গ্রাম্যজীবনের বর্ণনাতে কি মিশে ছিল না রবীন্দ্রনাথের নাগরিক দৃষ্টি, চেতনা?

যাই হোক, সে ভিন্ন আলোচনার প্রেক্ষিত । আমরা বরং চলে যাব সরাসরি আলোচ্য বিষয়ের কেন্দ্রে। রূপকথার অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক আখ্যান নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। রূপকথার ধাঁচও চির স্থির নয়। বস্তুত আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করব রাজনৈতিক ভাবনাকে যা এইসব শিল্পকর্মের অভ্যন্তরে প্রবহমান। রাজনৈতিক অবস্থান ছাড়া শিল্পও হয় না। যেমন রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত রূপক- সাংকেতিক নাটকও কী পরিমাণ রাজনৈতিক, তা লক্ষ করলেই ব্যাপারটি অনুধাবন করা যাবে। রূপকথার কথার আড়ালে থাকে রূপকের ভাঁজ। রূপকথার মধ্যেই রূপক শব্দটি রয়েছে। ‘রূপক’ অলঙ্কারে একটি বস্তুর গুণ অপর বস্তুতে আরোপিত হয় বা, একটি বস্তুকে অপর বস্তুর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যদিও রূপকথা উদ্ভবের যে কাল, শ্রুতির সে যুগে, প্রাক-সভ্যতার সময়ে সচেতন ভাবে নিশ্চয়ই কথায় প্রতীক- রূপক ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু চেতন অচেতনের একাত্মতা পরবর্তী সময়ে কথাসমূহকে প্রতীকায়িত করে তুলেছে। অবশ্য এর পিছনে সর্বপ্রাণারোপবাদের প্রভাবই সর্বাধিক। রূপকথা প্রাথমিকভাবে প্রাকৃতিক ন্যায় ও নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যেই উদ্ভূত। পরবর্তী কালে যখন রূপকথা মূলত রূপক হিসেবেই ব্যবহৃত হতে লাগল তখন তাতে যুক্ত হল সচেতনতা। এই দ্বিতীয় স্তরে পড়বেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর প্রমুখ। এখানে ব্যাখ্যার প্রসঙ্গও চলে আসে। রবীন্দ্রনাথ যেমন আন্ডারসনের রূপকথার আধুনিক ভাষ্য দেন ‘বিম্ববতী’

('সোনার তরী' ও 'শিশু' উভয় কাব্যগ্রন্থেই সঙ্কলিত) কবিতায়। অবনীন্দ্রনাথ 'ক্ষীরের পুতুল'-এ পুরোনো রূপকথার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন এবং সেই উদ্ঘাতগুলি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন। উপেন্দ্রকিশোরের লেখায় এটি পরিপূর্ণতা পেল। সত্যজিৎ অবশ্য বলছেন-

> "এমন অনেক উচুঁদরের শিশু সাহিত্য আছে যাদের পুরোপুরি রস গ্রহণ পরিণত বয়সেই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এমনকী সুকুমার রায় বা লীলা মজুমদারের লেখা সম্পর্কে এই কথাই খাটে... উপেন্দ্রকিশোরের লেখার জাদুই এমনিই যে তা অনায়াসেই পাঠকের এই শিশু মনটিকে সজাগ সজীব করে তোলে।"[৫]

নিঃসন্দেহে যথাযথ উক্তি। তবে শিশু সাহিত্যের অন্তর্গত রূপকথা তো কেবলমাত্র শিশুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তার আবেদন পরিণত বয়সেও থেকে যায়। 'টুনটুনির গল্প'তে টুনটুনি কি শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি নয় ? এমনকি একেবারে রূপকথাধর্মী 'ঘ্যাঁঘাসুর', 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন'-এ কি নেই অন্তর্নিহিত রাজনীতি ? বস্তুত শিশু সাহিত্য নামে পৃথক শ্রেণি বিভাগের প্রয়োজন আছে কি না, সেই প্রশ্নও এখন উঠছে। ব্রিটিশ আমলে ভারতীয়রা ব্রিটিশদের চোখে ছিল শিশু। সেসময় শিশু সাহিত্যের অধিক প্রচলনের মধ্যে দেশীয় ভাবধারার পুনর্নবীকরণের দিকটিও লক্ষ করা যায়। একদিকে দক্ষিণারঞ্জন আরেক দিকে উপেন্দ্রকিশোর। উপেন্দ্রকিশোরই রায় পরিবারে শিশু সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত ঘটান, যার উত্তরাধিকার সত্যজিৎ। সেই প্রথম যুগে ফ্রয়েডের আগমন তখনও ঘটেনি, তার পরে শৈশবকে আর আগের মতো দেখা হয়ত সম্ভব ছিল না। রূপকথা প্রকৃতপক্ষে কল্পনাবিলাসিতার জায়গা। বর্তমান যন্ত্র যুগে অনেকেই রূপকথা বিমুখ। কিন্তু মনে রাখতে হবে কল্পনার প্রসারতা, নীতি শিক্ষা এর মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। এমনকি সাহসও। কারণ, রূপকথার বৈশিষ্ট্যে দেখা যায় অভাব এবং তা থেকে যাত্রা। এই যাত্রা দুঃসাহসিক অভিযান যা শিশু মনে কল্পনা ও সাহসের বুনন নির্মাণ করে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন রূপকথাকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিলে মানবমন অনেকটা সৌন্দর্য ও উদারতা হারায়।

> "কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে রূপকথা অবাস্তব নহে, উহা একটা বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বা যে শক্তি আমাদিগকে জীবনের বাস্তব প্রয়োজন মিটাইতে প্রেরণা দেয়, তাহাই যে একমাত্র বাস্তব তাহা নহে... রূপকথা কতকগুলি অসম্ভব বাহ্যঘটনার ছদ্মবেশ পরিয়া আমাদের মনের সহিত ইহার প্রকৃত ঐক্যের কথা গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই ছদ্মবেশ খুলিলেই ইহার সহিত আমাদের যোগসূত্র সুস্পষ্ট হইবে।"[৬]

উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত ছদ্মবেশই রূপক। আসলে ইঙ্গিতের সাহায্যে ব্যক্ত করলে অনেকক্ষেত্রে তার ব্যাপ্তি হয় অধিক এবং সময় পরিবর্তনের সঙ্গে তা নতুন রূপে প্রতিভাত হয়। এতে সরাসরি উল্লেখের সাংবাদিক ধরণের পরিবর্তে সাহিত্যগুণ জোরালো হয়। অনেকসময় শাসকের রক্তচক্ষুও উপেক্ষা করা যায়। আবার পূর্বে উল্লেখিত প্রত্ন ছাঁদের চিরকালীন আবেদনও এর সঙ্গে মিশ্রিত হয়।

এই প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে চলে যাওয়া যেতে পারে রবীন্দ্র নাটকের সাজঘরে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই দেখতে হবে এইসব নাটকের রাজা চরিত্রটি এবং তৎসংলগ্ন দর্শন-ভাবনা। 'জীবনস্মৃতি'তে দেখা যায় –

> "বাড়িতে আরো-একটা জায়গা ছিল, সেটা যে কথায় তাহা আজ পর্যন্ত বাহির করিতে পারি নাই । আমার সমবয়স্কা খেলার সঙ্গিনী একটি বালিকা সেটাকে রাজার বাড়ি বলিত। কখনো কখনো তাহার কাছে শুনিতাম, "আজ সেখানে গিয়েছিলাম।" কিন্তু, একদিনও এমন শুভযোগ হয় নাই যখন আমিও তাহার সঙ্গ ধরিতে পারি। সে একটা আশ্চর্য জায়গা, সেখানে খেলাও যেমন আশ্চর্য খেলার সামগ্রীও তেমনি অপরূপ।"[৭]

- এই যে আড়াল থেকে রাজার সঙ্গে খেলা, এর যে দার্শনিক ব্যাপ্তি তার ভিতরেও ক্রিয়া করে রাজনৈতিক চোরাগুপ্তি। দার্শনিকতার দিক থেকে রাজা আত্মতত্ত্বেরই দ্যোতক। 'রাজার বাড়ি' কবিতায় দেখা যায়-

> "আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে তো! / সে বাড়ি কি থাকত যদি লোকে জানতে পেত। ... আমার রাজার বাড়ি কোথায় শোন্ মা, কানে কানে-/ ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে সেইখানে।।"[৮]

'জীবনস্মৃতি'তে যেখানে রাজার বাড়ির অন্বেষণ, এখানে তার সন্ধান। রাজা আছে তুলসীতলায় অর্থাৎ গৃহের অভ্যন্তরে। সহজিয়া বাউল ভাবনায় গৃহ দেহেরই প্রতীক। তাই রাজা নিজের ভিতরে অচেতনের অন্ধকার ঘরে। সুদর্শনা রূপী চেতন তাকে বারবার আলোয় দেখতে চায়। কিন্তু রাজা দেখা দেয় ঠিক সময় হলে, অবচেতনের দ্বার অর্গলমুক্ত করে। কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিতে রাজাকে দেখলে?

'রাজা' এবং 'রক্তকরবী' এই দু'টি নাটককে এই প্রসঙ্গে দেখে নেওয়া যাক। উভয়ক্ষেত্রেই আমরা দেখি অদৃশ্য এক রাজাকে তথা রাজশক্তিকে । রাজা এবং রাজশক্তি – এর মধ্যে লুকিয়ে আছে এক কূটপ্রশ্ন । সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে প্রধানত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে। একক রাজশক্তি থেকে অভিজাত ও সামন্ততন্ত্র হয়ে ধনতন্ত্রে পৌঁচেছে সময়। কিছু দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূয়োদর্শনের মধ্য দিয়ে অবলোকন করেছেন এই সব ক'টি অবস্থান । সেকারণে বিভিন্ন ধরণের রাজার দেখা মেলে তাঁর সাহিত্যে। এটি কি তাঁর নিজস্ব শ্রেণি চরিত্রের সঙ্গে কোথাও গিয়ে এক হয়ে যায় ? যেখানে জমিদার রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ? রবীন্দ্রনাথ তো রাজার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে প্রজাদের সঙ্গে মিশতে চেয়েছেন। রথীন্দ্রনাথকে চিঠিতে জানিয়েছেন প্রজাদের অছি হয়ে তিনি থাকতে চান। তাঁর জমিদারতন্ত্রকে প্রজামুখ্য করে তুলতে তিনি প্রচেষ্টা চালিয়েছেন আপ্রাণ। নিয়েছেন সমবায় নীতি। রাশিয়ার চিঠিতে বলছেন –

> "একদা আমি পদ্মার চরে বোট বেঁধে সাহিত্যচর্চা করেছিলুম। মনে ধারণা ছিল, লেখনী দিয়ে ভাবের খনি খনন করব এই আমার একমাত্র কাজ, আর কোনো কাজের আমি যোগ্যই নই। কিন্তু যখন এ কথা কাউকে বলে-কয়ে বোঝাতে পারলুম না যে, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকেই শুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্য কলম কানে গুঁজে এ কথা আমাকে বলতে হল – আচ্ছা, আমিই এ কাজে লাগব। ... এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে – জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর ; দ্বিতীয়ত, সমবায়নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না।"[৯]

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত মতামতও ছিল সাধারণ মানুষকেন্দ্রিক। এই প্রসঙ্গেই উঠে আসে দরবার সম্পর্কিত তাঁর মতামত। দরবার প্রাচ্য প্রথা। মানুষের অভিযোগ জানাবার একটি উপায়। ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথ দরবারী প্রথাকে আরও প্রজা ঘনিষ্ঠ করতে চেয়েছেন উচ্চ আসন ত্যাগ করে। রবীন্দ্রনাথের মতে –

> "চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষিতকে জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা-গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত এবং তার শ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ... এমনি করে দেশ ছিল দেশের লোকের; রাজা ছিল তার এক অংশে মাত্র, মাথার উপর যেমন মুকুট থাকে তেমনি।"[১০]

ফলত এদিক থেকেও বিচার্য হয়ে উঠে রবীন্দ্রনাটকের রাজা চরিত্র। সমাজ ও রাষ্ট্রের অভিমুখ সম্পর্কে কিছু কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। প্রাকৃতিক রাজ্য থেকে সমাজ হয়ে রাষ্ট্রে পৌঁছনোর স্তরগুলি বলাবাহুল্য রাজনৈতিক। সমাজ গঠিত হয় নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীর আদানপ্রদানের মাধ্যমে, যার মূল ভিত্তি ট্যাবু ও টোটেম। এই নিরিখে গড়ে ওঠে সমাজ- সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে রাষ্ট্রে প্রধান হয়ে ওঠে শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো। আধুনিক রাষ্ট্রভাবনা সার্বভৌমত্ব এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমা ও সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত। রাষ্ট্র উদ্ভবের মোটের ওপর চারটি মতবাদ পাওয়া গেছে- ঐশ্বরিক মতবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ, ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ। শেষ মতবাদটিই বর্তমানে অধিক গ্রহণীয়। প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্রের কথা আমরা জানি, সঙ্গে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। প্লেটোর মতে আদর্শ রাষ্ট্রে শাসক, সৈনিক ও জনগণ এই তিন শ্রেণি থাকবে। তবে আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা পশ্চিমী সভ্যতায় বিশেষভাবে দেখা যায় পনেরো শতক থেকে, যখন রোমান সাম্রাজ্য লোপ পায়, তা থেকে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তি একত্রিত হয়ে রাষ্ট্র গঠন করতে শুরু করে, পরবর্তীকালে যা জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত।

উনিশ শতকে যখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম হচ্ছিল, তখন বিভিন্ন রাজ্য ও রাজাধীনে থাকা অঞ্চল যে একত্রিত হয়ে উঠছিল, সেই প্রক্রিয়াটি লক্ষণীয়। জাতীয়তাবাদ এক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দিতে পারে তা আমরা দেখেছি। ভাষাকে কেন্দ্র করে ধর্মকে কেন্দ্র করে এই জাতীয়তাবাদ দানা বাঁধতে পারে। উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদকে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন সমর্থন করতে পারেননি। উগ্র জাতীয়তাবাদ আগ্রাসনের জন্ম দেয়, যেমনটা বুয়র যুদ্ধে দেখা গেছিল। 'নৈবেদ্য' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ এরই প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরই ভাবশিষ্য হাল্লা মন্ত্রীর মধ্যে সেই আগ্রাসনের দিকটি ফুটিয়ে তোলেন। ব্রিটিশ আমলে ভারতের একত্রীকরণ কিঞ্চিৎ অভিনব, কারণ এই দেশ ভাবনা ছিল নূতন। মৎস্যপুরাণে ভারতবর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্মর্তব্য পুরাণগুলি রচিত হয়েছে মোটামুটি গুপ্ত যুগে। গুপ্ত যুগেই অখণ্ড ভারতের একটা চেতনা সূক্ষ্মভাবে তৈরি হয় গুপ্ত সম্রাটদের রাজ্যবিজয়ের মাধ্যমে। এখানেই এসে পড়ে দেশ ও রাষ্ট্রের প্রসঙ্গ। দেশ হল চেতনা- আবেগ। রাষ্ট্র এক নির্দিষ্ট শাসনতান্ত্রিক কাঠামো। রাষ্ট্র তাই সীমানা দিয়ে চিহ্নিত। দেশ নিঃসীম। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ এই দেশেরই কথা ভেবেছেন। শুণ্ডী ও হাল্লা রাজার অন্তিম আচরণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের ওপর দেশ জয়ী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দেশও 'মিলাবে- মিলিবে', অন্তত সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে তো বটেই। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ ভারতের সমাজমুখ্যতার কথা তুলে ধরেন। রাষ্ট্রকাঠামোয় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম (অবশ্য সামাজিক স্তরে কোনরকম সমস্যা নেই এমনটা নয়, বরং বেশ কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র তার সাংবিধানিক আইন ব্যবহার করে মানুষকে বাঁচিয়েছে। তবু সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের ব্যাপারটিও অনস্বীকার্য)। রাষ্ট্র গঠনের সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব অনুযায়ী হবস রাষ্ট্র ও শাসককে এক করে দেখেছেন। এর কিছু পরে লক দুটিকে দেখেছেন। ভারতীয় স্মার্ত মনু রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধির ন্যায় গণ্য করলেও অত্যাচারী ও অকর্মণ্য শাসককে পদচ্যুত করার অধিকার প্রজাদের দিয়েছেন। পাশ্চাত্যে রুশোর মতে মানুষ সর্বদা স্বাধীন; কিন্তু সার্বিক মঙ্গলের জন্য নিজেকে আবদ্ধ করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব ইত্যাদিও এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত বলে তিনি মনে করেছেন। রুশোর প্রভাব ফরাসি বিপ্লবে অনস্বীকার্য। রোমান্টিক বিপ্লবে এখান থেকেই আসে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ মোটের ওপর রোমান্টিক। সেই রেনেসাঁ ও তৎপরবর্তী বুর্জোয়া উত্থানের সঙ্গে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম হচ্ছে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদকে কেউ কেউ মিলিয়ে দেখতে চান। কিন্তু ভারতের ব্যক্তি বৈচিত্র্য ও স্ব-পূর্ণতার আদর্শের কথাও মনে রাখতে হবে এ প্রসঙ্গে। এই অভিমুখ বা দৃষ্টিকোণ থেকে স্মৃতি ও সত্তায় সমাজমুখ্যতা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতায় রাষ্ট্র প্রাধান্য অবশ্যই রবীন্দ্রনাথকে এক দ্বান্দ্বিকতা দান করেছে। এখান থেকেই প্রশ্ন উঠতে পারে জমিদার রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অনুভাব সম্পর্কিত, অর্থাৎ প্রজা মুখ্য ব্যবস্থায় রাজার প্রয়োজনীয়তা কোথায়! প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে সমাজের প্রতিভূ তা দাঁড়িয়ে আছে আধা সামন্ততন্ত্র ও ঔপনিবেশিক নব্যধনতন্ত্রের এক অসমঞ্জস অবস্থানের ওপর। সেই অবস্থান থেকে তিনি যখন অন্যান্য দেশের সামাজিক পরিস্থিতি ও শাসনপদ্ধতি দেখেন, তখন ভোলেন না নিজের দেশের বাস্তবতা। রাষ্ট্রের সর্বময়তার নিদর্শন তখন সমাজের আষ্ঠেপৃষ্ঠে ধরেছে, ব্রিটিশ শাসনে। এবং সেই রানি বা রাজা দেশ শাসন করে সমুদ্রের ওপার থেকে। সাধারণ মানুষের কাছে সেটি অদৃশ্যই। এখন এই অদৃশ্যময়তা দুইভাবে প্রতিভাত হতে পারে। এক, রাজার আলাদা অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। প্রজার সেখানে স্বচ্ছন্দবিহার। রাজা নাটকে 'আমরা সবাই রাজা' গানটির মধ্যে তাই হয়ত গণতন্ত্রের বীজ খুঁজে পেয়েছিলেন টমসন। রাজা যেহেতু আমরা নিজেরাই, সুতরাং রাজা অর্থে এখানে স্বাধীনতা। স্ব + অধীনতা। মনে রাখতে হবে জাতীয়তাবাদের স্বরূপ ছিল স্বনির্ভরতা, রবীন্দ্রনাথের কাছে। বিষয়টিকে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখলে ফ্রয়েডীয় প্রতীক তত্ত্ব অনুযায়ী রাজা, শাসক, আরক্ষা পিতৃ প্রতীক, যা নিয়ন্ত্রণের দ্যোতক। স্বনিয়ন্ত্রণে থাকা মানুষই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এভাবেই সুশীল সমাজের জন্ম হয়, যেখানে স্বেচ্ছায় মানুষ যোগদান করবে। এখানে রুশোর মুক্ত- ইচ্ছার কথা উল্লেখ্য। অন্যদিকে এমন রাজা, যিনি জালের আড়াল থেকে লক্ষ রাখেন অগোচরে। এটাই আধুনিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নজর রাখার পদ্ধতি। ফুঁকোর পরিভাষা ধার করে বলা যেতে পারে 'Panopticism'.

> "Inspection functions ceaselessly. The gaze is alert everywhere: 'A considerable body of militia, commanded by good officers and men of substance' guards at the gates, at the town hall and in every quarter to ensure the prompt obedience of the most absolute authority of the

> magistrates … on the whole, therefore, one can speak of the formation of a disciplinary society in this movement that stretches from the enclosed disciplines, a sort of social 'quarantine', to an indefinitely generalizable mechanism of 'panopticism' … Our society is one not of spectacle, but of surveillance…"[১১]

রাজা এবং মকররাজের এই তফাৎটুকুর দিকে ইঙ্গিত করেছেন নবনীতা দেবসেন তাঁর প্রবন্ধে –

> "প্রকৃতপক্ষে এই দুই চরিত্রের মধ্যে কোনো তুলনা চলে না। মকরের দাঁত যে ব্যক্তির প্রতীক, তার সঙ্গে পদ্মের মর্মস্থলে বজ্রধারী রাজাটির কিসের মিল? মকররাজ একজন সাধারণ মানুষ যিনি নিজেকে জাহির করতে চান অতিমানবিক রহস্যময় পুরুষ হিসেবে, আর 'রাজা' সত্যিই এক রহস্যময় শক্তিমান পুরুষ, যিনি নিজেকে মানবিক মমতায় জড়াতে চান।"[১২]

এখানে ব্যক্তি রাজাকেই পরিগণিত করা হয়েছে। নিরাকার বিমূর্ত রাষ্ট্রশাসনের প্রতীক যে ব্যক্তি। আবার তা সমাজ হলে সমাজপতি। প্রাক – সভ্যতার কালে সেটি দলপতি। আপাতভাবে সাধারণ মানুষের মন এক নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। রাজা এক্ষেত্রে সেই আশ্রয়। এমনকি সেকারণে নিজের ভিতরের মর্ষকামিতাকে জাগিয়ে তুলতেও উদগ্রীব। সেহেতুই পদ্মের মধ্যে বজ্র। কঠিন – কোমলে মেশা ব্যক্তিস্তরিক ধারণা থেকে রাষ্ট্রশাসক ভাবনার যে ক্রম তা লুকিয়ে আছে একধরনের নিরাপত্তাহীনতার অনুভবে। সেকারণেই একসময় প্রজারা বলে– "আমাদের দেশে রাজা একজায়গায় দেখা দেয় না", আবার "আদপে রাজা নেই এ রাজ্যে"– দুইই। এই দোলাচলতায় দিশাহারা হয়ে পড়ে প্রজাদের জীবন। তাদের অনুভবের বাইরে থাকে উপলব্ধির সেই স্তর যে, প্রজারাই রাজশক্তির চালক। অন্যদিকে প্রজাদের সমস্ত আত্মবিশ্বাস গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে 'মরা ধনের' কারবারি মকররাজের রাজরথ। জালে ঘেরা আড়ালে সে বন্দি থেকেও প্রতাপে অদ্বিতীয়। রাশিয়ার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলছেন –

> "অবজ্ঞার কারণকে দূর করবার চেষ্টা না করে লোকের কাছে প্রমাণকরা যে আমরা অবজ্ঞার যোগ্য, এইটা হচ্ছে আমাদের অশক্তির সব চেয়ে বড়ো ট্যাক্স।"[১৩]

এই তথাকথিত অশক্তের, 'সভ্যতার পিলসুজের' ওপর ভর করেই তো শক্তিমানের শক্তি প্রদর্শন! 'রক্তকরবী' নাটকে নন্দিনী এবং অধ্যাপকের কথোপকথনে বিষয়টি ফুটে ওঠে–

অধ্যাপক। নন্দিনী, যে দিকটাতে ছাই, তোমার দৃষ্টি আজ সেই দিকটাতেই পড়েছে। একবার শিখার দিকে তাকাও, দেখবে তার জিহ্বা লকলক করছে।

নন্দিনী। তোমার কথা বুঝতে পারছি নে।

অধ্যাপক। রাজাকে তো দেখেছ? তার মূর্তি দেখে শুনছি নাকি তোমার মন মুগ্ধ হয়েছে?

নন্দিনী। হয়েছে বৈকি। সে যে অদ্ভুত শক্তির চেহারা।

অধ্যাপক। সেই অদ্ভুতটি হল যার জমা, এই কিম্ভূতটি হল তার খরচ। ঐ ছোটোগুলো হতে থাকে ছাই, আর ঐ বড়োটা জ্বলতে থাকে শিখা। এই হচ্ছে বড়ো হবার তত্ত্ব।

নন্দিনী। ও তো রাক্ষসের তত্ত্ব।

অবশ্য 'রক্তকরবী' নাটকে জালের আড়াল প্রায় সর্বত্রসঞ্চারী হয়েও একটু ফাঁক থেকে যায়। সেখানেই আবির্ভাব ঘটে সর্দার চরিত্রের। রাজা সেখানে নিজেই হয়ে পড়ে আক্ষরিক অর্থেই জালে বন্দী।

এর পাশাপাশি আমরা সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' এবং 'হীরক রাজার দেশে' ছবি দুটিকে দেখে নিতে পারি। আপাত রূপকথাধর্মী কথার (tale) অভ্যন্তরে রজনৈতিক চলন এই ছবি দুটির বৈশিষ্ট্য। 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা একটি গল্প। সত্যজিৎ রায় যখন ছবিটি তৈরি করেন তখন তা হয়ে দাঁড়ায় গল্পটির এক ভিন্নতর ব্যাখ্যা তথা উদ্ভাসন (interpretation)। উপেন্দ্রকিশোর থেকে সত্যজিৎ এই তিন প্রজন্মের সময়ের রাজনীতির ধরণ গেছে বদলে স্বাভাবিকভাবেই। গল্পের শুণ্ডি ও হাল্লা রাজা এবং চলচ্চিত্রের হাল্লা ও শুণ্ডি রাজার স্বভাব তাই গেছে পাল্টে, স্বভাবতই। এর মধ্যে দেখে নেওয়া যেতে পারে সুকুমার রায়ের 'রাজার অসুখ' গল্পটি। সেখানে রাজা ও ফকিরের অবস্থান, আনন্দ ও মুক্তির এবং বদ্ধতার দ্বন্দ্ব। দুখী রাজা তাই মাঠে খোলা

হাওয়া খেলে শান্তি পায়, গুপীর গানে। ঠিক এখানেই নজর পড়ে 'শারদোৎসব' নাটকটির দিকে, এবং সেই সূত্র ধরে 'ঋণশোধ' নাটক। 'ঋণশোধ' নাটকের ভূমিকাংশে লক্ষ করা যায় –

মন্ত্রী। মহারাজ, এই হচ্ছে রাজনীতি।

বিজয়াদিত্য। কী তোমার রাজনীতি?

মন্ত্রী। রাজ্য রাখতে রাজ্য বাড়াতে হবে। ও যেন মানুষের দেহের মতো, বৃদ্ধি যেমনি বন্ধ হয় ক্ষয়ও তেমনি শুরু হতে থাকে।

বিজয়াদিত্য। রাজ্য যতই বাড়বে তাকে রক্ষা করার দায়ও তো ততই বাড়বে– তাহলে থামবে কোথায় ?

মন্ত্রী। কোথাও না। কেবলই জয় করতে হবে, কেননা প্রতাপ জিনিসটা যেখানে থামে সেইখানে নিয়ে যায়।

এই আগ্রাসী লোভই দেখা যায় হাল্লার মন্ত্রীর মধ্যে। রাজ্যের লোককে আধপেটা খেতে দিয়ে, না দিয়ে সেই সঞ্চিত (বলা ভালো লুণ্ঠিত) অর্থে চলে সৈন্যের কুচকাওয়াজ । খিদের কথা বললেই প্রজাদের শুনতে হয় আজ বাদে কাল যুদ্ধের কথা। ধনঞ্জয় বৈরাগীর উদ্বৃত অন্ন এবং ক্ষুধার অন্নকে বৃদ্ধাঙ্গুঠ দেখিয়ে চলে শাসনের নামে শোষণ। রাজা আপন জালে বন্দী। 'রক্তকরবী' নাটকেও দেখা যায় সর্দারই হর্তাকর্তা। এই বিষয়ে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমলার মন' গ্রন্থের রক্তকরবী বিষয়ক আলোচনাটি উল্লেখ্যযোগ্য। তিনি দেখাচ্ছেন রক্তকরবী একইসঙ্গে ডমিন্যান্স এবং হেজিমনির আখ্যান । তা ছিল বিদায়ী ব্রিটিশ শক্তি ও গণতন্ত্রের উত্থানপূর্বের রূপরেখা। এদিক থেকে সত্যজিৎ যখন 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' নির্মাণ করেন, তখন স্বাধীন ভারতে মন্ত্রীদের কার্যকলাপ কি লক্ষ্য বস্তু হয়ে ওঠে ? রাজা কি দেশের রূপক? দুই রাজা প্রতিবেশী দুই দেশের রূপক। কৌটিল্যের চক্রবর্তী রাজার ভাবনা এখন প্রায় অস্তমিত ঠাণ্ডা যুদ্ধের কালে। মন্ত্রী চালিত দেশের স্থিতি ও অস্থিরতা এক বিমূর্ত উদ্বেগের জন্ম দেয়। সুকুমার রায়ের 'কানা-খোঁড়া সংবাদ'– এর সেই দুই রাজা

"মন ছিল খোলা, অতি আলাভোলা,
ধরমেতে ছিল মতি,
পর ধনে সদা ছিল দোঁহাকার
বিরাট বিকট অতি ।
প্রতাপের কিছু নাহি ছিল ত্রুটি
মেজাজ রাজারি মত,
শুনেছি কেবল বুদ্ধিটা নাকি
নাহি ছিল সরু তত ।
ভাই ভাই মত ছিল দুই রাজা,
না ছিল ঝগড়াঝাঁটি, ..."[১৪]

এই সৌভাতৃত্ব ভেঙে যেতে থাকে তিন হাত জমির জন্য। পৃথিবীর আদিমতম লিপ্সা ভূমি দখল এবং তৎসংলগ্ন মানুষের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার। ডমিন্যান্স থেকে হেজিমনি। এভাবেই এক জৈব ও মানস ক্ষমতাকে সুচারুভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যাতে সময়ের সঙ্গে সেই অবস্থাকেই মনে হয় স্বাভাবিক।

প্রকৃতপক্ষে এটিই 'মগজধোলাই'। যেখানে মানুষ হয়ে ওঠে যান্ত্রিক। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ছিল একদল পুতুল। শাসকের অঙ্গুলিহেলনে নেচে উঠত। আধুনিক নব্য-ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষ এখন রোবট। এভাবেই রাষ্ট্রের আড়ালে শাসকের জৈব-মানস আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহলে কেমন হতে পারে আদর্শ রাষ্ট্র ও শাসকের প্রতিচ্ছবি ? গ্রামশ্চি বলছেন,

> "In my opinion, the most reasonable and concrete thing that can be said about the ethical state, the cultural state, is this: every state is ethical in as much as one of its most important functions is to raise the grate mass of the population to a particular cultural and moral level, a level (or type) which corresponds to the needs of the productive forces for development, ..."[১৫]

যদিও সাংস্কৃতিক আধিপত্য, এর মাধ্যমে স্থাপিত হয় কি না, তা বিচার্য। কিন্তু তবু, যে রাজার রাজ্যে বসে সঙ্গীতের আসর, পাখিদের কলকাকলি আর অন্য দিকে সৈন্যের কুচকাওয়াজ সেখানে দুটির মধ্যে পার্থক্য অবিদিত নয়। এর সাহায্যেই অনুধাবন করা যায় রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিতের আদর্শ দেশ সম্পর্কে মনোভাব। রবীন্দ্রনাথের 'শারদোৎসব' নাটকে শরতের যে বিভিন্ন দিক লক্ষ করা যায়, যেখানে শরৎ দিগ্বিজয়ের ঋতু- প্রাচীন রাজা যুদ্ধ জয়ে বের হতেন। বণিকরা বের হত বাণিজ্যে। যাত্রার রূপকেই আসে 'অমল ধবল পালে' বেয়ে মেঘের গমন। শরৎ তাই অবকাশ, সোনালি রৌদ্র। একদিকে যেমন লক্ষেশ্বর ব্যবসা বুদ্ধি ও অন্যদিকে রাজা বিজয়াদিত্যের দিগ্বিজয়। কিন্তু এই বিজয় প্রকৃতির বিজয়ের ন্যায়। সেখানেই সংঘাত বাঁধে অঙ্গরাজ্যের রাজার সঙ্গে।

রাজা। সেকথা নিশ্চয় তোমার অগোচর নেই। আমি অখণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হতে চাই প্রভু!

সন্ন্যাসী। তা হলে গোড়া থেকে শুরু করো। তোমার খণ্ডরাজ্যটি ছেড়ে দাও।

রাজা। পরিহাস নয় ঠাকুর! বিজয়াদিত্যের প্রতাপ আমার অসহ্য বোধ হয়, আমি তার সামন্ত হয়ে থাকতে পারব না।

সন্ন্যাসী। রাজন্, তবে সত্য কথা বলি, আমার পক্ষেও সে ব্যক্তি অসহ্য হয়ে উঠেছে।

রাজার ছদ্মবেশে বিজয়াদিত্য প্রকৃতই রাজর্ষি, যার আকর্ষণ-সীতা উৎসবের বনভোজনে যাওয়ার জন্য প্রাণ কাঁদে। এখানেই তুল্য হয়ে ওঠে ছবির হাল্লা রাজা। কিন্তু বিজ্ঞান ও যাদুকে কাজে লাগিয়ে তাকে করে তোলা হতে থাকে হিংস্র রোবট। পাশব প্রবৃত্তিকে করা হয় লাগামছাড়া। নব্য সমাজ এভাবেই আমাদের লোভাতুর করে অপ্রাপ্তির হতাশায় তলিয়ে দিয়ে আগ্রাসী করে ফেলছে তার বৈজ্ঞানিক পণ্যের সহায়তায় এবং মুক্ত ক্রয় বিক্রয়ে। এখানে একটা প্রশ্ন উঠবে, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী রচিত 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' গল্পের সঙ্গে চলচ্চিত্রের পার্থক্য প্রসঙ্গে। উপেন্দ্রকিশোরের গুপী ও বাঘার কাহিনি প্রান্তিক মানুষের ক্ষমতাপ্রাপ্তি ও ইচ্ছাপূরণের গল্প। কাইন (গাইন) এবং পাইন (বাইন) নিম্নবর্ণীয়, তদুপরি নিজেদের শখের কারণে তারা প্রান্তিক। ভূতের রাজার বরে শুরু হয় পট পরিবর্তন। গল্পে তিন বরের মধ্যে প্রথমে গুপী ও বাঘা চায় গানবাজনার অধিকার ; কিন্তু চলচ্চিত্রে প্রথমে খাওয়া পরার কথা আসে, যেটি গল্পে ছিল দ্বিতীয় বর, এখানে গানবাজনার অধিকার তাদের পরিচয়ের সঙ্গে জড়িত। তাদের অস্তিত্ব। সত্যজিৎ তিন বরের প্রসঙ্গটির বিন্যাস করেন মানুষের মৌলিক চাহিদা ও অধিকারের ক্রমঃস্তরে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান। যোগাযোগ-ভ্রমণ, শখ ও আনন্দ। শুধু এখানে বাসস্থানের উল্লেখ নেই, তাদের ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে। দিগন্তবিস্তৃত মাঠে, গাছের ছায়ায় তাদের দিন কাটে। নদীর পাড়ে মহাভোজে বসে যায়। Abraham Maslow নামক এক মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক মনস্তত্ত্ববিদ মানুষের মৌল চাহিদার এক পিরামিডের ন্যায় রেখাচিত্র পরিবেশন করেছিলেন, যার পাঁচটি স্তর।[১৬] ground level- Basic/ psychological needs, safety & Security, Love & Belongings, Self-esteem, Self-actualization.

. Psychological needs (breathing, food, water, shelter, cloth, rest)

. Belongings and Loveliness (love affection, friendship) - Esteem needs

. Self- actualization (creative activities) - Self-fulfillment.

এই দিক থেকে প্রাথমিকভাবে খাদ্য, বস্ত্রের কথা এসেছে। তবে ভূতের রাজার বরের পর প্রথম দিনের আলোয় গলা ছেড়ে ওঠে গান, তারপরই অনুভূত হয় 'পেটে খালি বড় ভুখ'। এখানে ওই পিরামিড চিত্রের অবরোহণ ঘটেছে। ঠিক এরপরই আসে মধ্যবর্তী পর্ব (Belongingness), যেখানে রাজত্বের সঙ্গে রাজকন্যার কথা মনে আসে।

অন্যদিকে ভূতের নাচের সেই দীর্ঘ দৃশ্য। 'দর্পণ' পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ এই ব্যাপারে বলেছেন চেনাভূতকে ছেড়ে বাস্তবের প্রতিচ্ছবিকেই তিনি জানতে চেয়েছেন। ভূত অর্থাৎ অতীত হলে, অতীত থেকেই চলে আসা সমাজের বর্গ ও বর্ণের ক্রমবিন্যাস ধরা যেতে পারে। রাজা-রাজাড়া, চাষাভুষো, সাহেব ভূত, মোটা বেনে ভূত এইভাবে স্তর বিন্যাস হয়। ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র। লক্ষণীয় গুপী-বাঘাকে বর দেয় ব্রাহ্মণ ভূত (ব্রহ্মদৈত্য), অর্থাৎ এই তিনস্তরের মাথা, যার অনুমোদনের ওপরই ওই প্রান্তিক গুপী ও বাঘার অস্তিত্ব টিকে আছে। এই বিন্যাস মৃত্যুর পরেও যেন মানুষের পিছু ছাড়ে না। অন্যদিকে সাহেব ভূত বাইবেল হাতে প্রবেশ করে, এরপর সামাজিক চিত্র একটু পরিবর্তিত হয়, অন্তত উৎপাদন ব্যবস্থার দিক থেকে। এবং ঔপনিবেশিক পরিকাঠামোয় ক্ষুধা হয়ে ওঠে অন্যতম লক্ষণ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে এই নেটিভদের খিদের একাধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ

বিশ্বস্ত দলিল পাওয়া যায়। পুনরুক্তি সত্ত্বেও বলতে হয় সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবিই 'পথের পাঁচালী'। সত্যজিৎও প্রত্যক্ষ করেছেন মন্বন্তর ও স্বাধীনতা পরবর্তী খাদ্য আন্দোলন।

তিনটে বর যেন সব পেয়েছি দেশের সন্ধান। যেখানে খাওয়া পরার অভাব নেই, তালি দিলেই চলে আসে। যেখানে মনের আনন্দে গেয়ে ওঠা যায়। আবার গানই হয়ে ওঠে অস্ত্র। যার দ্বারা যুদ্ধ থামানো যায়। আবার জীর্ণ জীবনহারা যাপনের নির্মোক আত্মাকে অনাবিল করে সঙ্গীত। তাই হাল্লা রাজার রাজসাজ খসে পড়ে গান শুনলে। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে বলা হয়েছিল গানে শত্রুকে মিত্র করা যায়।

সঙ্গীত-অস্ত্রের এক ভিন্ন প্রয়োগ দেখা যায় 'হীরক রাজার দেশে' ছবিতে। এখানে যুদ্ধ হয়েছিল, অত্যাচারী শাসকের পতনের লক্ষ্যে। কিন্তু সেই যুদ্ধ বা বিপ্লব অহিংস, রক্তপাতহীন। এক গণতান্ত্রিক কাঠামোর ছাঁদ লক্ষ্য করা যায়। যেখানে শেষে অপামর সর্বশ্রেণি ও সর্বস্তরের মানুষ যোগ দেয় রাজমূর্তি ভাঙনকল্পে। যেন 'রথের রশি' নাটকের উচ্চনীচ ভেদ সমান করে, মহাকালের রথ যাত্রা। এই গণতান্ত্রিক ভাব লক্ষ করা যায় 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' ছবিতেও, যেখানে মূক প্রজাদের বাকক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ নীরব, অনুচ্চ কণ্ঠস্বরও স্বীকৃতি লাভ করে। এবং দুই রাজার পরিচ্ছদ হিন্দু ও মুসলমানের। গণতান্ত্রিক ধর্মনিরেপক্ষ রাষ্ট্র। 'রক্তকরবীর'র শেষে রাজা নিজের বিরুদ্ধেই লড়তে যায়, বুঝতে পারে নিজেই নিজের তৈরি তন্ত্র (system) –এর শিকার। 'হীরক রাজার দেশে' ও রাজার নিজেরই মগজধোলাই হয়ে যায়। 'রক্তকরবী'র সর্দারতন্ত্রের ছাপ লক্ষ করা যায় 'গুপীগাইন ও বাঘাবাইন' ছবির হাল্লার মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে। 'হীরক রাজার দেশে'-তে রাজা স্বৈরাচারী (autocrat), অনেকটা মকররাজের মতনই। ধরিত্রীর বুক চিরে সোনা এবং হীরা তারা বের করে এনে, তাকে কুক্ষিগত করে এক অশোভন ঐশ্বর্যের প্রদর্শন করে তারা। 'কালান্তর' প্রবন্ধ সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

> "... 'পশ্চিমের যে শক্তিরূপ দেখে এলে। তাতে কি তৃপ্তি পেয়েছ?' না, পাই নি। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বলছি নে, ইংরেজিতে বলতে হলে হয়তো বলতেম, টাইট্যানিক ওয়েল্থ্ । অর্থাৎ, যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল । হোটেলের জানলার কাছে রোজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশতলা বাড়ির ভ্রুকুটির সামনে বসে থাকতেন আর মনে মনে বলতেন, লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর- অনেক তফাত। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রী লাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই।"[১৭]

এবং সংগ্রাহক প্রবৃত্তি থেকে সঞ্চয়ীবৃত্তি যান্ত্রিকতার সূচনা করে। এই যন্ত্র ও প্রাণই কুবের ও লক্ষ্মীর প্রতীক। মগজ ধোলাইয়ের মাধ্যমে মানুষকে এই যান্ত্রিক করে তোলারই প্রচেষ্টা চলে। যান্ত্রিক অর্থে নিজস্ব অনুভূতি, আবেগ, চিন্তন শক্তি তিরোহিত। সেখানেই আঘাত হানে গুপী ও বাঘা। যখন হীরক রাজার বিরুদ্ধে গুপী গান গেয়ে ওঠে, তখন সেই গানের প্রথম কলিই হয় "নহি যন্ত্র নহি যন্ত্র আমি প্রাণী।" যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রাণকেই জয়যুক্ত করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, 'রক্তকরবী'তে। যান্ত্রিকতার চরম এক রূপ দেখা যায় 'মুক্তধারা' নাটকে। সেখানেও যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই। তবে লড়াইটা ঠিক যন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়, যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে। 'মুক্তধারা' নাটকে যন্ত্রের আড়ালে রাষ্ট্রের আগ্রাসনকে অনেক সময় আমরা লক্ষ করি না। কিন্তু 'মুক্তধারা'য় এমন এক Totalitarian রাষ্ট্রের পরিচয় পাওয়া যায় যেখানে শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি সবই হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রের অনুকূল । শিক্ষক, বিজ্ঞানীর পরিচয় রাষ্ট্রের বেতনভুক কর্মচারী মাত্র । মার্কসের মতে,

> "The bourgeoisie has stripped of its halo every occupation hitherto honoured and looked up to with reverent awe. It has converted the physician, the lawyer, the priest, the poet, the man of science, into its paid wage-labourers." [১৮]

আধুনিক সংগ্রহপ্রবণ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এটিই ভবিতব্য। এখানেই গোল বাধায় গুপী ও বাঘা। যক্ষপুরীতে যেমন নন্দিনী। 'রক্তকরবী' নাটকের প্রস্তাবনায় দেখা যায়– *ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎ বজ্রধারী দেবতার আপন প্রাসাদাদ্বারে শৃঙ্খলিত করে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারত।*

কিন্তু তার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অমনি ধর্ম জেগে উঠলেন। মূঢ় নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটে নি কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে। তা ছাড়া কলিযুগের রাক্ষসের সঙ্গে কলিযুগের বানরের যুদ্ধ ঘটবে, এমনও একটা সূচনা আছে।

গুপী ও বাঘা দু'জনে এসে এক বিপ্লবাত্মক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। চকিতে মনে পড়ে যেতে পারে 'তাসের দেশ' নাটিকার কথা। 'তাসের দেশ' নাটিকাতে রূপকথার ন্যায় অভাব-যাত্রা-আরোপণ-প্রতিপক্ষ এই ক্রমবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে অভাব, জীবনীশক্তির অভাব। গুপী বাঘার ক্ষেত্রেও তাই, একঘেয়ে দিনযাপন থেকে ভ্রমণ। ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছে যায় হীরক রাজ্যে। সেখানে এক গুহায় পরিচয় ঘটে উদয়ন পণ্ডিতের সঙ্গে। 'তাসের দেশ'-এ নিয়মের রাজত্বে ফাটল ধরায় রাজপুত্র- সদাগর পুত্রের জুড়ি। নিয়মের রাজত্বে এক অর্থে সন্ত্রাসের রাজত্ব। ফ্যাসিস্ট শাসকরা মূলত অতিরিক্তমাত্রায় আত্মপ্রেমী। চলচ্চিত্রে গুপী ও বাঘা সরাসরি বিপ্লব আনেনি কিন্তু অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। এখানে একটা পার্থক্য ঘটেছে 'তাসের দেশ' -এর সঙ্গে এবং 'মুক্তধারা'র সঙ্গেও। 'মুক্তধারা'য় শিক্ষককেও রাষ্ট্র করে তুলতে পেরেছে অনুরাগী। 'হীরক রাজার দেশে' ঠিক তার পূর্ব পর্যায়, হীরক রাজার সৈন্য হন্যে হয়ে খুঁজেছে উদয়ন পণ্ডিতকে। যাবতীয় পুঁথি পত্র পুড়িয়ে ফেলেছে। সংস্কারের নামে ঐতিহ্যকে ধ্বংস একাধিকবার দেখা গেছে ইতিহাসে। শিক্ষাকে ধ্বংস করে এবার খোঁজ চলছে উদয়নের, মগজধোলাইয়ের জন্য। যদিও সেই মস্তিষ্ক প্রক্ষালোক যন্ত্র শেষে রাজার বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয় । এখানেই গুপী-বাঘার ভূমিকা। উদয়ন, সেই বুদ্ধিজীবি শ্রেণির, বিদেশি শক্তির সাহায্যে বিপ্লব ঘটাতে চায়। অন্যদিকে বিজ্ঞানী, মস্তিষ্ক প্রক্ষালক যন্ত্রের আবিষ্কর্তা। রাষ্ট্র তার উদ্ভাবনী শক্তিকে এভাবেই নিজের কাজে লাগিয়েছে। সেও সেবকে পরিণত হয়েছে। কিন্তু মনের মধ্যে হতাশাকে লুকোতে পারেনি, বিশেষ করে যখন সে 'আমি একা, আমি একক, একমেবদ্বিতীয়ম' বলে তখন সেই যন্ত্রণা ও রাগ ফুটে ওঠে। গুপী ও বাঘা এটাকেই কাজে লাগায়, যদিও তার মধ্যে লোভ জাগিয়ে তুলে। আবার অন্য দৃষ্টিতে দেখলে, এটি সম্পদের বন্টন, যখন সঞ্চিত হীরক, গুপী ও বাঘা বিলিয়ে দেয় জনসাধারণের মাঝে। দ্বিতীয় বিরোধী কণ্ঠের চারণগান শোনা যায় ঠিক এই সংলগ্নেই। অনেকটা রবীন্দ্রনাট্যের ধনঞ্জয় বৈরাগীর মতো। এবার ভাঙতে থাকে রাজতন্ত্র। যদিও রাজতন্ত্র আপাতদৃষ্টিতে। প্রকৃতদৃষ্টিতে যে কোন শাসকতন্ত্র। অনেকসময় গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে, বিপ্লবের আড়ালে আসে একনায়কতন্ত্র (Jacob Leib Talmon প্রদত্ত Totalitarian democracy-এর ভাবনা প্রসঙ্গত স্মরণীয়) চলচ্চিত্রেও আমরা হীরক রাজাকে একাধিবার দেখি মন্ত্রীদের 'ঠিক কি না' জিজ্ঞাসা করতে, মন্ত্রীদেরও যেন কাজ শুধু 'ঠিক' কথাটা উচ্চারণ করা। শুধু পুরোহিত-জ্যোতিষী মাঝেমধ্যে ঈঙ্গিতপূর্ণ রহস্যময় কিছু উক্তি করেন। তা বাদে কবিও বেতনভুক কর্মচার। তার কবিত্বশক্তি হীরকরাজার গুণকীর্তনেই নিবেদিত। তাহলে 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' ছবির উন্নতিকামী গণতন্ত্রের অবস্থান কি এখানে ধাক্কা খেল? কিন্তু এর পাশেই দেখা যায় ছবির শেষে জনসাধারণের জাগরণ। যাদের জীবন ছিল গদ্যময়, ক্ষুধার রাজ্যে। এর সঙ্গে মিলিত হয় কাব্যের রাজ্যের রাজা ও রাজপ্রতিনিধি। রাজাও মুক্তি পায় তার রাজত্বের শৃঙ্খলাবয়ব থেকে। যেমন হাল্লার রাজা শরতের আকাশের মতোই ছুটির আনন্দে ছুটে বেড়ায়। এই মুক্তিই প্রাণ। স্বতঃস্ফূর্ততা। জীবন।

> "স্বভাবতই সংসারের একটা দিক যান্ত্রিক। সামাজিক কাঠামো, অর্থনীতিক কাঠামো, রাষ্ট্রিক কাঠামো, সবই অল্পবিস্তর যান্ত্রিক... কঙ্কালের নীরস অথচ দৃঢ় কাঠামোটাকে বাদ দিলে মানবদেহের চলে না। কিন্তু কঙ্কালের কাঠামোটাই সব নয়, তার উপরে রক্তমাংস আছে, এবং সবচেয়ে বেশি করিয়া আছে দেহের লাবণ্য ও মুখশ্রী। ঐখানেই মানুষের পরিচয় ... যন্ত্র এবং প্রাণ, দার্ঢ্য ও প্রেম, কর্তব্য ও আনন্দ মিলাইয়া জীবনের পূর্ণতা। কিন্তু কোনো কারণে কোনো সমাজে যদি যন্ত্রের দিকটাই প্রবল হইয়া ওঠে, তখন সে সমাজ মরিতে বসে। তখন সেই সমাজের মধ্যে হয় নন্দিনীর আবির্ভাব ঘটে, নয় সেই সমাজ ধ্বংস হয়।"[১৯]

গুপী বাঘা ফিরে এলো' এ থেকে একটু ভিন্ন। এখানে গুপী ও বাঘার আকাঙ্ক্ষা এবং আচার্য্যি মশাইয়ের অভীপ্সা পরস্পরকে ছেদ করেছে। ছবির প্রথমেই গুপী ও বাঘার মনোদুঃখ লক্ষ করা যায় বয়োবৃদ্ধির কারণে। 'ফাল্গুনী' নাটকের প্রথমে দেখা যায় রাজার বয়সবৃদ্ধি হেতু হতাশা। কবিশেখর বলে- *মহারাজ, এ-যৌবন ম্লান যদি*

হল তো হোক-না। আরেক যৌবনলক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন – নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে। সেখান থেকেই শুরু নাট্যকাহিনির বুনন। শেষ অবধি সেটি পৌঁছে যায় জীবন-মৃত্যুর দার্শনিকতায়। ফাল্গুনীর রাজাও আত্মপ্রেমী। রাজ্যের কর্ম, আশু কর্তব্য ফেলে রেখে, নিজের বয়সের চিন্তায় বিভোর। কিন্তু কবিশেখর ফাল্গুনী নাটকের মধ্য দিয়েই রাজার চক্ষু উন্মোচন করতে চায়। নাটকের প্রেক্ষিতে বসন্তকাল। কারণ বসন্ত শুধু ফোটো ফুলের মেলা নয়, ঝরা পাতার খেলাও। এই দ্বিতীয় যৌবনেই সম্ভব হয় নিরাসক্ত ভোগ। ত্যাগ ও ভোগের সঙ্গম। *এতদিন বসন্ত তার চোখের জলটা আমাদের কাছে লুকিয়ে ভেবেছিল আমরা বুঝতে পারব না, আমরা যে যৌবনে দুরন্ত। আমাদের কেবল হাসি দিয়ে ভুলোতে চেয়েছিল। কিন্তু আজ আমরা আমাদের মনকে মজিয়ে নেব এই সমুদ্রপারের দীর্ঘনিশ্বাসে।* [ফাল্গুনী]

গুপী ও বাঘাও এই সহজ এবং অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান পায় এক স্বপ্নের মাধ্যমে। ভূতের রাজা আক্ষেপ করে, গুপী বাঘার এই পতনে। পরদিন প্রথম সকালে, আলোকের ঝর্ণাধারায় স্নাত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে আলোর কাছে, সত্যের কাছে, সহজের কাছে। সেই পথ দিয়েই আচার্য্যি মশাইয়ের বিনাশ ঘটে। আচার্য্যি চেয়েছিল অমরত্ব। এই অভীপ্সা বাড়িয়ে তুলেছিল শুধু ভোগ লিপ্সা। মৃত্যুভয় থেকেই জাগে অবিরাম ভোগের তাড়না। ক্লান্ত মন ছুটে চলে নতুন ভোগের সন্ধানে। এই সত্য অস্বীকারের ভ্রমকে ছেদ করার জন্য প্রয়োজন এক নিষ্পাপ অন্তর্ভেদী চোখ। সেই ভূমিকাই পালন করে বিক্রম। ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’-এ এক বালিকা সন্ন্যাসীর নব সত্তার উদ্বোধন করে। বিক্রম এখানে দুর্গে বসবাসকারী সন্ন্যাসীরূপী দৈত্যের বিনাশ করে। গুপী ও বাঘার গান আর সরাসরি অস্ত্র না হয়ে এক্ষেত্রে হয়ে ওঠে সঙ্গত। এখানেও যুদ্ধ হয় রক্তপাতহীন। নিষ্পাপ দৃষ্টি। বিবেকের দৃষ্টি। চেতনার। গান সেই চেতনাকে চৈতন্যময় করে তুলতেই সাহায্য করে। ‘আগন্তুক’ ছবিতে সত্যজিতের আত্ম-মানসচরিত্র বলে তারাই সভ্য যারা অস্ত্র প্রয়োগে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তারই বিরোধী এক রূপ ফুটে ওঠে এই রক্তহীন যুদ্ধ বা বিপ্লবে।

> “Derrida insists that deconstruction is not a method, technique or species of critique. According to Derrida, deconstruction is a useful means of saying new things about the text.”[২০]

এই নতুন দিককেই দেখিয়েছেন সত্যজিৎ। রবীন্দ্রনাটক এবং উপেন্দ্রকিশোর- সুকুমারের সাহিত্যের এক ভিন্ন আঙ্গিকীকরণ ঘটেছে চলচ্চিত্রে। সঙ্গে মিশেছে সেই সময়ের দান। তাঁর নিজস্ব দূরদর্শিতা, বিশেষত রাজনৈতিক বোধ। যেমন, উৎপল দত্ত একটি লেখায় (বিদ্রোহী সত্যজিৎ) হীরক রাজার হাস্যকর ভাবে উপস্থাপনাকে তুলনা করেছেন মাও সে তুং –এর ‘কাগুজে বাঘ’-এর সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে এভাবে বয়ে চলে ঐতিহ্য পরম্পরা। প্রবহমানতা সংস্কৃতির লক্ষণ। প্রাবন্ধিক অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বলছেন,

> “যিনি উপেন্দ্রকিশোরের নাতি ও সুকুমার তনয় তিনি যে রবীন্দ্রনাথকেই গৃহদেবতা ভাববেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু সবিস্ময়ে খেয়াল করি তিনি রবীন্দ্রনাথকে কত ভাবেই না আবিষ্কার করেছে।”[২১]

এবং দুজনের দর্শনই কোথাও গিয়ে মিলে গেছে মানবতাবাদী এক বাঁকে। যদিও আভিধানিক মানবতাবাদে দুজনের কেউই চিহ্নিত হতে চাইতেন কি না সন্দেহ। সত্যজিৎ তো আলাদা করে মানবতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করার যৌক্তিকতা কোথায় এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ঠিকই তো, শিল্পী মাত্রেই মানবতাবাদী। সমস্ত তন্ত্রই মানবসৃষ্ট। তবে রবীন্দ্রনাথ যে আধ্যাত্মিক পূর্ণতার কথা ভাবতেন, সেখানে সত্যজিৎ হয়ত একমত হবেন না; কিন্তু তাতে মূল বক্তব্যের হেরফের হয় না। রবীন্দ্রনাথও মানুষের পার্থিব চাহিদাকে অস্বীকার করেননি, এমনকি রাজনৈতিকতাকে দেখেছেন মানুষের সার্বিকতার দিক থেকে। ‘বর্ষামঙ্গল’-এর শান্তিবচনে তাই ডাক দেন দানবের সাথে সংগ্রামের জন্য। ‘হীরক রাজার দেশে’ও উদয়ন পণ্ডিত বলে যুদ্ধটা প্রয়োজন। সামগ্রিক স্বার্থে যুদ্ধ কখনো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ‘গুপী গাইন ও বাঘা বাইন’ এর পাশাপাশি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবিরোধী ছবির মধ্যে অন্যতম। রাজনৈতিক ছবির প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রাজনৈতিক হিসেবে আলাদা ভাবে চিহ্নিতকরণে তেমন পক্ষপাতী ছিলেন না। আবার এও বলেছেন ভারতে সরাসরি রাজনৈতিক ছবি করা সম্ভব নয়। সত্যজিৎ ছবির আঙিনায় রাজনীতিকে এনেছেন প্রত্যক্ষ ও প্রতীকী দু’ভাবেই। আমরা ‘গুপী গাইন ও বাঘা বাইন’কে সত্যজিতের প্রথম সার্বিক রাজনৈতিক ছবি বলতে চাই। এর আগের ছবিগুলি যে অরাজনৈতিক তা নয়, পুনরুক্তি সত্ত্বেও বলতে হয় সব শিল্পই কোন না কোনভাবে রাজনৈতিক। বিশেষ

করে 'পরশ পাথর', 'জলসাঘর', 'মহানগর' প্রভৃতি ছবি উল্লেখ্য। কিন্তু গুপী বাঘায় আমরা সরাসরি দেশের অবস্থান, সৌভাতৃত্ব, রাষ্ট্রের আগ্রাসন, নিম্নবর্ণের অবস্থান লক্ষ করি। এর পরেই 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র মধ্য দিয়ে কলকাতা ত্রয়ী হয়ে 'হীরক রাজার দেশে' পৌঁছনো। এই ছবিটিকে সত্যজিৎ ফান্টাসিধর্মী বলেছেন। কিন্তু আবারও রূপকের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক বার্তা। এভাবেই মানুষের সামগ্রিকতা ও জাতীয়তার শিকড়ে আন্তর্জাতিকতায় শাখা মেলেছেন দুজনেই। জীবনপ্রান্তে এসে সমগ্র সভ্যতা ও জীবনের পাদটীকা নির্মাণ করেন 'সভ্যতার সংকট' এবং 'আগন্তুক'-এর মাধ্যমে। 'সভ্যতার সংকট' -এর শেষের সেই আশাবাণীই হয়ে ওঠে উভয়ের জীবনের কস্তুরি মৃগনাভি।

> "মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি। এই কথা আজ বলে যাব, প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে..." [২২]

তথ্যসূত্র ও উল্লেখপঞ্জী:

১। কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক, শঙ্খ ঘোষ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০০৯, পৃঃ - ৩১।
২। প্রবন্ধ সংগ্রহ, সত্যজিৎ রায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা - ৯, ২০১৫, পৃঃ - ৩০৮।
৩। অপুর পাঁচালি, তদেব, ২০১৮, পৃঃ - ১৮।
৪। তদেব।
৫। উপেন্দ্রকিশোর, সত্যজিৎ রায়, প্রবন্ধ সংগ্রহ (মূল গ্রন্থ), প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৪০৭-৪০৮।
৬। রূপকথা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা (মূল গ্রন্থ), সরস্বতী লাইব্রেরী, কলকাতা-৭৩, চৈত্র ১৩৫৩, পৃঃ- ৩-৪।
৭। জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা - ১৭, ১৪২৬, পৃঃ- ১৯।
৮। রাজার বাড়ি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশু (মূল গ্রন্থ), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪২৬, পৃঃ- ৫৫।
৯। রাশিয়ার চিঠি, তদেব, ১৪১১, পৃঃ - ২৫-২৬।
১০। কালান্তর, তদেব, ১৪২৫, পৃঃ - ৩৪৪।
১১। Discipline and punish – The Birth of the Prison, Michel Foucault, penguin Book, England, 1991, P – 195-217 .
১২। ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অন্যান্য প্রবন্ধ, নবনীতা সেন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ১৩৯০, পৃঃ- ৫০।
১৩। রাশিয়ার চিঠি, পৃঃ - ২১।
১৪। সুকুমার সাহিত্য সমগ্র (প্রথম খণ্ড), সুকুমার রায়, আনন্দ পাবলিশার্স, জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ, পৃঃ-১২০।
১৫। Prison Notebooks, Antonio Gramsci, Fleek Books, London, 1999, P-526 .
১৬। ১৯৪৩ সালে 'Psychological Review' journalএ প্রকাশিত 'A Theory of Human Motivation' শিরোনামে। বর্তমান তথ্য আন্তর্জাল সূত্রে প্রাপ্ত- [https:// canadacollege.edu, access date- 30.4.25]
১৭। কালান্তর, পৃঃ - ১৭৩।
১৮। The Communist Mannifesto, Karl Marx & Friedrich Engels, Vintang Book-Penguin Random House, New York, 2018, P. – 26।
১৯। রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ, প্রমথনাথ বিশী, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, - ৭৩, ১৯৯৮, পৃঃ-২৫৯।
২০। আন্তর্জাল সূত্রে প্রাপ্ত, Gavin P. Hendricks, http://www.scielo.org.za
২১। অনভিজাতদের জন্য অপেরা, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, প্রতিভাস, কলকাতা - ২, ২০১৪, পৃঃ - ৫২।
২২। কালান্তর, পৃঃ - ৪১৬।

মূল ও আকর:

মূল রবীন্দ্রনাটকের জন্য –
১। রবীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রীসরস্বতী প্রেস, কলকাতা – ১, শিক্ষাসচিব-মহাকরণ, ১৯৮৪।
২। রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), তদেব, ১৯৮৫ ।

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের জন্য –
(i) Tech 3.0 with Dutta vlogs (youtube channel)
(ii) Tulika films (Ibid)
(iii) Mukta Akash Bangla (Ibib).

সহায়ক গ্রন্থ:
১। আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ, নীরদ চন্দ্র চৌধুরী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭৩, ১৪১৯।
২। আমলার মন, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০১৭।
৩। রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা – ৭৩, ১৪০৫।
৪। সাক্ষাৎকার সমগ্র, সত্যজিৎ রায়, পত্রভারতী, ২০২০।

সহায়ক প্রবন্ধ:
১। বিদ্রোহী সত্যজিৎ, উৎপল দত্ত, সত্যজিৎ রায় সংখ্যা, নন্দন বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৯৯২।
২। 'রক্তকরবী' ও স্মৃতিলোক, তপোব্রত ঘোষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৪০১।
৩। রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনী : চিত্রপট থেকে চিত্তপটে, সুশোভন অধিকারী, দেশ পত্রিকা, জুন ২০২১।

সহায়ক পত্রিকা:
১। Frontline Magazine, November, 2021 (The World of Ray) ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
১। শ্রীমান অর্ক দেবের ১৭ই ডিসেম্বর, ২০২০-এর ফেসবুক পোস্ট।
২। গুপী বাঘা ত্রয়ীর আলোচনার জন্য You Tube channel-
Ranadeepnaskar23, Gyanpedia, The space link.
৩। সত্যজিৎ রায়ের সাক্ষাৎকারের জন্য You Tube channel-
Prasar Bharati Archives, Filmkopath

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1179-1183
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.119

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মায়া ও আত্মজ্ঞান লাভের পথ অনুসন্ধান

সন্তু কান্ডার, *সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 16.05.2025; Accepted:27 .05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Swami Vivekananda, one of the most prominent spiritual leaders of modern India, greatly explored the concept of Māyā from the Advaita Vedanta. Māyā according to him is the ignorance that ties individuals to the material world, without realizing their true divine nature. This ignorance manifests through attachment to impermanent occurrences, identification with the physical body, and ignorance of the ultimate reality- Brahman.

Vivekananda emphasized that if someone wants to attain Ātmā-Jñāna or self-realization then he must be overcoming Māyā. He was an Advatin. According to Advaita Vedanta living beings (Jivātma) are identical with Brahman (Paramātmā). He proposed different paths like, knowledge (Jñāna), devotion (Bhakti), selfless action (Karma), and meditation (Raja Yoga) for liberation. Vivekananda said that service to humanity is a powerful means to transcend ignorance or Māyā. He believed that perceiving the divine in all beings and work unselfishly for the welfare of others leads to purification of the mind, finally bringing one closer to self-realization. In present day, when we are going through the critical situation Vivekananda's teaching is very relevant. His philosophy provides us a pathway to inner peace and self-realization. His teachings encourage us to rise above ignorance and illusion, finding truth through wisdom, love, and selfless action. So, according to Swami Vivekananda, liberation from Māyā and the attainment of Ātmā-Jñāna is not just a theoretical practice but a practical journey of self-discipline, selfless service, and deep concentration. By following this path, one can transcend illusion and realize his own nature.

Keywords: Advaita Vedanta, Brahman, Māyā, Self-realization, Liberation

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের মাটিতে আর্বিভূত মহাপুরুষদের মধ্যে একজন অন্যতম মহান দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তক। তিনি তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারা ভারতীয় দর্শন ও বেদান্তের গভীর ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। তবে তাঁর শিক্ষা ও ভাবনায় যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে তা হল 'মায়া ও আত্মজ্ঞান' বিষয়ক আলোচনা। 'মায়া' হল সেই বিভ্রম বা ভ্রান্তি যা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বা আত্মপরিচয় থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। অন্যদিকে 'আত্মজ্ঞান' হল সেই চেতনা বা উপলব্ধি যা আমাদের নিজেদের প্রকৃত স্বরপকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন, আত্মজ্ঞান লাভ বা নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে মানুষ মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে। ফল স্বরূপ সে তাঁর জীবনের পরম উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। আলোচ্য এই প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মায়ার প্রকৃত স্বরূপ ও আত্মজ্ঞান লাভের উপায় বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

১৮৬৩ সালে **১২ই** জানুয়ারি কলকাতার এক অভিজাত পরিবারে আর্বিভূত এক মহাপুরুষ হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। অত্যন্ত মেধাবী বিবেকানন্দ বিভিন্ন বিষয়ের চিন্তায় গভীরভাবে মগ্ন থাকতেন। শস্য-শ্যামলায় পরিপূর্ণ রমণীয় এই বিশ্বজগতের দিকে তাকিয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন যে, তা এক বিচিত্র শোভায় সুসজ্জিত হয়ে রয়েছে। প্রতিটি মানবই নিয়ত প্রকৃতির এই সৌন্দর্য সুখ সম্ভোগ করে চলেছে। বিশ্বপ্রকৃতির এই বিচিত্র রূপে মুগ্ধ তাঁর হৃদয়ে বারবার তাই নানান প্রশ্নের উদয় হয়েছে, - দৃশ্যমান এই জগত প্রপঞ্চের রহস্য কী? কে এই প্রপঞ্চের স্রষ্টা? কেমনভাবে তিনি এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি করলেন? ঈশ্বর বলে আদৌ কি কিছু আছে? দৃশ্যমান এই জগত কি কেবলই মায়া? মুক্তি কিভাবে সম্ভব? – প্রভৃতি নানান প্রশ্ন প্রায়শঃই তাঁকে উদ্বেলিত করে তুলত।

তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী। তাঁর চিন্তা ভাবনার মূল ভিত্তিভূমি- ই ছিল উপনিষদ ও বেদান্ত। তাঁর সমস্ত বিশ্বাসের মূলে রয়েছে এক অদ্বয় সত্যের প্রতি গভীর আস্থা। সমস্ত কিছুকে তিনি একের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতেন। জগত সর্ম্পকে তাঁর অভিমত, জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে অতিন্দ্রীয় বিষয়ের তফাৎ, মায়া বা অবিদ্যা বিষয়ক বিভিন্ন ব্যাখ্যা– সবই তিনি দিয়েছেন অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে। তবে তিনি যুগ ও সময়ের প্রয়োজনে বেদান্তের এক নব ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি অদ্বৈত বেদান্তে বিশ্বাসী হলেও বেদান্তের এর এক নব রূপ জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলতেন –

> “একটিমাত্রই বস্তু আছে- তাহাই নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছে। তাহাকে আত্মাই বল আর বস্তুই বল বা অন্য কিছুই বল, জগতে কেবলমাত্র তাহারই অস্তিত্ব আছে। অদ্বৈতবাদের ভাষায় বলতে গেলে এই আত্মাই ব্রহ্ম, কেবল নাম-রূপ- উপাধিবশতঃ ‘বহু’ প্রতীত হইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গগুলির দিকে দৃষ্টিপাত কর; একটি তরঙ্গও সমুদ্র হইতে পৃথক নহে। তবে তরঙ্গকে পৃথক দেখাইতেছে কেন? নাম ও রূপ– তরঙ্গের আকৃতিই রূপ, আর আমরা উহার নাম দিয়াছি ‘তরঙ্গ’, এই নাম-রূপই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক করিয়াছে। নাম-রূপ চলিয়া গেলেই তরঙ্গ যে সমুদ্র ছিল, সেই সমুদ্রই হইয়া যায়। তরঙ্গ ও সমুদ্রের মধ্যে কে প্রভেদ করিতে পারে? অতএব এই সমগ্র জগত এক সত্তা। নাম-রূপই যত পার্থক্য রচনা করিয়াছে। যেমন সূর্য লক্ষ লক্ষ জলকণার উপরে প্রতিবিম্বত হইয়া প্রত্যেক জলকণার উপরেই সূর্যের একটি পূর্ণ প্রতিকৃতি সৃষ্টি করে, তেমনি সেই এক আত্মা, সেই এক সত্তা অসংখ্য নাম- রূপের বিন্দুতে প্রতিবিম্বত হইয়া নানা রূপে উপলব্ধ হইতেছেন। কিন্তু স্বরূপতঃ উহা এক । বাস্তবিক ‘আমি’ বা ‘তুমি’ বলিয়া কিছু নাই– সবই এক। হয় বল– সবই আমি, না হয় বল– সবই তুমি।[১]”

অদ্বৈত বেদান্তে বিশ্বাসী হলেও জগৎ বিষয়ে বিবেকানন্দের অভিমত ছিল অদ্বৈতবাদীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ ব্যবহারিক দিক থেকে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও পারমার্থিক দিক থেকে তাঁরা জগতের কোন সত্তায় মানতেন না। কিন্তু বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক এই দুই অবস্থার মধ্যে ভারসাম্য রাখতে। তিনি অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী হলেও জাগতিক সত্যতাকে কখনই অস্বীকার করেননি। তাঁর মতে ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, তিনিই সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। আর একথা সত্য যে উপলব্ধির দিক থেক স্রষ্টা ও সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কোন তফাৎ থাকেনা। অর্থাৎ তিনি অদ্বৈতবাদীদের মত জগতকে অমায়িক বলতেন না।

তিনি মনে করতেন নিছক শূন্য থেকে কোন কিছুর উৎপত্তি হয়না। অর্থাৎ কারণ ভিন্ন কার্যের উৎপত্তি কোনভাবেই সম্ভব নয়। কারণই কার্যের মধ্যে অন্য এক রূপে উপস্থিত হয়। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরূপ কার্যও তেমনি পূর্ববর্তী কোন সূক্ষ কারণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কেননা সকল কার্যবস্তু উৎপত্তির পূর্বে তার উপাদান কারণে সূক্ষরূপে বর্তমান থাকে। সমস্ত বস্তু যাদের আমরা উৎপন্ন হতে দেখি তারা অনন্তকাল ধরে আছে এবং থাকবে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ কারণ হল চৈতন্য। সৃষ্টির পূর্বে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চৈতন্যে অবক্ত্যরূপে বর্তমান ছিল আর সৃষ্টির মাধ্যমে তা আমাদের কাছে ব্যক্তরূপে ধরা দেয়। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে চৈতন্য ক্রমসঙ্কুচিতরূপে থাকে আর শেষে তা ক্রমবিকশিত হয়। সুতরাং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা জগতরূপে যে চৈতন্য আমাদের কাছে প্রকাশিত হচ্ছে তা সেই ক্রমসঙ্কুচিত সর্বব্যাপী চৈতন্যেরই অভিব্যাক্তি। আর এই সর্বব্যাপী চৈতন্যই হল ঈশ্বর। জগতে আমরা যা কিছু দেখি, জড়, শক্তি, মন চৈতন্য প্রভৃতি নানান বস্তু সবই সেই চৈতন্যেরই প্রকাশ। যা আমরা দেখছি, শুনছি বা অনুভব করছি সবই ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট, আরও স্পষ্টভাবে বলে গেলে সবই তিনি।

অদ্বৈত বেদান্তে ঈশ্বরের কথা বলা হলেও তা ছিল অজ্ঞান বা অবিদ্যা প্রসূত। অদ্বৈত মতে ঈশ্বর হলেন সগুণব্রহ্ম। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বিবেকানন্দের কাছে অসীম ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। এমনকি তাঁর কাছে ঈশ্বর অবিদ্যা প্রসূতও নয়। আসলে আমাদের এরূপ বিভাজনের পিছনে রয়েছে আমাদের অজ্ঞতা ও সীমিত উপলব্ধি। প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হলে আমরা এই সত্য উপলব্ধি করি যে, অসীম ব্রহ্ম যেমন সত্য ঈশ্বরও তেমনি সত্য। তাঁদের মধ্যে কোন ভেদ নেই। বিবেকানন্দের ভাষায়,-

> "সগুণ ঈশ্বর মায়ার মধ্য দিয়া দৃষ্ট সেই নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যাতীত আর কিছু নন। মায়া বা প্রকৃতির অধীন হইলে সেই নির্গুণ ব্রহ্মকে 'জীবাত্মা' বলে এবং মায়াধীশ বা প্রকৃতির নিয়ন্তারূপে সেই নির্গুণ ব্রহ্মই 'ঈশ্বর' বা সগুণ ব্রহ্ম। যদি কোন ব্যাক্তি সূর্য দেখিবার জন্য এখান হইতে যাত্রা করে, সে প্রথমে সূর্যকে ছোট দেখিবে; যতদিন না আসল সূর্যের নিকট পোঁছিতেছে, ততদিন উহাকে ক্রমশঃ বড় হইতে বড় দেখিবে। যতই সে অগ্রসর হয়, ততই সে ভিন্ন ভিন্ন সূর্য দেখিতেছে বলিয়া মনে করিতে পারে, কিন্তু সে যে একই সূর্য দেখিতেছে, তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। এইভাবে আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, সবই সেই নির্গুণ ব্রহ্ম- সত্তারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র, সুতরাং সেই হিসাবে সেগুলি সত্য। ইহাদের মধ্যে কোনটিই মিথ্যা নয়, তবে আমরা এইটুকু বলিতে পারি, এগুলি নিম্নস্তরের অবস্থা মাত্র।"[২]

তিনি মনে করতেন ঈশ্বর সমস্ত স্থানে, সমস্ত বিষয়ে উপস্থিত। আকাশ, বাতাস, সূর্য সবই এই ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে তাদের কার্য সম্পাদন করে থাকে।

অর্থাৎ বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে দৃশ্যমান এই জগত প্রপঞ্চ অবিদ্যা বা মায়া প্রসূত নয়। মায়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে মায়া শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। প্রচীন বৈদিক যুগে মায়া শব্দটি 'কুহক' অর্থে ব্যবহৃত হত। সেখানে আমরা লক্ষ্য করি এই মায়ার দ্বারা ইন্দ্রের নানান রূপ ধারণের কথা। মায়া শব্দটির দ্বারা সেখানে ইন্দ্রজাল বা অনুরূপ কোন অর্থ বোঝান হত। পরবর্তিকালে মায়া শব্দটি আবার ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। শেতাশ্বতর উপনিষদে 'মায়া' শব্দটির দ্বারা প্রকৃতিকে বোঝানো হয়েছে আর 'ময়ী' শব্দের দ্বারা মহেশ্বরকে বোঝানো হয়েছে। আবার বৌদ্ধ দর্শনে মায়া কে বলা হয়েছে কল্পনামাত্র। অদ্বৈতবাদীরা মায়াকে ভ্রম সৃষ্টিকারী শক্তি বলতেন। তাঁদের মতে এই মায়ার দ্বারাই মিথ্যা জগৎ আমাদের কাছে সত্যরূপে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু বিবেকানন্দ মায়া বলতে এরূপ কোন কিছু বুঝতেন না। তাঁর কাছে মায়া হল জাগতিক ঘটনাসমূহের বর্ণনামাত্র। অর্থাৎ আমাদের চারপাশে যা কিছু ঘটছে বা এই সংসারের যাবতীয় ঘটনাসমূহ যেভাবে ঘটে চলেছে মায়া কেবল তারই বর্ণনা মাত্র। তাঁর ভাষায়,-

> "মায়া সংসার-রহস্যের ব্যাখ্যার নিমিত্ত একটি মতবাদ নহে; সংসারের ঘটনা যেভাবে চলিতেছে, মায়া তাহারই বর্ণনামাত্র অর্থাৎ ইহাই বলা যে, বিরুদ্ধভাবই আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি; সর্বত্র এই ভয়ানক বিরোধের মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছি। যেখানে মঙ্গল, সেখানেই অমঙ্গল। যেখানে অমঙ্গল, সেখানেই মঙ্গল। যেখানে জীবন, সেখানেই ছায়ার মতো মৃত্যু তাহার অনুসরণ করিতেছে। যে হাসিতেছে, তাহাকে কাঁদিতে হইবে; যে কাঁদিতেছে, সে হাসিবে। এ অবস্থার প্রতিকারও সম্ভব নয়। আমরা অবশ্য এমন স্থান কল্পনা করিতে পারি – যেখানে কেবল মঙ্গলই থাকিবে, অমঙ্গল থাকিবে না; যেখানে আমরা কেবল হাসিব, কাঁদিব না। কিন্তু যখন এই সকল কারণ সমভাবে সর্বত্র বিদ্যমান, তখন এরূপ সজ্ঘটন স্বতই অসম্ভব। যেখানে আমাদিগকে হাসাইবার শক্তি আছে , কাঁদাইবার শক্তিও সেইখানেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যেখানে সুখোৎপাদক শক্তি বর্তমান, দুঃখজনক শক্তিও সেইখানে লুক্কায়িত।"[৩]

জগতের প্রতিটি মানুষ এরূপ বিরোধের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এর প্রতিকার কোনভাবেই সম্ভব নয়। আমাদের সমগ্র জীবন এরূপ সৎ ও অসৎ, ভাল ও মন্দ প্রভৃতি বিরুদ্ধ বিষয়ের সমাহার। আমরা এমন কোন জগতের কথা বলতে পারিনা, যেখানে কোন দুঃখ নেই, কেবল আনন্দই বিরাজমান। জাগতিক বিষয়সমূহ কখনো সত্য বলে মনে হয় আবার কখনো মনে হয় মিথ্যা। কখনো আনন্দময়, কখনো আবার দুঃখজনক। কখনো মনে হয় আমরা

জাগ্রত আবার কখনো মনে হয় নিদ্রিত। এইভাবে প্রতিনিয়ত যে আলো ও অন্ধকারের খেলা চলছে – তার বর্ণনামাত্রই হল মায়া।

প্রতিটি মানুষই কোন না কোনভাবে মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই সংসার সুখ, দুঃখ, মঙ্গল, অমঙ্গল, ভাল, মন্দ প্রভৃতি বিরুদ্ধ বিষয়েরই সংমিশ্রণ। একটি বাড়লে অন্যটিও সেই সাথে বৃদ্ধি পাই। এই সংসারে আমরা, কেবল সুখ কিংবা কেবল দুঃখ এমন কিছু পাইনা। কেননা সুখ, দুঃখ– এগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন পৃথক সত্তা নয়। তাই এই সংসারে আমরা এমন কোন বস্তু পাইনা যা সম্পূর্ণ মঙ্গলজনক বা সম্পূর্ণ অমঙ্গলজনক,- এমন ধারণা স্ববিরোধী। কেননা যে বিষয়টি আজ ভালো বলে মনে হচ্ছে কাল তা মন্দ হতে পারে। একটি ঘটনা যা আজ শুভ বলে মনে হচ্ছে কাল তা অশুভ মনে হতে পারে। একই বস্তু যা একজনকে সুখ প্রদান করছে তা অপরকে দুঃখ দিতে পারে। যে অগ্নি দগ্ধ করে সেই অগ্নিই আবার অনাহার ক্লিষ্ট ব্যক্তির আহার প্রস্তুত করতে পারে। যদি কেউ মৃত্যু বরণ করতে চাই তাঁকে জীবনও ধারণ করতে হবে। কেননা দুঃখহীন সুখ ও মৃত্যুহীন জীবন কোনভাবেই সম্ভব নয়। আজ আমার কাছে যে জিনিস সুখকর কাল তা দুঃখজনক হতে পারে। সুতরা আমাদের বর্তমান অবস্থা যেমন সম্পূর্ণ সত্য নয় তেমনি তা সম্পূর্ণ অসত্যও নয় – উভয়ের সংমিশ্রণ। অর্থাৎ আমাদের জীবন সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ প্রভৃতি ঘটনার সংমিশ্রণমাত্র। এরূপ মায়াপাশে আমরা সকলে আবদ্ধ।

কিন্তু প্রশ্ন হল সংসার যদি এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থার সংমিশ্রণ হয় তবে আমরা কর্ম কেন করব? অর্থাৎ অকল্যাণ ছাড়া যদি কল্যাণকে না পাওয়া যায়, সুখ উৎপন্ন করলে যদি দুঃখও উৎপন্ন হয় তবে কর্মের আবশ্যকতা কি? উত্তরে বেদান্তে বলা হয়েছে, আমাদের পূর্ণতার অভিমুখে যাত্রা করতে হবে। আমরা কেবল পঞ্চইন্দ্রিয়ের দ্বারা আবদ্ধ মানবই নয়, আমাদের এর চেয়ে এক উচ্চতর অবস্থান রয়েছে। আর আমাদের উচিৎ সেই উচ্চতর আর্দশ ও পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া। অর্থাৎ শুধু ভাল-মন্দ বা শুভ-অশুভেরই কেবল অস্তিত্ব আছে তা নয়– এর বাইরে রয়েছে এক উচ্চতর সত্তা, সেটাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিৎ নিজেকে মুক্ত করা। আমরা কেউই প্রকৃতির দাস নই, ছিলাম না আর হবও না। প্রকৃতিকে আপাতদৃষ্টিতে অসীম মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অসীম নয়, সসীম। সমুদ্রের সাথে তুলনা করে বলা যায়, তা একটা বিন্দুমাত্র। আর মানুষ হল স্বয়ং সমুদ্রস্বরূপ। মানুষ যখনই একথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে তখনই শুভ-অশুভ, ভাল-মন্দ সবই জয় করতে সমর্থ হবে। মানুষ তাঁর নিজের চোখে হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে বলে মনে হচ্ছে অন্ধকার। হাত সরিয়ে নিলেই সে আলো দেখতে পায়। অর্থাৎ তুমি নিজেই তোমার অদৃষ্টকে নির্মাণ করতে সমর্থ। মানুষ তার চারপাশের জগতের দিকে তাকালে অনুভব করতে পারে যে, সে বন্দি। সে এও অনুভব করে তার অন্তরে কে যেন রয়েছে সে চাইছে এই বন্দিদশা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করতে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে তাই বলা হয়েছে,-

> “শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।
> আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থূঃ।।”[৪]

অর্থাৎ হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ! শ্রবণ কর, আমি পথ খুঁজিয়া পাইয়াছি; যিনি অন্ধকারের পারে, তাহাঁকে জানিলেই মৃত্যুর পারে যাওয়া যায়।

বিবেকানন্দ বলতেন জগতে একমাত্র অনন্ত পুরুষ আত্মাই সত্য। তিনিই একমাত্র শুদ্ধ সত্তা। তিনি নিম্নতর প্রাণী কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে উচ্চতর প্রাণী মানুষ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই নিজেকে প্রতিবিম্বিত করে চলেছেন। জগতে তিনিই একমাত্র সত্য। জগতের প্রতিটি মানুষই স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ। মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে বলে মানুষ তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেনা। এই মায়া বা অজ্ঞান বা অবিদ্যা থেকে যদি আমরা মুক্তিলাভ করতে পারি তবেই আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। তাই ভেদজ্ঞান একটি মিথ্যা প্রতীতিমাত্র।

মানব দেহ, দেহ, মন ও আত্মা– এই তিনটি অংশ দ্বারা গঠিত। দেহ আত্মার বর্হিঅঙ্গ আর মন আত্মার অর্ন্তঅঙ্গ। এই আত্মাই মন নামক অন্তঃকরণের দ্বারা দেহকে চালিত করে থাকে। কিন্তু আত্মার প্রকৃতপক্ষে কোন জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। এমনকি তাঁর কোন বন্ধন নেই, তা এক শাশ্বত সত্তা। আমরা প্রায়শঃই আকাশে নানা বর্ণের মেঘের উদ্ভব হতে দেখি, কিন্তু সেই সকল বিচিত্র বর্ণের মেঘের অবস্থান আকাশে ক্ষণস্থায়ী। কিছুক্ষণের জন্য তা অবস্থান করলেও পরবর্তিকালে তা আর থাকে না, কিন্তু আকাশের নীল রঙের কোন পরিবর্তন হয় না। ঠিক তেমনি আত্মার কোন পরিবর্তন হয়না। তা এক অপরিবর্তনীয় নিত্য সত্তা। তবে বিবেকানন্দ বলতেন, আত্মা নিত্য, অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত

সত্তা হলেও তা নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে গমন করে। বিবেকানন্দ মনে করতেন আত্মজ্ঞান লাভই হল মানুষের জীবনের পরম লক্ষ্য। কিন্তু মায়া বা অবিদ্যার কারণে মানুষ আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করতে সক্ষম হননা। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য বিবেকানন্দ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও প্রেম, ধ্যান ও যোগ সাধনা, গুরুর উপদেশ পালন ও শাস্ত্র অধ্যয়ন প্রভৃতি কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপায়ের নির্দেশ করেছেন। এগুলি ঠিক ঠিক ভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে একজন ব্যাক্তি বন্ধন দশা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হন বা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে।

মানুষ যখন তার বন্ধনদশা ছিন্ন করতে পারে তখনই সে মুক্ত হয়। বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদীদের মত দু ধরণের মুক্তি মানতেন- জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি। দেহ থাকাকালীন অবস্থায় যে মুক্তি তা হল জীবন্মুক্তি। আর দেহের বিনাশে যে মুক্তি তা হল বিদেহ মুক্তি। জীবন্মুক্ত পুরুষ যে সকল কর্ম সম্পাদন করেন তা তাঁকে প্রভাবিত করে না। তিনি অনাসক্ত হয়ে কাজ করে থাকেন। পদ্ম পাতা জলে অবস্থান করলেও জল যেমন তাকে সিক্ত করতে পারেনা, জীবন্মুক্ত পুরুষও ঠিক তেমন। তিনি কর্ম সম্পাদন করলেও কখনো কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না।

সুতরাং পরিশেষে আমরা একথা বলতে পারি যে, বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মায়া হল সেই অজ্ঞানের আবরণ, যা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আত্মজ্ঞান মধ্য দিয়েই মানুষ এই মায়ার জাল ছিন্ন করে প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য তিনি সাধনা, আত্মচিন্তা, নিঃস্বার্থ কর্ম ও গুরুর উপদেশ পালনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর এই শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করলে আমরা মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে আত্মদর্শন লাভের মাদ্যমে মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করতে পারি।

তথ্যসূত্র:

১। বিবেকানন্দ, স্বামী, বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২৮তম পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১২, পৃ.- ৩৮

২। বিবেকানন্দ, স্বামী, বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২৮তম পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১২, পৃ.- ২৬৬

৩। বিবেকানন্দ, স্বামী, বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২৮তম পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১২, পৃ.- ৯

৪। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ- ২/৫

গ্রন্থপঞ্জী:

১। বিবেকানন্দ, স্বামী, বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২৮তম পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১২

২। বিবেকানন্দ, স্বামী, বাণী ও রচনা (তৃতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২৬তম পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১২

৩। বিবেকানন্দ, স্বামী, বাণী ও রচনা (চতুর্থ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২৪তম পুনর্মুদ্রণ, মে ২০১২

৪। বিবেকানন্দ, স্বামী, বাণী ও রচনা (পঞ্চম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২৫তম পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১২

৫। বিবেকানন্দ, স্বামী, বেদান্তের আলোকে, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৫তম পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

৬। বিবেকানন্দ, স্বামী, বেদান্ত কি এবং কেন, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০তম পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৫

৭। ভট্টাচার্য, দীনেশ্চন্দ্র শাস্ত্রী, বিবেকানন্দের বেদান্তচিন্তা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৬

৮। বিবেকানন্দ, স্বামী, আমার ভারত অমর ভারত, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, ২০১৪

৯। Lal, Basant Kumar, Contemporary Indian Philosophy, Motilal Banarasidass, Delhi, 9th Reprint, 2013

১০। Ranganathanand, Swami, Pracital Vedant and The Science of Values, Advaita Ashrama, Kolkata, February 2012

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1184-1189
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.120

ভারতীয় দর্শনের আলোয় মুক্তির স্বরূপসন্ধান

স্নিগ্ধা চ্যাটার্জী, *রাষ্ট্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, সংস্কৃত বিভাগ, রামপুরহাট কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 14.05.2025; Accepted:17 .05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The word 'philosophy' comes from the root word Drish. It means true philosophy or philosophy of view. The word 'philosophy' is used as a synonym for the English word Philosophy. But the meaning of the two words is not the same. Etymologically, the word 'philosophy' means love for knowledge, and the word philosophy means true philosophy. In Indian philosophy, the goal is not to know this true philosophy or truth, but to establish truth in life. Indian philosophy is divided into two parts, theistic and atheistic. Indian philosophy is basically the philosophy of spiritualism. Except for the Charvak philosophy, all other philosophies are deeply spiritual. According to spiritualism, the inert is the ultimate truth. The soul has to realize it in life. What Indian philosophers call 'Moksha' or 'liberation'. Moksha or liberation is freedom from suffering. And only when ignorance is destroyed, there will be freedom from suffering. Ultimate liberation from suffering is the ultimate endeavor of human life. Purushartha refers to religion, artha, kama moksha. Mokshaists have different views on the nature of moksha. For example, according to Jainism, the soul attains moksha by practicing direct vision, direct knowledge, and direct character. In the state of moksha, suffering is destroyed. Buddhists say that ignorance is the root cause of suffering. According to them, nirvana or moksha is possible only if the rotation of the cycle of existence can be stopped. Vedantists say that the realization of Brahman or moksha is an unattainable blissful state. According to Sankhya Yoga, the presence of the purusha or soul in the form of the mind is moksha. According to Nyaya, the presence of the soul in the form of nirguna is liberation. Thus, almost all schools of Indian philosophy call moksha or liberation the supreme purushartha.

Keyword: Philosophy, Etymologically, Artha, Kama Moksha, Vedantists, Nirguna, Purushartha etc

"দেশশূন্য, কালশূন্য, জ্যোতিঃশূন্য, মহাশূন্য-পরি
চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান,
মহা অন্ধ অন্ধকার সভয়ে রয়েছে দাঁড়াইয়া
কবে দেব খুলিবে নয়ান।"[১]

[১] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতসংগীত, 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতা

ভারতীয় দর্শনে জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকেই বলা হয় পুরুষার্থ। পুরুষের অর্থ হচ্ছে পুরুষার্থ। পুরুষার্থ বলতে বোঝায় মানুষ সচেতনভাবে যাকে তার কাম্য বস্তু বা প্রয়োজনীয় উপাদান রূপে গ্রহণ করে। কাম্যবস্তু হলো সাধনা লব্ধ এবং সাধনা লব্ধ বস্তু মাত্রই মানুষের কাছে মূল্যবান। তাই ভারতীয় দর্শনে মানুষের নানা প্রয়োজনের মধ্যে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারটি প্রয়োজনকেই মুখ্য বা প্রধান বলা হয়েছে। এই চারটি হলো পুরুষার্থ। জীবনের পরিপুষ্টির জন্য এই চারটি অত্যাবশ্যক। এই চার পুরুষার্থকে চতুর্বর্গ বলা হয়। 'বিচিত্র রুপা খলু চিত্ত বৃত্তয়:'- বিভিন্ন মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন। এজন্য একজনের কাছে যা মুখ্য লক্ষ্য, আরেকজনের কাছে তা গৌণ হতে পারে। অনেকের মতে কামই একমাত্র পুরুষার্থ। আবার অনেকে ধর্ম, অর্থ ও কাম কে মুখ্য বলেছেন। এই তিন পুরুষার্থকে ত্রিবর্গ বলা হয়। আবার অনেকে চারটি প্রয়োজনকেই মুখ্য বলেছেন। মোক্ষবাদী দার্শনিকরা মোক্ষকেই জীবনের পরকাষ্ঠা বলে বিশ্বাস করেন। এই কারণেই মানুষের প্রকৃতির পার্থক্য অনুসারে চার রকম পুরুষার্থের কথা বলা হয়ে থাকে।

ভারতীয় দর্শনে এই চার পুরুষার্থকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ক) প্রেয়: খ) শ্রেয়:। প্রথম তিনটি অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ কাম হল প্রেয়: অর্থাৎ প্রিয়বস্তু, এবং শেষেরটি অর্থাৎ মোক্ষ হল একমাত্র শ্রেয়:। শ্রেয়: হচ্ছে মুক্তি এবং মুক্তির একমাত্র উপায় হল আত্মজ্ঞান। কেননা ধর্ম, অর্থ, কাম- এগুলি সবই অনিত্য। অনিত্য হওয়ার কারণে দুঃখদায়ক। কিন্তু শ্রেয়: হলো আত্মজ্ঞান, যা লাভ করলে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ঘটে। তাই মোক্ষই হল পরম পুরুষার্থ। মোক্ষ বা মুক্তি কি? মোক্ষ শব্দটি মুচ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। মুচ ধাতুর অর্থ মোক্ষণ। এই মুক্তি নিয়ে ভারতীয় দার্শনিকরা বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। জীব স্বরুপত:নিত্য, শুদ্ধ,বুদ্ধ, মুক্ত আত্মা। কিন্তু অনাদি কর্মবশতঃ জীব দেহ মন প্রভৃতি উপাধীর সাথে যুক্ত হয়ে সংসারে জন্মগ্রহণ করে। একেই বদ্ধদশা বলে। বেদে বলা হয়েছে মুক্তির অর্থ মৃত্যু রূপ বন্ধন থেকে মুক্তি; অমৃত থেকে নয়। জীবের জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হওয়াকে উপনিষদে সংসার বলা হয়েছে। আর ওই অবস্থা থেকে অব্যাহতি পাওয়াকে মুক্তি বলা হয়েছে। দুর্গাদাস তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁর 'ধাতুদীপিকায়' মুক্তি প্রসঙ্গে বলেছেন-"বন্ধনরহিতীভাবে অকর্ম্মকোঅয়ম্, আলানান্মুক্তো গজ: কর্ত্তরি ক্ত এবং পাপান্মুক্ত ইত্যাদৌ পাপবন্ধনান্মুক্ত ইত্যর্থঃ"[২]। এখানে তর্কবাগীশ মহাশয় বন্ধন যুক্ত অবস্থা থেকে বন্ধন রহিত অবস্থার এবং পাপ রূপ বন্ধন থেকে মুক্তি এই প্রাপ্তিকেই মুক্তাবস্থা বলে গ্রহণ করেছেন। মৃত্যু, কামনা ইত্যাদি বন্ধন স্বরূপ বলে ওই সব কিছু থেকে মুক্তির কথায় শাস্ত্রে উল্লেখিত হয়েছে।

মোক্ষ হল জীবের পূর্ণাঙ্গ মুক্তি। সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি। এই বন্ধন ও মোক্ষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন, দিন-রাত্রি, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মরণ। বন্ধন আছে বলেই মুক্তি আছে, এবং ওই বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভই হল মুক্তির তাৎপর্যার্থ। আত্মজ্ঞান লাভ করলেই জীবের মোক্ষ লাভ হয়। তাকে পুনরায় আর জন্ম জন্মান্তরের আবর্তনচক্রে পড়তে হয় না।মোক্ষ অবস্থায় জীব উপলব্ধি করে যে সেও পরমাত্মা স্বরূপত: এক ও অভিন্ন। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে সত্য জ্ঞান হলো মুক্তির কারণ। কিন্তু এই সত্য জ্ঞান ইন্দ্রিয় সংযম এবং দীর্ঘ মনন ছাড়া লাভ করা যায় না। আমাদের ইন্দ্রিয় অতিশয় চঞ্চল। জাগতিক বিভিন্ন বস্তুর প্রতি ধাবিত হয় ইন্দ্রিয়। তাতে মনের চঞ্চলতা বাড়ে, আর মন চঞ্চল হলে সত্য জ্ঞান লাভ কখনোই সম্ভব নয়। সেই জন্য ইন্দ্রিয় সংযমী হতেই হবে। ভারতীয় দার্শনিকরা এই সত্য জ্ঞান লাভের জন্য ইন্দ্রিয় সংযমের কথা বলেছেন। রাগ, দ্বেষ ও ভ্রান্ত সংস্কার দূর করার জন্য ইন্দ্রিয় সংযম এবং সুঅভ্যাস অর্জন করা উচিত। ইন্দ্রিয় সংযত হলে সত্য জ্ঞান লাভের অধিকার জন্মে। ভারতীয় দার্শনিকরা বলেছেন মুক্তির জন্য সত্য জ্ঞান এর সম্যক উপলব্ধি ও অনুসরণ আবশ্যক।

মোক্ষের বিভিন্ন পর্যায় শব্দ আছে। অর্থাৎ মোক্ষবাদীরা মোক্ষকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। যেমন-কৈবল্য, নির্বাণ, নি:শ্রেয়স, শ্রেয়, অমৃত, অপবর্গ ইত্যাদি। এছাড়াও অন্যত্র স্বরূপপ্রাপ্তি, ব্রহ্মভবন, ব্রহ্মলয়, সংজ্ঞানাশ, প্রলয় ইত্যাদি পর্যায় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'কৈবল্য' বলতে বোঝায় জীব যখন সুখ-দুঃখ থেকে মুক্ত হন। সাংখ্যযোগ মতে দেহ এবং ইন্দ্রিয় ত্যাগপূর্বক আত্মার কেবলত্বই অর্থাৎ নিঃসঙ্গতাই 'কৈবল্য' শব্দের তাৎপর্য। নির্বাণ-বৌদ্ধরা 'নির্বাণ' কে দীপ নির্বাণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দীপ যেমন নির্বাপিত হলে আর তাকে দেখা যায় না, ঠিক তেমনি জীবত্বের অবসান ঘটলেও আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। নি:শ্রেয়স- 'নি:শ্রেয়স' শব্দে নিশ্চিত মঙ্গলকে বোঝায়। জীবের

[২] ভারতীয় দর্শনের মুক্তিবাদ, বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. বিজয় ভূষণ, পৃষ্ঠা-৫

জন্ম মৃত্যুর জীবনচক্রই অমঙ্গল। কারণ তা সকল দুঃখের মূল। এই জন্ম মৃত্যুর চিরতরে নাশ হল 'নি:শ্রেয়স'। তাই 'নি:শ্রেয়স' অর্থে মুক্তিকেই বোঝায়। অপবর্গ-'অপবর্গ' শব্দের অর্থ হলো মুক্তি। জীব অনাত্মবর্গকে আত্মরূপে গ্রহণ করেছিল, সেই অনাত্মবর্গের আত্যন্তিকরূপে বর্জনই 'অপবর্গ'।

মোক্ষের আলোয় দর্শন তত্ত্ব:

চার্বাক ভিন্ন সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় মোক্ষকেই পরম পুরুষার্থ বলে অভিহিত করেছেন। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা এ বিষয়ে একমত যে মোক্ষ লাভ করলে জীবাত্মার সব দুঃখের বিনাশ হয়। তবে মোক্ষবাদী দার্শনিকরা মোক্ষকে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি বললেও মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। যেমন জৈন মতে,মোক্ষ প্রাপ্তির পর আত্মা অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত আনন্দের আশ্রয় রূপে অবস্থান করে। বৌদ্ধমতে মোক্ষ বা নির্বাণ হচ্ছে আত্যন্তিক দুঃখ মুক্তি। অদ্বৈত বেদান্ত মতে, ব্রহ্ম উপলব্ধি বা মোক্ষ হচ্ছে এক অনাবিল আনন্দময় অবস্থা। ন্যায় মতে আত্মার স্বরূপ নির্গুণরূপে অবস্থানই মুক্তি। সাংখ্য-যোগ মতে, পুরুষের বা আত্মার চিৎস্বরূপ অবস্থানই মোক্ষ। রামানুজের মতে ঈশ্বরের অংশ রূপে জীবের যে উপলব্ধি তাই মুক্তি।

চার্বাক মতে, চৈতন্য যুক্ত দেহই আত্মা। দেহের বিনাশের সাথে চেতনা ও আত্মার বিনাশ হয়। চার্বাক মতে মোক্ষ বা মুক্তি পুরুষার্থ হতে পারে না। তারা বলেন কাম বা সুখই পুরুষার্থ-'কাম এবৈক:পুরুষার্থ:'। "সুখমেব পুরুষার্থ"। চার্বাক ব্যতীত ভারতীয় অন্যান্য দার্শনিকরা সুখকে জীবনের নিষ্প্রয়োজন ও নিন্দনীয় না বললেও পরম পুরুষার্থ বলেন না। যে দর্শনে আত্মার স্বতন্ত্র শাশ্বত সত্ত্বা স্বীকৃত হয়নি, সে দর্শনে আত্মার মুক্তির প্রশ্ন অবান্তর ও নিরর্থক।

জৈন মতে, আত্মা স্বরূপতঃ অনন্ত জ্ঞান, শক্তি, অনন্ত দর্শন ও আনন্দের আশ্রয়। কামনা বাসনা জনিত কর্মশক্তির প্রভাবে আত্মা পুৎগল অর্থাৎ জড় পরমাণুর সংস্রবে আসে এবং আত্মা বিশেষ প্রকার দেহ ধারণ করে। এই প্রকার দেহ ধারণকেই আত্মার বন্ধন দশা বলা হয়। এই বদ্ধ অবস্থায় আত্মার স্বরূপ আবৃত থাকে। পুৎগল বিযুক্তিই হচ্ছে মুক্তি। অজ্ঞান জনিত কামনা বাসনার জন্যই পুৎগল সংযুক্তি ঘটে। জ্ঞানের সঞ্চার হলে নতুন পুৎগলের অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়, যাকে বলা হয় সংবর; সঞ্চিত পুৎগল বিনষ্ট হলে তাকে বলা হয় নির্জরা এবং আত্মা তখন স্বরূপে অবস্থান করে। জৈন দর্শনে বলা হয়েছে- "আস্রবো ভবহেতুঃ স্যাৎ সংবরো মোক্ষকারণম"। অর্থাৎ আস্রব সংসার বা বন্ধনের কারণ এবং সংবর হল মোক্ষের কারণ। এ প্রসঙ্গে উমাস্পতি তত্ত্বার্থাধিগম সূত্রে বলেছেন- সম্যকদর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষ মার্গা। অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান, সম্যক দর্শন ও সম্যক চরিত্রের দ্বারাই আত্মার মোক্ষ লাভ হয়। মোক্ষ অবস্থায় কোন দুঃখবোধ থাকে না। আত্মা এ অবস্থায় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত দর্শন ও অনন্ত আনন্দ লাভ করে। বদ্ধাবস্থায় যে দুঃখ ছিল, মোক্ষাবস্থায় শুধু যে তা থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তাই নয়, এই অবস্থায় আত্মা অনাবিল ও অনন্ত সুখের অধিকারী হয়।

বৌদ্ধমতে মোক্ষ বা মুক্তি কে নির্বাণ বলা হয়েছে। বুদ্ধদেব বলেছেন - সমস্ত বন্ধনের কারণ হল মোহ। আর এই মোহ থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় হল যথার্থ জ্ঞান। তিনি বলেছেন জীবন দুঃখময়, কিন্তু দুঃখের নিবৃত্তিও সম্ভব। আর এই দুঃখ নিরোধকেই তিনি নির্বাণ বলেছেন। অবিদ্যা, অজ্ঞানতাই হল দুঃখের মূল কারণ। অজ্ঞানের জন্যই মোহ এবং মোহমুক্তি মানেই অজ্ঞান- তরণ। বুদ্ধদেব বলেছেন, বন্ধনমুক্ত মন অগ্নি শিখার নির্বাণের সদৃশ। বন্ধনের কারণ রূপে বৌদ্ধ দর্শনে 'দ্বাদশ নিদানের' উল্লেখ করা হয়েছে। অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞানাদি দ্বাদশ নিদানকেই সংসার চক্র বা ভবচক্র বলা হয়। এই ভবচক্রের আবর্তন থেকে মুক্তি বা নির্বাণ লাভের উপায় স্বরূপ বৌদ্ধ দর্শনে অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলা হয়েছে। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গকে তিনটি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে প্রজ্ঞা,শীল ও সমাধি।

সম্যক দৃষ্টি
সম্যক সংকল্প → প্রজ্ঞা
সম্যকবাক

সম্যক কর্মান্ত
সম্যক আজীব → শীল
সম্যক ব্যায়াম

সম্যক স্মৃতি
→ সমাধি
সম্যক্‌সমাধি

প্রজ্ঞা অর্থে যথার্থ জ্ঞান, শীল অর্থে সদাচার, সমাধি অর্থে ধ্যানকে বোঝায়। বৌদ্ধ দর্শনে মোক্ষ বা নির্বাণ লাভের জন্য জ্ঞানমার্গের ও কর্মমার্গের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। বৌদ্ধগণ জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী।

অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতোই সাংখ্য কর্তারাও জীবনে সুখের চেয়ে দুঃখের মাত্রাধিক্যের কথা স্বীকার করেছেন। সাধারণত মানুষের জীবনের দুঃখকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে-- ১>আধ্যাত্মিক, ২>আধিভৌতিক এবং ৩>আধিদৈবিক। প্রত্যেক মানুষই এই তিন রকম দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের প্রার্থনা করে। সেই জন্য সাংখ্য কর্তারা বলেছেন দুঃখ ত্রয়াভিঘাত বা দুঃখ ত্রয়ের নাশ প্রত্যেক মানুষের পরম পুরুষার্থ। এই দুঃখ ত্রয়ের নাশকেই মুক্তি বা অপবর্গ বলে। সাংখ্য সূত্রে বলা হয়েছে - "জ্ঞানাৎ মুক্তি"। সাংখ্যকারিকায় বলা হয়েছে- "জ্ঞানেন চ অপবর্গ"। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগই হল বন্ধন। আর তাদের বিবেক জ্ঞানই হলো মুক্তি। যে কোন প্রকারে প্রকৃতির সম্বন্ধের উচ্ছেদ হওয়াই পরমপুরুষার্থ বা মোক্ষ-"যদ্বাতদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ"।[৩]

দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায় হল তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ হল 'ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞান'। 'ব্যক্ত' অর্থে প্রকৃতির বিকাশ স্থুল পদার্থ, 'অব্যক্ত' অর্থে প্রকৃতি এবং 'জ্ঞ' অর্থে জ্ঞাতা বা পুরুষকে বোঝায়। সাংখ্য মতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল মোক্ষ। পুরুষের স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। মোক্ষাবস্থায় আত্মার কোন নতুন কিছুর উদ্ভব হয় না। আত্মা বা পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাবের। নৃত্যাসরে দর্শকের ভূমিকা যেরূপ, সেরূপ সাক্ষী পুরুষ স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে উদাসীনভাবে প্রকৃতির লীলা দেখে। এই উদাসীনভাবে পুরুষের স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ।

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর যোগদর্শন-এ বলেছেন "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধ:"[৪] অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগ নামে অভিহিত করা হয়। প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি -এই পাঁচ প্রকার বৃত্তির যখন নিরোধ হয় তখনই দ্রষ্টা আপন স্বরূপে স্থিতি লাভ করে। একেই যোগ শাস্ত্রে কৈবল্য বা মুক্তি বলে। "পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি"[৫] কৈবল্যপাদ। পুরুষকে ভোগ ও কৈবল্য প্রদান করার জন্যই গুণসমূহের প্রবৃত্তি। এই গুণগুলি সঙ্গে পুরুষের অবিদ্যা জনিত সংযোগ ছিল, তা ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর পুরুষের নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া-এই হল পুরুষের কৈবল্য অর্থাৎ সর্বতোভাবে পৃথক হয়ে আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। একে অসম্প্রজ্ঞাত যোগও বলা যায়। অসম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভ হলে পুরুষ চিতি শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থা পুরুষের আত্যন্তিক গুণবিয়োগাবস্থা অর্থাৎ এরপর আর কখনো কোন গুণ তাকে আবৃত করতে পারে না। গুণ এর সঙ্গে চিরতরে বিয়োগই হলো কৈবল্য বা মুক্তি।

ন্যায় সূত্রে বলা হয়েছে 'তদত্যন্তবিমোক্ষোপবর্গঃ'। অর্থাৎমুখ্য ও গৌণ সর্ববিধ দুঃখের সহিত অত্যন্ত বিয়োগই হলো মুক্তি বা অপবর্গ। ন্যায় দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি গৌতম অপবর্গ বা মোক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ- মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।"[৬] অর্থাৎ দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, মিথ্যাজ্ঞান এদের মধ্যে সর্বশেষ কথিত মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হলে তার অব্যবহিত পূর্বে উক্ত দোষের নাশ হয়, দোষের নাশ হলে

[৩] সাংখ্য প্রবচন সূত্র ৬। ৭০

[৪] যোগদর্শন-২

[৫] যোগদর্শন-৩৪

[৬] ন্যায়সূত্র

তার পূর্বে প্রবৃত্তির নাশ হয়, প্রবৃত্তির নাশ হলে আর জন্ম হয় না, জন্মরুদ্ধ হলে দুঃখের নাশ হয় একেই অপবর্গ বা মোক্ষ বলা হয়। ন্যায় বৈশেষিক মতে আত্মা স্বরুপত: নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। অবিদ্যাবশতঃ আত্মা নিজেকে দেহ মন ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করে। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞানই হচ্ছে দুঃখের মূল কারণ। "তত্ত্বজ্ঞানাৎনিঃশ্রেয়সাধিগমঃ"[৭]- কেবল তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যেই জীব মন ও দেহের বন্ধন ত্যাগ করে নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ লাভ করতে পারে। আত্মা, শরীর প্রভৃতি ১৬ টি প্রমেয় পদার্থের যথার্থ জ্ঞানলাভ করলেই মোক্ষ লাভ হয়। এর জন্য প্রয়োজন শ্রবণ মনন, নিদিধ্যাসন। এই শ্রবণাদি দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। তত্ত্বজ্ঞান হলে আত্মা উপলব্ধি করে যে আত্মা দেহ নয়, ইন্দ্রিয় নয়, মন নয়।

শাস্ত্রোক্ত 'আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন' একথা শ্রবণ করার পর শাস্ত্র বাক্য গুলির যথার্থ চিন্তা করতে হবে,এরপর যুক্তির দ্বারা আত্মা যে দেহ থেকে ভিন্ন ও নিত্য তার অবধারণ করতে হবে এর নামই মনন। আত্মার স্বরূপ শ্রবনের পর তর্কের দ্বারা মনন করা উচিত। মননের পর আসবে নিদিধ্যাসন অর্থাৎ যোগাভ্যাসের দ্বারা আত্মার স্বরূপ ধ্যান করা। ধ্যানের মাধ্যমেই আত্মার যথার্থ স্বরূপের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়। তখন অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়ে আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ বা অপবর্গ।

প্রাচীন মীমাংসা দর্শনে ধর্মকেই পরম পুরুষার্থ বলা হয়েছে। জৈমিনি ও শবরের মতে বৈদিক বিধি 'স্বর্গকামঃ যজেত' অনুসরণীয়। অর্থাৎ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গ লাভই জীবের চরম লক্ষ্য। বেদ বিহিত যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারাই অনাবিল সুখ লাভ করা যায়। তাদের মতে স্বর্গ সুখ লাভই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু পরবর্তী মীমাংসক কুমারিল ভট্ট ও প্রভাকর মিশ্র, অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকের মতো পুরুষার্থের উল্লেখ করে মোক্ষকে প্রাধান্য দিয়েছেন। নব্য মীমাংসকদের মতে স্বর্গ সুখ পরম কাম্য হতে পারে না। কেননা সেই সুখেরও অবসান ঘটে। অনিত্য বস্তুতে সুখ স্থায়ী নয়-নিত্য ও অনন্ত প্রাপ্তিতেই প্রকৃত সুখ। শরীরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধই বন্ধন এবং এই বন্ধন নাশই হল মোক্ষ।

প্রভাকর মীমাংসকের মতে সর্বপ্রকার দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ ঘটে। ভোগের দ্বারা সমস্ত কর্মের ক্ষয় সাধন হলে জীবের মুক্তি হয়। আত্মজ্ঞানই মুক্তি লাভের উপায়। মুক্ত অবস্থায় আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। মোক্ষ প্রাপ্তিতে আত্মা নির্গুণ ও নির্বিশেষরূপে অনন্তকাল বিরাজ করে। মুক্ত অবস্থায় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে এবং সুখের অনুভূতিও থাকে না। মোক্ষলাভ হলে জীবের আর পুনর্জন্মও ঘটে না। আত্মজ্ঞান তথা তত্ত্ব জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের মাধ্যমেই মোক্ষলাভ সম্ভব।

বেদান্ত মতে জীব স্বরূপতঃ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, আত্মা। অদ্বৈতবেদান্তি শংকরের মতে জীবই ব্রহ্ম, জীবাত্মাই পরমাত্মা। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ নেই। জীবাত্মার পরমাত্মারূপে উপলব্ধি হলো মোক্ষ। আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের অভাবই জীবের বদ্ধ দশার কারণ। আসলে আত্মার বন্ধন নেই, মুক্তিও নেই। মুক্তি ও বন্ধন ভ্রম মাত্র। এই ভ্রম জ্ঞান কে বলা হয় অধ্যাস। বুদ্ধের সৃষ্টি হয় অধ্যাস থেকে। অধ্যাসের অভাবই হলো মোক্ষ। শঙ্করের মতে আত্যন্তিক জ্ঞান লাভের জন্য সাধন চতুষ্টয় অর্জন করতে হবে। সাধন চতুষ্টয় সম্পাদনার পর সাধক ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের অধিকারী হবে। জ্ঞানই মোক্ষলাভের একমাত্র পথ। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞানই মুক্তি। এই প্রকার জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শ্রবণ হচ্ছে 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বেদান্ত বাক্য শ্রবণ, মনন হল ওই সব বেদান্ত মহাবাক্যের তাৎপর্য গ্রহণ- ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু এমন চিন্তন, এবং নিদিধ্যাসন হল ব্রহ্মকে ধ্যানের বস্তু করে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ উপলব্ধি। এই প্রকার উপলব্ধিই মোক্ষ বা মুক্তি।

উপসংহার:

ভারতীয় দর্শন আধ্যাত্মিকতাবাদের দর্শন। উপনিষদে বলা হয়েছে "অসতো মা সদ্ গময়ঃ/ তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ।"[৮] অর্থাৎ অসৎ থেকে সৎ এর পথে এবং অন্ধকার থেকে আলোর পথে গমনই হল মুক্তি। চার্বাক ছাড়া প্রায় সকল দর্শন সম্প্রদায়ই মুক্তির সুলুক সন্ধান করেছেন। প্রায় সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করেছে যে মোক্ষের প্রধান

[৭] তদেব ১

[৮] বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-১/৩/২৮

প্রতিবন্ধকতা হল অবিদ্যা,অজ্ঞানতা। সত্য জ্ঞান তথা তত্ত্ব জ্ঞান যে মুক্তির কারণ তা ভারতীয় দার্শনিকেরা মনে করেন। যে তত্ত্বের আলোয় মানুষ মুক্তির স্বাদ পায় আর অনুভব করেন- "আমার মুক্তি আলোয় আলোয়।"[৯]

গ্রন্থপঞ্জী:

১. মুখোপাধ্যায়, ফাল্গুনী, ভারতীয় দর্শন, বিজয়া পাবলিশিং হাউস, ১০৬, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা ৭০০০০৬, ISBN :81-87964-10-3
২. বাগচী, দীপক কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, ৩৭ এ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, ISBN81-89846-10-8.
৩. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, ভারতীয় দর্শন, প্রকাশক শ্রী বিপ্লব ভাওয়াল, বুক সিন্ডিকেট লিমিটেড এর পক্ষে ৩৫কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ISBN-978-81-89019-24-2.
৪. বন্দোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রী বিজয় ভূষণ, ভারতীয় দর্শনে মুক্তিবাদ, প্রকাশক শ্রী পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
৫. ১।৮ চিত্তরঞ্জন কলোনি, যাদবপুর কলিকাতা ৩২
৬. মহর্ষি পতঞ্জলি কৃত যোগ দর্শন, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর।
৭. সান্যাল, জগদীশ্বর, ভারতীয় দর্শন, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০০০৯ ।
৮. চক্রবর্তী, ডক্টর নীরদবরণ, ভারতীয় দর্শন, দত্ত পাবলিশার্স, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯

[৯] রবীন্দ্রনাথের গীতবিতান ।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1190-1198
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.121

সাংখ্য দর্শনে অনুমান প্রমাণ: একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

রোজিনা খাতুন, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.04.2025; Accepted: 14.05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The main goal of Indian philosophy is the ultimate cessation of suffering, or liberation, but different philosophical schools have proposed different ways to achieve liberation. For example, the twenty-five principles of Sāṅkhya philosophy acknowledge that the ultimate cessation of suffering comes from the knowledge of the difference between prakṛti and purusha, which is contained in the twenty-five principles. In Sāṅkhya philosophy, each of the twenty-five principles is a subject of knowledge. pramāṇa is needed to establish these knowledge points. Therefore, a discussion of pramāṇa theory is necessary. Although there is disagreement about the number of pramāṇa, all Indian philosophical schools have accepted Perception (Pratyaksha) and have recognized it as the oldest and most powerful of all other pramāṇa. However, not everything can be proven by Pratyaksha, so we have to take the help of other pramāṇa such as Inference (anumāṇa), Verbal Testimony (Śabda) etc. The next pramāṇa of Perception (Pratyaksha) is anumāṇa. In Indian philosophy, anumāṇ a refers to the method of obtaining pramāṇa or true knowledge. And the knowledge obtained through that anumāṇa pramāṇa is called anumiti. This anumiti is a type of prama jñāna. When the term anumāṇa denotes inferential knowledge (anumiti-jñāna), it should be interpreted as employing the suffix anaṭ in the passive sense (bhāva-vācya). Conversely, when anumāṇa signifies anumāṇa as a means of proof, the suffix anaṭ is to be understood in the instrumental sense (karaṇa-vācya).

Although there is wide variation in Indian philosophical views on the laksana of anumāṇa, classification of anumāṇa etc., all philosophers, except the Charvākās, unanimously accept that anumāṇa is a distinct proof. Although Ishvarakṛsṇa did not discuss the nature of anumāṇa in detail in his book Sāṃkhyakārikā, Sāṅkhya philosophers before and after him have discussed the nature and classification of anumāṇa in detail. There is a lack of consensus among Sāṅkhya philosophers on the classification of anumāṇa. As there is no scope here to discuss in detail why this is so or whose views are more reasonable, this paper will only discuss the various anumāṇa accepted by Sāṅkhya philosophers.

Keywords: Sāṅkhya, Anumāṇa, Pramāṇa, Anumiti-jñāna, Vyāpti, Liṅga, Liṅgī

সাংখ্য দর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব মূলত *সাংখ্যকারিকা* এর উপর রচিত গৌড়পাদের *গৌড়পাদভাষ্য* ও বাচস্পতি মিশ্রের *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*র মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। প্রত্যেকটি ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ে প্রমেয় তত্ত্ব আলোচনা করার পর সেই প্রমেয় তত্ত্ব সিদ্ধ করার জন্য প্রমাণের স্বরূপ, সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করা হয়। কারণ যে তত্ত্ব প্রমানসিদ্ধ নয় তা আকাশ কুসুমের মতো অলীক বলে গণ্য হয়। এইজন্য প্রত্যেকটি ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় তাদের প্রমেয় তত্ত্ব

সিদ্ধ করার জন্য প্রমাণের স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা করেছে। সাংখ্য দর্শনও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন- "প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি"[১]। অর্থাৎ সাংখ্যগণের প্রমেয় তত্ত্ব সিদ্ধ করার জন্য প্রমাণের স্বরূপ আলোচনা প্রয়োজন। তবে আশ্চর্যের হলেও সত্যি যে সূত্রকারেরা কেউই প্রমাণের সামান্যলক্ষণ দেননি। *সাংখ্যকারিকা* যা বর্তমানে কপিল দর্শনের একমাত্র মৌলিক গ্রন্থ রূপে স্বীকৃত সেখানেও প্রমাণের সামান্য লক্ষণের নির্দেশ নেই। টিকাকার শ্রীবাচস্পতি মিশ্র *সাংখ্যকারিকার* এই নূন্যতা পরিহার করতে বলেছেন যে, প্রমাণ শব্দটিকে যৌগিক ধরলে তার নির্বাচন থেকেই প্রমাণের সামান্য লক্ষণটি পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন "প্রমীয়তে অনেন ইত নির্বচনাৎ প্রমাং প্রতি করণত্বং গম্যতে।"[২] অর্থাৎ প্রমার করণ বা সাধনই প্রমাণ। 'প্রমীয়তে অনেন'- এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্র-মা + অনট্ প্রত্যয় দ্বারা 'প্রমাণ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। সাংখ্য মতে প্রমা জ্ঞানের যা করণ তাই প্রমাণ এবং তা তিন প্রকার- প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ।[৩] সাংখ্য দর্শনের প্রমাণতত্ত্ব কিভাবে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে তা দেখানো বর্তমানে অসম্ভব কেননা প্রাচীন সাংখ্য গ্রন্থ প্রায় দুর্লভ, অন্যত্র কেবল তার নামের উল্লেখ আছে মাত্র। এক্ষেত্রে *যুক্তিদীপিকা* ও *তত্ত্বকৌমুদি* র সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এখানে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় অনুমান প্রমাণ, তাই আমরা এই প্রবন্ধে অনুমান প্রমাণের স্বরূপ, শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি বিষয়ে সাংখ্য মত আলোচনা করব।

অনুমানের স্বরূপ:

ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থে অনুমান প্রমাণের বিস্তারিত আলোচনা করেননি। বাচস্পতি মিশ্র তাঁর *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* নামক গ্রন্থে অনুমান প্রমাণের স্বরূপ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তবে তিনি ত্রিবিধ অনুমানের উল্লেখ করায়, *সাংখ্যকারিকা*তে যেহেতু ত্রিবিধ অনুমানের উল্লেখ পাওয়া যায় তাই বাচস্পতি মিশ্রের মত বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তবে প্রাচীন সাংখ্য দার্শনিক যেমন বিন্ধ্যবাসী প্রমুখ ব্যক্তিরা যেহেতু অনুমান কে দ্বিবিধ বলে উল্লেখ করেছেন, তা যে ঈশ্বরকৃষ্ণের অভিপ্রেত নয় তা বোঝা যায় তাঁর "ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতম"[৪] এই উক্তি থেকে। এখন আমরা ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থে অনুমানের যে লক্ষণ দিয়েছেন তা বাচস্পতি মিশ্রের বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করব। *সাংখ্যকারিকা* তে অনুমানকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে লিঙ্গ ও লিঙ্গি থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান হিসেবে।[৫] অর্থাৎ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর মধ্যে যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধজ্ঞানের করণ অনুমান এটাই ঈশ্বরকৃষ্ণের অভিপ্রেত অর্থ। বাচস্পতি মিশ্র এই সংজ্ঞাটিকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন 'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ হলো 'ব্যাপ্য' এবং 'লিঙ্গি' শব্দের অর্থ হলো "ব্যাপক"[৬]। সুতরাং ব্যাপ্যব্যাপকসম্বন্ধজ্ঞানাধীন জ্ঞানই হল অনুমান। অন্যদিকে এগুলিকে হেতু ও সাধ্য বলা হয়। অনুমান প্রক্রিয়ায় সাধ্য দ্বারা হেতুগুলি ব্যাপ্ত হয়। অনুমানমূলক জ্ঞান বা অনুমিতি জ্ঞান উৎপন্ন হয় হেতু (ধূম - যেটি ব্যাপ্ত) ও সাধ্য (বহ্নি - যেটি ব্যাপক) এর মাধ্যমে।[৭] বাচস্পতি উপলব্ধি করেন যে শুধুমাত্র ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমানমূলক জ্ঞানের কারণ হতে পারে না, ব্যাপারেরও প্রয়োজন আছে। যেমন— পর্বতে বিদ্যমান আলো বা পোড়া ছাই জাতীয় কিছু ধূম থেকে বহ্নির অনুমান করতে সহায়ক নাও হতে পারে। যেখানে সাধ্যের অনুমান করা হয়েছে সেখানে হেতু প্রয়োগের অতিরিক্ত কোন কিছুর অর্থাৎ পরামর্শের আবশ্যিকতা রয়েছে। এখানে হেতু ও সাধ্যের উল্লেখ থাকলেও হেতুজ্ঞান ও সাধ্যজ্ঞান এর উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু আমাদেরকে হেতুজ্ঞান ও সাধ্যজ্ঞান শাস্ত্রের তাৎপর্য বলে বুঝতে হবে। তাই বাচস্পতি মিশ্রের ভাষায় বলা যায় *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থে 'লিঙ্গি' শব্দটিকে একশেষ সমাস এর উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।[৮] প্রথম 'লিঙ্গী' শব্দের অর্থ 'ব্যাপ্তির নিরূপক' যা ব্যাপক এর ধারণা

---

১ সাংখ্যকারিকা, ৪

২ সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদি,সা.কা. ৪

৩ 'ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি'। - সাংখ্যকারিকা, ৪

৪ সাংখ্যকারিকা, ৫

৫ 'তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্ব্বকম'। - সাংখ্যকারিকা, ৫

৬ 'লিঙ্গম ব্যাপ্যম লিঙ্গি ব্যাপকম'। - সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সা.কা. ৫

৭ 'ধূমাদির্ব্যাপ্যা বহ্ন্যাদির্ব্যাপক'। - তদৈব

৮ গোস্বামী চন্দ্র, নারায়ণ.; সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী,পৃ- ৫৩

দেয়। দ্বিতীয় 'লিঙ্গী' শব্দের অর্থ হল লিঙ্গ বা হেতুর অধিকরণ। পক্ষই হেতুর অধিকরণ হয়।[৯] কিন্তু এখানে 'লিঙ্গী' শব্দের দ্বারা শুধু পক্ষকে বুঝলেই উপপত্তি হবে না। এই জন্য লক্ষণার দ্বারা 'লিঙ্গী' শব্দের অর্থ পক্ষবিশেষ্যক হেতুজ্ঞান বুঝতে হবে। অর্থাৎ কারিকাটি ব্যাখ্যা করা সময় এটির পুনরাবৃত্তি করলে আমরা পরামর্শ জ্ঞানের সন্ধান পেয়ে থাকি অর্থাৎ পক্ষ-সাধ্য-ব্যাপ্য-হেতুমান এরূপ জ্ঞান হল পরামর্শ। অতএব অনুমানের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে যে, অনুমান হল এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে হেতু দর্শন, ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুজ্ঞানের মাধ্যমে সাধ্যকে নিশ্চিত করা হয়। যেমন- 'পর্বত বহ্নিমান ধূমাৎ'- এখানে আমরা পর্বতে ধূম প্রত্যক্ষ করছি। এই ধূম ও বহ্নির মধ্যে যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে তা নিশ্চিতভাবে জানা গেলে তবে আমাদের ব্যাপ্তি স্মরণ হয় এবং তারপরে আমাদের পর্বতটি হেতু বিশিষ্ট, যে হেতু বহ্নির ব্যাপ্য অর্থাৎ 'পর্বতঃ বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান' এই আকারের জ্ঞান হয়। ব্যাপ্তিজ্ঞান পরামর্শের জনক এবং পরামর্শ জ্ঞান অনুমিতির জনক। সুতরাং পরামর্শকে আমরা ব্যাপার বলতে পারি। যখন আমরা বলি 'ব্যাপ্তিজ্ঞানকরণকজ্ঞানমনুমান' সেখানে পরামর্শের উল্লেখ না থাকলেও সেটা অন্তর্নিহিত আছে। এই জন্যই ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর পঞ্চম কারিকাতে পরামর্শের উল্লেখ না করলেও ব্যাপ্তিজ্ঞানের কথাই বলতে চেয়েছেন তা বোঝা যায় তাঁর কারিকায় উল্লেখিত "তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্বকম"[১০] এই লক্ষণের দ্বারা।

আচার্য মাঠর এবং গৌড়পাদ *সাংখ্যকারিকা* প্রদত্ত অনুমানের লক্ষণ সরাসরি স্বীকার করেননি।[১১]তবে তাঁরা অনুমানের ক্ষেত্রে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর আবশ্যিকতাকে স্বীকার করেছেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে কখনো কখনো লিঙ্গ থেকে লিঙ্গীর জ্ঞান হয় এবং কখনো কখনো লিঙ্গী থেকে লিঙ্গের জ্ঞান হয়।[১২] *সাংখ্যসূত্রে* অনুমানের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবদ্ধজ্ঞানমানুমানম্'[১৩]। অর্থাৎ অনুমান হল অপরিবর্তনীয় ব্যাপ্যের মাধ্যমে ব্যাপকের জ্ঞান। বাচস্পতি মিশ্রের অনেক পূর্ববর্তী সাংখ্য দার্শনিক বিন্ধ্যবাসী অনুমান সম্বন্ধে অনেক তথ্য দান করেছিলেন তবে দুর্ভাগ্যবশত সেই গ্রন্থ আর বর্তমানে পাওয়া যায় না। সাংখ্যসূত্রবৃত্তিকার অনিরুদ্ধের মতে অনুমান হল লিঙ্গ লিঙ্গীর মধ্যে অপরিবর্তনীয় সাহচর্য নিয়ম পর্যবেক্ষণ করা ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপ্যকে জানার মাধ্যমে ব্যাপকের জ্ঞান।[১৪] বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁর *সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে সাংখ্যসূত্রের* ব্যাখ্যায় বলেন, অনুমান হল অপরিবর্তনীয় সাহচর্য নিয়ম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ব্যাপকের জ্ঞান।[১৫] যদিও *যুক্তিদীপিকা সাংখ্যকারিকার* উপর রচিত একটি টিকাগ্রন্থ তবুও *যুক্তিদীপিকা* তে অনুমানের কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি।

অনুমানের উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলি বোঝার জন্য ব্যাপ্তি ধারণার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কেননা ব্যাপ্তি হলো অনুমানের যৌক্তিক ভিত্তি। অনুমানে পক্ষপদের সাথে সম্পর্কিত সাধ্যপদের জ্ঞান হেতু ও সাধ্য পদের মধ্যে ব্যাপ্তি জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। ব্যাপ্তি সম্বন্ধে ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থে বিশেষ কোন আলোচনা করেননি। তবে অনুমানের লক্ষণ আলোচনা করলে বোঝা যায় যে তিনি ব্যাপ্তিকে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং ব্যাপ্তি সম্পর্কে তৎকালীন যেসব মত ছিল সেই মতকে তিনি তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত বলে ধরে নিয়েছেন।[১৬] প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থ গুলিতে 'সাহচর্য নিয়ম' কথাটি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং তার সাথে 'ব্যাপ্তি' ও 'অবিনাভাব' এই দুটি পর্যায় শব্দও লক্ষ্য করা যায়।[১৭] ব্যাপ্তি হল স্বাভাবিক এবং উপাধি বর্জিত সম্পর্ক। কিন্তু উপাধি কী সে ব্যাপারে প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থে স্পষ্টভাবে কিছু বলা

---

[৯] Vide K. S.; *Sāṃkhya Yoga Epistemology*, p.112

[১০] চট্টোপাধ্যায় কুমার, নারায়ণ.; সাংখ্য-যোগদর্শন-প্রমাণতত্ত্ব, পৃ-১৩২

[১১] চট্টোপাধ্যায় কুমার, নারায়ণ.; সাংখ্য-যোগদর্শন-প্রমাণতত্ত্ব, পৃ-১৪২

[১২] 'তল্লিঙ্গলিঙ্গিপুর্বকামিতি লিঙ্গেনা ত্রিদন্ডাদি দর্শনেনাদৃষ্টো অপি লিঙ্গী সাধ্যতে নুনামসাউ পরিব্রাদস্তি যস্যেদম ত্রিদন্ডামিতি'। - মাঠরবৃত্তি, সা.কা.৫

[১৩] সাংখ্যসূত্র, ১.১০০

[১৪] 'অবিনাভদর্শিনো ব্যাপ্যজ্ঞানাদানুব্যপাকজ্ঞানামানুমানম্'। - সাংখ্যসূত্রবৃত্তি, ১.১০০

[১৫] 'ব্যাপ্তিদর্শনাদ্ব্যাপকজ্ঞানামানুমানম'। – সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, সা.সূ. ১.১০০

[১৬] চট্টোপাধ্যায় কুমার, নারায়ণ., সাংখ্য-যোগদর্শন-প্রমাণতত্ত্ব,পৃ-১৩৫

[১৭] চট্টোপাধ্যায় কুমার, নারায়ণ., সাংখ্য-যোগদর্শন-প্রমাণতত্ত্ব,পৃ-১৩৫

নেই। ভারতীয় সকল দর্শন সম্প্রদায়ে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনার ধারাটি মোটামুটি ভাবে একই রকম ছিল। *সাংখ্যসূত্রের* পঞ্চম অধ্যায়ে বিশেষ করে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে অনেক সূত্র রচিত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন দার্শনিকদের মতের উল্লেখ আছে।[১৮] তবে এই সূত্র গুলির সমর্থক হিসেবে আর কোন প্রাচীন গ্রন্থ আমরা পায়না এবং তার কারনও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। *সাংখ্যসূত্রে* বলা হয়েছে "নিয়তধর্মসাহিত্যমুভয়রেকতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ"[১৯]। অর্থাৎ ব্যাপ্তি হল সাধ্য এবং সাধন উভয়ের নিরন্তর সহ অবস্থান, তাছাড়া আলাদা কিছু নয়। বিজ্ঞানভিক্ষু ব্যাপ্তি জ্ঞানকে অনুমিতির কারণ বলেছেন এবং অনিরুদ্ধ ভট্ট তাঁর রচিত *সাংখ্যপ্রবচনসূত্রবৃত্তিতে* এই সম্পর্কে বিশেষ কোন কথা বলেননি।[২০] আবার কিছু আচার্যের মতে ব্যাপ্তি হলো একটি অতিরিক্ত সত্তা হিসেবে বস্তুর নিজ শক্তির প্রভব।[২১]

অনুমানের বিভাগ:

ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থে ত্রিবিধ অনুমানের কথা বললেও সেই অনুমানগুলির নাম উল্লেখ করেননি তার কারণ মহর্ষি গৌতম তাঁর পূর্বেই *ন্যায়সূত্রে* অনুমানগুলির নাম উল্লেখ ও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছিলেন এবং তৎকালীন দার্শনিক সমাজে সেই আলোচনা বিশেষ ভাবে সমাদৃত ও গৃহীত হয়েছিল।[২২] মহর্ষি গৌতম তাঁর *ন্যায়সূত্রে* তিন প্রকার অনুমানের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল- পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। সাংখ্যকারিকাকার বোধ হয় পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট এই ত্রিবিধ অনুমানের কথাই বলতে চেয়েছিলেন। তবে তিনি শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের কথা তাঁর ষষ্ঠ কারিকার মধ্যেই বলেছেন।[২৩]

"সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রয়ানণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎসিদ্ধম্।" (সা. কা.- ৬)

আচার্য গৌড়পাদের মতে অনুমান পাঁচ প্রকার যথা- পূর্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতোদৃষ্ট, লিঙ্গ এবং লিঙ্গী।[২৪] সর্বপ্রথম বাচষ্পতি মিশ্রই অনুমানের শ্রেণিবিভাগ সঠিকভাবে করেছিলেন। বাচষ্পতি মিশ্রের অনেক পূর্ববর্তী সাংখ্য দার্শনিক বিন্ধ্যবাসী বীত ও অবীত এই দ্বিবিধ অনুমানের নামকরণ সর্বপ্রথম করেছিলেন বলে মনে করা হয়। যুক্তিদীপিকাকারও এই মত পোষণ করেছেন।[২৫] আচার্য মাঠর তাঁর *মাঠরবৃত্তিতে* তিন প্রকার অনুমানের কথা বলেছেন- পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট।[২৬] তিনি গৌড়পাদের পঞ্চবিধ অনুমানের কথা স্বীকার না করলেও পূর্ববৎ ও শেষবৎ অনুমানের ব্যাখ্যা গৌড়পাদকে অনুসরণ করেই দিয়েছেন। আবার সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানকে অতীন্দ্রিয়পদার্থ জানবার উপায় রূপে অবলম্বন করেছেন এবং অনুরূপ দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তাঁর মতে এই অতীন্দ্রিয় অবশ্য অদৃশ্য নয়।[২৭] যুক্তিদীপিকাকারের পরবর্তীকালে বাচষ্পতি মিশ্র প্রাচীন সাংখ্যগনের দ্বিবিধ অনুমানের উল্লেখ করেছেন- বীত এবং অবীত।[২৮] অনিরুদ্ধ ভট্ট ত্রিবিধ অনুমানের ক্ষেত্রে নতুন কোন কথা বলেননি। যদিও তিনি কেবল অন্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী এবং অন্বয়ীব্যতিরেকী অনুমানের নাম উল্লেখ করেছেন। *সাংখ্যসূত্রে* কোথাও অনুমানের বিভাগের উল্লেখ

---

[১৮] সাংখ্যসূত্র, ৫.২৮-৫.৩৫

[১৯] সাংখ্যসূত্র, ৫.২৯

[২০] চট্টোপাধ্যায় কুমার, নারায়ণ.,সাংখ্য-যোগদর্শন-প্রমাণতত্ত্ব, পৃ-১৩৪

[২১] 'নিজশক্ত্যুদ্ভবমিত্যাচার্যঃ'। - সাংখ্যসূত্র, ৫. ৩১

[২২] ঘটক,পঞ্চানন.,সাংখ্যদর্শন,পৃ-১৬

[২৩] 'সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রয়ানণাং প্রতীতিরনুমানাৎ। তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎসিদ্ধম্'। - সাংখ্যকারিকা, ৬

[২৪] তদৈব, পৃ-১৪৫

[২৫] 'তত্র প্রযোগমাত্রভেদাত দ্বৈবিধাম বিতাঃ আভিতাঃ ইতি'। - যুক্তিদিপিকা, সা.কা. ৫

[২৬] মাঠরবৃত্তি,৫

[২৭] চট্টোপাধ্যায় কুমার, নারায়ণ.,সাংখ্য-যোগদর্শন-প্রমাণতত্ত্ব,পৃ-১৪৬

[২৮] 'তাবৎ দ্বিবিধম বীতমবিতং চ'। - সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সা.কা. ৫

না থাকলেও বিজ্ঞানভিক্ষু অনুমানের তিনটি বিভাগের উল্লেখ করে তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছেন।[২৯] উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনুমানের বিভাগ বিষয়ে সাংখ্য দার্শনিকদের মধ্যে ঐক্যমতের অভাব রয়েছে। এর কারণ কি বা কার মত যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ এখানে না থাকায় আমরা শুধু এখানে সাংখ্য দার্শনিক স্বীকৃত বিভিন্ন অনুমানগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করব:

- **পূর্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান:**

পূর্ববৎ অনুমান- *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* তে বলা হয়েছে পূর্ববৎ অনুমান হল সেই অনুমান যেখানে কোন প্রসিদ্ধ বা জ্ঞাত শ্রেণীর অন্তর্গত কোন একটি বস্তুকে অনুমান করা হয়। যেমন, পর্বতে ধূমের মাধ্যমে বহ্নির অনুমান।[৩০] যুক্তিদীপিকাকারের মতে পূর্ববৎ অনুমানে কারণটিকে পর্যবেক্ষণ করার পর ভবিষ্যতের কার্যকে জানা যায়।[৩১] যেমন- আকাশে ঘন মেঘ দেখার পরে কেউ ভবিষ্যৎ বৃষ্টিপাতের অনুমান করতে পারেন।[৩২] যদিও যুক্তিদীপিকাকার এই উদাহরণটি ত্রুটি মুক্ত মনে করেন না।[৩৩] তাই যুক্তিদীপিকাকারের মতে পূর্ববৎ অনুমানকে আমরা এইভাবে বোঝার চেষ্টা করতে পারি- যেখানে সহকারি অন্য শক্তি দ্বারা অনুগৃহীত অপ্রতিবন্ধক কার্যকারণ শক্তিকে পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কার্যের ভবিষ্যৎ উত্থানকে জানতে পারে, ঠিক যেমন লৌহদণ্ডাদি সাধন সামগ্রী নিয়ে কুম্ভকার মাটি থেকে ব্যাপারের দ্বারা ঘট প্রস্তুত করেন।[৩৪] মাঠর এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর দৃষ্টিতে পূর্ববৎ অনুমান পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। তাঁরা পূর্ববৎকে ব্যাখ্যা করেছেন পূর্ব প্রত্যক্ষিত বিষয় হিসেবে।[৩৫] যেমন, আকাশে ঘন মেঘ দেখে বৃষ্টির অনুমান। গৌড়পাদ যুক্তিদীপিকাকার কে এ বিষয়ে অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয়। তাঁদের মতে পূর্ববৎ অনুমান হল পূর্ব হিসেবে যার হেতু বা কারন আছে।[৩৬]

শেষবৎ অনুমান- শেষবৎ অনুমানকে প্রধানত তিনটি অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে - (১) কার্য থেকে কারণ অর্থে (২) একটি অংশ থেকে শেষ অংশ অর্থে (অবশিষ্ট অংশ) এবং (৩) বর্জনের মাধ্যমে (বিকল্প) অর্থে।

(১) ব্যাখ্যা অনুসারে, শেষবৎ অনুমান হল যেখানে সম্পন্ন কার্যটি প্রত্যক্ষ করার পর অপ্রত্যক্ষ কারণের অনুমান করা হয়। যেমন- একটি ছেলেকে দেখার পর তার পিতা মাতার মিলন অনুমান করা হয়। উল্লেখ্য যে, শেষবৎ অনুমানের এই ব্যাখ্যাটি যুক্তিদীপিকাকার দিয়েছেন। তবে তিনি নিজেই মনে করেন উক্ত উদাহরণটি ত্রুটিমুক্ত নয়।[৩৭] তাই যুক্তিদীপিকাকার অন্য একটি ত্রুটিহীন উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যেমন, জলের উপর পাতা দেখে বোঝা যাবে জলের নিচে শালুক ছিল অথবা অঙ্কুর দেখে বোঝা যাবে মাটির নিচে বীজ ছিল।[৩৮]

---

[২৯] সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, সা.সূ.১.১০৩

[৩০] "তত্রৈকং দৃষ্টলক্ষণসামান্যবিষয়ং যৎ তৎপূর্ববৎ.......যথা ধূমাদ্বহ্নিসামান্য বিশেষঃ পর্বতেহনুমীয়তে।" - সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সা.কা.৫

[৩১] 'তত্র পূর্ববৎ যদা কারণমব্ভুদিতং দৃষ্ট্বা ভবিষ্যত্বং কার্যস্য প্রতিপদ্যেতে'। - যুক্তিদিপিকা, সা.কা.৫

[৩২] 'তদ যথা মেঘোদয়ে ভবিষ্যত্বং বৃষ্টেঃ'। - যুক্তিদিপিকা, সা.কা.৫

[৩৩] 'ন হি মেঘোদয়োহবশ্যং বৃষ্টেঃ কারণং ভবতি বায়্যা দিনিমিত্তপ্রতিবন্ধসম্ভবাৎ'। - তদৈব

[৩৪] 'যদি তর্হি কারণশক্তিং সহকারিশক্ত্যন্তরাহনুগৃহীতাম...তদ যথা যদা লৌহদন্ডাদিসাধন সম্পন্নেন ব্যাপরবতা...তদা পূর্ববৎ।' - যুক্তিদিপিকা, সা.কা.৫

[৩৫] মাথরবৃত্তি, সা.কা.৫
'তত্র প্রত্যক্ষীকৃতজাতীয়বিষয়কং পূর্ব্ববৎ।'- সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, সা.সূ. ১.১০৩

[৩৬] 'পূর্ব্বমস্যাস্তীতি পূর্ব্ববদযথা মেঘোন্নত্যা বৃষ্টিং সাধয়তি পূর্ব্ববৃষ্টিত্বাৎ'।- গৌড়পাদভাষ্য, সা.কা. - ৫

[৩৭] 'ন হি দ্বয়সমাপত্তিপূর্বক এব প্রানভৃতাং প্রাদুর্ভাবো, দ্রোণাদিনামন্যথোৎপত্তিবিশেষ শ্রবণাৎ'। - যুক্তিদিপিকা, সা.কা.,৫

[৩৮]'পর্ণং দৃষ্ট্বা শালূকং প্রতিপদ্যতে, অঙ্কুরং বা দৃষ্ট্বা ভা দ্রষ্টভা বীজমিতি তদা শেষবৎ'। - যুক্তিদিপিকা, সা.কা.,৫

(২) ব্যাখ্যা অনুসারে, শেষবৎ অনুমান হল সেই অনুমান যেখানে আমরা একটি সমগ্র অংশের এক ক্ষুদ্র অংশকে জানতে পারি এবং অবশিষ্ট অংশ ক্ষুদ্র অংশের মতোই সমগুণ সম্পন্ন। এই ব্যাখ্যাটি গৌড়পাদ ও মাঠর দিয়েছেন এবং তারা একই উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। যেমন, সমুদ্র থেকে এক ফোটা জল লবণাক্ত হওয়ায় কেউ অনুমান করে যে বাকি জলও লবণাক্ত।[৩৯]

(৩) ব্যাখ্যা অনুসারে, শেষবৎ অনুমান হল বস্তুর সম্ভাব্য ধর্মকে বর্জন করার পরে অবশিষ্ট অংশের যে জ্ঞান, যা অন্য বস্তুর সাথে অবাঞ্ছিতভাবে যুক্ত নয়। বিজ্ঞানভিক্ষু এই ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন।[৪০] যেমন, ক্ষিতিত্বের মাধ্যমে পৃথিবীকে অন্য সমস্ত দ্রব্য থেকে আলাদা করার জন্য শেষবৎ অনুমান করা হয়।[৪১] এবং বাচস্পতি মিশ্র বিজ্ঞানভিক্ষুকে অনুসরণ করে এই অনুমানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[৪২] এই ধরনের অনুমান শব্দকে গুণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।[৪৩]

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান- *সাংখ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান হল পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েরই অস্তিত্বের প্রমাণ।[৪৪] এই অনুমানে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে কেবল ব্যাপ্তি সম্পর্ক থাকে, কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় না। কেবলমাত্র সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে এই অনুমান করা হয়। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানকে প্রধানত দুটি অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে - (ক) সাদৃশ্যের মাধ্যমে এবং (খ) একটি ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করার পর অন্যান্য ক্ষেত্রেও সেই বৈশিষ্ট্যটিকে অনুমান করার মাধ্যমে।

গৌড়পাদ তাঁর *ভাষ্যে* উভয় অর্থের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি (ক) অর্থের ব্যাখার উদাহরণ প্রসঙ্গে বলেন, চৈত্র নামে কোন ব্যক্তি এক স্থান পরিত্যাগ করে অন্য স্থানে উপস্থিত হয় এটা দেখে তাকে যেমন গতি বিশিষ্ট বলে মনে হয় তেমন চন্দ্র তারাও গতি বিশিষ্ট বলে মনে হয়। কেননা তারাও স্থান পরিবর্তন করে।[৪৫] এই অর্থ অনুসারে, সংক্ষেপে, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান হল সেই অনুমান যেখানে একটি বস্তুর সাদৃশ্যের মাধ্যমে অন্য একটি বস্তুর অনুমান করা হয়ে থাকে। এবং (খ) অর্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গৌড়পাদ, মাঠর প্রদত্ত একই উদাহরণ দিয়েছেন। অর্থাৎ একটি আম গাছের ফুল দেখে কেউ অনুমান করে অন্যান্য আম গাছেও ফুল আছে।[৪৬] মাঠরাচার্য তাঁর *মাঠরবৃত্তিতে* কেবলমাত্র (খ) অর্থের ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন।[৪৭] এই অর্থে, সংক্ষেপে, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান হল সেই অনুমান যেখানে কোন বস্তুর একটি ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করার পর অন্যান্য ক্ষেত্রেও সেই বৈশিষ্ট্যটিকে অনুমান করা হয়ে থাকে।

- **বীত ও অবীত অনুমান :**

প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্য বিন্ধ্যবাসীই সর্বপ্রথম অনুমানকে বীত ও অবীত এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন বলে দাবী করা হয় এমনকি যুক্তিদীপিকাকারও এই মত স্বীকার করে তাঁর গ্রন্থে এই দ্বিবিধ অনুমানের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৪৮]

---

[৩৯] 'সমুদ্রোদকবিন্দুং প্রাস্য শেষস্য লবনাভব অনুমীয়তে ইতি শেষবৎ'। - মাথরবৃত্তি, সা.কা.,৫
'সমুদ্রদেকম জলাবলম লবনামাসাদ্য শেষস্যাপ্যস্তি'। - গৌড়পাদভাষ্য, সা.কা.,৫

[৪০] 'ব্যতিরেকানুমানং শেষবৎ শেষোঽপূর্ব্বোঽর্থোঽস্য বিষয়াত্বেনাস্তীতি শেষবৎ।অপ্রসিদ্ধসাধ্যকমিতি যাবৎ'।- সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, সা.সূ. ১.১০৩

[৪১] যথা পৃথিবীত্বেনেতরভেদানুমানম্। - সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, সা.সূ. ১.১০৩;

[৪২] 'শিষ্যতে পরিশিষ্যতে ইতি শেষঃ স এব বিষয়তয়া যস্যাস্ত্যানুমানজ্ঞানস্য তচ্ছেষবৎ'। - সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সা.কা.৫

[৪৩] গোস্বামী,নারায়ণচন্দ্র.; সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদি, সা.কা. ৫, পৃ-৫৫

[৪৪] 'সামান্যতোদৃষ্ট উভয়াসিদ্ধিঃ'। - সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ১. ১০৩

[৪৫] 'দেশান্তরাদ্দেশান্তরং দৃষ্টং গতিমচন্দ্রতারকং, চৈত্র' । - গৌড়পাদভাষ্য, সা.কা. ৬

[৪৬] 'তথা পুষ্পিতাম্রনদর্শনাদন্যত্রপুষ্পিত মা ইতি সামান্যতোদৃষ্টেন সাধয়তি'। - গৌড়পাদভাষ্য, সা.কা.,৬

[৪৭] 'পুষ্পিতামরাদর্শনাৎ অন্যত্র পুষ্পিতা অমরা ইতি'। - মাঠরবৃত্তি, সা.কা.৫

[৪৮] 'তত্র প্রযোগমাত্রভেদাত দ্বৈবিধাম বিতাঃ আভিতাঃ ইতি'। - যুক্তিদিপিকা, সা.কা.৫

যুক্তিদীপিকা তে বলা হয়েছে প্রয়োগের দিক থেকে অনুমান দুই প্রকার- বীত এবং অবীত।[৪৯]যুক্তিদীপিকাকারের মতে যে হেতুটি সাধ্য সিদ্ধির পক্ষে স্বরূপে প্রযুক্ত হয় তাহল বীত। আর যে হেতুটি অবশেষে অন্য অর্থকে বোঝায় তাহল অবীত।[৫০]পরবর্তীকালে বাচস্পতি মিশ্র তাঁর *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* নামক গ্রন্থে এই দ্বিবিধ অনুমানের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে যে অনুমানটি অন্বয়ব্যাপ্তি মূলক সেটি হলো বীত অনুমান[৫১] এবং যা ব্যতিরেক ব্যাপ্তি মূলক তা হল অবীত অনুমান।[৫২] এই বীত ও অবীত অনুমানের মধ্যে অবীত অনুমানকে বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়রীতি অবলম্বন করে তার *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে* শেষবৎ অনুমান বলেছেন।[৫৩] এই শেষবৎ অনুমানকে পরিশেষ অনুমানও বলা হয়েছে।[৫৪] এমনকি বাচস্পতি মিশ্র ন্যায় ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রদত্ত শেষবৎ অনুমানের দৃষ্টান্তটিকেই আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন।[৫৫] কিন্তু তিনি এই দৃষ্টান্তটিকে স্বীকার করেননি।

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী তে বীত অনুমানকে পূর্ববৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।[৫৬] যে অনুমানের বিষয় জ্ঞাত পদার্থ অর্থাৎ অনুমান করার পূর্বে সহচারদর্শনকালে ব্যাপক রূপে জ্ঞাত পদার্থ সাধ্য হয় সেই অনুমান পূর্ববৎ।[৫৭] যেমন- ধূমের উপস্থিতি থেকে আমরা পর্বতে বহ্নির উপস্থিতি অনুমান করি।[৫৮] দ্বিতীয় প্রকার বীত অনুমান হল সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান।[৫৯] সামান্যতোদৃষ্ট হল সেই অনুমান যার স্বলক্ষণ পূর্বে জ্ঞাত হয়নি এরূপ সামান্য বিশেষের জ্ঞান।[৬০] *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* তে বলা হয়েছে, যে সামান্যের স্বজাতীয় কোন বিশেষ ব্যক্তি অনুমানের পূর্বে প্রত্যক্ষিত হয়নি কিন্তু ঐ সামান্যের ব্যাপক সামান্যের স্বলক্ষণ প্রত্যক্ষিত হলে, সেই সামান্যকে বিষয় করে যে অনুমান করা হয় তা সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান।[৬১] যেমন- ইন্দ্রিয় বিষয়ক অনুমান।

- **কেবল অন্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী ও অন্বয়ীব্যতিরেকী অনুমান :**

সাংখ্য দর্শনের টীকাকার অনিরুদ্ধ ভট্ট তাঁর *সাংখ্যপ্রবচনসূত্রবৃত্তি* তে ত্রিবিধ অনুমান (পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যোতদৃষ্ট) ব্যতীত আরও তিন প্রকার অনুমানের উল্লেখ করেছেন, যথা- কেবল অন্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী এবং অন্বয়ীব্যতিরেকী, তবে এগুলো নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেননি।[৬২] কেবলঅন্বয়ী অনুমানে কেবলমাত্র অন্বয়ী দৃষ্টান্তের ওপর ভিত্তি করে অনুমান করা হয়। যেমন– 'শব্দ অনিত্য যেহেতু তা উৎপত্তিশীল'। কেবল ব্যতিরেকি অনুমানে কেবলমাত্র ব্যতিরেকি দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে অনুমান করা হয়। যেমন– 'জীবিত শরীর সাত্মক (মন ও আত্মার দ্বারা যুক্ত), যেহেতু তা প্রাণাদিমান'। অন্যদিকে, অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমানে অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয় প্রকার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অনুমান করা হয়। যেমন-'ধূম থেকে বহ্নির অনুমান'।

---

[৪৯] 'প্রয়োগমাত্রভেদাদ দ্বৈবিধ্যম। বীতঃ অবীত ইতি'। - যুক্তিদীপিকা, সা.কা.৬

[৫০] 'যদা হেতুঃ স্বরূপেণ সাধ্যসিদ্ধৌ প্রযোজ্যতে।স বীতোহর্থান্তরাক্ষেপাদিতরঃ পরিশেষিতঃ'। - তদৈব

[৫১] 'অন্বয়মুখেন প্রবর্তমানং বিধায়কং বীতম'। - সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সা.কা.৫

[৫২] 'ব্যতিরেকমুখেন প্রবর্তমানং নিষেধকমঅবীতম'। - তদৈব

[৫৩] 'তত্রাবীতং শেষবৎ'। - সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সা.কা.৫

[৫৪] 'অন্যাত্রাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে সম্পত্যয়ঃ পরিশেষঃ।'-তদৈব

[৫৫] 'প্রসক্তপ্রতিষেধ অন্যাত্রাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে সম্পত্যয়ঃ পরিশেষঃ।' ইতি(ন্যায়ভাষ্যম)- সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সা.কা.৫

[৫৬] 'বীতং দ্বেধা-পূর্ববৎ সামান্যতোদৃষ্টং চ'। - সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সা.কা.৫

[৫৭] 'তত্রৈকং দৃষ্টলক্ষণসামান্যবিষয়ং যৎ তৎপূর্ববৎ'। - তদৈব

[৫৮] 'যথা ধুমাদ্বহ্নিত্বসামান্যবিশেষঃ পর্বতে অনুমিয়তে, তস্য বহ্নিত্বসামান্যবিশেষস্য স্বলক্ষণং বহ্নিবিশেষো দৃষ্টোরসবত্যামঃ'। - সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সা.কা.৫

[৫৯] 'অপরং চ বীতং সামান্যতোদৃষ্টং'। - তদৈব

[৬০] বেদান্তচুঞ্চু, পূর্ণচন্দ্র., সাংখ্যকারিকা ৫,পৃ-৩৯

[৬১] 'সামান্যতোদৃষ্টং অদৃষ্টস্বলক্ষণসামান্যবিষয়ম্'।- সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সা.কা.৫

[৬২] 'অন্বয়ী, ব্যাতিরেকি, অন্ব্যব্যতীরেকি, পূর্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ সংহিতম্'। - সাংখ্যসূত্রবৃত্তি, ১.১০০

- **স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান:**

সাংখ্যকারিকা তে *এই* অনুমানের বিভাগকে উল্লেখ করা না হলেও *যুক্তিদীপিকা* তে এবং *মাঠরবৃত্তি* তে অনুমান সম্পর্কে আলোচনা করার প্রসঙ্গে অনুমানের এই ধরনের বিভাগের সংকেত পাওয়া যায়। আচার্য মাঠর ন্যায় বাক্যের তিনটি অবয়বের কথা বলেছেন সেগুলি হল- পক্ষ, হেতু এবং দৃষ্টান্ত। তিনি পক্ষকে বলেছেন প্রতিজ্ঞা এবং দৃষ্টান্তকে বলেছেন নিদর্শন। স্বার্থানুমান স্থলে এই তিনটি বাক্য যে একান্তভাবে প্রয়োজনীয় তা নৈয়ায়িকগণ বলে থাকেন। তাছাড়া পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে তাঁরা পঞ্চাবয়ব স্বীকার করেন এবং মাঠরও তা স্বীকার করেছেন বলে দাবী করা হয়। তবে স্বার্থানুমানে এগুলি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নেই বলে মাঠর মনে করেন।[৬৩] *যুক্তিদীপিকা* তেও প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন– এই পাঁচটি বাক্যকে পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন বলা হয়েছে। এছাড়া *যুক্তিদীপিকাকার* প্রাচীন ন্যায়ের দশাবয়বের কথা বলে সেগুলির উল্লেখ করেছেন।[৬৪] কিন্তু পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে দশাবয়বের আবশ্যিকতা যে নেই তা তিনি ইঙ্গিতের দ্বারা বুঝিয়েছেন।[৬৫] যদিও ঈশ্বরকৃষ্ণ অনুমানের এই পঞ্চ অবয়বের কথা স্পষ্টভাবে বলেননি, তবে তাঁর *সাংখ্যকারিকার* কিছু কারিকা থেকে এই পঞ্চাবয়বের একটি ধারণা পাওয়া যায়।[৬৬] গৌড়পাদ তাঁর *ভাষ্যে* সুনির্দিষ্ট ভাবে অনুমানের অবয়ব নিয়ে কোন আলোচনা না করলেও পঞ্চ অবয়বের আলোচনা তাঁর *ভাষ্যে* দেখা গেছে। প্রকৃতির অস্তিত্বের অনুমানের ক্ষেত্রে পঞ্চবয়যবের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬৭] *সাংখ্যসূত্রেও* পঞ্চাবয়বের উল্লেখ রয়েছে।[৬৮]

আমরা প্রতিনিয়তই কোন না কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেই চলেছি। এই জ্ঞান অর্জন প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ বা সরাসরি হতে পারে আবার পরোক্ষও হতে পারে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করি কিন্তু পরোক্ষ জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অনুমান, শব্দ ইত্যাদি প্রমাণের উপর নির্ভর করতে হয়। বস্তু জগতের খুব কম অংশই আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানতে পারি। যার ফলে এই বিশাল জ্ঞান ভান্ডারের প্রায় সবটুকুই থেকে যায় আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান পরিসীমার বাইরে। তাই মানুষ তার জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে অনুমান নামক এমন একটি উপায় বের করেছেন যার সাহায্যে তাদের জ্ঞানের সীমাকে ধূলিকণা থেকে শুরু করে মহাশূন্য পর্যন্ত বিস্তৃত করতে পেরেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রায় সকল দার্শনিক ও যুক্তিবিদ, গণিতজ্ঞ, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক অনুমানকে যথার্থ জ্ঞান অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে হোক প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে ভাবে জড়িত রয়েছে এই অনুমান। আমাদের সমাজিক জীবনের যাবতীয় কাজ কর্ম অনুমান ছাড়া প্রায় অচল এবং দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরা করাও কষ্টকর। এমনকি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে, প্রকল্প রচনার ক্ষেত্রে এই অনুমানের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক। জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, যন্ত্রবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, আইনশাস্ত্র, নন্দনতত্ত্ব, যোগা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই অনুমানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিমুহূর্তে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, কাউকে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে এবং নিত্য নতুন তথ্য প্রতিনিয়ত জানার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে হয়। তাই বলা যায় জ্ঞান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে অনুমানের গুরুত্ব অপরিসীম ও অনস্বীকার্য।

---

[৬৩] 'অনুমানংত্রিবিধম্। ত্রিসাধনং ত্র্যবয়বং। পঞ্চাবয়বমিত্যপরে..........এবং পঞ্চাবয়বেন ও বাক্যেন সুনিশ্চিতার্থ প্রতিপাদনং পরার্থনুমানম্। - মাঠরবৃত্তি সা.কা.৫, পৃ-১১৫

[৬৪] 'তস্যপুনরবয়বাঃজিজ্ঞাসাসংশয়প্রয়োজনশক্যপ্রাপ্তিসংশয়ব্যুদাসলক্ষণাশ্চব্যাখ্যাঙ্গম।প্রতিজ্ঞাহেতুদৃষ্টান্তোপসংহারনিগমনানিপরপ্রতিপাদনাঙ্গমিতি'। - যুক্তিদীপিকা, সা.কা.৬

[৬৫] চট্টোপাধ্যায় কুমার, নারায়ণ., সাংখ্য-যোগদর্শন-প্রমাণতত্ত্ব,পৃ-১৬০

[৬৬] সাংখ্যকারিকা, কারিকা-১৭,৩৫,৪২

[৬৭] 'তথা সমন্বয়াদিহলোকে প্রসিদ্ধির্দৃষ্টা যথা ব্রতধারিণং বটু দৃষ্ট্বা সমন্বয়তি......অতঃ সমন্বয়াদস্তিপ্রধানম্'। - গৌড়পাদভাষ্য সা.কা. ১৫

[৬৮] 'পঞ্চাবয়বযোগাৎ সুখসম্বিত্তিঃ'। - সাংখ্যসূত্র, ৫.২৭

গ্রন্থপঞ্জী:

১. বেদান্তচুঞ্চু, শ্রী পূর্ণচন্দ্র, সাংখ্যকারিকা-ঈশ্বরকৃষ্ণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৩
২. বন্দোপাধ্যায়, শ্রী অশোককুমার, ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকা, গৌড়পাদভাষ্য তত্ত্বকৌমুদীসহিতা সানুবাদ, ওরিয়েন্টাল প্রেস, কলকাতা- ০৬, ১৪১৪
৩. গোস্বামী, শ্রী নারায়ণচন্দ্র, ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকা শ্রী বাচষ্পতি মিশ্র বিরচিতা সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা- ০৬, ২০১৬
৪. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, সাংখ্যপ্রবচনসূত্র কৃত গদ্যানুবাদ, কলিকাতা -১২, ১৯৯৭
৫. তর্কাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কালীপদ, গৌড়পাদভাষ্য-গৌড়পাদাচার্য, ছাত্রপুস্তকালয়, কলিকাতা, ১৯২৮
৬. বেদান্তবাগীশ, কালীবর, শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুককৃত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য-তত্ত্ব-সমাসাখ্য-সাংখ্যসূত্র-সমেতম্, সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৩৬০
৭. বেদান্তবাগীশ, কালীবর, অনিরুদ্ধ বৃত্তি (তৃতীয় সংস্করণ)- অনিরুদ্ধ, বেদান্তবাগীশ নিকেতন, কলিকাতা, ১৩৩৭
৮. গৌরসুন্দর ভাগবত-দর্শনাচার্য্য দেবশর্ম্মণা সম্পাদিত, মাঠরবৃত্তি - মাঠরঃ, কাশীনাথ বেদান্তশাস্ত্রী প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩৪৭
৯. ত্রিপাঠী, শ্রী যদুপতি শাস্ত্রীনা, যুক্তিদীপিকা,সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা
১০. চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণকুমার, সাংখ্য-যোগদর্শন-প্রমাণতত্ত্ব, বিজন পাবলিশার্স,কলিকাতা-০৭, ১৯৮৮
১১. ঘটক, ডঃ পঞ্চানন, সাংখ্য দর্শন-১, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, ২০০০
১২. Shiv Kumar Vide, Sāṃkhya Yoga Epistemology, Generic publishers, 4th edition, 1984
১৩. Anima Sengupta, Classical Samkhya, The United press Ltd., 1969

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1199-1213
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.122

প্রাগাধুনিক বাংলা হস্তলিপি: ঐতিহ্যের শিল্পিত রূপান্তর ও ইতিহাসের নীরব ভাষ্য

ইয়াসমিন প্রামানিক, *রাষ্ট্রীয় সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, পাণ্ডবেশ্বর কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
ড. মোঃ সিদ্দিক হোসেন, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজ,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 18.05.2025; Accepted: 28 .05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The ancient handwritten manuscripts of the Bengali language are not merely linguistic expressions but represent a profound cultural heritage. This paper explores the historical evolution, artistic attributes, and socio-cultural significance of pre-modern Bengali manuscripts. Starting from the palm-leaf and birch-bark manuscripts preserved in ancient universities like Takshashila and Nalanda to the flourishing manuscript culture of medieval Bengal, every stage reflects a silent artistic legacy. The study highlights the structural beauty of these handwritten texts, their intricate calligraphy, and the unparalleled craftsmanship of scribes. Additionally, it discusses the process of manuscript reproduction and its impact on society. These handwritten manuscripts not only preserved literary traditions but also acted as milestones in the development of Bengali literature. These valuable relics from the past are not merely objects of pride for our heritage; they symbolize the immortality of Bengali literary art. The findings of this research emphasize the responsibility of the present generation to preserve this legacy for future ones.

Keywords: Manuscript, Pre-modern Bengali, Palm-leaf Manuscripts, Calligraphy, Scribe, Literary Heritage, Manuscript Reproduction

লিপির ইতিহাস মানব সভ্যতার অগ্রগতির অন্যতম প্রমাণ। প্রাগৈতিহাসিক যুগে গুহাচিত্র ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে ভাষার সূচনা পরিলক্ষিত হয়, যা পরবর্তীতে হস্তলিপির মাধ্যমে শিল্পমণ্ডিত রূপে বিকশিত হয়। বাংলার সাহিত্যিক ঐতিহ্যেও হস্তলিপির ভূমিকা অপরিসীম। প্রাচীন পুথি, তালপাতা ও ভোজপাতায় লিপিবদ্ধ গ্রন্থসমূহ আজও ইতিহাসের নিরব সাক্ষ্য বহন করে। তক্ষশীলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলি আমাদের কাছে একদিকে জ্ঞানচর্চার নিদর্শন, অন্যদিকে শিল্পিত ক্যালিগ্রাফির অপূর্ব উদাহরণ। বাংলার পুথি- সংস্কৃতি, যা মূলত মৌখিক পরম্পরায় শুরু হলেও, পরবর্তীতে লিপিকরদের নিপুণ হাতে হস্তলিপিতে রূপান্তরিত হয়। এ লেখনীতে প্রতিফলিত হয়েছিল বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবনার নিপুণ প্রকাশ। তাই, বাংলার হস্তলিপি কেবলমাত্র ভাষার বাহন নয়; এটি এক মহাকালের শিল্পিত সাক্ষ্য, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়েছে

- **হাতের লেখার ঐতিহ্য ও সাহিত্যিক মূল্যবোধ:**

"হাতের লেখা খারাপ হলে ক্ষতি নেই, লেখার হাত ভাল হওয়াই আসল।"- এই প্রবচন সাহিত্যিক সৃষ্টির গভীরতম তত্ত্বের প্রতিফলন। সাহিত্যের মর্মস্পর্শী অনুভূতি, চিন্তার গভীরতা ও কাব্যময়তা হাতের লেখার শৈল্পিকতার ওপর নির্ভর করে না; বরং লেখার অন্তর্নিহিত ভাব ও সৃজনশীলতায় তার অমরত্ব নিহিত। বাংলাসাহিত্যের বহু মনীষীর

হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে দেখা যায়, হাতের লেখা যতই অস্পষ্ট হোক, চিন্তার গভীরতা ও কাব্যময়তার সৌকর্য আজও পাঠককে মুগ্ধ করে।

- **প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি:**

প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানচর্চার দুই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র নালন্দা ও তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বিশ্ববিখ্যাত। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদ, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তালপাতা ও ভোজপাতায় লেখা অগণিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। শিক্ষার্থীরা হস্তলিপি শিখত এবং তা অলংকৃত ক্যালিগ্রাফি ও সূক্ষ্ম চিত্রাঙ্কনে সমৃদ্ধ ছিল। হিউয়েন সাং- এর বিবরণ অনুযায়ী, নালন্দার গ্রন্থাগারে তিনটি বিভাগ- Ratnasagara, Ratnadadhi এবং Ratnaranjak- ছিল, যেখানে দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য ও ধর্মীয় তত্ত্ব সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল।

মধ্যযুগে ইসলামী সভ্যতার দুই প্রধান জ্ঞানকেন্দ্র ছিল বাগদাদের 'বৈতুল হিকমাহ' এবং কর্ডোভার গ্রন্থাগার। এখানে গ্রিক, পার্সিয়ান ও ভারতীয় পাণ্ডুলিপির অনুবাদ হতো। ইবনে সিনা, আল- ফারাবি ও ইবনে রুশদ- এর দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক পাণ্ডুলিপিগুলি ছিল ক্যালিগ্রাফি ও অলংকরণের নিদর্শন।

ইউরোপে মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থায় হস্তলিপি ছিল জ্ঞানচর্চার মূল ভরকেন্দ্র। অক্সফোর্ড এবং ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বহু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আজও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। শেকসপিয়রের নাটকগুলোর মূল পাণ্ডুলিপি ছিল হাতে লেখা এবং অলংকৃত। প্রতিটি অক্ষর সূক্ষ্ম ক্যালিগ্রাফিতে উৎকীর্ণ ছিল।

- **হস্তলিপি সংরক্ষণ পদ্ধতি:**

প্রাচ্যে তালপাতা ও ভোজপাতায় লেখা পাণ্ডুলিপি বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করা হতো। তক্ষশীলা ও নালন্দার গ্রন্থাগারে বাঁশ ও কাঠের বাক্সে রক্ষিত এই পাণ্ডুলিপিগুলি ছিল জলরোধী ও কীটনাশক প্রতিরোধী। পাশ্চাত্যে ভেলাম (vellum) ও পার্চমেন্ট (parchment) ব্যবহৃত হত, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং শক্তিশালী। মধ্যযুগীয় ইউরোপে গির্জা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই পাণ্ডুলিপিগুলি লোহার খাঁচায় সংরক্ষিত থাকত।

- **হস্তলিপির শিল্পগুণ ও সাহিত্যিক ঐতিহ্য:**

হস্তলিপি ছিল কেবলমাত্র লিখনের মাধ্যম নয়, তা ছিল এক বিশেষ শৈল্পিক ঐতিহ্য। নালন্দা, তক্ষশীলা, বাগদাদ, কর্ডোভা, অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ- এই সব শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে হস্তলিপির অলংকরণ ও ক্যালিগ্রাফি কেবলমাত্র জ্ঞান সংরক্ষণের মাধ্যম ছিল না, তা ছিল এক শৈল্পিক নিদর্শন। আজও সেই পাণ্ডুলিপিগুলি আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে সংরক্ষিত আছে।

- **বাংলা পুথি লিখনের ঐতিহ্য: মৌলিকতা, নকলনির্মাণ ও পাঠ-প্রক্রিয়া:**

বাংলা পুথি-সাহিত্য আমাদের সাহিত্য-ইতিহাসের এক অপরিহার্য ও মূল্যবান অঙ্গ। এ এক বিস্মৃত অধ্যায়, যা কখনো মৌলিক সৃষ্টির দীপ্তিতে উজ্জ্বল, আবার কখনো অনুলিপি নির্মাণের সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় জটিল। তবে, প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে, আমি নিজে বাংলা পুথির হস্তাক্ষর-বিচার বা হাতের লেখার বিশ্লেষণে কোনও বিশেষজ্ঞ নই। এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞজনদের অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ যে কতখানি কার্যকরী, তা অস্বীকারের অবকাশ নেই। আমি কেবলমাত্র পুথিপাঠ ও পুথি দেখার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমার নিজস্ব উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। তবে এই বিশ্লেষণ যে চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয়, সে দাবি আমার নেই। এ শুধু এক আন্তরিক প্রচেষ্টা, যেখানে পুথির লেখনপ্রণালী, তার প্রতিলিপি নির্মাণ, এবং মৌলিক রচনার অনুসন্ধানকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস থাকবে।

- **পুথি লিখনের তিনটি পর্যায়: মৌলিকতা থেকে নকলের প্রসার:**

বাংলা পুথি লিখনের ইতিহাস গভীর মনোযোগে পর্যবেক্ষণ করলে মূলত তিনটি পৃথক ধারা পরিলক্ষিত হয়।

মৌলিক রচনা বা প্রাথমিক সৃষ্টিকর্ম:

পুথি রচনার সূচনাতেই থাকে সেই মৌলিক প্রতিভা, যে কবি বা লেখক প্রথমবারের মতো একটি সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করেন। এটি মূলধারা, যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী প্রতিলিপির বিস্তার ঘটে। এই মৌলিক পাণ্ডুলিপি হাতে লেখা হত; একটিমাত্র কপি, যার পাঠান্তর ও ব্যাখ্যা ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় মৌলিক এই

পুথিগুলি নানা কারণে হারিয়ে যায়, বা নষ্ট হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র উল্লেখ করা যেতে পারে, যা মূলত মৌখিক পরম্পরায় সংরক্ষিত ছিল এবং পরবর্তীতে লিপিবদ্ধ হয়। মৌলিক পুথির সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ; অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা যে পাণ্ডুলিপি হাতে পাই, তা মৌলিক নয়, বরং তার বহু পর্যায়ের অনুলিপি।

প্রাথমিক নকলনির্মাণ:

মৌলিক পুথি রচনার পর তার প্রতিলিপি তৈরি হতো- কখনও সরাসরি পাঠ করে শুনিয়ে, কখনওবা চোখে দেখে লিখে। এই অনুলিপি প্রক্রিয়া একাধিক ব্যক্তির হাতে সম্পন্ন হতো, এবং প্রত্যেকের হাতে লেখার ভঙ্গি, বানানরীতি ও ভাষার প্রয়োগে সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখা দিত। এখানেই নকলনির্মাণের সূচনা, যা মূল লেখার ভাবকে ধরে রাখলেও কোথাও কোথাও ভিন্নতা তৈরি করত। এই ভিন্নতা কখনও ছিল অনিচ্ছাকৃত- যেমন, লিখনপ্রক্রিয়ায় অনবধানতা বা ভুল, আবার কখনও সচেতনভাবে রচনার সম্প্রসারণ বা পরিবর্তন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, প্রতিলিপিকার নিজস্ব ব্যাখ্যা বা ভাবনাও রচনার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের বিভিন্ন পাঠান্তর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একই পঙক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তর প্রতিটি নকল পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান।

নকলের উপর নকল: চিরায়ত প্রতিলিপির বিস্তার:

প্রাথমিক নকলনির্মাণের পর, সেই নকল থেকে আবার আরও নকল তৈরি করা হতো। এ প্রক্রিয়া ছিল দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রায়শই ছিল ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতামুক্ত। ফলে, একটি পুথির অসংখ্য সংস্করণ বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ত। এখানে মৌলিক রচনার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হত; পাঠের ক্রমাগত প্রচার ও পুনরুৎপাদনের ফলে মৌলিক বক্তব্যে সংযোজন-বিয়োজন ঘটত। উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলায় এই প্রতিলিপি নির্মাণের প্রবণতা অব্যাহত ছিল, যা শুধু কাব্য নয়, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস ইত্যাদি বহু বিষয়ে বিস্তৃত ছিল।

- **প্রতিলিপি নির্মাণে পরিবর্তনের ধারা ও তার প্রভাব**

একটি মৌলিক রচনার প্রতিলিপি তৈরি করতে গেলে কেবল লেখকের ভাষা ও বক্তব্য সংরক্ষিত থাকত না; প্রতিলিপিকার নিজস্ব বোধ, ব্যাখ্যা ও মনোভঙ্গিও সংযোজিত হত। এ এক অভিনব প্রক্রিয়া, যেখানে মূল রচনাটি ক্রমান্বয়ে ভিন্ন রূপ ধারণ করত। অনেক সময় মূল লেখকের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বা ভাবগত সূক্ষ্মতা হারিয়ে যেত এবং তার পরিবর্তে নকলকারীর ভাষা ও শৈলীর প্রতিফলন ঘটত। এই পরিবর্তনকে 'পাঠান্তর বৈচিত্র্য' বলা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পাণ্ডুলিপি সংস্কৃতির উদাহরণ দেওয়া যায়। বিশেষত মধ্যযুগের ইউরোপীয় কপিস্টরা (Scribes) যখন বাইবেল বা ক্লাসিক গ্রন্থগুলির প্রতিলিপি করতেন, তখন তাঁদের হাতের লেখায় বা ব্যাখ্যায় নানান ভিন্নতা দেখা দিত। এটি কখনও বানানরীতি, কখনও বাক্যগঠন, কখনওবা শব্দার্থে পরিবর্তন আনে। ঐতিহাসিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিকদের মতে, এটি শুধু ভাষার বৈচিত্র্যই সৃষ্টি করেনি; বরং একটি গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ তৈরি করেছে।

- **বাংলার পুথি সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও তার সৃজনশীল বহমানতা**

বাংলা পুথি সাহিত্য আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক মূল্যবান স্মারক। মৌলিক রচনা থেকে প্রতিলিপি এবং তার পুনরুৎপাদনের এই দীর্ঘ প্রক্রিয়া কেবলমাত্র পাঠান্তর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেনি, বরং বাঙালি জাতিসত্তার সাহিত্যচর্চার এক ঐতিহাসিক পরিচায়ক হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিলিপি প্রথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, একটি গ্রন্থ কেবলমাত্র লেখকের হাতে সীমাবদ্ধ থাকে না; তা কালক্রমে একাধিক অনুলিপিকারীর হাতে প্রসারিত হয় এবং ভাষার নতুন আঙ্গিকে বেঁচে থাকে।

- **ভ্রমণকাব্যের আদিপর্ব: বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল':**

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শনগুলির মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত বিজয়রাম সেনের লেখা **'তীর্থমঙ্গল'**। এটি বাংলায় রচিত প্রথম সার্থক ভ্রমণকাব্যরূপে সাহিত্য-ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে। এই অমূল্য গ্রন্থটি সংরক্ষিত আছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ- এ, যেখানে বাংলা সাহিত্যের বহু অমূল্য ধ্রুপদী নিদর্শন যুগযুগান্তর ধরে লালিত ও সংরক্ষিত হচ্ছে। 'তীর্থমঙ্গল'-এর বিশেষত্ব এই যে, এটি বিজয়রাম সেনের স্বহস্তলিখিত ও স্বাক্ষরিত এক ঐতিহাসিক দলিল, যা রচিত হয়েছিল ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে। এমন সরল অথচ সুস্পষ্ট হস্তাক্ষরে রচিত এই পুথিটি বাংলা পাণ্ডুলিপি সাহিত্যকে নতুন দিগন্তে উন্নীত করেছে।

- **হস্তলিপির ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য:**

বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল'- এর এক বিশেষ তাৎপর্য হল, এতে ব্যবহৃত হস্তলিপির শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ শব্দই তিনি পৃথকভাবে লিখেছেন; অর্থাৎ, শব্দগুলি একে অপরের সংলগ্ন হয়ে মিশে যায়নি। বাংলার প্রাক-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক যুগের পুথিগুলিতে সাধারণত একটানে পদ বা বাক্য লেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। পাণ্ডুলিপি- সংস্কৃতিতে এটি 'টানা লেখা' নামে পরিচিত, যেখানে কাগজ থেকে কলম না- তুলে এক প্রবাহে পুরো বাক্য বা পদ লেখা হত। এই একটানা লেখাকে সে-সময়ে একধরনের 'পুণ্যকর্ম' বলে গণ্য করা হত, কারণ এতে লেখার মাঝে ভাঙন ঘটত না, ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকত।

তবে, বিজয়রাম সেন এই প্রথা ভেঙেছেন। তাঁর 'তীর্থমঙ্গল'- এ পৃথকভাবে লেখা শব্দগুলির পরিচ্ছন্ন বিন্যাস কেবল হস্তলিপির সুসংহত রূপই উপস্থাপন করেনি, এটি পাঠকের পাঠ- স্বাচ্ছন্দ্যেও অভিনব মাত্রা সংযোজন করেছে। পুথি পাঠের ক্ষেত্রে এক একটি শব্দ আলাদা ভাবে প্রতিস্থাপিত থাকায় পাঠক সহজেই তার ভাবসম্প্রসারণে প্রবেশ করতে পারে।

ভ্রমণকাব্যের অগ্রদূত:

'তীর্থমঙ্গল'-কে বাংলাভাষার প্রথম সার্থক ভ্রমণকাব্য বলা হয়। ভ্রমণকাহিনির সাহিত্যমূল্য যেখানে শুধুমাত্র ভৌগোলিক বর্ণনা নয়, বরং সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আঙ্গিক, মানুষের জীবনধারা, বিশ্বাস, আচার- অনুষ্ঠানের চিত্রায়ণ- এই সবই বিজয়রাম সেন দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। এক অর্থে এটি কেবল ভ্রমণের বিবরণ নয়, বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় আঙ্গিনার এক জীবন্ত দলিল।

প্রসঙ্গান্তরে: ভ্রমণকাব্যের প্রসার ও ধারা:

বাংলা ভ্রমণকাব্যের অগ্রদূত হিসেবে 'তীর্থমঙ্গল'যে নতুন ধারার সূচনা করেছিল, তার প্রভাব পরবর্তীকালের অনেক সাহিত্যিকদের লেখায় পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যাত্রী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী', এবং মধুসূদন দত্তের 'কাপটিক কমল'- সবই ভ্রমণকাহিনির বিভিন্ন রূপ ও প্রকাশ। পাশ্চাত্য সাহিত্যে হোমারের 'ওডিসি' বা ড্যান্টের 'ডিভাইন কমেডি' যেমন ভ্রমণকাহিনির মহাকাব্যিক রূপ, তেমনি বাংলা সাহিত্যের ভ্রমণকাব্যেও বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল' এক ঐতিহাসিক স্তম্ভ।

'তীর্থমঙ্গল' কেবল একটি ভ্রমণকাব্য নয়; এটি বাংলা সাহিত্যের আদি ভ্রমণকাহিনির এক মহিমামণ্ডিত প্রতিচ্ছবি। এর হস্তলিপির ব্যতিক্রমী শৈলী, ভ্রমণের সরল অথচ বিশদ বর্ণনা এবং ধর্মীয় সাংস্কৃতিক উপলব্ধির নিবিড় প্রতিফলন বাংলা সাহিত্যকে ঐতিহাসিক পরম্পরায় সমৃদ্ধ করেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ- এর সংগ্রহে থাকা এই অমূল্য পুথিটি শুধু একটি সাহিত্যিক সৃষ্টি নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতির এক জীবন্ত ইতিহাস।

প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি:

'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ? তবু জানিও, পথেই রহিয়াছে মুক্তি।'- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই পঙক্তি বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল'- এর মূল দর্শনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। ভ্রমণের পথে পথিক যেমন মুক্তির সন্ধান পায়, তেমনই বিজয়রাম সেন তাঁর তীর্থযাত্রার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক মুক্তির সন্ধান পেয়েছেন।

- **পুথির লিপি: নকলনবিশের পরম্পরা ও পাঠবিকৃতির আখ্যান:**

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত পুথি- সাহিত্যের ধারায় তীর্থমঙ্গল ছাড়াও আরও বহু প্রাচীন বাংলা পুথির অস্তিত্ব আমাদের জানা আছে। কিন্তু খোঁজ করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেগুলির নাগাল পাওয়া যায়, সেগুলি মূল পাণ্ডুলিপি নয়, বরং তার অসংখ্য নকল বা প্রতিলিপি। এই নকল পাণ্ডুলিপিগুলিই যুগ যুগ ধরে লিপিকরদের দক্ষ হাতের ছোঁয়ায় পুনর্লিখিত হয়ে এসেছে। তবে সমস্যা হলো, এই নকলনবিশের প্রক্রিয়ায় কেবল কপি বা হুবহু অনুলিপিই হয়নি; সময়ের প্রবাহে বহু ক্ষেত্রে শব্দের গঠন, বানান এমনকি বাক্যবিন্যাসেও পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন কেবল ব্যক্তিভেদে নয়, স্থান-কাল-পাত্রভেদেও চিহ্নিত হয়েছে। শব্দের ছাঁচ বদলানোর বিষয়টি অবশ্য কালের সঙ্গে ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন বলে ধরা যায়। ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হয় 'ধ্বনিগত ও গঠনগত বিবর্তন', যা যুগের

পর যুগে ভাষার আপন স্বভাবেই ঘটে। তবে এই আলোচনা ভাষার প্রাকৃতিক বিবর্তন নয়, বরং মূল পাণ্ডুলিপি থেকে প্রতিলিপির ক্ষেত্রে যে বিকৃতি বা পরিবর্তন দেখা যায়, তা নিয়ে।

প্রাচীনকালে যাঁরা পুথি নকল করার পেশায় যুক্ত ছিলেন, তাঁদের বলা হতো **লিপিকর**। এঁদের কাজ ছিল মূল পাণ্ডুলিপি থেকে হুবহু প্রতিলিপি তৈরি করা। অর্থাৎ, একরকম পেশাদার নকলনবিশ বলা চলে। বিনিময়ে তাঁরা পেতেন ধান, বস্ত্র কিংবা অর্থ। এক্ষেত্রে পুথিলিখনের প্রতিযোগিতায় দক্ষ লিপিকরদের হাতের লেখা ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার, ছন্দময় এবং টানা টানা অক্ষরে সুসজ্জিত। তাঁদের লেখা যেন একধরনের শিল্পমাধুর্য ধারণ করত। অথচ, পেশাদারিত্বের এই দিকটি সবসময় বজায় থাকত না। ড. কল্পনা হালদার তাঁর গবেষণায় লিপিকরদের তিনটি ভাগে বিভাজিত করেছেন- **শিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত**।

এই শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিক্ষিত লিপিকরদের লেখায় ভাষার শুদ্ধতা ও সৌকর্য বজায় থাকত। তাঁদের হস্তলিপি ছিল সহজপাঠ্য, গঠনগত দিক থেকে যথার্থ এবং বানানবিধির প্রতি যত্নশীল। বিপরীতে, অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লিপিকররা মূলত জীবিকার তাগিদে এই পেশায় যুক্ত হলেও তাঁদের লেখায় সেই পরিমিতি ও নিখুঁততা থাকত না। ফলে, তাঁদের হাতের লেখা অস্পষ্ট এবং অনেকক্ষেত্রে অসংলগ্ন হতো। পাঠবিকৃতি, বানানের অমিল, শব্দের অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি—এসব ত্রুটি প্রায়শই দেখা যেত তাঁদের লেখনীতে। ড. হালদারের ভাষায়, 'নিছক জীবিকার প্রয়োজনে এই পেশায় আসা লিপিকরদের হাতের লেখায় ছিল না সুস্পষ্টতা; ছিল না যথার্থ পাঠযোগ্যতার নিশ্চয়তা।'

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে মধ্যযুগীয় ইউরোপের 'স্ক্রাইব' বা নকলনবিশদের কথা। সেখানেও শিক্ষিত ও অশিক্ষিত স্ক্রাইবদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যেত। যেমন, ফ্রান্সিস বেকন মন্তব্য করেছিলেন, 'Copyists are not mere scribblers; they are the guardians of words, yet often the betrayers of authenticity.' অর্থাৎ, নকলনবিশরা কেবল লেখক নন, তাঁরা শব্দের রক্ষকও বটে, কিন্তু সেই রক্ষণের মধ্যেই অনেকসময় মূল রচনার বিশুদ্ধতা ব্যাহত হয়। বাংলা পুথির ক্ষেত্রেও এই কথাটি খাটে।

প্রাচীন যুগে বানানবিধি ছিল একরকম অদৃশ্য ধারণা। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কোনও বানানরীতি ছিল না; তাই লিপিকররা প্রায়শই নিজেদের মতো বানান লিখে রাখতেন। এমনকি একই পুথির বিভিন্ন স্থানে একই শব্দের একাধিক বানানও দেখা যেত। এই বানানবিধির বৈচিত্র্য কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ধারণার উপর নির্ভর করত না, অঞ্চলভেদেও পরিবর্তিত হতো। এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বলা যায়, যেমন মধ্যযুগীয় ইংরেজি সাহিত্যে *Canterbury Tales* এর পাণ্ডুলিপিতেও বানানের এই বৈচিত্র্য দেখা যায়। চসারের ভাষায়, "And eek therto he was right curious; His writinge ful craftily was dight,"- এই পংক্তিতে 'writinge' শব্দের বানান বর্তমান ইংরেজি 'writin' থেকে ভিন্ন হলেও তখন সেটি স্বাভাবিক ছিল।

আসলে, বাংলা পুথি-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে লিপিকরদের এই বানান- বিভ্রাটকে সম্পূর্ণ ভুল বলা চলে না। কারণ, তখনকার পাঠক মূলত শ্রোতা ছিলেন। পুথি পাঠের প্রথা ছিল মূলত শ্রুতিনির্ভর। শ্রোতার কানে বানানভুল ধরা পড়ত না; তাঁদের কাছে ভাষার ধ্বনিগত সৌন্দর্যই মুখ্য ছিল। তাই, লিপিকররা বহুক্ষেত্রে বানান ভুলের পরোয়া না করেই লেখনী শেষ করতেন। এটি ভাষার ধ্বনিগত প্রবাহকে অব্যাহত রাখার জন্যই ছিল।

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর মন্তব্য স্মরণযোগ্য:'Writing is the painting of the voice.' অর্থাৎ, লেখনী হচ্ছে কণ্ঠস্বরের চিত্রায়ণ। সেই চিত্রায়ণে যদি ধ্বনির সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে বানানের অসংগতি সেভাবে অনুভূত হয় না। বাংলা পুথি-সংস্কৃতিতেও লিপিকরদের এই প্রবণতা একইভাবে লক্ষণীয়।

সর্বোপরি, বাংলা পুথি-সংস্কৃতির ধারায় লিপিকরদের অবদান অস্বীকার করার নয়। তাঁদের হাত ধরেই পুথিগুলি প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হয়েছে। যদিও তাদের লেখনীর অসংগতিগুলি আধুনিক গবেষকের জন্য একপ্রকার 'পাঠবিকৃতি' রূপে দেখা দেয়, তবু সেই বিকৃতিই ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে থেকে যায়। তাই, পুথি-সংস্কৃতির এই নকলনবিশ পরম্পরাকে মূল্যায়ন করতে হলে শুধুমাত্র বানান ও ভাষার বিশুদ্ধতার নিরিখে বিচার করলে চলবে না; প্রয়োজন ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতিগত প্রেক্ষাপটকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা।

- **পুথি-লিপির শৈল্পিক পরম্পরা: হস্তাক্ষরের নিপুণতা ও বৈচিত্র্য:**

হস্তাক্ষরের অনুশীলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পুথি- লিপির ঐতিহ্য বাংলা সাহিত্যের এক গভীর শৈল্পিক অধ্যায়। একাধারে এটি বর্ণমালার শিল্পিত প্রকাশ, অন্যদিকে ইতিহাসের অমোঘ সারণি। লিপিকরদের হাতের লেখা কেবল পাঠযোগ্যতার জন্য নয়; বরং তা একপ্রকার শিল্পের সংরক্ষণ। লিপিকরের হাতের ভঙ্গি, অক্ষরের বিন্যাস, টানের সূক্ষ্মতা ও পঙক্তির সাযুজ্য মিলিয়ে গড়ে ওঠে একেকটি পুথি। হস্তাক্ষরের সুঠামতা, পরিশীলিত রূপ এবং গভীর শৈল্পিকতাই প্রকাশ করে সেই লিপিকরের অধ্যবসায় ও সৃজনশীলতা।

- **পরিশীলিত লিপির নিদর্শন: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মনসামঙ্গল:**

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ- এ সংরক্ষিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*- এর পুথিটি হস্তাক্ষরের শৈল্পিকতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এর প্রতিটি অক্ষরে সুসংবদ্ধতা ও শৃঙ্খলার ছাপ স্পষ্ট। যদিও লিপিকরের নাম জানা যায়নি, তবে তার হাতের লেখা দেখে অনুমান করা যায় যে তিনি একজন দক্ষ লিপিকর ছিলেন। এরূপ বহু পুথি বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে রয়েছে, যেখানে লিপিকরের নাম ও নকলের তারিখ পুষ্পিকায় উল্লেখ থাকে। এই পুষ্পিকাগুলি কেবলমাত্র গ্রন্থের আদি বা অন্তে স্থান পায় না; বরং তা ইতিহাসের দলিল হয়ে থাকে, যা গবেষকদের মূল্যবান তথ্য প্রদান করে।

বিশ্বভারতী পুথিশালায় সংরক্ষিত বিপ্রদাস পিপিলাই- এর *মনসামঙ্গল*-এর পুথি (লিপিকর: জয়দেব নন্দী, ১২৩১ বঙ্গাব্দ) সেই একই শৈল্পিকতার স্বাক্ষর বহন করে। জয়দেব নন্দীর হাতের লেখায় যে নিখুঁত সুবিন্যস্ততা, অক্ষরের মসৃণ গঠন এবং অনুপম শৈলী দেখা যায়, তা প্রমাণ করে তিনি কেবল পেশাদার লিপিকরই ছিলেন না, একজন শিল্পীও ছিলেন। তার লেখনীতে প্রতিটি অক্ষর যেন শিল্পের একেকটি নিদর্শন।

- **অপেশাদারিত্বের প্রতিচ্ছবি: দ্রুত হাতের লেখার প্রকাশ:**

এর বিপরীতে, এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত বিপ্রদাস পিপিলাই- এর আরেকটি *মনসামঙ্গল* পুথি, যা লিপিকর গোপীনাথ সিংহের হাতে লেখা, তা লিপিকরের অপেশাদারিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। তার অক্ষরের বিন্যাস, পঙক্তির অমিল ও ওপর- নীচের ব্যবধানহীনতা দেখে অনুমান করা যায় যে, এটি তিনি কোনো মূল পুথির উপর নির্ভর না করে শুনে শুনেই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এখানে পেশাদারিত্বের অভাব স্পষ্ট; লেখার গঠনশৈলীতে একপ্রকার অগোছালো ভাব প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্বভারতীতে রক্ষিত মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* (লিপিকর: বেচারাম সম্মণ, ১১৯৪ বঙ্গাব্দ) এবং দ্বিজ রঘুনন্দনের *পঞ্চাননমঙ্গল* (লিপিকর: রামকান্ত পণ্ডিত, ১২০২ বঙ্গাব্দ)-এর ক্ষেত্রেও এই অপেশাদারিত্ব ধরা পড়ে।

- **লিপির সূক্ষ্মতার শিল্পময়তা ও অপূর্ণতার বিপরীতমুখী রূপ:**

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের বহু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, লিপিকরের দক্ষতা কেবল লেখার গঠনেই সীমাবদ্ধ নয়, তা আসলে এক ধরনের শিল্পচেতনার প্রকাশ। মধ্যযুগীয় ইউরোপে *Illuminated Manuscripts* বা অলঙ্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলি যেমন লিপিকরের শিল্পীসত্তার উদাহরণ, তেমনি বাংলার পুথি-লিপিও এক ধরনের শৈল্পিক অভিজ্ঞান। ইউরোপীয় স্ক্রাইবরা প্রতিটি অক্ষরকে অলঙ্কৃত করতেন স্বর্ণ-রূপার আভায়, আর বাংলার লিপিকররা অক্ষরের গাঁথুনিতে রচনা করতেন শিল্পের ব্যঞ্জনা।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত নিত্যানন্দ ঘোষের *মহাভারত* পুথিটি (১১৯৯ বঙ্গাব্দ), যা হস্তাক্ষরের অপূর্ণতার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত, সেই তুলনামূলক বিশ্লেষণকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। এই পুথির লিপিকর পরিচিত নন; কেবল উল্লেখ আছে, 'এ পুস্তক শ্রীনিমাইচরণ মল্লিকের', এবং এটি মালিকের স্বহস্তলিখিত। অক্ষরের আকারের অসামঞ্জস্য, পঙক্তির অগোছালো বিন্যাস প্রমাণ করে এটি একজন অপ্রশিক্ষিত লিপিকরের হাতে লেখা।

- **লিপিকরের শৈল্পিকতার মূল্যায়ন ও ঐতিহ্যের অনুসন্ধান:**

বস্তুত, পুথির হস্তাক্ষর দেখে লিপিকরের দক্ষতা, তার শিল্পচেতনা এবং পাণ্ডুলিপি সৃষ্টির প্রতি তার আন্তরিকতার পরিচয় মেলে। প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলি শুধু লেখার বাহক নয়, তা এক একটি ঐতিহাসিক শিল্পকর্ম। যেমন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ- এ রক্ষিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, বিশ্বভারতীর *মনসামঙ্গল* অথবা এশিয়াটিক সোসাইটির *চৈতন্যমঙ্গল*— প্রত্যেকটি লিপিকরের দক্ষতা, শিল্পীসত্তা এবং মননশীলতার এক অনন্য উদাহরণ।

লিপির শৈল্পিকতা, তার সূক্ষ্মতা ও বিন্যাসের নিপুণতা আসলে এক ধরণের ঐতিহ্যের ধারক। কেবল পাঠ্যবস্তু নয়, পুথির প্রতিটি অক্ষরে স্পন্দিত হয় ইতিহাসের ধ্বনি, সংস্কৃতির আর্তনাদ এবং লিপিকরের আত্মনিবেদন। তাই পুথি- লিপি কেবল একটি লিপিবদ্ধ নথি নয়, তা হয়ে ওঠে এক অন্তর্গত শিল্পের বহিঃপ্রকাশ।

এই বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পুথি-লিপিগুলি একদিকে পাঠযোগ্যতার ধারক, অন্যদিকে শৈল্পিকতার নিদর্শন। লিপিকরের হাতের লেখায় লুকিয়ে থাকে ইতিহাসের সাক্ষ্য, শিল্পের প্রমাণ এবং লিপির প্রতি তার গভীর ভালোবাসার স্পর্শ।

- **শিবায়ন পুথি: ইতিহাসের ধুলো ঝেড়ে ফেরা স্মৃতি:**

পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণার মাটির বুক থেকে একদিন আলোর মুখ দেখেছিল একটি পাণ্ডুলিপির খণ্ডিত অংশ- **শিবায়ন পুথি**। সেই প্রাচীন লেখনীর স্মৃতিচিহ্ন ধারণ করে থাকা এই পুথিটির রচনাকাল অনুমান করা হয় অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ অথবা ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভিক সময়। যদিও এর পুষ্পিকা (কলophon) অনুপস্থিত, তবু সেই অস্পষ্ট হস্তাক্ষরের গাত্রে বিধৃত রেখাগুলি যেন যুগ- যুগান্তরের নিঃশব্দ ইতিহাসকে ভাস্বর করে তোলে। লিপিকর বা লেখকের নাম অজ্ঞাত, কিন্তু সেই অক্ষরবিন্যাসের শৈল্পিক ধারাপ্রবাহ তাঁর ধৈর্য, একাগ্রতা ও অন্তর্নিহিত মননশীলতার নিদর্শন স্বরূপ। লিপিকরের পরিচয় অজ্ঞাত হলেও, তাঁর কলমের প্রতিটি আঁচড় যেন সময়কে থমকে দাঁড় করায়, পাঠককে নিয়ে যায় একটি হারিয়ে যাওয়া যুগের অন্তরালে।

লিপিকর মাত্রই কি তবে একজন প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডুলিপি- লেখক? ইতিহাসের পরতে পরতে দেখা যায়, শুধু পেশাদার লিপিকর নয়, অনেক সময় ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মানুষ নিজেও নকল করে রাখতেন ধর্মীয় শ্লোক বা তন্ত্রমন্ত্র। এই ব্যক্তিগত লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে হস্তাক্ষরের শৈলী কখনও অপরিণত, কখনও বা পরিশীলিত হয়ে উঠত। যেমন, তুলট কাগজের পাতায় লাল কালির উজ্জ্বলতায় লিপিবদ্ধ এক বিষঝাড়ার মন্ত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল এক শিশুসুলভ সরলতা। সেখানে হস্তাক্ষরের রেখাগুলি ছিল অসংলগ্ন, যেন শিক্ষানবিশের প্রথম হাতেখড়ি। এমন কাঁচা হাতের লেখাও কি তখনকার সমাজের একটি নিদর্শন নয়? সেই সময়ের মানুষের জীবন, শিক্ষার অবস্থা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ছবি কি এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না?

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে মধ্যযুগের ইউরোপীয় পাণ্ডুলিপি- সংস্কৃতির কথা। চার্চের ভেতর ধর্মীয় গ্রন্থ নকল করতেন একদল সন্ন্যাসী, যাঁদের বলা হতো *Scribes*। তাঁরা অবিচল ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে একেকটি অক্ষরকে রূপ দিতেন, যেন প্রতিটি শব্দই ছিল একটি শিল্পকর্ম। আমাদের চন্দ্রকোণার শিবায়ন পুথির হস্তাক্ষরের শৈল্পিকতার মধ্যে যেন সেই মধ্যযুগীয় *Scribal Tradition*- এর প্রতিফলন দেখা যায়।

তবে, এর একটি ব্যতিক্রমী দিকও রয়েছে। ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরেও তখনকার সমাজে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মানুষ অনেক তথ্য ও তন্ত্রমন্ত্র লিখে রাখতেন। বিষঝাড়ার মন্ত্রের সেই অসংলগ্ন হাতের লেখার মধ্যে লুকিয়ে ছিল এক সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস আর আস্থা। এটি কেবল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার প্রতিফলন নয়; বরং লোকজীবনের অন্ধবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানেরও স্মারকচিহ্ন। এই বিষঝাড়ার মন্ত্র যেন সেই লোকাচারের এক নীরব দলিল, যেখানে হাতের লেখা হয়ে ওঠে জীবনযাপনের প্রতিচ্ছবি।

শিবায়ন পুথির লিপিকর অজ্ঞাত থাকলেও, তাঁর হাতের লেখায় ফুটে ওঠা ধৈর্য, নিষ্ঠা ও সৌন্দর্যবোধ আমাদের মনে করিয়ে দেয় বাংলা সাহিত্যের সেই সব নিঃশব্দ স্রষ্টাদের কথা, যারা হয়তো নিজের নাম অক্ষরে অক্ষরে রেখে যেতে পারেননি, কিন্তু তাঁদের সৃষ্টিকর্ম আজও বেঁচে আছে সময়ের হাত ধরে। চন্দ্রকোণার মাটির নিচে চাপা পড়া সেই শিবায়ন পুথি যেন কালের ধুলো ঝেড়ে বলতে চায়—'আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকব।'

- **কৃষকের খাতার অক্ষর-চিহ্নে এক সামন্তযুগের প্রতিচ্ছবি:**

সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো ও সামাজিক অবস্থানের সূক্ষ্ম চিহ্নগুলো মাঝে মাঝে লুকিয়ে থাকে একমুঠো পুরনো কাগজের টুকরোয়, যেখানে হাতের লেখার ভাঁজে ভাঁজে জমে থাকে সময়ের নিঃশব্দ সাক্ষ্য। ১৮৮৩ বঙ্গাব্দের কিছু হিসাবের কাগজপত্র সেই নীরব ইতিহাসের দরজা খুলে দেয়। সেই কাগজের টুকরোয় স্পষ্ট সুঠাম হস্তাক্ষরে লেখা ছিল- 'শন ১২৮৩ তিরাসি সাল তারিখ ১২ চৈত্র খাটানি আরম্ভ শ্রীনারায়ণ মণ্ডল সাং সুলতানপুর।'এক নিঃশব্দ অথচ

দৃঢ় অক্ষরে লেখা এই বাক্য শুধুমাত্র একটি সময়ের কৃষিকাজের সূচনার কথা জানায় না; এর পেছনে লুকিয়ে থাকে ঋণ, দাদন, খাটানি, এবং গ্রামীণ অর্থনীতির জটিল বুনন।

এই খাতায় নারায়ণ মণ্ডল নামক কৃষকের নামোল্লেখের পাশাপাশি পাওনা ফসলের পরিবর্তে তাকে অগ্রিম ৯ টাকা দাদন দেওয়ার প্রসঙ্গও উল্লেখ রয়েছে। এটি শুধু একটি আর্থিক লেনদেন নয়, বরং ঔপনিবেশিক সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতিচ্ছবি, যেখানে কৃষকরা ছিল ঋণের বেড়াজালে বন্দী। সেই ঋণের অঙ্ক ছোট হলেও তার শিকড় ছিল গভীর, যা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে পরম্পরায় গড়িয়ে যেত। মার্কস তাঁর *Das Kapital*- এ 'Primitive Accumulation' বা 'প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়'- এর যে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন, তার প্রয়োগ আমরা নারায়ণ মণ্ডলের এই দাদনের হিসাবেও দেখতে পাই। ঋণের বিনিময়ে ফসল, খাটানি এবং প্রায়শই শ্রমের উপর মালিকানা স্থির হতো। একদিকে জমিদারের অগ্রিম অর্থ প্রদান, অন্যদিকে ফসলের মাধ্যমে সেই ঋণ উসুলের জটিল হিসাব- এই অর্থনৈতিক সম্পর্কই নির্মাণ করত সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শক্তিশালী ভিত্তি।

পৃথক একটি কাগজে উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই বছরেরই ১৮ চৈত্র, গরু কেনার জন্য ২০ টাকা ব্যয় হয়েছিল। এখানে নামোল্লেখ নেই, তবে হাতের লেখা ছিল এক, যা স্পষ্টতই ইঙ্গিত দেয় যে, একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সেই সমস্ত খরচের হিসাব রাখতেন। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক লেনদেন নয়, প্রতিটি লিপিবদ্ধ লেখার মধ্যে লুকিয়ে ছিল একজন জমিদার বা সম্পন্ন কৃষকের সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা। হিসাবের ধারাবাহিকতা, তারিখের সুনির্দিষ্ট উল্লেখ এবং খরচের খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধকরণ- সবই ছিল নিখুঁত ও পরিশীলিত। এই পরিশীলিত হস্তাক্ষর এবং যথাযথ হিসাবরক্ষণ থেকে তার আর্থসামাজিক অবস্থান সহজেই অনুমেয়।

এই পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা বুঝতে পারি, সে- সময়ের অধিকাংশ কৃষক ছিল নিরক্ষর। তাদের পক্ষে এই রকম সুশৃঙ্খল হিসাবরক্ষণ তো দূরের কথা, স্বাক্ষর করাও ছিল এক দূরুহ বিষয়। নারায়ণ মণ্ডলের ক্ষেত্রে সেই চিত্র পরিষ্কার, যিনি দাদনের অর্থ গ্রহণ করলেও নিজে কিছু লিখতে সক্ষম ছিলেন না। অপরদিকে, যিনি এই খাতাগুলো লিখে রেখেছেন, তিনি শুধু অক্ষরজ্ঞানসম্পন্নই নন, বরং পরিশীলিত ও সুগঠিত হস্তাক্ষরের অধিকারী। এই সুস্পষ্ট ও সুঠাম হস্তাক্ষর ইঙ্গিত দেয় তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অর্থনৈতিক সচ্ছলতার দিকে। এখানে এটা বলা যায় না যে, শুধুমাত্র পেশাদার লিপিকররাই সুন্দর হস্তাক্ষরে পারদর্শী ছিলেন। জমিদার বা সম্পন্ন কৃষকেরাও ছিলেন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সুসংহত।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজেও এই ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেনের লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়। 'অর্থশাস্ত্র'- এ চাণক্য উল্লেখ করেছেন, 'ধন আদান-প্রদানের হিসাব রাখার জন্য প্রতিটি লেনদেন লিখিতভাবে নথিভুক্ত করতে হবে, যাতে পরবর্তী কালে কোনো বিরোধ না তৈরি হয়।' (অর্থশাস্ত্র, তৃতীয় অধ্যায়)। মধ্যযুগের ইউরোপেও সামন্তপ্রভুদের অধীনে খাতায় জমির মালিকানা ও ফসলের হিসাব সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ থাকত। ইংরেজ সামন্ত প্রথায় এটি পরিচিত ছিল 'Manorial Rolls' নামে।

এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, হস্তাক্ষর শুধু লেখার মাধ্যম নয়, বরং তা এক সামাজিক পরিচয়ের চিহ্নও বটে। একটি খাতার অক্ষরে লুকিয়ে থাকে সেই সময়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক, সামাজিক অবস্থান এবং প্রজাপতির মতো ক্ষুদ্র অথচ সুদৃঢ় এক জীবনের নিঃশব্দ স্পন্দন।

এই আলোচনায় নারায়ণ মণ্ডলের খাতার টুকরোগুলো যেন কালের বুকে খোদাই করা এক নীরব প্রমাণ, যা সময়ের প্রবাহে বিলীন হলেও তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য অমলিন থেকে যায়। অক্ষরের ভাঁজে ভাঁজে লেখা থাকে এক অন্যায়ের ইতিহাস, এক অসম প্রতিযোগিতার গল্প, যা শুধু আর্থিক লেনদেনের দলিল নয়; তা এক প্রজন্মের সংগ্রাম ও বেঁচে থাকার অনবদ্য সাক্ষ্য।

- **শিলালিপি, তাম্রশাসন ও মন্দিরফলকের লিপি: ঐতিহাসিক ভাষ্য ও শিল্পিত প্রতিচ্ছবি:**

প্রাচীন বাংলার লিপি- ঐতিহ্য শুধু পুথির হস্তাক্ষরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এর এক বিস্তৃত ধারাবাহিকতা মূর্ত হয় শিলালিপি, তাম্রশাসন এবং মন্দিরফলকের খোদিত লিপিতে। এদেরকে প্রচলিত অর্থে 'হস্তাক্ষর' না বলা গেলেও, এই লিপিগুলি এক অর্থে হস্তাক্ষরের আদলেই নির্মিত, শিল্পীর নিপুণ খোদাইয়ের মাধ্যমে পাথর বা ধাতব তলে ভাষার চিরন্তন প্রতিচ্ছবি স্থাপিত হয়েছে। খোদিত এই অক্ষরসমূহ ছিল শাসন- প্রশাসনের দলিল, দানপত্র, রাজকীয়

ঘোষণাপত্র এবং মন্দিরের ধর্মীয় নির্দেশাবলীর সাক্ষ্যবাহী। এই শিলালিপি ও তাম্রশাসনের ভাষা, লিপি, শৈল্পিকতা এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট আমাদের ইতিহাসের মূল্যবান নিদর্শন।

- **শিলালিপি ও তাম্রশাসন: শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক প্রতিফলন:**

বাংলার শাসনব্যবস্থায় শিলালিপি ও তাম্রশাসনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই লিপিগুলি শুধু রাজকীয় দানপত্র বা প্রশাসনিক আদেশ নয়; বরং সামাজিক স্তরবিন্যাস, অর্থনৈতিক লেনদেন এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির এক লিখিত দলিল। লক্ষ্মণসেনের (১১৭৯-১২০৬) মাধাইনগর তাম্রশাসন ও ভাওয়াল তাম্রশাসনের দিকে তাকালে এর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়। খোদিত অক্ষরের শৈল্পিকতা, ভাষার পরিশীলিত ব্যবহার এবং রাজকীয় সিলমোহরের নিখুঁত প্রকাশ সেই সময়কার প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচায়ক। শাসকের দান, অধিকার অর্পণ কিংবা ভূমি প্রদান- এসবের আইনি বৈধতা প্রমাণে এই খোদিত লিপির প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিহার্য। শিল্পীর হাতে খোদিত সেই অক্ষরসমূহ শুধু তথ্যের বাহক নয়, ইতিহাসের শৈল্পিক উপস্থাপনাও বটে।

আবার, ত্রিপুরার একটি তাম্রশাসনের প্রসঙ্গ ধরা যাক। ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা বিজয়মাণিক্যের আত্মীয়া পুণ্যবতী দেবী জনৈক আচার্য বনমালীকে কুমিল্লার কয়েকটি গ্রাম দান করেন। এই তাম্রশাসনের ভাষা ছিল সংস্কৃত, কিন্তু লিপি ছিল বাংলা। লক্ষণীয়, এখানে খোদিত অক্ষরের শৈল্পিকতা ছিল অপরিশীলিত ও অপরিণত, যা মূলধারার রাজকীয় শাসনপ্রণালীর তুলনায় স্বতন্ত্র। শিল্পীর হাতের পরিপক্বতার অভাব স্পষ্টত প্রতিফলিত হয়েছিল সেই লিপির বিন্যাসে। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রাজকীয় ক্ষমতার উচ্চস্তরের দানপত্রে লিপির সৌন্দর্য যেমন সুবিন্যস্ত, নিম্নস্তরের ব্যক্তিগত বা ছোট দানে তেমনটা ছিল না। এই বৈষম্যই আমাদের সামনে তুলে ধরে সেই সময়কার সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস এবং প্রশাসনিক কাঠামোর ভেদরেখা।

- **লিপির শৈল্পিক উৎকর্ষ ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য**

শিলালিপি ও তাম্রশাসনের লিপির ক্ষেত্রে কেবল তথ্য সংরক্ষণই মুখ্য ছিল না, শিল্পীত সুষমা ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসও লক্ষণীয়। লিপিগুলি পাথর, তাম্র বা মন্দিরের ফলকে খোদিত হতো, এবং সেগুলি স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকত প্রজন্মের পর প্রজন্ম। এটি ছিল একধরনের 'অক্ষর স্থাপত্য'- যেখানে ভাষা ও শিল্প একসূত্রে গাঁথা। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে অশোকের শিলালিপিগুলি নেওয়া যেতে পারে, যেখানে খোদিত লিপি শুধু শাসনপদ্ধতির সাক্ষ্য বহন করেনি, বরং তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মীয় ও নৈতিক বার্তাও পরিবেশন করেছে। এই শৈল্পিক উৎকর্ষ আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রাচীন মিশরের হায়ারোগ্লিফিক লিপির কথা, যা কেবলমাত্র ভাষার বাহক ছিল না, বরং ইতিহাসের চিত্ররূপময় প্রতিফলনও ছিল।

- **পূর্ব-পশ্চিমের লিপি শৈলী:**

প্রাচ্যের শিলালিপি ও তাম্রশাসনের খোদিত শৈল্পিকতা যেমন বাংলা ও সংস্কৃত লিপির মধ্যে সুসংগঠিত ও শিল্পীত ছিল, তেমনি পশ্চিমে গ্রিক ও রোমান শিলালিপিতে খোদিত অক্ষরেও শৈল্পিকতার ছাপ ছিল প্রকট। গ্রিকদের মার্বেল ফলকে উৎকীর্ণ লিপি যেমন তাদের রাজনৈতিক ও দার্শনিক ভাবধারার পরিচায়ক, রোমান সাম্রাজ্যের খোদিত লিপি তেমনই সামরিক বিজয় ও আইন প্রণয়নের নিদর্শন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই লিপি শিল্পের তুলনামূলক আলোচনা আমাদের সামনে এক বিস্তৃত সাংস্কৃতিক ধারার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে, যেখানে ভাষা ও শিল্প একসূত্রে গ্রথিত।

- **লিপি-ঐতিহ্যের চিরন্তনতা:**

শিলালিপি, তাম্রশাসন ও মন্দিরফলকের খোদিত লিপি শুধুমাত্র ইতিহাসের দলিল নয়, বরং তা একটি জীবন্ত সংস্কৃতি, যা ভাষার শৈল্পিক রূপান্তরকে অমরত্ব দান করে। এর মাধ্যমে প্রাচীন সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চালচিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই শৈল্পিক ভাষা-প্রকাশের ঐতিহ্য আজও আমাদেরকে ইতিহাসের অনন্য এক ভাষ্যমালা উপহার দিয়ে যায়, যা কালের আবরণেও ম্লান হয় না।

- **প্রতিষ্ঠালিপির নীরব সাক্ষ্য: ঐতিহ্যের খোদিত স্মৃতি:**

বাংলা ভূখণ্ডের অগণিত মন্দিরফলক, যা ইতিহাসের পাতায় নীরব অথচ সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে চলেছে, তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে ঐতিহ্যের স্রোতকে অনুভব করা যায়। এই প্রতিষ্ঠালিপিগুলি কেবল পাথরে খোদিত কিছু শব্দমালা নয়; বরং একেকটি ফলক যেন যুগ-যুগান্তরের স্মৃতিচিহ্ন, যা আমাদের অতীতের মন্দির নির্মাণ, ধর্মীয় বিশ্বাস, স্থাপত্যরীতি এবং খোদাইকলার উৎকর্ষতার পরিচায়ক।

প্রাচীন বাংলায়, বিশেষত মধ্যযুগে, মন্দির নির্মাণকালে প্রতিষ্ঠালিপি খোদাই করার রীতি ছিল অত্যন্ত প্রচলিত। শুরুর দিকে কালো পাথরের কঠিন স্তরে প্রতিষ্ঠাকাল, নির্মাণকার্য এবং দেবতার নাম খোদাই করা হত। এই খোদিত লিপি ছিল স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় এবং প্রাকৃতিক প্রভাবে টিকে থাকার মতো শক্তিশালী। সময়ের পরিক্রমায় টেরাকোটার ফলকে খোদাই করার প্রবণতা দেখা যায়, যা শিল্পরীতির এক নতুন ধারা এনে দেয়। টেরাকোটার মৃন্ময় স্পর্শে মন্দিরের গাত্রপ্রাচীরে লিপিবদ্ধ হতো প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত। আর তারও পরবর্তী সময়ে মার্বেলফলককে খোদাইয়ের চল শুরু হয়। মার্বেলফলকগুলি অধিকতর মসৃণ ও স্থায়িত্বশীল ছিল, যেখানে অক্ষরগুলির নকশা ছিল সুস্পষ্ট এবং ছাপার অক্ষরের মতো নিখুঁত। এই ধারা মূলত ঔপনিবেশিক প্রভাবের কারণে আধুনিকতার ছোঁয়া পায়।

প্রতিষ্ঠালিপির খোদাইশিল্প এক অভিনব দক্ষতার পরিচায়ক। যদিও লিপিটি হস্তাক্ষরে লিখিত নয়, তবুও খোদাইকরের হাতের ছোঁয়ায় অক্ষরগুলির নান্দনিকতা এবং ছাঁদের সৌন্দর্য অসাধারণভাবে ফুটে ওঠে। খোদাইকারী শিল্পীর নিপুণতা এবং সূক্ষ্মতার পরিচয় মেলে তার খোদিত অক্ষরের বিন্যাসে। এর মধ্য দিয়ে আমরা খোদাইশিল্পের কারিগরি দক্ষতা, স্থাপত্যশৈলী এবং ধর্মীয় আনুষঙ্গিকতার সার্থক সমন্বয় প্রত্যক্ষ করি।

একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠালিপি হলো চন্দ্রকোণার লালজীউ মন্দিরের ফলক। বর্তমানে এই ঐতিহাসিক ফলকটি সংরক্ষিত রয়েছে চন্দ্রকোণা সংগ্রহশালায়। ফলকের লিপি অনুসারে, ১৫৭৭ শকাব্দ তথা ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমতী লক্ষ্মণাবতী কর্তৃক এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়। লালজীউ মন্দির, যা বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত, একসময় ধর্মীয় এবং স্থাপত্যশৈলীর অনন্য নিদর্শন ছিল। সেই প্রতিষ্ঠালিপির খোদিত বর্ণনায় নির্মাণকাল ও প্রতিষ্ঠাতার নাম সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে, যা ইতিহাসের নির্ভুল তথ্য সরবরাহ করে।

ফলকটির সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হলো এর শেষ পঙক্তি- *"পৌরাণিক শ্রীমোহন চক্রবর্তী গোকুল দাস।"* এই লিপির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ তারাপদ সাঁতরা অনুমান করেন যে, মোহন চক্রবর্তী ছিলেন এই লিপির মূল রচয়িতা এবং গোকুল দাস ছিলেন এর খোদাইকারক। এই বিশ্লেষণ খোদাইশিল্পের দুই ধাপকে আলাদা করে চিহ্নিত করে- প্রথমত, ভাষার নির্মাণ, এবং দ্বিতীয়ত, ভাষার খোদাই।

মন্দিরফলকগুলির এই খোদিত অক্ষর শুধু প্রতিষ্ঠার ইতিহাসকে ধারণ করে না, বরং তা ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকেও প্রতিফলিত করে। যেমনটি আমরা পাই দক্ষিণ ভারতের তাম্রলিপি কিংবা অজন্তা- ইলোরা গুহার শিলালিপিতে, যেখানে দেবদেবীর আরাধনা এবং রাজসভার কীর্তিগাথা খোদাই করা হয়েছিল। বাংলার মন্দিরফলকগুলিও ঠিক তেমনই, ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন ধারাকে ভাষার অক্ষরে বন্দী করে রেখে গেছে।

শিল্প, স্থাপত্য এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের এই একত্রিত প্রকাশ মন্দিরফলককে নিছক পাথরের খোদিত অক্ষরের গণ্ডিতে আটকে রাখে না; বরং তাকে করে তোলে এক জ্যান্ত ঐতিহ্য, যা শতাব্দী পেরিয়ে বর্তমান প্রজন্মের কাছে অতীতের স্মারক হয়ে বেঁচে থাকে। এই প্রতিষ্ঠালিপিগুলি শুধু স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন নয়, বরং একেকটি ফলক একেকটি ইতিহাসের জীবন্ত দলিল।

"ইতিহাস কথা বলে, শুধু প্রয়োজন তার কান পেতে শোনা।"- এই নীরব সাক্ষ্যগুলিকে শ্রবণ করলেই অতীতের সেই গৌরবময় নির্মাণশৈলী ও ধর্মীয় ঐক্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চন্দ্রকোণার লালজীউ মন্দিরের ফলক তার এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

এইভাবে বাংলার প্রাচীন মন্দিরফলকগুলি একদিকে ইতিহাসের সংরক্ষক, অন্যদিকে আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ধারক ও বাহক। পাথরের বুকে খোদিত সেই অক্ষরগুলো আজও নীরবে বলে চলে আমাদের অতীতের গল্প, যা আমাদের ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখে।

- **প্রস্তরফলকে খোদিত লিপির অন্তর্নিহিত পাঠ: শৈল্পিক অমরত্বের প্রতিচ্ছবি:**

খোদাই করা লিপিগুলি ছিল অমসৃণ, অসমতল- যেন অক্ষরের গঠনশৈলীতে এক অদ্ভুত এলোমেলো ভাব। প্রতিটি অক্ষর ছিল পৃথক, তাদের মধ্যে ছিল না সুবিন্যস্ত সামঞ্জস্য। প্রথম দর্শনেই মনে হয়, খোদাইকার্যের পেছনে কোনো দক্ষ শিল্পীর সূক্ষ্মতা কাজ করেনি; বরং এক অপটু খোদাইকারীর আঙুলের ছোঁয়ায় অক্ষরগুলি পাথরের গায়ে অঙ্কিত হয়েছে। তবে, খোদিত বয়ানের সারবস্তু এখানে আলোচ্য নয়; শুধু একটিমাত্র পঙক্তি পাঠকের দৃষ্টি কাড়ে- **"পৌরাণিক শ্রীমোহন চক্রবর্তী গোকুল দাস।"**

তদন্তমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে তারাপদ সাঁতরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মোহন চক্রবর্তী লিপিটির মূল রচয়িতা, আর খোদাইকার্যের দায়িত্বে ছিলেন গোকুল দাস। অর্থাৎ, মন্দিরের নির্মাতা এবং ফলকটির খোদাইকারক দুই ভিন্ন ব্যক্তি। এই দ্বৈত পরিচয় শুধু নির্মাণশৈলীর পৃথকতার ইঙ্গিতই দেয় না, বরং খোদাইকার্যের প্রথাগত প্রকরণের দিকেও ইঙ্গিত করে। প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীনকালে পাথর বা মৃত্তিকা-ফলকে কোনো লেখা খোদাই করার আগে, মূল লেখকের বয়ানকে একটি নিখুঁত রেখাচিত্রে গুটিয়ে তোলা হত। সেই অঙ্কিত রেখাচিত্র ছিল মূল লেখকের হস্তলিপির প্রতিফলন। পরে সেই রেখাচিত্রের ওপর ভিত্তি করেই খোদাইকার্য সম্পন্ন হত। ফলে, ফলকের গায়ে যে খোদাই লিপি ফুটে উঠত, তা মূল রচয়িতার হস্তলিপির এক প্রতিচ্ছবিমাত্র।

এই পদ্ধতির বৈচিত্র্যময়তাকে বুঝতে গেলে, প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ও খোদাই শিল্পের ইতিহাসের দিকে নজর দিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, এলিফ্যান্টা গুহার শিলালিপি কিংবা খাজুরাহোর মন্দির প্রাঙ্গণের খোদিত শ্লোকগুলি এই খোদাই পদ্ধতির অপূর্ব নিদর্শন। প্রতিটি খোদাইয়ে খোদাইকারকের শৈল্পিক দক্ষতা যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি মূল লেখকের চিন্তাধারাও অক্ষরে অক্ষরে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

এখানে তারাপদ সাঁতরার অনুমান শুধু কল্পনার বিস্তার নয়, বরং ঐতিহাসিক খোদাই পদ্ধতির প্রামাণ্য স্বীকৃতি। খোদাইকারক এবং রচয়িতা পৃথক হওয়া সত্ত্বেও তাদের কাজের মধ্যে যে সাংগীতিক সাযুজ্য রচিত হয়েছে, তা এক শিল্প- অভিজ্ঞান। যেমন, মেসোপটেমিয়া সভ্যতার কিউনিফর্ম লিপি বা প্রাচীন মিশরের হায়ারোগ্লিফিক খোদাইকার্যেও আমরা দেখতে পাই, মূল লেখকের বাণীকে পাথরে অমর করে তোলার এই অনন্য দক্ষতা।

তাই, এই লিপির প্রতিটি অক্ষর কেবল ভাষার বাহক নয়, বরং এক যুগের প্রতিচ্ছবি- যেখানে খোদাইকারক আর রচয়িতার পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় গড়ে ওঠে এক অক্ষয় শিল্পকীর্তি। 'পৌরাণিক শ্রীমোহন চক্রবর্তী গোকুল দাস' নামাঙ্কিত সেই ফলক শুধু ইতিহাসের এক পরিচায়ক নয়; বরং মানুষের সৃজনশীলতার এক শাশ্বত নিদর্শন।

- **শিবনিবাসের রাজরাজ্ঞীশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি: এক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞান:**

নদিয়ার শিবনিবাসে অবস্থিত রাজরাজ্ঞীশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিটি এক অনন্য ঐতিহাসিক নিদর্শন। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, যার শাসনকাল বাংলা সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত। প্রতিষ্ঠালিপির ভাষা এবং খোদাইপ্রকল্পের নিপুণতা প্রত্নতাত্ত্বিক ও শিল্প- ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিশেষ আলোচনার বিষয়। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাবর্ষ হিসেবে উল্লেখ রয়েছে ১৬৮৪ শকাব্দ, যা খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জিতে ১৭৬২ সালের সমতুল্য।

প্রতিষ্ঠালিপিটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো খোদাইকার্যের ভারসাম্যপূর্ণ বিন্যাস ও শিল্পগুণ। যদিও খোদাইকারকের নাম লিপিতে উল্লিখিত নেই, তথাপি শিল্পশৈলীর নিখুঁত বিন্যাস ও স্পষ্টতর রূপায়ণ এই প্রতিষ্ঠালিপিকে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। চন্দ্রকোণার ফলকের তুলনায়, যেখানে খোদাইয়ের কারুকার্য ছিল কিছুটা অপরিণত এবং 'কাঁচা,' সেখানে শিবনিবাসের এই লিপিতে দেখা যায় পরিপূর্ণ শিল্পবোধের প্রকাশ। লিপির অক্ষর বিন্যাসে রয়েছে এক অপূর্ব ভারসাম্য, যা কেবল দক্ষ শিল্পীর হাতেই সম্ভব।

- **নিস্তারিণী কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠালিপি: শৈল্পিক উৎকর্ষের প্রতিচ্ছবি:**

প্রসঙ্গক্রমে, শেওড়াফুলির নিস্তারিণী কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠালিপি (১৮২৭ খ্রিস্টাব্দ) আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক। এই লিপি তার শিল্পগুণ ও সৌকর্যের দিক থেকে অনন্য উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অক্ষর বিন্যাসের নিখুঁততা, খোদাইয়ের সূক্ষ্মতা এবং ভাষার সংযত ব্যবহারে এই লিপিটি বাংলা শিল্প- ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল প্রতিফলন।

লিপিতে ব্যবহৃত ভাষা সংস্কৃত, যা তৎকালীন বঙ্গদেশের বহু মন্দির ও প্রতিষ্ঠালিপিতে দেখা যায়। এটি ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধের প্রতিফলন। প্রসঙ্গত, বঙ্গদেশের বহু সংস্কৃত পুথিতেও এমন শিল্পগুণের নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানেই শিবনিবাসের মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপির সঙ্গে নিস্তারিণী কালীবাড়ির ফলকের শিল্পগুণের একটি সূক্ষ্ম বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। শিবনিবাসের লিপিতে খোদাইয়ের নিখুঁত সমতা থাকলেও, নিস্তারিণী কালীবাড়ির লিপি শৈল্পিক সৌকর্যে তাকে অতিক্রম করেছে।

- **ভাষার দ্বৈত ব্যবহার: ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা ও নতুনতর সংযোজন:**

এই তিনটি প্রতিষ্ঠালিপির মধ্যে ভাষার ব্যবহারে একটি সাধারণ ঐক্য বিদ্যমান। লিপিগুলির মূল ভাষা সংস্কৃত হলেও, নদিয়ার শিবনিবাসের মন্দির এবং নিস্তারিণী কালীবাড়ির ফলকে বাংলার ছোঁয়া স্পষ্ট। বিশেষত, নিস্তারিণী কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠালিপির শেষ চারটি পঙক্তি বাংলায় উৎকীর্ণ, যা ভাষাগত মেলবন্ধনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এখানে শেষ দু-পঙক্তি উল্লেখযোগ্য:

"মাটিয়ারি গ্রামবাসি নির্মানেতে দক্ষ।
কৃষ্ণচন্দ্র ভাস্কর নির্ম্মিল সমক্ষ।"

এখানে 'মাটিয়ারি গ্রামবাসি' শব্দবন্ধ বাংলা গ্রামীণ সমাজের সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত বহন করে। আর কৃষ্ণচন্দ্র ভাস্কর ছিলেন মন্দিরটির প্রধান স্থপতি। তবে, প্রশ্ন উঠে, এই উৎকীর্ণ লিপিটি কি কৃষ্ণচন্দ্র ভাস্করেরই সৃষ্টি? প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট না হলেও, ধারণা করা যায় খোদাইকার্যের এই সূক্ষ্মতা এবং শৈল্পিক উৎকর্ষ সম্ভবত ভিন্ন কোনো দক্ষ শিল্পীর হাতের কারুকার্য।

- **প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পবোধের সমন্বয়:**

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ভারতীয় খোদাই শিল্পে যেমন সূক্ষ্মতার প্রাধান্য, তেমনই পাশ্চাত্য গথিক স্থাপত্যশৈলীতেও এই সূক্ষ্মতার ছোঁয়া বিদ্যমান। বিশেষত, ইতালির পিসা ক্যাথেড্রালের খোদাইশিল্প কিংবা ফ্লোরেন্সের ক্যাথেড্রাল দুমোর কারুকার্য আমাদের নিস্তারিণী কালীবাড়ির লিপির শিল্পবোধকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সেখানে যেমন প্রতিটি খোদাইয়ে শিল্পের শুদ্ধতা ফুটে ওঠে, নিস্তারিণী কালীবাড়ির ফলকেও তেমনই এক শিল্পনৈপুণ্যের ঝলক দেখা যায়।

- **ঐতিহ্য এবং শৈল্পিক মননের সংযোগ:**

শিবনিবাসের রাজরাজ্ঞীশ্বর মন্দির, নিস্তারিণী কালীবাড়ি এবং চন্দ্রকোণার ফলকের এই তুলনামূলক আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, বাংলার মন্দির স্থাপত্যে খোদাইকার্যের সূক্ষ্মতা কেবল শিল্পভাবনাই নয়, বরং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার প্রমাণও। এই স্থাপত্যগুলোতে খোদাইয়ের ভাষা যেমন সংস্কৃত ও বাংলা—তেমনি খোদাইয়ের শিল্পগুণেও রয়েছে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন।

প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন, 'সংস্কৃতি মানে শুধু অতীতের উত্তরাধিকার নয়, তা বর্তমানের নির্মাণও।' এই প্রতিষ্ঠালিপিগুলির খোদাইশিল্প সেই নির্মাণের প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে অতীতের ঐতিহ্য আর বর্তমানের শিল্পনৈপুণ্য একাকার হয়ে উঠে।

এভাবে শিল্প, সংস্কৃতি, এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এই লিপিগুলি আমাদের কাছে শুধু পাথরে খোদিত কিছু অক্ষর নয়, বরং অতীতের এক জীবন্ত সাক্ষী হিসেবে রয়ে গেছে।

- **পুথির হস্তলিপি: সৃষ্টির রূপরেখা ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব:**

পুথির জগতে প্রবেশ করলে প্রথমেই আমাদের নজরে আসে হস্তলিপির নান্দনিক বৈচিত্র্য। এটি শুধু কাব্য বা গদ্যের বাহ্যিক রূপ নয়, বরং এক গভীর ঐতিহ্যের স্মারক। কালের প্রবাহে, লিপিকরদের সুক্ষ্ম হাতে রচিত এই পুথিসমূহে কখনো কখনো বানান-ভুল, শব্দের স্থানচ্যুতি বা বাক্যপ্রক্ষেপণ দেখা যেত, যা মূল সৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকত না। এই ত্রুটিগুলি, যা কখনো অসাবধানতায়, কখনো অজ্ঞতায় বা কখনো উদ্দেশ্যমূলকভাবে যুক্ত হত, তা পুথির পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করত।

লিপিকরদের নিজস্ব সাফাই ছিল একেবারেই স্পষ্ট। পুথির শেষাংশে, অর্থাৎ পুষ্পিকায় তারা নির্দ্বিধায় উল্লেখ করতেন- *'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখক দোষ নাস্তি'* অর্থাৎ, 'যা দেখেছি, তাই লিখেছি; লেখকের (লিপিকরের) কোনো ত্রুটি নেই।' এই সরল স্বীকারোক্তির মধ্যে দিয়ে তাঁরা যেন সমস্ত দায় ঝেড়ে ফেলতেন। আবার কখনো কখনো তাঁরা আরও একধাপ এগিয়ে বলতেন, *'ভীমাস্বপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম '* যেন যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম পতিত হলেও মুনিদের চিন্তার ভ্রান্তি হতে পারে। এই কথাগুলি শুধু আত্মপক্ষ সমর্থন নয়, বরং তৎকালীন কপিলংকিত সমাজের এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকেও প্রতিফলিত করে, যেখানে ভুল স্বীকার না করেও দায় এড়ানোর প্রবণতা লক্ষণীয়।

জনৈক লিপিকর ফকির চান্দ সেন আরও এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, *'এই পুস্তক দেখিয়া যেবা মন্দ বোলে। অঘোর নরকে তার বাস নিশ্চত্র।'* এই ঘোষণা ছিল একেবারে নির্ভীক এবং ঋজু। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিলেন যে, যদি কেউ এই পুথির সমালোচনা করে, তবে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। এখানে লিপিকরের আত্মবিশ্বাস এবং নিজের কাজের প্রতি অগাধ আস্থার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

তাহলে প্রশ্ন আসে, এই ভুলত্রুটি সত্ত্বেও, পুথির পাঠ কি সম্ভব ছিল? ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, অধিকাংশ পুথির মালিক, অর্থাৎ যাঁরা এই পাণ্ডুলিপিগুলি সংগ্রহ করতেন, তাঁরা মূল পাঠাংশ প্রায়শই মুখস্থ রাখতেন। ফলে, হস্তলিপির জটিলতা তাঁদের কাছে তেমন অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত না। পাঠ করতে গিয়ে কোনো অক্ষরের অস্পষ্টতা বা শব্দের বিভ্রান্তি হলে তাঁরা স্মৃতির আশ্রয়ে মূল পাঠটি উদ্ধার করতে পারতেন।

অন্যদিকে, লিপিকরদের মধ্যে অনেকেই পুথি নকল করাকে ধর্মীয় পুণ্যকর্ম হিসেবে বিবেচনা করতেন। এই বিশ্বাস তাঁদের হাতের লেখাকে যথাসম্ভব সুন্দর এবং স্পষ্ট করে তোলার জন্য প্রেরণা জোগাত। হস্তলিপির মধ্যে যে শিল্পীত নিপুণতা দেখা যায়, তা এই ধর্মীয় অনুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ। মনে পড়ে ইউরোপীয় মধ্যযুগের *Illuminated Manuscripts*- এর কথা, যেখানে ধর্মীয় গ্রন্থগুলি হাতে লেখা হত এবং শিল্পিত অলঙ্করণে তা সুসজ্জিত করা হত। তেমনি বাংলার পুথিতেও সেই পরম্পরা বজায় ছিল।

এরপর আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন বাংলা হরফে মুদ্রণের প্রচলন শুরু হয়, তখন অক্ষরের ছাঁচ তৈরির জন্য যে হস্তলিপিগুলি ব্যবহার করা হত, তার ভিত্তি ছিল এইসব প্রাচীন পুথির লেখনী। বলা যায়, সেই সমস্ত লিপিকরদের হাতের রেখা থেকেই বাংলা মুদ্রণশিল্পের ভিত্তিপ্রস্তর রচিত হয়।

ইতিহাসের এই বাঁকে এসে আমরা দেখতে পাই, পুথির হস্তলিপি কেবলমাত্র লেখার বাহ্যিক রূপ নয়, এটি ছিল বাংলা ভাষার বিকাশের মূল স্তম্ভ। প্রাচীন লিপিকরদের নিখুঁত সৃষ্টিশীলতা এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলেই আজকের বাংলা ভাষার অক্ষররূপ নির্মিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রাচ্যের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ এবং পাশ্চাত্যের *Scriptorium* সংস্কৃতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, উভয় ক্ষেত্রেই হস্তলিপির গুরুত্ব অপরিসীম।

তবে শুধু পুথির লেখনী নয়, এর মধ্যে যে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাস নিহিত ছিল, তা এক বিশাল কালানুক্রমিক ইতিহাসের ধারক। সেই ইতিহাসের পাতায় লিপিকরদের হাতের টানে ফুটে ওঠা প্রতিটি শব্দ আজও স্মৃতির ক্যানভাসে অমলিন হয়ে রয়ে গেছে।

- **অক্ষরের উত্তরাধিকার: হস্তাক্ষর থেকে মুদ্রণযুগে বাংলা লিপির রূপান্তর:**

মানবসভ্যতার প্রাচীনতম ইতিহাস থেকে আজ পর্যন্ত, লিখনপ্রক্রিয়ার বিবর্তন মানুষের বৌদ্ধিক অভিযাত্রার এক অন্তর্লীন প্রতিফলন। লিখনের সেই প্রাথমিক ধারা ছিল হস্তাক্ষরনির্ভর- যেখানে প্রতিটি অক্ষর ছিল স্রষ্টার একান্ত মননের পরিচায়ক। তবে বাস্তবিক অর্থে, হস্তাক্ষর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একজন লিপিকরের স্বতন্ত্র প্রবণতা ছাড়া তার ব্যক্তিত্ব বা সৃজনশীলতার গভীরতর মেধা নিরূপণ করা সম্ভবপর নয়। এখানে বানানের গঠন, অক্ষরের শৈলী কিংবা ছাঁদ সময়ের স্রোতে পরিবর্তিত হয়েছে, যা মূলত যৌথ প্রবণতারই ইঙ্গিত বহন করে। এই যৌথ প্রবণতার রূপান্তর কোনো একক লিপিকরের নয়, বরং বৃহত্তর সাংস্কৃতিক অভিযোজনের অংশ।

তবে এই বিবর্তনের ইতিহাস সহজ ও সরল ছিল না। লিপির আদিরূপ যখন তালপাতা বা ভোজপাতার উপর আঁকা হতো, তখন হস্তাক্ষরের গঠনশৈলী ছিল সম্পূর্ণরূপে লেখকের দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। সেই দক্ষতা আবার নির্ধারিত হতো লেখার মাধ্যম, ব্যবহৃত কালি, লিপিকরের শারীরিক অবস্থা এবং তার একাগ্রতার মাধ্যমে। প্রাচীন

ভারতীয় শাস্ত্রে 'প্রিষ্ঠ ভঙ্গ কটি গ্রিবা তুল্য প্রষ্ঠ অধোমুখং' বলে উল্লেখ রয়েছে- যেখানে লিপিকরের শারীরিক ভঙ্গি এবং লেখার সময় তার মনোসংযোগ কীভাবে লেখার শৈলীতে প্রভাব ফেলে, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আবার, এই পরিবর্তনশীলতার প্রভাব শুধু লিপির ছাঁদেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; ধীরে ধীরে তা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিযোজনের প্রতিফলন হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছে। হস্তাক্ষরের এই রূপান্তর ছিল ধীর এবং কালস্রোতে গ্রথিত। বাংলা ভাষার প্রাচীন পুঁথিপাঠ থেকে শুরু করে মুদ্রণযুগের সূচনা পর্যন্ত, লিপির গঠনে যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, তা মূলত যুগের প্রয়োজন এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার ফল।

পুঁথির হস্তাক্ষর শুধু বাংলা সাহিত্যের লিখিত ঐতিহ্যের সাক্ষ্যই বহন করেনি, এটি ছিল এক বিস্তৃত ঐতিহাসিক সংস্কৃতির ধারক। প্রতিটি অক্ষরের বাঁক, প্রতিটি শব্দের গঠন ছিল প্রায় শিল্পকর্মের সমতুল্য। যেমনটি ফিলিপ হোমার বলেছিলেন, *"Writing is not just a means of communication; it is an art that mirrors the soul of its creator."* সেই প্রতিফলনের মাধ্যমেই প্রাচীন বাংলার হস্তাক্ষর একদিকে শিল্প এবং অন্যদিকে ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

তবে কালক্রমে প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে হস্তাক্ষরনির্ভর পাণ্ডুলিপির স্থান দখল করে নেয় মুদ্রণপ্রযুক্তি। প্রথমদিকে মুদ্রিত অক্ষরও ছিল হস্তাক্ষরের আদলে নির্মিত। সেই আদলকে 'আদর্শ' ধরা হতো, যা মূলত প্রাচীন হস্তলিপির অনুকরণেই সৃষ্টি। কিন্তু এখানেই থেমে থাকেনি লিপির ইতিহাস। মুদ্রণযুগের প্রচলন ভাষার রূপকে স্থিরতা দিলেও হস্তাক্ষরের নান্দনিকতাকে পুরোপুরি বিলুপ্ত করতে পারেনি। আজও স্বহস্তে লিখিত একটি পত্র বা পাণ্ডুলিপি আমাদের কাছে গভীর অনুভূতির প্রতীক হিসেবে ধরা দেয়।

এই উত্তরাধিকারকে সংরক্ষণ করা শুধু সাংস্কৃতিক গর্ব নয়, এটি বাংলাভাষার প্রতি আমাদের ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা। প্রখ্যাত বাঙালি সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'অক্ষরবৃত্ত' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, *"অক্ষরকে আমরা যত্ন করে লালন করব, কারণ এতে লুকিয়ে আছে আমাদের সংস্কৃতির গভীর স্মৃতি।"* আমাদের বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর সমাজেও সেই দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায়- যেন বাংলাভাষার সেই ঐতিহ্যবাহী লিপিচর্চা এবং সংস্কৃতির উত্তরাধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে।

অতএব, হস্তাক্ষরের সৌন্দর্য এবং তার ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের গুরুত্বকে আমাদের মনে রাখতে হবে। মুদ্রণযুগ আমাদের কাছে সহজলভ্যতা এবং স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা দিলেও, হস্তলিপির নান্দনিকতা এবং মানবিকতার ছোঁয়া আমাদের হৃদয়ে আজও অম্লান। বাংলাভাষার এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা, চর্চা করা এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত দায়িত্ব।

- **উত্তরাধিকার ও দায়বদ্ধতার সেতুবন্ধন:**

যেমনটি মাইকেল অ্যাঞ্জেলো বলেছিলেন, *"A man paints with his brains and not with his hands."*- একজন লিপিকরও লেখেন তাঁর চিন্তা ও সংস্কারকে লিপিবদ্ধ করার মানসে। এই উত্তরাধিকারের সেতুবন্ধন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সজীব রাখতে হবে। মুদ্রিত অক্ষর আমাদের আধুনিকতার প্রতীক হলেও, হস্তাক্ষরের ঐতিহ্য আমাদের অতীতের স্মৃতি। এ দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই আমাদের দায়িত্ব।

উপসংহার:

প্রাগাধুনিক বঙ্গীয় হস্তলিপি বাংলার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি জীবন্ত স্মারক। লিপিকরদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় তৈরি এই পাণ্ডুলিপিগুলি শুধু ভাষার বাহকই নয়, এটি ছিল এক অমলিন শিল্পচর্চা। মুদ্রণযুগের আবির্ভাব এই হস্তলিপির প্রভাবকে কমিয়ে দিলেও, এর ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক গুরুত্ব আজও অম্লান। লিপির প্রতিটি আঁচড়ে ছিল একেকটি গল্প, যা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সংরক্ষিত হয়েছে। তাই, এই অমূল্য ঐতিহ্য সংরক্ষণ আমাদের দায়বদ্ধতা। আজকের ডিজিটাল যুগে, সেই প্রাচীন হস্তলিপির শৈল্পিক সৌন্দর্য এবং ভাষার ঐতিহাসিক গুরুত্বকে আমরা যেন ভুলে না যাই। আমাদের প্রজন্মের কাছে এই মূল্যবোধকে পৌঁছে দেওয়া, বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধার প্রকাশ।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, আনন্দ চন্দ্র, *Bengali Manuscript Tradition and Its Historical Significance*. কলকাতা: বিশ্বভারতী প্রেস, ১৯৯৮
২. চৌধুরী, হরপ্রসাদ, *The Art of Bengali Calligraphy*. ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৫
৩. ব্যানার্জি, সত্যজিৎ, *Script and Scribes of Ancient Bengal*. কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০১২
৪. সেন, দিনেশ চন্দ্র, *History of Bengali Literature*. কলকাতা: ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৪৮
৫. শর্মা,রমেশ, *The Evolution of Indian Manuscripts*. দিল্লি: একাডেমিক পাবলিশার্স, ২০১০
৬. ভট্টাচার্য, তন্ময়, *গঙ্গা- তীরবর্তী জনপদ*। মাস্তুল, ২০২৩
৭. বসু, ত্রিপুরা, *বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠপরিক্রমা*। পুস্তক বিপণি, ২০০০
৮. ভৌমিক, যূথিকা বসু, *বাংলা পুথির পুষ্পিকা*। সুবর্ণরেখা
৯. সাঁতরা, তারাপদ, *মন্দিরলিপিতে বাংলার সমাজচিত্র*। টেরাকোটা সংস্করণ, ২০১৫
১০. হালদার, কল্পনা, *পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা*। সাহিত্যলোক, ১৯৯৮

প্রতিষ্ঠান:

এশিয়াটিক সোসাইটি।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
বিশ্বভারতী।
চন্দ্রকোণা সংগ্রহশালা।

লেখকগণ:

তন্ময় ভট্টাচার্য,চক্রবর্তী, আত্রেয়ী, অরিন্দম গোস্বামী এবং সুবর্ণকান্তি উত্থাসনী।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1214-1222
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.123

অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের সাংগঠনিক দিক

দিলীপ সরকার, *সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, শ্রীপত সিং কলেজ, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.05.2025; Accepted: 28 .05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The word co-operative literally means collective or joint effort. When a number of people engage in an activity for the purpose of achieving a common goal, it is essentially a cooperative program. In this article, I want to show how the organizations that were inspired by the philosophy of Ramakrishna Vivekananda in the late 18th and mid-19th century, among the various programs adopted by them, the development of women was one of the programs- how they implemented that program. At the time when Sri Ramakrishna or Swami Vivekananda emerged as a guide, the trend of social reform in Bengal was at the forefront of the question of women's emancipation. Therefore, in order to resolve their helpless situation, the society developed anti-sati-burning movement, cohabitation consent movement, anti-child marriage movement and above all efforts to spread women's education. Raja Rammohan Roy and Ishwarchandra Vidyasagar who took a leading role in women's emancipation.

Keywords: cooperative, women's emancipation, social reform, Cohabitation, Philosophy of Ramakrishna

সমবায় শব্দের আক্ষরিক অর্থ সমষ্টিগত বা সম্মিলিত প্রয়াস। যখন কিছু সংখ্যক মানুষ একক লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে কোন কার্যে লিপ্ত হয় তাকেই মূলত সমবায়ভিত্তিক কর্মসূচী বলা যায়। আমি এই প্রবন্ধে দেখাতে চাইছি অষ্টাদশ শতকের শেষ ও ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে সংগঠনগুলি গড়ে উঠেছিল, তাদের গৃহীত নানাবিধ কর্মসূচীর মধ্যে নারীজাতির উন্নতিসাধন ছিল অন্যতম কর্মসূচী-সেই কর্মসূচীকে কিভাবে তারা বাস্তবায়িত করেছিল। যে সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বা স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে পথপ্রদর্শকের আর্বিভাব ঘটে সেসময় বাংলায় সমাজসংস্কারের প্রবাহ চলছিল, তার পুরোভাগে ছিল নারীমুক্তির প্রশ্নটি। তাই তাদের অসহায় অবস্থার নিরসনকল্পে সমাজে গড়ে উঠেছিল সতীদাহ বিরোধী আন্দোলন, সহবাস সম্মতি আন্দোলন, বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলন এবং সর্বোপরী নারীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা। নারীমুক্তির ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এছাড়া ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন, পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, দূর্গামোহন দাস, শশীপদ ব্যানার্জী এবং ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অনান্য ব্যক্তিরাও নারীমুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

অন্যদিকে নারীমুক্তির ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ একটু স্বতন্ত্র ছিল। তথাকথিত সমাজ সংস্কারকগণ পরিবার তথা সমাজে নারীর অবনমিত অবস্থার উন্নতিসাধনে নিয়োজিত করেছিলেন।কিন্তু নারী যে পুরুষের মতই সমাজের পরিচালিকা শক্তি হিসেবে নিজেদের উপস্থাপিত করতে পারে সে প্রত্যয় তাদের

ছিল না।তাঁদের মতে নারী পুরুষের অধীনেই থাকবে, হ্যা, তবে কিছু পরিমাণে তাদের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এমনকি কেশবচন্দ্র সেন নারীদের পাঠক্রমে ন্যায়শাস্ত্র অর্ন্তভুক্ত করার ক্ষেত্রে তীব্র আপত্তি জানান। অর্থাৎ তথাকথিত সমাজসংস্কারকগণ নারী-পুরুষের সাম্যনীতির জয়গান করেননি।এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বক্তব্যের ভিত্তি ছিল "ত্বং স্ত্রী, ত্বং পুং মানসী, ত্বং কুমার উত বা কুমারী" অর্থাৎ তুমি স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমি বালক আবার তুমিই বালিকা অর্থাৎ নারী পুরুষের মধ্যে কোন ভেদ নেই। অন্যদিকে বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ অনুযায়ী নারী হবে স্বাধীন, স্বতন্ত্র একমাত্র নিজার জাগ্রত চৈতন্যের অধীন, কারোর অধীন নয়। সেজন্য স্বামীজী তৎকালীন নারীসমস্যার সমাধানকল্পে পুরুষদের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছেন "আগে মেয়েদের শিক্ষা দাও, তারপর তারাই স্থির করবে তাদের জন্য কি ধরনের সংস্কার দরকার।"

নারীজাতির দুঃখদুর্দশা দূর করার জন্য ব্যক্তিগত প্রয়োজন যথেষ্ট ছিল না, প্রয়োজন ছিল সুপরিকল্পিত সংগঠনের। নারীমুক্তির আদর্শ প্রচার করেই শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ বা তাঁদের অনুগামীগণ সামাজিক দায়িত্ব সম্পাদন করেননি, তার পাশাপাশি তাঁরা বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও গড়ে তোলেন। যার মধ্যে কয়েকটি জনসেবার জন্যে, আবার কয়েকটি নারীমুক্তির কাজে মনোনিবেশ করেছে। যেহেতু ঊনবিংশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনে নারীমুক্তি ছিল অন্যতম চালিকা শক্তি, তাই আমি আমার প্রবন্ধে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্যোগে নারীজাতির কল্যাণে যে প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছিল সেদিকে আলোকপাত করতে চাই। এক্ষেত্রে আমি আমার সময়সীমা সীমাবদ্ধ রাখবো ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত। তাই সময়ের দিক থেকে যে প্রতিষ্ঠানটি প্রথম রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে গড়ে উঠেছিল তা হল সারদেশ্বরী আশ্রম (১৮৯৫)।

(১) সারদেশ্বরী আশ্রম:

নারীজাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে রূপায়িত করতে জন্ম হয় এই সংগঠনের।নারীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা ও স্বনির্ভরশীলতার মনোভাব জাগাতে গৌরিমা (আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা) এই উদ্যোগ নেন যা সারদেশ্বরী আশ্রমরূপে স্বীকৃত। তাঁর মনে হয়েছিল উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে নারী আদর্শ গৃহলক্ষী হইতে পারে না,সন্তানকে সুশিক্ষা দিতে পারে না,কেবল দৈহিক বল নয়,আত্মিক বলের অভাবে অতি তুচ্ছ কারণে নারীকে সংসারের অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হয়।শারীরিক অত্যাচার ও মানসিক আঘাত সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া নারী সময় সময় আত্মঘাতিনী পর্যন্ত হইয়া থাকে।

উনিশ শতকে শেষদিকে বাংলায় যখন স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটেছিল অন্যদিকে জাতিগঠন তথা জাতীয় আন্দোলনও শুরু হয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষায় পাশ্চাত্য প্রভাব প্রয়োজনের তুলনায় অধিক ছিল। বিশেষত ১৮৭৬ সালে অ্যানেট আক্রয়েড বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর অনেকে এই ধরনের বিজাতীয় শিক্ষাকে বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং প্রণালী এক হওয়াকে জাতীয় সত্তা এবং সংস্কৃতির পক্ষে হানিকর বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন। 'নববিভাকর সাধারণী' মেয়েদের জন্য যে পাঠ্যসূচীর প্রস্তাব করেছিলেন তাতে চরিত্র গঠনের জন্য প্রাচীন ভারতের মহীয়সী নারীদের জীবনী পাঠ, ব্রতকথা, রামায়ন, মহাভারত, গীতা এবং গৃহকর্ম শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রাধান্য পায়। এই পরিবেশে মেয়েদের স্বদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার উপযোগী জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন করলেন মাতাজী তপস্বিনী গঙ্গাবাঈ ১৮৯৩ সালে মহাকালী পাঠশালার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এর ঠিক দুবছর পরেই ঐ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। তাতে প্রথমটির উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় শিক্ষা,চরিত্র গঠন ও আদর্শ গৃহিণী গড়ে তোলা। কিন্তু সারদেশ্বরী আশ্রমের লক্ষ্য ছিল শিক্ষার সঙ্গে ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনী গড়ে তোলা।

ক্ষুদ্র আকারেই প্রাথমিক ভাবে আশ্রমের সূচনা হয়। ২৫ জন আশ্রমবাসিনীকে নিয়ে গৌরিমা নারীজাতির উন্নতিসাধনের সংকল্পের সূচনা করেন। তিনি নিজে সকলকে শিক্ষা (বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা) দিতেন। পরিণত বা বয়স্কদের ধর্মোপদেশ দান করতেন- এজন্য আশ্রমে বসবাস, আহার ও শিক্ষার বিনিময়ে তিনি কোন রূপ অর্থ গ্রহণ করতেন না। স্বাভাবিকভাবেই আশ্রমটির ব্যয়সংকুলানের নিমিত্ত স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাহায্যের প্রয়োজন হয় এবং তিনি তা লাভও করেন। প্রথম কয়েক বৎসর নিতান্ত অর্থাভাবের মধ্যে আশ্রমটি কাজ চলেছিল, ধীরে ধীরে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তাঁকে সাহায্য করেন। ২৪ পরগনার এক ধনী পরিবারের গৃহিনী অর্থসাহায্য করেন,

এছাড়া মুঙ্গেরের সিভিল সার্জেন রায় উপেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের স্ত্রী সরোজিনী দেবী এবং গৌরিমার গর্ভধারিনী গিরিবালা দেবীও নানাভাবে আশ্রমকে সাহায্য করেন। সহায়তার জন্য এগিয়ে আসেন তেওর জাতির মুচিরাম দাস, গগন জেলে, পূণ্যবাবু দারোগা, চন্দ্রনাথ নিয়োগী, মোহিত মুখোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং সুরেন্দ্রনাথ সেন। কলকাতার প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার মাধবচন্দ্র রায়বাহাদুর একটি টাকার তোড়া এবং তাঁর স্ত্রী কেশবমোহিনী দেবী আশ্রমের চারিদিকে নিজ ব্যয়ে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেন। স্বামী প্রেমানন্দ রান্নাঘরে সংস্কারের নিমিত্ত ২৫ টাকা দান করেন।

এই আশ্রমের সমাজকল্যাণমূলক কাজ প্রধানত চার ভাগে বিভক্ত ছিল- (ক) স্ত্রীশিক্ষা প্রচার (খ) শিক্ষিকামন্ডলী গঠন (গ) দরিদ্র মেয়েদের এবং বিধবাদের সাহায্য (ঘ) মেয়েদের জীবন ও জীবিকার উপায় সন্ধানে সহযোগিতা করা। তাঁর বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত। ইংরেজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও এই বিদ্যালয়ে ছিল। পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষা যেমন তাঁত বোনা, সেলাই ও অনান্য শিল্পকর্ম পাঠ্যসূচীর অর্ন্তভুক্ত ছিল। আশ্রমের যাবতীয় কার্যাবলী রন্ধনাদি, পূজাপাঠ থেকে হিসাব লিখন সকল প্রকার কাজই ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থিনী ও শিক্ষয়িত্রীকে করতে হত। এই ধরনের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পরবর্তীকালে জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করত।

বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন গৌরীমা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে কলকাতার জনমন্ডলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্ধ রাখতে না পারলে তাঁর নারীশিক্ষা এবং আদর্শ নারীগঠনের কাজ প্রসারতা লাভ করবে না। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে কলকাতায় যে মাতৃসভা আহুত হয় সেখানে শ্রোতৃমন্ডলীকে নারীকল্যাণে আত্মনিয়োগ করার জন্য গৌরীমা উদ্বুদ্ধ করেন। ক্রমে মহেন্দ্রনাথ শ্রীমানীর অর্থানুকূল্যে বিদ্যালয়ের জন্য গাড়ী ও ঘোড়া কেনা হয়। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯২৪) প্রথম পরামর্শ সভা গঠিত হয়, শিক্ষিত হিন্দু মহিলাদের নিয়ে একটি মহিলাসমিতি গঠন করা হয়; কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে কার্যনির্বাহক সমিতিও সংগঠিত হয়। আশ্রমের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিছু দায়িত্ব ব্রক্ষচারিণীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নারীজাতির কল্যাণসাধনে উৎস্বর্গিতপ্রাণা কিছু আদর্শ চরিত্রের ব্রক্ষচারিণী গঠন করা যাঁরা অপর মেয়েদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করতে পারবেন। এই শিক্ষয়িত্রীদের ভবিষ্যতে সন্ন্যাস দেওয়া তাঁর লক্ষ্য ছিল। তিনি সেই উদ্দেশ্যে মাতৃসঙ্ঘ স্থাপন করেন এবং স্বয়ং এই সঙ্ঘের পরিচালিকা ও সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

ক্রমে ধনী দরিদ্র সমাজের সকল স্তরে শিক্ষার্থীদের কাছে এই প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তাই আশ্রমের কার্যপ্রণালীর প্রসারকল্পে শাখাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনও অনুভূত হয়। এর ফলস্বরূপ ১৯৪২ সালে নবদ্বীপে ও ১৯৪৭ সালে বিহারের গিরিডিতে আশ্রমের দুটি শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৯৫ সালে ৭ই জানুয়ারী আশ্রমটির শতবর্ষপূর্তি উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল কে. ভি. রঘুনাথ রেড্ডি একশো বছর ধরে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে কাজ করে যাওয়ার জন্য আশ্রমকে অভিনন্দন জানান। এভাবে আশ্রমটি একাধারে শিক্ষার্থিনী ও সন্ন্যাসিনী প্রস্তুত করে চলেছে।

(২) রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়:

১৮৯৮ সালে ১৩ই নভেম্বর শ্রীশ্রীমার কালীপূজার দিনে যোগীনমা, গোলাপ মা, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দের উপস্থিতিতে কলকাতার বাগবাজারে (১৬ নং বোসপাড়া লেন) শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন পূজা করে বালিকাদের শিক্ষার জন্য নিবেদিতা পরিচালিত বিদ্যালয়ের সূচনা করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৮৯৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ের কাজ ছিল পরীক্ষণমূলক।

বিদ্যালয়ের ভবিষ্যত সাফল্য সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত্ত হন। অত: পর অর্থের প্রয়োজনে তিনি বিদেশযাত্রা স্থির করেন। ১৮৯৯ এর জুলাই থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয় সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল। ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংল্যান্ড আমেরিকা থেকে ফিরে এসে নিবেদিতা আবার বিদ্যালয়ের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি কিন্ডারগার্ডেন পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে শুরু করেন। এসময় দৈনন্দিন কার্যতালিকায় পড়াশোনা অপেক্ষা সেলাই ও খেলাধূলা ছিল প্রধান।

নিবেদিতা ১৯০২ সালের নভেম্বরে নিজের গৃহে কথকতা ও চন্ডীপাঠের ব্যবস্থা করেন।সেই সুবাদে অন্তঃপুরের নারীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও সৌহাদ্য স্থাপিত হয়। সিস্টার ক্রিস্টিন ১৯০৩ সালের এপ্রিল

মাসে নিবেদিতার সাথে যোগদান করায় বয়স্ক মহিলাদের জন্য 'পুরস্ত্রী বিভাগ'টি সামান্য ভাবে হলেও আরম্ভ করা সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৪ সালে জগদ্ধাত্রী পূজার দিন বিকালে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় রূপে 'পুরস্ত্রী বিভাগ'টির সূচনা হয়। বিভাগটি সম্পূর্ণভাবে ভগিনী ক্রিস্টিনের পরিচালনাধীন ছিল।

নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের আন্তরিকতা ও আগ্রহ বাস্তবিকই তৎকালীন গোঁড়া সমাজের সকল বাধা দূর করেছিল। ধীরে ধীরে রক্ষণশীল পরিবারের কন্যা ও বধূগণ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। পর্দাপ্রথা অক্ষুন্ন রেখে তাদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তির আনুকূল্যে দুটি ঘোড়ার গাড়ি সংগৃহীত হয়। বিদ্যালয় বসত তিনবার-সকাল আটটা, দুপুর এগারোটা ও বিকেল চারটে, প্রথম পর্বে শিশুদের পাঠশালা বসত এবং পরের দুই অধিবেশনে পুরস্ত্রীগণ নিজেদের সুবিধামত আসতেন। প্রথম থেকেই এর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে আমেরিকার বোস্টন শহরের অধিবাসিনী মিসেস ওলি বুল। স্বামীজী তাঁকে 'ধীরামাতা' বলে সম্বোধন করতেন।

নিবেদিতা লিখেছেন

> "অতীতের হিন্দু নারীগণ কি আমাদের লজ্জার কারণ ছিলেন, যে তাঁদের লাবণ্য, মাধুর্য, নম্রতা ও ধর্মভাব, সহিষ্ণুতা ও শিশুসুলভ গভীর ভালোবাসা এবং করুণা প্রভৃতি প্রাচীন আদর্শ বর্জন করে আমরা পাশ্চাত্য নারীর বিবিধ তথ্যসংগ্রহ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের দুর্বার আগ্রহ- যা পাশ্চাত্য শিক্ষার অসংস্কৃত ফলমাত্র - তাই গ্রহণে ব্যগ্র হব?"

তবে একথা মনে করা ভুল হবে যে নিবেদিতা অগ্রগতির বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন পুরাতন প্রথার মধ্যে মেয়েরা কেবল শৃঙ্খলা নয়, জীবনের উদ্দেশ্য লাভ করেছে। কিন্তু তিনি জানতেন ভারতীয় সমাজে যে পরিবর্তনের সৃষ্টি হয়েছে তাকে উপেক্ষা করে পুরাতন প্রথা বজায় রাখা সম্ভব নয়। প্রগতির স্রোত তখন রক্ষণশীল পরিবারে ক্রমবর্ধমান। তাই বিধবা ও বিবাহিতা মেয়েদের বাংলা সাহিত্য ও সূচীশিল্প শিক্ষার সাথে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থাও করেন।নিবেদিতার বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা শিক্ষকতা করার সুযোগ লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভগিনী শ্রীমতি লাবণ্যপ্রভা বসু এবং পরে পুস্প দেবী, মহামায়া দেবী, বিপিনচন্দ্র পালের কন্যা অমিয়া দেবী, লেডি অবলা বসু এবং সরলাবালা সরকারের নাম উল্লেখ করা যায়।

১৯১১ সালে ভগিনী নিবেদিতার আকস্মিক দেহত্যাগে বিদ্যালয়ের ভবিষ্যত সমন্ধে সকলেই হতাশ হয়ে পড়েন। ইতিপূর্বে ১৮ই জানুয়ারী, ১৯১১ সালে মিসেস ওলি বুলের মৃত্যুতে বিদ্যালয়ের আর্থিক অনিশ্চয়তা তৈরী হয়। এই সংকট মুহূর্তে ভগিনী ক্রিস্টিন দৃঢ় হস্তে বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ভগিনী সুধীরা তাঁকে এ কাজে সাহায্য করেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটলে তিনি আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করলে সুধীরা দেবী সর্বতোভাবে বিদ্যালয় পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যুর পর ১৯১৩ সালে মার্চ মাসে টাউন হলে এক স্মরণসভা আহুত হয় মূলত জনগনের সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু ১৯১৩ সাল পর্যন্ত সন্তোষজনকভাবে কোন সাহায্য সংগৃহীত হয়নি। এই বিষয়টি ১৯১৩ সালের ৯ই জুন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে তুলে ধরা হয় এবং বলা হয় স্মরণসভার আহ্বানের পর কুড়ি মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও যেটুকু পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়েছে তা হল ৯৩২-৭-৯। আরো বলা হয় যে বিদ্যালয়টি- decidedly one of very few institutions, if not the only institution of its kind, that has real access to Hindu middle- class ladies behind the purdah and that imparts education on thoroughly oriental. এই পত্রিকার ১৩ই জুন আরেকটি সম্পাদকীয় বিভাগে বলা হয় Dr. Mrs. Jagadish Chandra Bose had donated 500/- to the school. Both Dr. Rashbehari Ghosh and Mr. C.C. Ghosh were also ready to pay their promised subscription as soon as a responsible committee had been formed to manage the school.

বাস্তবিক নিবেদিতার দেহত্যাগের পর ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক ভক্তের এককালীন অর্থ প্রদান এবং মিসেস বুলের ইচ্ছা অনুসারে ইজি. থর্প প্রেরিত মাসিক দুইশত টাকার সাহায্যে বিদ্যালয় কিছুটা আর্থিক সংকটমুক্ত হয়। স্বামী সারদানন্দ 'পুরস্ত্রী শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের কার্যবিবরণী' তে লিখেছেন -ভগিনী নিবেদিতার মহান আত্মত্যাগ কেন্দ্র রূপে পরিণত হইয়া আপনার চতুপার্শ্বে কতকগুলি আত্মত্যাগিনী শিক্ষয়িত্রীর সমাবেশ

ঘটিয়াছে, এ সমাবেশই যেন প্রতিষ্ঠানটির স্থায়ী মুলাবোধ- ইহার বিস্তার ও উন্নতির অব্যর্থ প্রতিভূস্বরূপ এবং এই মহৎ কার্য বর্ধিষ্ণু হইয়া বৃক্ষলতাদির মত চারিদিকে মঞ্জুরিত ও পল্লবিত হইয়া ফুটিতে চেষ্টা করিতেছে।

(৩) মাতৃমন্দির:

সুধীরা দেবী ১৮৮৮ সালে উত্তর কলকাতার জন্মগ্রহন করেন। তাঁর মধ্যে প্রথমে দেশাত্মবোধ ও পরে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি যে আগ্রহ দেখা যায় তার পশ্চাতে ছিল তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। প্রথমে বিপ্লবী ও পরবর্তী জীবনে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী প্রজ্ঞানন্দ (দেবব্রত বসু) প্রেরণা ও উৎসাহ। ১৯০৬ সালে তিনি নিবেদিতা বিদ্যালয়ে কর্মী রূপে যোগদান করেন।[১৮] ১৯১২ সালে সম্পূর্ণ রূপে গৃহত্যাগ করে তিনি বিদ্যালয়ের কার্যভার গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি সংসারে অনাগ্রহী বয়স্কা মহিলাদের নিয়ে স্বামী সারদানন্দের সহায়তায় স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ অনুযায়ী 'মাতৃমন্দির' নাম দিয়ে একটি আশ্রম বিভাগ স্থাপন করেন। ১৯২০ সালে শ্রীমায়ের মহাপ্রয়ানের পর এটি 'সারদা মন্দির' নামে পরিচিত হয়। ক্রমে মাতৃমন্দিরের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন দেশের কল্যাণ সাধনে একটি প্রচারিকা সঙ্ঘ গঠনের প্রয়োজন। স্বামীজীর এই সম্মিলিত কাজকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে এসেছিলেন ভগিনী সুখীরা। সারদা দেবীর প্রয়াণের পর মাতৃমন্দির 'সারদামন্দির' নামে পরিচিত হয়। স্থানাভাবে বিদ্যালয়ের মেয়েরা বিভিন্ন ভাড়াবাড়িতে গিয়ে নানারকম অসুবিধার মধ্যে কাজ করতেন দেখে সারদা দেবী বলেছিলেন: আমার মেয়েরা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে,ওদের একটা বসবার জায়গা হলে ভালো হয়।ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াও ১৭ নং বোসপাড়া লেনে স্থানাভাব লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে বেলুড় মঠের ট্রাস্টিরা বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুভব করেন। সেই উদ্দেশ্যে ১৯১৭ সালে বোসপাড়া লেনে একখন্ড জমি ক্রয় করা হয়।[২০] ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠানটি রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র রূপে গৃহীত হয়। ১৯১৬-১৮ সালে বার্ষিক বিবরণীতে জানা যায় প্রতিষ্ঠানটির স্বতন্ত্র তিনটি বিভাগ ছিল: (১) নিবেদিতা বিদ্যালয় (২) বিবেকানন্দ পুরস্ত্রী বিভাগ এবং (৩) মাতৃমন্দির ১৯১৪-১৫ সালের বিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণীতে সুধীরার কর্মকুশলতা ও শিক্ষকতার প্রশংসা করা হয়। তাতে বলা হয়।

অন্ত:পুরচারিণীদের বিভাগে ৩৭ জন শিক্ষালাভ করিতেছে। অন্ত:পুরচারিণীদের বিভাগে দুইটি প্রধান শ্রেণীভাগ রহিয়াছে। প্রথমে একটি শ্রেণীতে বর্ত্তমানে স্ত্রীলোকদিগের বিশেষভাবে শিক্ষণীয় 'সকল বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হয়' এবং দ্বিতীয় অংশে ঐ সকল বিষয় ব্যতীত যাঁহারা শিক্ষাদানকার্যে নিপুণতা লাভ করতে চাহেন, তাঁহাদের সে কার্য্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শেষোক্ত বিভাগে বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র, জীবনবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শিক্ষাদান কার্য্য ও প্রতি শনিবার শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থিনীকে প্রতিদিন দুইঘন্টা বা ততোধিক কাল বালিকা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষকতা করাইয়া শিক্ষাদানকার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে দেওয়া হয়।অন্ত:পুরচারিণীদের শিক্ষাকার্য্যে প্রথম বিভাগে ১৪ জন বিধবা ও ৬ জন সধবা স্ত্রীলোক আছেন; ইহাদের অভিভাবকগণ সকলেই ইহাদের শিক্ষালাভে উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।দ্বিতীয় বিভাগে ১৭ জন মহিলা শিক্ষকতা ও বিদ্যালয় পরিচালন কার্য্যে যোগ্যতা লাভ করিতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে ১৩ জন সিস্টার ক্রিস্টিনের প্রধান সহায়তাকারিণী শ্রীমতি সুধীরার নেতৃত্বে সমগ্র বালিকা বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্য্য চালাইয়া দিতেছেন। প্রসঙ্গত আমরা জ্ঞাপন করিতে চাই যে উক্ত ১৭ জন শিক্ষার্থিনীর মধ্যে সপ্তদশবর্ষীয়া একটি কুমারীকে তাহার অতি দরিদ্র পিতামাতা ইচ্ছানুরূপ পাত্রস্থ করিতে না পারায় গত দুই বৎসর হইল শ্রীমতি সুধীরা তাঁহাকে শিক্ষাদানরূপ মহৎ ব্রতের দীক্ষিত করিয়া লইয়াছেন। এই বিভাগে সেলাই কার্য্যে তিনটি বর্ষীয়সী মহিলা শিক্ষার্থিনী হইয়া যোগদান করিয়াছেন।

১৯১৬-১৮ সালের বার্ষিক বিবরণীতে এই মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। এগুলি ছিল নিম্নরূপ: -

(১ম) শিক্ষা ও সেবাব্রতে যাহারা জীবন উৎস্বর্গ করিয়াছেন এইরূপ হিন্দু রমনীগণের বাসভবন রূপে ইহা প্রধানত পরিগণিত হইবে।

(২য়) পূর্বোক্ত ব্রতদ্বয় ধারণে অভিলাষিণী হইয়া যে সকল হিন্দু রমণীর উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে চাহেন, আশ্রম তাঁহাদিগকে নিজ করে রাখিয়া ঔই উচ্চাদর্শে জীবন গঠন করিবার এবং শিক্ষাদান ও সেবা

করিবার বর্তমানকালের প্রকৃষ্ট জীবন প্রণালীর সকল শিখিবার সুবিধা বিধান করিবে।

(৩য়) কলিকাতায় থাকিবার সুবিধা না থাকায় দূরবর্তী স্থানের যে সকল ছাত্রী সিস্টার কৃষ্টিনা পরিচালিত বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের অভিলাষিণী হইয়াও আশা পূরণ করিতে পাইতেছে না, মাসিক খরচা লইয়া আশ্রম তাহাদিগের ঐ বিষয়ে সুযোগ করিয়া দিবে।

(৪র্থ) সীবন বিদ্যা, সূচী শিল্প প্রভৃতি শিখাইয়া এবং লেখাপড়া জানিলে ভদ্রপরিবারে পড়াইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, আশ্রম অসহায়া দরিদ্রা পুরস্ত্রীদিগকে জীবিকানির্ব্বাহে সহায়তা বিধান করিবে।

১৯১৫ থেকে **১৯১৮** সাল পর্যন্ত এই মাতৃমন্দিরের ছাত্রীসংখ্যা এবং **১৯১৬-১৮** পর্যন্ত সীবন ও সূচীশিল্প দ্বারা যা আয় হয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হল: -

ছাত্রীসংখ্যা:

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে	-	**১১** জন
১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে	-	**১৬** জন
১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে	-	**২৩** জন
১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে	-	**৩২** জন

সীবন ও সুচীশিল্প দ্বারা আয়:

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে	-	**১১৮** টাকা
১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে	-	**২৫০** টাকা
১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে	-	**৩২১** টাকা

মন্দির পরিচালিকা ও নিবাসিনীগণের উপার্জিত অর্থ দ্বারা মন্দিরের ব্যয় নির্বাহ করা ছাড়া দরিদ্রকে বস্ত্রদান এবং দুজন অসহায় বালকের স্কুলের বেতন ও পুস্তক ক্রয় করা হয়েছিল। এ যেন নিবেদিতার সেবার আদর্শের বাস্তবায়িত রূপ। 'মাতৃমন্দির' সকলের প্রচেষ্টা ও উদ্যমেই পরিচালিত হতে থাকে। যেমন শ্রীশ্রীমা একবার সুধীরার প্রসঙ্গে বলেন 'যখন খরচ চলে না, বড়লোকে মেয়েদের গানবাজনা শিখিয়ে মাসে ৪০/৫০ টাকা ও তাহার সহচারিণীগণ ভদ্র পরিবারের ছাত্রী পড়াইয়া এবং বয়ন, সীবন, সূচীশিল্প প্রভৃতি নানা উপায়ে অর্থউপার্জনক্ষম আপনারাই বহন করিতেছিল।.... অতএব সাবলম্বন ও পরার্থে ত্যাগি যে ইহাদের জীবনের মূলমন্ত্র তাহা আর বলিতে হইবে না। নারীজাতির শিক্ষা ও সাহায্যের জন্য মূলত এই সারদামন্দিরের প্রতিষ্ঠা।তবে তাহার ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিক জীবন যেখানে মেয়েরা হয়ে উঠবে স্বাধীন ও সাবলম্বী।

এই পর্বে শুধুমাত্র যে মাতৃমন্দিরের উন্নতি হয়, তা নয় নিবেদিতা বিদ্যালয়ে ক্রমপ্রসার ও সম্ভব হয়েছিল। **১৯১৯- ২২** খ্রী: বিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায় এই পর্বে বিদ্যালয় ও পুরস্ত্রী বিভাগের ছাত্রী সংখ্যা **২৪৫** জন এবং তাহাদের দৈনিক উপস্থিতি গড়পড়তায় **২০০** জন ছিল। এই সময় **৯** জন শিক্ষয়িত্রী বিনা পারিশ্রমিকে কার্য করতেন। এই রিপোর্টেই ভগিনী সুধীরার প্রসঙ্গে বলা হয়,

> "ভগিনী ক্রিস্টিনার আমেরিকা প্রত্যাবর্তনের পর হইতে বিদ্যালয়ের কার্য্য বিভিন্ন প্রণালীতে নানা নতুন শাখাপ্রশাখার বিভক্ত হইয়া দ্রুতগতিতে বাড়িয়া উঠিতেছিল ... **১৯১৭** খ্রীষ্টাব্দে কাশী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের সংশ্লিষ্ট একটি নতুন শাখা বিদ্যালয়ের পত্তন করেন ... **১৯১৯** খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা শহরে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ঐরূপ আরেকটি শাখা স্থাপন ও তাঁহারই চেষ্টার ফলস্বরূপ।"

(৪) সারদা বিদ্যালয় (মাদ্রাজ):

১৯১২ সালে মাদ্রাজের ইগমোরে ভগিনী সুব্বালক্ষী ও তাঁর মাসি ভালাম্বাল আম্মাল এই দুই বালবিধবা আরো চারজন বিধবাকে নিয়ে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিধবা আশ্রম ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়। **১৯২৭** সালে ভগিনী সুব্বালক্ষী সারদা লেডিজ ইউনিয়ন গঠন করেন এবং সেই বছরেই তিনি বারোজন বিধবাকে নিয়ে মাদ্রাজের ত্রিপ্লিকেনে একটি ভাড়াবাড়িতে বিদ্যালয়ের সূচনা করেন।এখানে মেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হবার মত প্রশিক্ষণ পেত। বিদ্যালয়টির মাধ্যমে ছাত্রীরা যাতে নিজেদের জীবনধারনের প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হত। বিদ্যালয়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে এটি শহরে বিভিন্ন

ভাড়াবাড়িতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ১৯৩৮ সালে ভগিনী সুব্বালক্ষী বিদ্যালয়টিকে রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে যুক্ত করার আবেদন জানান। শেষপর্যন্ত ১৯৩৮ সালে মিশন কর্তৃপক্ষ এই বিদ্যালয়ের নাম ও আদর্শ অক্ষুন্ন রেখে এর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের পরিধি আরো সম্প্রসারিত হয়। এরপর এই প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়টির তিনটি বিভাগের সূচনা ঘটে - ক. Higher Elementary Senior খ. Junior এবং গ. Preparatory মহালক্ষী স্ট্রীটে আদর্শ Elementary বিদ্যালয়টি প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় রূপে পরিচিত হয়। এর পাশাপাশি সভার পরিচালনায় Elementary বিদ্যালয়টি চলতে থাকে।ছাত্র বিদ্যালয় থেকে ছাত্রীর অংশটিকে আলাদা করে ১৯৪০ সালে সারদা মিশনের অধীনস্থ করা হয়।

(৫) মাতৃমন্দির (মাদ্রাজ):

ব্যাঙ্গালোরে ভেঙ্কটরমন নামে একজন ভদ্রলোক স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর দুই কন্যা শিক্ষার ভার নিতেন ভগিনী নিবেদিতাকে অনুরোধ করেন।এর উত্তরে ভগিনী সুধীরা (২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১০) লেখেন -এরকম মেয়েদের এখানে থাকার জন্য প্রয়োজন শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর বাড়ির লাগোয়া একটি বাড়ি ও আরেকজন রক্ষণশীল হিন্দু মহিলা, যাঁর তত্ত্বধানে তারা থাকবে।

১৯১১ সালে সারদা দেবী দক্ষিণভারত ভ্রমণকালে ব্যাঙ্গালোরে উপস্থিত হন। সেখানে ভেঙ্কটরমন সকন্যা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর কন্যাদের শ্রী শ্রী সারদা মায়ের তত্ত্বধানে রাখার অনুরোধ জানান। ঐ দুইজন মেয়েকে কেন্দ্র করে মাদ্রাজে 'সারদা মাতৃমন্দির' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণভারতে ভবিষ্যতে একটি পূর্ণাঙ্গ মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্যে স্বামী সর্বানন্দ ঐ দুইকন্যাকে আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান মনস্থ করেন।এজন্য রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি কন্যাদ্বয়কে কলকাতায় প্রেরণের অনুমতি চান।তাঁর নিরন্তর প্রচেষ্টা এবং সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মিশন কর্তৃপক্ষের অনুমতি এলে (অক্টোবর, ১৯১৭) দুইবোন প্রায় চারবছর কলকাতায় শ্রীমায়ের কাছে থেকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করে।

(৬) মহিলা হাসপাতাল (বারাণসী):

কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ ভগিনী নিবেদিতা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ভগিনী সুধীরাকে একদিন প্রশ্ন করেন, সুধীরা এখানে সেবাশ্রমে ছেলেরা রুগিনীদের সেবা করেন। সেকাজের জন্য তুমি একটি মেয়ে পাঠাতে পার না?" এই প্রস্তাবেই কাশী সেবাশ্রমের পৃথক মহিলা হাসপাতালের অঙ্কুর নিহিত ছিল।১৯১৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে সুধীরা, সরলা নামক বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে ডাফরিন স্কুলে ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তি করেন। ১৯১৭ সালে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় এবং সরলা তাতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

১৯১৯ সালে ভগিনী সুধীরা সরলাকে কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে নিয়ে যান মূলত মহিলা রুগীদের সেবা করা এবং কয়েকটি মেয়েকে (বিশেষত বিশ্বেশ্বরী নামক মেয়েটিকে) অসুস্থের শুশ্রুষা করার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। আবার শ্রীমার জীবনের অন্তিম দিনগুলিতে এবং মায়ের ভ্রাতুস্পুত্রী রাধুর সন্তান সম্ভাবনাকালীন সময়ে সেবার ভার তিনি স্বয়ং নেন। সুতরাং সরলা নামক এই মেয়েটির শিক্ষা সেসময় যথেষ্ট উপযোগী ছিল । ১৯৪৮ সালে রামকৃষ্ণ মিশনকর্তৃপক্ষ বারাণসী হাসপাতালের সম্পূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব নিলেও মহিলা বিভাগের আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ছিল পুরোপুরি মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত।

১৯৩১ সালে সরলা এবং প্রফুল্লমুখী দেবী কাশীতে 'সারদা কুটির'স্থাপন করেন,যাতে এরপর থেকে তাঁরা সেখানে স্বাধীনভাবে থাকতে পারেন অর্থাৎ এটি ছিল স্ত্রীমঠের নামান্তর। এই 'সারদা কুটির' নির্মাণের কৃতিত্ব একান্তই সরলার এবং প্রফুল্লমুখীর (নিবেদিতা বিদ্যালয়ের আরেক ছাত্রী)। কারণ সারদা কুটির নির্মাণে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল তা এসেছিল মূলত সরলার মাধ্যমে।কলকাতা থাকাকালীন শরৎ মহারাজ তাঁকে ভক্তদের বাড়িতে সেবার নিমিত্ত পাঠাতেন, এর বিনিময়ে ভক্তরা যে পরিমাণ অর্থ দেন তা দিয়ে দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতেন এবং সঞ্চয়ও করতেন।এই সঞ্চিত অর্থ দিয়েই 'সারদা কুটির' স্থাপন।

মূল্যায়ন:

তৎকালীন সমাজ সংস্কারকদের মত নারীজাতির উন্নতিকল্পে কোন সংস্কার প্রর্বতন বা মহিলাদের ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত না করলেও নারীর সামাজিক অবস্থানের একটি ধারণা দেন যেমন নারীকে মাতৃভাবে

সাধন, স্ত্রী, পতিতা নির্বিশেষে সকল নারীর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি।অন্যদিকে বিবেকানন্দ মনে করতেন কোন আইনের মাধ্যমে নারী অবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়, সমাজের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনেই তা সম্ভব।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ সমাজ তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল।এই ভাবাদর্শের প্রসারকে অনেকে 'আন্দোলন' রূপে অভিহিত করেন। তবে 'আন্দোল' প্রসঙ্গে বলা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ কোন আন্দোলনের স্বঘোষিত নেতা ছিলেন না এমনকি কোন ছকেঁ বাধা কর্মসূচী তাঁরা নেননি। তাসত্ত্বেও তাঁদের বাণী ও আদর্শকে পাথেয় করে যে প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছিল তা একাধারে শাশ্বত ও বর্তমান যুগোপযোগী মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিল। এর পাশাপাশি এই সংগঠনগুলি সমাজের প্রান্তিক নারী তথা অবহেলিত শিশুরা উপকৃত হয়েছিল। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ যেমন মি: ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ এবং ড: সুমিত সরকার ও ড: সালাহউদ্দিন আহমেদ রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী ও রক্ষণশীল বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা এই ভাবাদর্শকে ভারতীয় সমাজের হিন্দুধর্মবাদী প্রবণতা বা 'Dynamic force' হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন, যদিও এর প্রত্যাশিত সাফল্য মেলেনি। বিবেকানন্দ হলেন সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি সমাজের সকল স্তরে সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য গৃহত্যাগ করেন। নাম্বুদ্রিরিপাদ বলেছেন বিবেকানন্দের উদ্দেশ্য ছিল মূলত হিন্দুধর্মের প্রচার কিন্তু পরিণতিতে দেখা যায় বিদেশী শাসক কর্তৃক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন ভারতীয় সংস্কৃতি বা আত্মাকে তিনি জাগিয়ে তোলেন।[৩৪] মুসলিম সমাজের বেশকিছু মানুষ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে প্রভাবিত হন। যেমন মৌলবী দূরনেশ পীর এবং সৈয়দ ওয়াজিদ আলি যিনি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আন্দোলনকে 'mass movement' রূপে অভিহিত করেন এবং আরও বলেন- Quite distinct from the elitist movement of Rammohan Roy and Syed Ahmed Khan. বাস্তবিক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের সমাজসেবার বিষয়টি তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

এছাড়া আরেকটি দিক দিয়ে এই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শগত সংগঠনগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ যে সময় এই আদর্শের আর্বিভাব ঘটে ভারতে তখন সমাজ সংস্কারের প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি বা ভাবধারার অন্ধ অনুকরণ করেননি। পাশ্চাত্য পদ্ধতি ব্যতীত সম্পূর্ণ ঐতিহ্যগত বা দেশীয় পদ্ধতিতেও যে সমাজসংস্কার সম্ভব- তাঁরা মূলত এদিকটিকেই তুলে ধরেছেন। কোন ভাবাদর্শ তথা আন্দোলনের প্রসারের মাপকাঠিতে তাঁর গুরুত্ব বিচার করা যায় না। কোন পরিস্থিতিতে সেই ভাবাদর্শের উদ্ভব বা সমাজের তার প্রাসঙ্গিকতা ঠিক কতটা- তার ভিত্তিতে ঐতিহাসিক বা গবেষকগণ বিচার করে থাকেন। উনিশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধে সমাজসংস্কারকগণ যখন প্রচলিত কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে নারীশিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, তখন অন্যদিকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ তথা এর সাংগঠনিক আদর্শ নারীকে স্বনির্ভর ও সাবলম্বী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। এইপর্বের প্রতিষ্ঠানগুলি মূলত নারীদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাতেই গড়ে উঠেছিল।তাই নারীজাতি সমস্যার সমাধান নারীরাই করবেন স্বামীজীর এই বাণীর প্রকৃত বাস্তবায়ন ঘটেছিল এর মাধ্যমেই।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. বসু, স্বপন ও চৌধুরী ইন্দ্রজিৎ, উনিশ শতকে বাঙালী জীবন ও সংস্কৃতি, কলকাতা: পুস্তক বিপনী,
২. দাশগুপ্ত, সান্তনা, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ জীবনদর্শন ও সমাজ দর্শন, কলকাতা: মানসী প্রেস, ১৯৯২
৩. গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ কথামৃত, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৩
৪. দেবী, দূর্গাপুরী, গৌরী মা. কলকাতা: সারদেশ্বরী আশ্রম, ১৯৩৯ (বঙ্গাব্দ ১৩৪৬)
৫. দাস, সুস্মিতা, বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলন এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৯
৬. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ই জানুয়ারী, ১৯৯৫
৭. নিবোধতে পত্রিকা, পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৯৭
৮. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, নিবেদিতা লোকমাতা খন্ড, ১, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৬৮

৯. স্বামী সারদানন্দ (সম্পাদিত). নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়, বিবেকানন্দ পুরস্ত্রীশিক্ষা ও মাতৃমন্দিরের বার্ষিক বিবরণী, বাগবাজার: রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

১০. নিবেদিতা বিদ্যালয় শতবর্ষ স্মারক পত্রিকা ১৮৯৮-১৯৯৮ সিস্টার নিবেদিতা গালর্স স্কুল: রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, ১৯৯৮

১১. প্রব্রাজিকা অশেষপ্রাণা, অনন্যা সুধীরা, দক্ষিনেশ্বর: রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, ২০১৩

১২. Ali, S, Wajid Bengalees of Tomorrow. Calcutta: Das Gupta Publisher, 1945

১৩. Forbes, Geraldine, Women in Modern India: New Cambridge

১৪. History of India. Vol. 4, Cambridge: Cambridge University Press, 1996

১৫. Mukherjee, Jayasri, Ramakrishna Vivekananda Movement: Impact of Indian Society and Politics (1893 - 1922). Calcutta:

১৬. Nambudripad, E.M.S. A History of Indian Freedom Struggle. New Delhi: Social Scientist Press, 1977

১৭. Pravrajika, Atmaprana, My India, My People - Sister Nivedita. New Delhi: Ramakrisna Sarada Mission, 1985.

১৮. Sister Nivedita, Hints on National Education. Vol.2, Calcutta: Udbodhan Office, 1923

১৯. Gambhirananda, Swami, History of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission.

২০. Calcutta: Advaita Ashrama, 1957

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1223-1229
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.123

বিতর্কের 'কষ্টিপাথরে' 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সুরজিৎ চক্রবর্তী, *গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 21.04.2025; Accepted: 24.05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The skill and expertise that Ramananda Chatterjee (1865-1943) showed in editing magazines ranging from 'Dasi', 'Pradeep', 'Dharmabandhu' to 'Prabasi' and 'The Modern Review' is astonishing and rare in the world of Indian Journalism. The infinite patience he tested in editing the Bengali periodical 'Prabasi' (1901) is instructive for today's 21st century. Respect for work, patient mentality and perfect professionalism in editing– these were the main Key door of the Ramananda Chatterjee's editing technique. He got respect, prestige and fame in editing 'Prabasi'. Ramananda Babu's field of work was not always smooth. Like the sudden appearance of clouds in a clear sky, many such controversies have been circulating in Ramananda Chatterjee's editorial career. Four topics, like, Controversy over financial rewards for writers, Controversy over the release of the play 'NatirPuja', debate with the 'Vichitra', and Debate with Chittaranjan Das have been raised from such numerous controversies. Did Ramananda Babu himself, the 'expatriate' of Ramananda Babu's devotion, get away from those controversies, or did those controversies remain unanswered? This article is written with the desire to examine some such historical events, the 'stone of contention' of controversial controversies.

Keywords: 'Parabasi', 'Natir Puja', Sarala Devi, 'Vichitra'

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩) 'দাসী', 'প্রদীপ', 'ধর্মবন্ধু' থেকে শুরু করে 'প্রবাসী' পত্রিকা সহ 'মডার্ন রিভিউ'-এর পত্রিকা সম্পাদনায় যে দক্ষতা, তথা পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন তা ভারতীয় সম্পাদনার জগতে বিস্ময়কর এবং একইসাথে বিরল। বিশেষ করে, বাংলা সাময়িকপত্র 'প্রবাসী'(১৯০১) সম্পাদনায় তিনি যে অসীম ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিয়েছিলেন তা আজকের একুশ শতকের কাছে শিক্ষণীয়। 'সাময়িকপত্র বহু লোকের সমবেত উদ্যমে জীবিত'[১] থাকে—একথা জোরের সাথে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও জানিয়ে গেছেন 'বঙ্গদর্শন'-এর 'নবপর্য্যায়'-এ (১৯০১) সম্পাদন-'সূচনা'তেই। প্রবাসে থাকা রামানন্দবাবু সেটা বুঝতে পেরেছিলেন ভালোভাবেই। তাই, তিনি 'সম্পাদকের কার্য্যকে শিক্ষক বা অধ্যাপকের কার্য্য অপেক্ষা কম পবিত্র ও দায়িত্ত্বপূর্ণ' বলে মনে করেননি[২] কখনও। তাই, নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশে তিনি কখনই উদ্যোমহীন হননি। কাজের প্রতি শ্রদ্ধা, ধৈর্য্যশীল মানসিকতা এবং সম্পাদনায় নিখুঁত পেশাদারিত্ব—এই ছিল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা প্রকৌশলের ইউপিএস। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা-জীবনে নানান সময়ে হাজির হয়েছে অনেক ঘটনা, যাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ঘটনাচক্রে এমনই অসংখ্য বিতর্ক-অনুষঙ্গ থেকে চারটি প্রসঙ্গ তুলে আনা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। রামানন্দবাবুর সাধের 'প্রবাসী' তথা, রামানন্দবাবু স্বয়ং সেই বিতর্ক থেকে অব্যহতি পেয়েছিলেন, না কি উত্তরহীন হয়েই থেকে গেছে সেইসকল বিতর্ক? এমনই কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহকে, বিতর্কিত অনুসঙ্গের 'কষ্টিপাথরে' যাচাই করার বাসনাতেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

লেখককে আর্থিক সম্মাননা প্রদান প্রসঙ্গে বিতর্ক:

লেখার জন্য লেখকদের কি কোনও আর্থিক সম্মান-দক্ষিণা থাকা উচিত? রবীন্দ্রনাথের বিদূষী ভাগিনেয়ী 'ভারতী'-সম্পাদিকা সরলা দেবীর এ ব্যাপারে স্পষ্ট মত ছিল- না। লেখার বিনিময়ে লেখকদের টাকা না দিতে বদ্ধ-পরিকর সরলাদেবীর মতে, সরস্বতীর বাণিজ্য দিয়ে লক্ষ্মীলাভের চেষ্টা করা ঠিক নয়। এ নিয়ে তাঁর সজ্ঘাত 'প্রবাসী'-র সঙ্গে সরাসরি ঘটে নি যদিও। বিবাদ বেধেছিল খোদ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই। লেখার জন্য 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সেই সময় তিনশো টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে এবং তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন সানন্দে।

'ভারতী' পত্রিকার ৫০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সেই পত্রিকায় রামানন্দবাবু এবং প্রবাসী নিয়ে এই বিষয়ে মন্তব্য করে লেখা হলো—

> ''সরস্বতীর কমলবনে তাঁর চরণমধুলোলুপ হওয়াই তাঁহারা (পূর্বের সম্পাদকেরা) আত্মনিবেদন করিয়াছেন। লক্ষ্মীর কোপগ্রস্ত হইয়াছেন, তথাপি নিজেকে বিকান নাই।... 'ভারতী'র সেবা জীবিকার অবলম্বন করেন নাই।''[৩]

উক্ত সংখ্যায় সম্পাদিকা সরলাদেবী এটাও লিখলেন,

> ''প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাসিক-পত্র-জগতে সেই ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তন করেন।... 'বাল্মিকী প্রতিভা'র কবিকেও সরস্বতীর বিনাপণের মহল হইতে ছুটাইয়া লক্ষ্মীর পণ্যশালায় বন্দী করিয়াছেন। এখন অনেকে রামানন্দের গতানুগতিক।''[৪]

উল্লেখ্য, এই পত্রিকাটির দীর্ঘায়ু কামনা করে 'শুভেচ্ছা'বার্তাও[৫] দিয়েছিলেন বৈশাখ সংখ্যায় রামানন্দবাবু। এখানে আরও একটা বিষয় উল্লেখ করার, 'প্রবাসী' সেই বছরেই পঁচিশ বছরে পদার্পণ করেছিল। 'ভারতী'-র পাতায় শুভেচ্ছা থাকার পাশাপাশি, 'প্রবাসী'-র পঁচিশ বছরে প্রকাশিত লেখকদের বক্তব্য যে 'অত্যুক্তি-অমূলক' দোষে দুষ্ট—সেই বিষয়ে খোঁচা[৬] দিতেও ছাড়েন নি 'ভারতী'-সম্পাদিকা। 'প্রবাসীর প্রতিপত্তি' নিয়েও সরলাদেবী বক্তব্য রেখেছেন। বিশেষভাবে, 'প্রবাসী'-র ব্যবসায়িক পন্থাকে 'ভারতী'-সম্পাদিকা আক্রমণ করেন। আক্রমণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকেও বিঁধতে ছাড়েন নি। লেখার জন্য টাকা নেওয়ার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ছিল সরলার বিপরীতে। লক্ষ্মী তাঁর 'লেখনীর উপর স্বর্ণবৃষ্টি করলে' তিনি মোটেই দুঃখিত হবেন না, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের মত। ফলে সরলার এই বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হলেন তিনি। তখনই কিছু বললেন না। ১৩৩৩ সালের আশ্বিনের 'সবুজপত্র'-এ সরলার লেখার কঠোর সমালোচনা করলেন।

সকলেই জ্ঞাত যে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা নীতিতে প্রথম থেকেই লেখকদের আর্থিক সম্মাননা প্রদানের প্রসঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। সম্পাদক রামানন্দবাবু তা করতেন। রবীন্দ্রনাথ (২১জুলাই ১৯২৬ তারিখে লিখিত প্রবন্ধে) 'প্রবাসী' সম্পাদকের পক্ষে 'সবুজপত্র'-এ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে আশ্বিন সংখ্যায় (পৃ ৬-৭) লেখেন-

> ''প্রবাসী-সম্পাদক যদি সেদিন আমাকে অর্থমূল্য দিতে পেরে থাকেন, তবে তার কারণ এ নয় যে, তিনি ধনবানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার কারণ এই যে, ন্যায্য উপায়ে পত্রিকা থেকে লাভ করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। তাতে কেবল যে তাঁর সুবিধা হয়েছে তা নয়, আমারও হয়েছে; এবং এই সুবিধা দেশের কাজে লাগাতে পেরেছি।''[৭]

রবীন্দ্রনাথের উক্ত লেখায় স্পষ্টত 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দবাবুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আরও লেখেন-

> ''প্রবাসী-সম্পাদক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার প্রবন্ধের মূল্য দিয়েছিলেন। মাসিকপত্র থেকে এই আমার প্রথম আর্থিক পুরস্কার।...কিন্তু অর্থই ত একমাত্র আমুকূল্যের উপায় নয়। প্রবাসী সম্পাদক সর্বদা তাঁর লেখার দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা মমত্বের বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা বিশ্বভারতীর যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। আমি নিশ্চিত জানি সেই আনুকূল্য দ্বারা তিনি আমার অতিপীড়িত আয়ুকেও রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন।''[৮]

এই একই লেখায় রবীন্দ্রনাথ কতটা 'প্রবাসী'-সম্পাদককে 'রক্তসম্পর্কগত আত্মীয়ের চেয়ে' কম করে যে দেখেন নি, বরং বেশি করেই দেখেন—তা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেছেন।

'সূর্য' রবীন্দ্রনাথ, 'বালি' চিত্তরঞ্জন দাশ !:

রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্ব মানবতার কথা প্রচার করছেন। বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভাবকে বিশ্ববাসীর কাছে পৌছে দিচ্ছেন লেখায়-কথায়। ১৩২৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তীক্ষ্ম জোরাল ভাষায় রবীন্দ্রনাথে সমালোচনা করলেন।

> "সূর্যের চেয়ে বালির তাপ বেশী, আমাদের দেশে এই সব নকল পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এত বশী যে তাহাদের কোন মতকে কিছুতেই কণ্ডন করা যায় না। এমন কি যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলকে সত্য করিবার কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ এখন—স্যার রবীন্দ্রনাথ এবার আমেরিকায় ঐ মতটি খুব জোরের সঙ্গে জাহির করিয়াছেন।"[৯]

এর প্রত্যুত্তরে রামানন্দবাবু 'প্রবাসী'-তে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪-তে প্রথম পাতায়[১০], 'আসল পণ্ডিত ও নকল পণ্ডিত অথবা সূর্য ও বালি' শীর্ষক লেখাটি লেখেন। লেখাটিতে রামানন্দবাবু দেখিয়েছেন চিত্তরঞ্জন দাশ যাঁর বিরোধিতা করেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথকে আকন্ঠ গ্রহণ করেছেন অজান্তেই। একটু ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতেই লেখেন সূর্য কে, বালি কে! এটা মনে রাখা দরকার, চিত্তরঞ্জন দাশ সেই সময়ে জাতীয় রাজনীতিতে অনেক বেশি ওজনদার ব্যক্তি। তবুও নির্ভিক রামানন্দ পিছপা হন নি চিত্তরঞ্জন বিরোধিতা করেতে।

'নটীর পূজা' নাটক প্রকাশকে নিয়ে বিতর্ক:

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের গভীর স্তরে প্রথম চির ধরে ১৯২৬ সালে। ওই বছর রবীন্দ্রনাথে সঙ্গে রামানন্দবাবুর সম্পর্কের মধ্যে মান-অভিমান কাজ করে। কারণটা, 'বসুমতী'-তে রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' প্রকাশ-সংবাদ। উল্লেখ করেত হয়, 'নটীর পূজা' 'বসুমতী'-তে বৈশাখ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় বিশ্বভারতী থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে। মাসিক পত্রিকা হিসেবে 'বসুমতী'র আবির্ভাব ১৯২২ সালে। পত্রিকাটিতে রবীন্দ্রনাথ যে খুব নিয়মিত লিখেছেন এমন কিন্তু নয়। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু লেখা এতে প্রকাশিত হয়, যার মধ্যে উল্লিখিত 'নটীর পূজা' উল্লেখযোগ্য। বসুমতীর সঙ্গে যাঁদের সখ্য গভীর ছিল তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরুচির অনেক পার্থক্য ('রক্ষণশীলতা ও হিন্দুভাবাপন্নতা') ছিল বলে অনেকে মনে করেন।। তবে উক্ত পত্রিকায় 'নটীর পূজা' ছাপানোর জন্যে রবীন্দ্রনাথকে ৬০০ টাকা পত্রিকাটির পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। তাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি কিছুটা মনক্ষুণ্ণ হন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ৯ মে ১৯২৬-এ রবীন্দ্রনাথকে কিছুটা অনুযোগের, কিছুটা অভিমানের স্বরেই বলেন-

> "আমি আপনার লেখা পাইবার জন্য কখনও কাড়াকাড়ি করি নাই। আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে অনেক অনুগ্রহ করিয়াছেন... কিন্তু কাল রাত্রে শান্তিনিকেতনে আহারের পর শুনিলাম যে, 'নটীর পুরস্কার' নাটিকাটি 'বসুমতী'-কে ছাপিবার জন্য ৬০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।... ছয়শত টাকা দিতে সম্ভবতঃ আমিও পারিতাম।"[১১]

উল্লেখ্য সেই সময়ে 'প্রবাসী'-তে 'গোরা' উপন্যাসটি কিস্তিতে কিস্তিতে প্রকাশিত হতে থাকে। উল্লেখ্য 'মুক্তধারা' নাটকটি প্রকাশের সময়েও রামানন্দবাবু বিশ্বভারতীর শর্ত ('ছাপানোর অধিকারের জন্যে ১২৫০টাকা নগদ এবং ৩৭৫০ খানি মুক্তধারা বিশ্বভারতীকে' দেওয়া) মেনে তা প্রকাশ করেন। এখানে মনে রাখা দরকার, বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের রামানন্দবাবুর মতে, "যদিও উহা নামে মাত্র, কাজ প্রায় autocraticallyই হইয়া থাকে"[১২] প্রতিষ্ঠা হয়েছে জুলাই ১৯২৩ সালে। ১৯২২ সালে রবীন্দ্ররচিত সকল বাংলা বইয়ের স্বত্ব বিশ্বভারতীকে দেওয়া হয়। ফলে, রামানন্দবাবু সব শর্ত মেনে পূর্বোক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন প্রাতিষ্ঠানিক শর্ত মেনেই। কিন্তু তার বিনিময়ে 'পুরস্কার' তেমন পেলেন না বলেই মনে করছেন রবীন্দ্রানুরাগী রামানন্দবাবু। উক্ত চিঠিতেই তীব্র অভিমান ('সম্পাদকী অহং!'[১৩]) শব্দবন্ধে ধরা পড়েছে-

> "আপনার নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই, যে, আপনি অতঃপর আমাকে বাংলা বা ইংরেজী কোন লেখা দিবেন না। আমি জানি, আপনার লেখা না পাইলে আমার কাগজ দুটির গৌরব হ্রাস পাইবে। কিন্তু অতঃপর আপনার লেখা গ্রহণ করা আমার পক্ষে উচিত হইবে না।"[১৪]

এর উত্তর রবীন্দ্রনাথ পরের দিনই অর্থাৎ ১০ মে ১৯২৬-এ দিলেন। সম্পর্কের এই টানা পোড়েনে রবীন্দ্রনাথও যে ভালো ছিলেন এমন নয়। বরং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা তার এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্পর্শকাতর অথচ সংযত। তিনি লিখলেন-

> "আমাকে ভুল বুঝবেন না, বুঝলে অন্যায় হবে। কারণ প্রবাসীর প্রতি মমত্ব ও আপনার প্রতি শ্রদ্ধাবশতই আমি অনেক কঠিন বাধার সঙ্গে লড়াই করে এসেচি।...আমার লেখা কোনো কোনো অবস্থার দুর্ব্বিপাকে পণ্য দ্রব্য হয়ে ওঠে—কিন্তু যখনি সে কথা ভোলবার সুযোগ পাই আমি তো নির্ব্বিচারে স্বচ্ছন্দচিত্তে আপনাকেই পাঠিয়ে দিই—এটুকুর জন্যেও ত আপনার কাছে বিচার দাবী করতে পারি—দোকানদারও নিজের দোকানের জিনিষ আত্মীয়কে উপহার দিতে পারে। যখন আপনার কাছ থেকে টাকাও পেয়েছি তখনো সে টাকাকে আমি মূল্য বলে মনে করি নি।"[১৫]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী'-র প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে দুর্বলতা ছিল, তা এই বিরোধ-মধ্যবর্তী সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অভিমানে রবীন্দ্র-রামানন্দ এই দুইজনের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল ঠিক কথা, কিন্তু সেই দূরত্বে দুজনেই যে ভালো ছিলেন না তা বলাই বাহুল্য। ১৯২৭ সালের ২রা জুলাই, রবীন্দ্রনাথ লিখলেন রামানন্দবাবুকে-

> "যখনি এই উপন্যাস লিখতে বসেচি তখনি আমার মনে হয়েচে প্রবাসীর জন্যে একটা উপন্যাস লিখতেই হবে। অর্থোপার্জ্জনের জন্যে নয়, এতকাল বিরুদ্ধতার ভিতর দিয়েও প্রবাসীর প্রতি (আপনার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার খাতিরেই) যে মনোভাব পোষণ করে এসেচি সেইটেকে রক্ষা করবার জন্যে।"[১৬]

আসলে সেই সময়ে নতুন নতুন বাংলা সাময়িকপত্রের আবির্ভাব ঘটছে। পাশাপাশি, নিজস্ব ঘরানায় প্রকাশিত পাঠকের কাছে প্রিয় 'প্রবাসী' তখন নতুন এক প্রতিযোগিতার সংকেতও পাচ্ছে। বিশেষ করে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তৈরি হওয়া দূরত্ব যেন সেই কথাই স্পষ্ট করে দিচ্ছে। সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মনমানসিকতা কি তখন প্রতিযোগিতা মূলক ধ্যানধারণা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে? তাহলে কেন, রবীন্দ্রনাথকে এতটা আঁকড়ে থাকার প্রবল প্রয়াস? মুক্তমনা, মায়াবিমুখ রবীন্দ্রনাথকে বাঁধতে চাওয়ার প্রবল চেষ্টা এক সম্পাদকের! বিস্মিত হতে হয়।

বিতর্কে 'বিচিত্রা' ও 'প্রবাসী':

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরে 'আষাঢ়ের প্রথম দিবসে—মন্দাক্রান্তা ছন্দে'[১৭] 'বিচিত্রা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আষাঢ় ১৩৩৪-এ বের হয়। 'কল্পনা এবং বাস্তবের উভয় লোকে 'বিচিত্রা' কাঁচা কলমের কাজ করলে তার অস্তিত্ব সার্থক হবে।'[১৮] বলে শুরুর কথা বললেও, পাতা ওল্টালে বোঝা যায়, প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্র-সুবাসে পূর্ণ। পত্রিকাটির সূচনায় রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে লেখা 'বিচিত্রা' কবিতাটি ছাপা হয়। এছাড়া এই সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথেরই 'নটরাজ' প্রকাশিত হয়। উল্লেখ করার মতন বিষয়, শ্রাবণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'[১৯], 'সাহিত্য-ধর্ম্ম'[২০] প্রকাশ হবে বলে বিজ্ঞাপনও দেন 'বিচিত্রা'-সম্পাদক। এছাড়া 'প্রবাসী'-র 'বিবিধ প্রসঙ্গ' অনুকরণে 'বিচিত্রা'-য় থাকলো 'বিবিধ সংগ্রহ'। 'আশ্বিনে রবীন্দ্রনাথের নুতন উপন্যাস আরম্ভ হইবে'[২১] বলে পরের সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। আশ্বিন ১৩৩৪ থেকে রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি ('তিনপুরুষ' নামে) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এককথায় 'প্রবাসী'-র প্রতিপক্ষ এক পত্রিকা হয়ে উঠতে থাকে বলা যায়! 'নটরাজ' প্রকাশ নিয়ে তো রীতিমত প্রতিযোগিতা দেখা গিয়েছিল। 'বিচিত্রা' সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'স্মৃতিকথা'-তে লিখছেন-

> "একটি সমসাময়িক মাসিকপত্রিকার কর্তৃপক্ষ সেটি অধিকার করবার চেষ্টা করছিলেন। ছ শো টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক দেবার প্রস্তাব করে তাঁরা ইতস্তত করেছিলেন অবগত হয়ে আমরা একেবারে এক সহস্র টাকার একখানি চেক নিয়ে গিয়ে 'নটরাজ' হস্তগত করি"[২২]

এই সকল ঘটনাক্রমকে কেন্দ্র করে 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যে বিশেষভাবে বিচলিত হয়েছেন বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কতকটা অপ্রসন্ন হলেন। তিনি মনে করলেন, 'বিচিত্রা' ইত্যাদি পত্রিকা 'প্রবাসী'-কে 'crush' করবার জন্যেই পরিকল্পনা ('ষড়যন্ত্র'!) করেছে। 'তারা ষড় করে

ভেঙে ফেলতে চাইছে 'প্রবাসী'-র 'রবীন্দ্র-মনোপলি'।'[২৩] যদি রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর আর একটি চিঠির (৩০ জুন, ১৯২৭) দিকে তাকানো যায়, দেখা যাবে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মানসিক অস্থিরতার চিত্র-

> ''একটি নতুন সচিত্র মাসিক কাগজ বাহির হইয়াছে। উহা অন্য সব পুরাতন সচিত্র মাসিকের ন্যায় প্রবাসীরও rival। অধিকন্তু মৌখিক ইহা রটিত হইয়াছে, যে উহা প্রবাসীকে crush করিবে। এইরূপ কাগজে আপনার লেখা অধিক পরিমাণে বাহির হইলে তাহা হইতে যাহা অনুমান হয়, লোকে তাহাই করিবে।''[২৪]

এই অস্থিরতা আরও প্রকাশ পাবে চিঠির পরের অংশে। তিনি যে রবীন্দ্রনাথের থেকে আর কোনও লেখা চাইবেন না, দেখাও করবেন না কবির সঙ্গে—এরূপ প্রতিজ্ঞা করে ফেলছেন। তিনি অনুগ্রহও চান না, সমালোচনার তীরও নিক্ষেপ করতে অপারগ। উভয় সংকটে প্রবাসী-র সম্পাদক। 'সকল দিক্ দিয়া আমার কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, স্থির করা কঠিন।'[২৫] চিঠিটিতে একদম শেষে পুনশ্চ অংশে রামানন্দবাবু দৃঢ় বলিষ্ঠ এক সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন কবিকে-

> ''প্রবাসীর ভাদ্র সংখ্যা হইতে আমি আপনার লেখা হইতে বঞ্চিত থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম।...প্রবাসী crushed হয় কি না, তাহার experiment টা সম্পূর্ণ সন্তোষজনকরূপে হইয়া যাওয়াই ভাল।''[২৬]

'বিচিত্রা' পত্রিকা হিসাবে কিন্তু সেই সময়ে যথেষ্ট কদর পেয়েছিল। 'প্রবাসী'-র মতন প্রথম সারির কুলীন পত্রিকাকেও ভাবতে হয়েছিল এই 'নবজাত পত্রিকা'কে নিয়ে। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম এবং প্রধান ইচ্ছে ছিল তাঁর কল্পনার কাগজকে তিনি বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির একটি কাগজে পরিণত করবেন। সেকারণে তাঁর 'বিচিত্রা'-র পরিচালন কমিটিতে রেখেছিলেন অমল হোমের মতো মানুষ, যিনি কলকাতার 'বেঙ্গলি', লাহোরের 'পাঞ্জাবী', এলাহাবাদের 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট', এবং পরে 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এর সম্পাদকও হয়েছিলেন। ভারতী-প্রবাসী-ভারতবর্ষ-যমুনা-সবুজপত্র-কল্লোল প্রভৃতি প্রায় ২৭টি মতো পত্রিকার যুগে 'সমাগত রাজবদুন্নতধ্বনি' শোনা গেল।[২৭] সুচারু মুদ্রণ, চারু রায়ের শোভন প্রচ্ছদ, নন্দলাল বসুর চিত্রসম্ভার যেমন ছিল তেমনই মূল্যবান কাগজে মূল্যবান লেখকদের রচনাও সজ্জিত থাকত 'বিচিত্রা'-য়। কড়া টক্কর দিয়েছিল 'প্রবাসী'-র মতন প্রথমসারির পত্রিকাকেও।

'প্রবাসী'-র মতন 'বিচিত্রা' পত্রিকা নানা বিভাগে সজ্জিত থাকত। নানা নামে। 'পুস্তক পরিচয়', 'পট ও মঞ্চ' (যা পরবর্তীকালে 'সিনেমা সমাচার'/'চিত্রপট' নামেও প্রকাশিত হত। উল্লেখ্য এই বিভাগের পরিচালনার ভার ছিল বাণীনাথের। এখানে 'গোরা', 'চোখের বালি', 'বড়দিদি' সহ একাধিক সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণের খবরাখবর থাকত। শেষে থাকত 'নানাকথা' নামে একটি বিভাগ। এই বিভাগে বিভিন্ন সংবাদ থাকতো। চিত্রশিল্পীদের পরিচয়, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, রামকৃষ্ণদেব সহ প্রমুখ ব্যক্তিদের খবর থাকত। পত্রিকাটির উল্লেখযোগ্য বিভাগ ছিল 'বিতর্কিকা'। এটি দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই প্রকাশ পেত। এখানে সাহিত্যের নানা বিতর্ক উত্থাপিত হত। সেখানে রবীন্দ্রনাথ, সজনীকান্ত দাস, শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বিতর্কের কেন্দ্রে থাকতেন।[২৮] এছাড়া, গ্রন্থাগার আন্দোলন 'বিচিত্রা'র একটি উল্লেখযোগ্য দিক বলা যেতেই পারে। এইরকম একটি নূতনের আগমনে 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কি 'অশনি সংকেত' দেখলেন? এটা আরও স্পষ্ট হতে পারে, একটি পরিসংখ্যান দেখতে পেলে। ১৩২৯ সাল থেকে 'প্রবাসী'-র ছাপা সংখ্যা[২৯] ৭৫০০। আবার, ১৩৩৪ বৈশাখ সংখ্যায় যদি প্রথম সারির পত্রিকার প্রচার সংখ্যা দেখা যায়, দেখবো, 'প্রবাসী'-র সেই সময়ে প্রচার সংখ্যা ৮০০০; 'ভারতবর্ষ'-র প্রচার সংখ্যা ১১০০০; আর 'বিচিত্রা'-র প্রচার সংখ্যা সেখানে ১৩০০০। উল্লেখ করার মতন বিষয় প্রতিটি পত্রিকার দাম তখন আট আনা। এমনও হয়েছে, বাংলা র পাঠকসমাজকে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিচিত্রা' যে ষড়রত্নের (বিভূতি-মানিক-অন্নদাশঙ্কর-অমিয়চন্দ্র-চারুচন্দ্র-নারায়ণ) উপহার দিয়েছিল, তা খুব কম কাগজই দিতে পেরেছিল। 'যোগাযোগ', 'পথের পাঁচালী', 'পথে-প্রবাসে' একই সঙ্গে প্রকাশ হচ্ছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পও বের হচ্ছে।

পূর্বোক্ত বিতর্ক-প্রসঙ্গগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে, জ্ঞানত কখনও অজ্ঞানত এসে পড়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সম্পর্কের রসায়নে একটি পত্রিকা, পত্রিকার সম্পাদক কতটা আবদ্ধ, তা রামানন্দবাবু এবং তাঁর 'প্রবাসী'-কে দেখলে অনুমান করা যায়। সুদীর্ঘ পত্রিকা-সম্পাদনাকালে (প্রায় চারদশকের অধিক) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে নানাজনের অসংখ্য বিষয়ে মতান্তর হয়েছে, মনান্তর হয়েছে। কখনও তাঁর প্রিয়জনের সঙ্গে, কিংবা কখনও দূরে থাকা কোনও

ব্যক্তির মন্তব্যে, আবার কখনও বা কোনও সাময়িকের সঙ্গে। কখনও তিনি সরবে সোচ্চারিত হয়ে প্রতিবাদ করেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কখনও সেই অপ্রাসঙ্গিক সমালোচনায় হিরণ্ময় নীরবতাকেই করেছেন হাতিয়ার। কখনও তাঁর প্রতিবাদে খুঁজে পেয়েছেন নিজের সুস্পষ্ট অবস্থান, কখনও বা সেই প্রতিবাদে পরবর্তীসময়ে ভ্রমিতও হয়েছেন। সংশয় প্রকাশ করেছেন নিজের প্রতিবাদ নিয়ে। সংশোধন করেছেন নিজেকে নির্দ্বিধায়। কষ্টও পেয়েও প্রকাশের আবিলতা তাকে ঘিরে ধরে নি কখনই। রবীন্দ্র-ব্র্যাণ্ডকে ব্যবসায়িক স্বার্থে অপপ্রয়োগের মতন অভিযোগে, কেউ যখন তুলনা টানেন 'আদিম জন্তুটার নাক নাই, কান নাই, শুধু লালাসিক্ত ক্ষুধা আছে।'[৩০] তখন সম্পাদক রামানন্দ সেইসকল বিষোদগার পান করেছেন অনায়াসে। এমন অসংখ্য প্রিয়জনের বিষোদগারে, হয়েছেন আহত, কিন্তু সেই আঘাতের ছবি আঁকেন নি তাঁর সৃজনে। তিনি সবসময় চেয়েছেন যেকোন সংশয় বা সমালোচনার সমাধানে পৌঁছাতে। 'বিতর্কের জন্য বিতর্ক'—এই পলিসিতে রামানন্দের না-পসন্দ। মধ্যে মধ্যে সাময়িকের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়েছেন নানা বিষয়ে, আবার নিজের পত্রিকায় 'কষ্টিপাথর'-এর মতন বিভাগও রেখেছেন, যেখানে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'ভারত মহিলা', 'নব্যভারত', 'কোহিনূর', 'প্রতিভা', 'মানসী', 'বিজ্ঞান', 'আর্য্যাবর্ত্ত', 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতী', 'উদ্বোধন' 'ভারতবর্ষ', 'গৃহস্থ', 'বিক্রমপুর', 'বিজয়া',. 'সবুজপত্র', 'নারায়ণী', 'কৃষক', 'উপাসনা', 'সৌরভ', 'প্রবর্ত্তক', 'নমশুদ্র', 'হিতৈষী', 'ভাণ্ডার', 'যমুনা', 'শিক্ষক', 'সুবর্ণ বণিক সমাচার', 'মৌচাক', 'ইতিহাস ও আলোচনা', 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', 'সন্দেশ', 'বিকাশ', 'বঙ্গবাণী', 'মাসিক বসুমতী', 'মাসিক মহম্মদী'-র মতন অসংখ্য নামী-অনামী পত্রপত্রিকাকে। তার যা কিছু ভালো, সমাজের জন্যে মঙ্গল তা প্রকাশ করেছেন উদারমনে। তাঁর দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ থেকে কলেজস্ট্রীটের বই প্রকাশক ভোলানাথ সেন ও তাঁর কর্মীদের (যে ভোলানাথ সেন ও তাঁর দুই কর্মীকে 'প্রাচীন কাহিনী' নামক পাঠ্যপুস্তকে মোহম্মদের ছবি ছাপানোর জন্যে দুজন পাঞ্জাবী মুসলমান হত্যা করে, রামানন্দবাবু সেই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেন এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তোলেন[৩১])—পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্পাদনা কার্যকে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছেন আজীবন। তবুও, শরৎচন্দ্রের মতন ঘটনাবহুল 'অস্বস্তিকর বিতর্ক' যেমন এসেছে, তেমনই বিখ্যাত নাটককার গিরিশচন্দ্র ঘোষ নিয়ে একপ্রকার নিবিড় নীরবতা বজায় রেখে বলেছেন-

> ''আমরা তাঁহার কোনও নাটক পড়ি নাই, বাংলা নাটকাভিনয় দেখিবার জন্য কোনো থিয়েটারেও কখনও যাই নাই।''[৩২]

এরকম কথা পণ্ডিত, বিদ্বান রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এই কথা যখন শোনা যায়, তখন খটকা লাগে পাঠকের। এত গভীর পাণ্ডিত্য, অথচ জানেন না বা দেখেন নি বা পড়েন নি! এখানেই ধাঁধা লাগে। খুব গভীর দৃষ্টিতে দেখলে, দেখা যাবে, এই রকম ক্ষেত্রে (যেখানে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অপছন্দ) তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ভাবনা বা আদর্শ, তাঁর কঠোর অনুশাসন অনেক বিতর্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই অনুশাসন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা কার্যকে স্পর্শ করতে পারে নি—এরকম বলা যাবে না। এখানে বিতর্কহীন থাকতে পারেন না রামানন্দবাবু। সময়ের গর্ভে জাত সেই বিতর্কের মূল্যবান কষ্টিপাথরে, বহুবিধ দ্বৈরথে সংশয়ে সন্দিহান রামানন্দ কখনও উত্তীর্ণ হয়েছেন, কখনও বা 'হেরে যাওয়া'র অভিমানে হয়ে উঠেছেন অসম্ভব অভিমানী। তবুও এককী-ই দাঁড়িয়ে কলম-পেশায় মেতে ছিলেন নিজে, পত্রিকা-পাঠে মাতিয়ে রেখেছিলেন আপামর বাঙালিকে। আর আজ কে না স্বীকার করে, প্রায় অর্ধশতাব্দী সময় ধরে ক্লান্তিহীনভাবে বাঙালিকে মনের রসদ জুগিয়ে গেছেন কে! বিতর্ক পিছু ছাড়ে নি তবুও। বিতর্কের শরশয্যায় থেকেও মহাভারতের পিতামহ ভীষ্মের মতনই নিজকর্মে থেকেছেন অটুট। নিজ বিশ্বাসে থেকেছেন প্রত্যয়ী।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (সম্পা), "সূচনা", 'নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন', ১৩০৮, বৈশাখ, পৃ ২

২. চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ, "সাময়িক সাহিত্যের কথা", পৌষ ১৩০৭, পৃ ১৭

৩. দেবী, সরলা (সম্পা), 'পঞ্চাশ বর্ষ', 'ভারতী', বৈশাখ ১৩৩৩, পৃ ২০০

৪. তদেব, পৃ ২০১

৫. চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ, 'শুভেচ্ছা', 'ভারতী', ৫০বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ ৮০

৬. দেবী, সরলা (সম্পা), 'ভারতী', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩, পৃ ৩৭১-৭২

৭. চৌধুরী, প্রমথ (সম্পা), 'সবুজপত্র', ১৩৩৩, আশ্বিন, পৃ ৬-৭

৮. তদেব, পৃ ৬-৭

৯. বসু, সোমেন্দ্রনাথ, 'সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ', টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ ১৭

১০. চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (সম্পা), 'প্রবাসী', জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ ,পৃষ্ঠা ১০৫

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'চিঠিপত্র', দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ ৩৬৬

১২. তদেব, ৬৭১

১৩. মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, 'কবি আর সম্পাদক : স্তরিত সম্পর্কের গহনতলে', রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সার্ধশতবার্ষিক স্মরণ, রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ ৭০

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'চিঠিপত্র', দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ ৩৬৭

১৫. তদেব, পৃ ৮৮-৮৯

১৬. তদেব, পৃ ১০৯

১৭. গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'আমাদের কথা', 'বিচিত্রা', আষাঢ় ১৩৩৪, পৃ ৮

১৮. ঐ

১৯. গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (সম্পা), 'বিচিত্রা', আষাঢ় ১৩৩৪, পৃ ৭২

২০. তদেব, পৃ ৭৭

২১. তদেব, পৃ ১৯৪

২২. গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'স্মৃতিকথা', চতুর্থ পর্ব, ডি.এম লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯, পৃ ১০৩

২৩. মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, 'কবি আর সম্পাদক : স্তরিত সম্পর্কের গহনতলে', রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সার্ধশতবার্ষিক স্মরণ, রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ ৭৩

২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'চিঠিপত্র', দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ ৩৭১

২৫. তদেব, পৃ ৩৭২

২৬. তদেব, পৃ ৩৭৩

২৭. রায়, প্রবীর, 'প্রবাসী ও বিচিত্রা : সাহিত্যের দুই কাণ্ডারী', 'কোরক সাহিত্য পত্রিকা', 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা', বইমেলা ২০১৫, পৃ ১৭৪

২৮. তদেব, পৃ ১৭৯

২৯. দেবী, শান্তা, 'ভারত-মুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা', প্রথম দেজ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১২, পৃ ৩৫১

৩০. দাস, সজনীকান্ত, "প্রসঙ্গ কথা", 'শনিবারের চিঠি', কার্তিক ১৩৪৮, পৃ ১৩৫

৩১. চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (সম্পা), 'প্রবাসী', আষাঢ় ১৩৩৮, পৃ ৪৩৪

৩২. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও প্রবাসী', দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৭, কলকাতা, পৃ ৪৭

ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-v, May, 2025, Page No. 1230-1238
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.125

কৈলাসবাসিনী দেবীর 'জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী': প্রসঙ্গ ঊনবিংশ শতকের 'নতুন' পরিবারভাবনা

সৌমী বসু, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 13.05.2025; Accepted: 14.05.2025; Available online: 31.05.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article attempts to explore the 'new' family-view and the inner quarters of an enlightened Hindu household in 19th century Bengal through the autobiographical narrative of Kailashbasini Devi (1829-1995). Kailashbasini was the wife of Kishori Chand Mitra (1822-1873), a writer, social reformer and civil servant in colonial Bengal, who was educated at Hindu College. His brother was the renowned novelist Peary Chand Mitra. By examining Kailashbasini Devi's autobiography, we delve into the domestics and conjugal lives of Kishori Chand and Kailashbasini, revealing the ethos of their family and the evolving 'new' family perspective of a western-educated young man. We analyze her narrative in the context of social history to understand why this memoir has become an essential document for studying the emergence of 'new' family-thoughts in 19th century Bengal.

Keywords: Nineteenth Century, Colonial Bengal, Hindu Household, Western-Educated Enlightened Man, 'New' Family-thoughts, Inner World of Family, Memoir of Women, Social History.

বর্তমান প্রবন্ধের মূল অভিমুখ কৈলাসবাসিনী দেবীর (১৮২৯-১৮৯৫) আত্মকথার প্রেক্ষিতে ঊনবিংশ শতকের বঙ্গদেশ, তৎকালীন সমাজ, নারী ও সমকালীন সময়ের পরিবারভাবনাকে অনুধাবন করার চেষ্টা। উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে আমরা বুঝে নিতে চেষ্টা করবো কেমন ছিল কৈলাসবাসিনীর জীবন! দেখবো উনিশ শতকের বাঙালি মেয়েদের নিয়ে সমাজপতিদের চিন্তাভাবনার পাশাপাশি তিনি নিজে কী ভাবে দেখছেন ক্রম বিবর্তিত সময়, সমাজকে। ঠিক কী ভাবছেন নিজেকে নিয়ে বা আদৌ কিছু ভাবছেন কি না! সময়ের উপকরণ হিসাবে চিহ্নিত আমাদের নির্বাচিত কৈলাসবাসিনী দেবীর আত্মকথা, কী ভাবে সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ঊনবিংশ শতকের 'নতুন' পরিবারভাবনাকে বুঝতে অপরিহার্য অভিজ্ঞান হয়ে উঠেছে, তা পর্যালোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কৈলাসবাসিনীর জন্ম সম্ভবত ১৮২৯-এ। স্থান রাজপুর। পিতা গোরাচাঁদ ঘোষ। দেশাচার মেনে মাত্র এগারো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয় প্রসিদ্ধ বাগ্মী, লেখক, সমাজ সংস্কারক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে। কিশোরীচাঁদের জন্ম ১৮২২-এর ২২ মে। পিতা রামনারায়ণ মিত্র; ছিলেন পরিশ্রমী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন এবং রামমোহন রায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু। মাতা আনন্দময়ী ও অগ্রজ সাহিত্যিক প্যারীচাঁদ মিত্র। বাল্যকালে হেয়ার স্কুল ও তৎপরবর্তীতে হিন্দুকলেজে শিক্ষালাভ কিশোরীচাঁদের মনকে করেছিল যুক্তিবাদী ও প্রসারিত। ডিরোজিওর ছাত্রবন্ধু অগ্রজ প্যারীচাঁদ মিত্র ও তাঁর সতীর্থ-সহপাঠী রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দে, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ 'ইয়ংবেঙ্গল'এর সান্নিধ্য কিশোরীচাঁদের মননকে গঠন করতে সহায়কের ভূমিকা

নিয়েছিল।[১] ১৮৩৫-এ ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন ও মেকলে মিনিটের ফলস্বরূপ বঙ্গদেশে তৈরি হওয়া একদল নব্য শিক্ষিত যুবক যাঁরা ইংরেজি শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে নবভাবনা ও নবচেতনার আলোকে বিবাহ ও দাম্পত্য সম্পর্ককে নতুন ভাবে সংজ্ঞায়িত করতে তৎপর হয়েছিলেন, কিশোরীচাঁদ মিত্র ছিলেন তাঁদেরই একজন এবং সেই পথ ধরেই কৈলাসবাসিনী দেবীর 'জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী'তে এক নারীর ভাষ্যে ব্যক্ত হয়েছে সমকালের প্রেক্ষিতে নারী-পুনর্গঠনের ইতিহাসও। প্রকাশিত হয়েছে চেতনার আলোকপ্রাপ্ত এক মহিলা কী ভাবে দেখছেন সমাজ, পরিবার ও 'আত্ম'কে!

কৈলাসবাসিনী দেবীর আত্মকথাটি 'গত যুগের জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী' শীর্ষকে ধারাবাহিক ভাবে প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের প্রথমেই। এর প্রায় ঊনত্রিশ বছর পরে ১৩৮৮ বঙ্গাব্দের শারদীয় 'এক্ষণ' পত্রিকায় 'জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী' নামে এটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। ডায়েরীর সূচনা হয়েছে ১২৫৩ সালের আষাঢ় মাস থেকে এবং শুরুতেই কৈলাসবাসিনী তাঁর সদ্যজাত পুত্রের মৃত্যুর খবর জানিয়ে বলেছেন পৌত্র হারিয়ে কীভাবে তাঁর শাশুড়ি ঠাকুরানী এবং পুত্র হারিয়ে তাঁর স্বামী বেদনায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর স্বামীর অগ্রজ শ্যামচাঁদ মিত্র; যিনি ষোল বছর বয়সে গতাসু হন তাঁর কথাও উল্লেখ করেছেন। কৈলাসবাসিনীর ডায়েরীর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হোল সাল-তারিখ এবং সময়ের উল্লেখ। এছাড়াও সমান্তরালে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী, যেমন নবাব সাহেবের মাতার এন্তেকাল, সিপাহী বিদ্রোহ কিংবা বিলাতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু প্রভৃতির উল্লেখ দেখা গেছে তাঁর ডায়েরীতে। উনিশ শতকের অন্তঃপুরিকা কৈলাসবাসিনীর জীবন যে কেবল অন্তঃপুরকেন্দ্রিক ছিল না বা তাঁর জানার-ভাবার-খোঁজ রাখার পরিধি যে কেবল 'খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার' অবধি ছিল না,তা বোঝা যায় উক্ত বিষয়গুলি থেকে।

দ্বারকানাথের মৃত্যুর সময় কৈলাসবাসিনী ছিলেন গর্ভবতী। গর্ভাবস্থায় বাড়িতে তাঁর প্রতি নেওয়া যত্ন প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,

> '...আমি বাটিতে রহিলাম চৈত্র মাসে আমার সাদ হল। আমার জারা সাদ দিলেন। আমি সবার ছোটো আমার আদর সবার কাচে।'[২]

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের সমাজে; যখন ধর্ম ও পরিবার কল্যাণের নামে দেশাচার বজায় রাখতে হিন্দু পরিবারের নারীকে জীবিতাবস্থায় সহমরণে-অনুমরণে পাঠানো ছিল স্বাভাবিক ঘটনাবলী, যখন কৌলীন্যপ্রথার ফলাফলে স্বামীর বহুবিবাহ নারীর জীবনকে করে তুলেছিল যন্ত্রনাদীর্ণ, সে সময় দাঁড়িয়ে হিন্দু পরিবারের কোন বধূ যখন শ্বশুরগৃহে নিজের প্রতি পরিবারবর্গের নেওয়া আদর-যত্নের উল্লেখ করেন তখন একবিংশ শতকের পাঠক হিসাবে আমাদের অত্যন্ত ভালো লাগে বইকি এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই পাশাপাশি স্মরণে আসে সারদাসুন্দরী দেবীর কথা; কেশব জননী সারদাসুন্দরী তাঁর আত্মকথায় প্রথম শ্বশুরবাড়ীতে এসে তাঁর ভীত-ত্রস্ত দৈনন্দিন জীবনের কথা ব্যক্ত করেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়।[৩] সারদাসুন্দরীর জন্ম ১৮১৯ সালে এবং দশ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। অপরদিকে কৈলাসবাসিনীর জন্ম ১৮২৯-এ। তাঁর বিবাহ হয় এগারো বছর বয়সে। অর্থাৎ প্রায় দশ বছরের তফাতেই যে কোন-কোন হিন্দু পরিবারের অন্দরমহলে এমন কিছু-কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছিল তা কিন্তু লক্ষ্যণীয়! সেকালের কলকাতার বিখ্যাত ধনী সমাজপতি দেওয়ান রামকমল সেনের বধূমাতা সারদাসুন্দরীর আত্মকথায় তাঁর শাশুড়ি ঠাকুরানীর বধূর প্রতি অকারণ আক্রোশের কিছু নমুনা মিললেও কৈলাসবাসিনীর আত্মকথায় কিন্তু তাঁর শিক্ষিত[৪] শাশুড়িমাতার তরফে এমন কো ন আচরণের উল্লেখ মেলেনি যদিও শিশু পুত্রের মৃত্যুর পর যদিও কৈলাসবাসিনীর দ্বিতীয় সন্তান কন্যা ভূমিষ্ঠ হলে তিনি দুঃখিত হয়ে বলে উঠেছিলেন, 'সোনা হারিয়ে কাঁচ পাইলাম।'[৫] স্পষ্টত বোঝা যায়, এটি পুরুষতান্ত্রিক ভাবনারই কণ্ঠস্বর। যে ভাবনার ফলাফলে পরিবারের উত্তরাধিকারী হিসাবে কেবল পুরুষেরা নয়, পরিবারের মহিলাদেরও প্রার্থিত থেকেছে পুত্রসন্তান। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় আসলে তার পরবর্তী বাক্যটি! কৈলাসবাসিনী লিখছেন,

> 'আমার স্বামি বড় আহ্লাদিত হইলেন। চিটি নিকিলেন তোমার একটি কন্যা হইয়াচে সুনে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা বর্ণনা জায় না। শ্রীশ্রীজগদিশ্বরের ইচ্ছাতে তুমি ভালো য়াছ ও

> আমার কন্যাটি ভালো আচে শুনে আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম। তুমি মনে কিছু দুঃখিত হও না। শ্রীশ্রীজগতপতির কাচে সব সমান। আমাদের কাচে সব সমান ভাবা উচিত।'(৬)

এই বয়ান ছিল উনিশ শতকের নব্য শিক্ষিত যুবকের বয়ান যাঁর কাছে বিবাহ-দাম্পত্য-সন্তান কেবলমাত্র ধর্মানুসারে শাস্ত্র নির্দেশিত ধর্মীয় কর্তব্য নয়, বরং দাম্পত্য সম্পর্ককে নতুন ভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল এই সময় থেকে।

গবেষক বিনয় ঘোষ উনিশ শতকের বঙ্গদেশে ইয়ংবেঙ্গলের 'বিদ্রোহ'-এর কারণ হিসাবে সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে পারিবারিক কাঠামো ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যের অসঙ্গতিকেই চিহ্নিত করেছেন। পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত তরুণ দল তাঁদের মানসলোকে যে নতুন সমাজ ও পরিবারের ছবিকে নির্মাণ করছিলেন তা বঙ্গদেশের আবহমান কাল ধরে চলে আসা পুরাতন অনুদার ঐতিহ্যবাহী রূপ নয়, বরং তা ছিল বিশ্বজনীন ও ব্যক্তিকৃতিমুখী।(৭) কিশোরীচাঁদ মিত্র ছিলেন হিন্দু স্কুলের ছাত্র ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁর মানসিক উন্নতিবিধান হয়েছিল স্বয়ং ডেভিড হেয়ার ও ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসনের প্রযত্নে, অগ্রজ প্যারীচাঁদ তথা ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর সাহচর্য তিনি লাভ করেছিলেন। তাঁর সতীর্থদের মধ্যে ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, মধুসূদন দত্ত প্রমুখেরা। এহেন কিশোরীচাঁদের মানসিক গড়ন যে কিছু ভিন্ন প্রকৃতির হবে তা বলাই বাহুল্য। নব্য শিক্ষিত যুববৃন্দ বঙ্গদেশে আবহমান কাল ধরে চলে আসা দেশীয় কাঠামোর বিপরীতে যে একটা 'নতুন' পরিবারভাবনাকে নির্মাণ করার চেষ্টা শুরু করেছিলেন এবং এই নতুন পরিবারভাবনার কেন্দ্রে ছিল নারী ও নারীর পুনর্গঠন। অন্তঃপুরের অন্ধকার থেকে বের করে নারীকে আলোর সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা। তাকে 'গড়ে তোলা' নিজের 'যোগ্য' সহধর্মিণী হিসাবে। তাঁরা চাইছিলেন এই নবভাবনায় নির্মিত পরিবারগুলো কেবল আর কর্তব্য ও নৈতিকতার বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে না, বরং পরিবারই হয়ে উঠবে জীবন বিকাশের আধার। আত্মকথায় কৈলাসবাসিনী লিখছেন ১২৫৪ সনের ৭ই বৈশাখ তাঁর কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে, অনেকেই পরবর্তী পুত্রসন্তান হওয়ার ঈঙ্গিত দেন অথচ কিশোরীচাঁদ আর কৈলাসবাসিনী সারাজীবন একমাত্র কন্যা সন্তান কুমুদিনীর পিতা-মাতা হয়েই থেকে গেলেন। কিশোরীচাঁদের ছেলের সখের কথা কৈলাসবাসিনী নিজে লিখলেও পুত্রসন্তানের আশায় তৃতীয়বার গর্ভধারণ করতে বাধ্য হননি কৈলাসবাসিনী। বরং দেখা যায় তাঁরা প্রতীক্ষা করেছেন এবং পরবর্তীকালে কন্যা কুমুদিনীর পুত্রসন্তান হলে সেই দৌহিত্রকে সোহাগে জড়িয়ে পুত্রসন্তানের শূণ্যস্থান পূরণ করেছেন এই দম্পতি। এপ্রসঙ্গে মনে আসে বাংলা ভাষার প্রথম আত্মজীবনীকার রাসসুন্দরী দাসীর কথা; যিনি তাঁর জীবনের আঠেরো থেকে একচল্লিশ দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে পৌনঃপুনিক ভাবে কেবল সন্তানের জন্মই দিয়ে যেতে বাধ্য থেকেছেন। 'আমার জীবন'-এ তাঁর মাতৃত্বকালীন এই পর্ব, যা সম্পর্কে রাসসুন্দরী লেখেন,

> '...ইহার মধ্যে ঐ ২৩ বৎসর আমার যে কি প্রকার অবস্থায় গত হইয়েছে তাহা পরমেশ্বর জানিতেন, অন্য কেহ জানিত না...'(৮)

এই বাক্যের গূঢ়ার্থ ও অন্তর্নিহিত দীর্ঘশ্বাস সংবেদী পাঠককে মনস্তাপই দেয়।

কন্যা সন্তানের প্রতি অসীম যত্ন ও পুত্র সন্তানের জন্য আকুতির পাশাপাশি কৈলাসবাসিনী ডায়েরী প্রকাশ করেছে উনিশ শতকের পরিবারগুলির অস্বাস্থ্যকর সূতিকাঘরের চিত্র। পারিবারিক বিত্তসম্পদের প্রাচুর্য যে সূতিকাঘরের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার বদল ঘটাতো না, তা প্রকাশ পেয়েছে কৈলাসবাসিনীর প্রতি ছত্রে...

> 'আমাদের জে শূতিকাগার তাহা এক প্রকার গারোদ ঘর। জদিও আমি বড় নকের কন্যা, বড় নকের বৈউ, বড় নকের স্ত্রী তথাপি সেই সামান্য নকের মতন থাকিতে হইবে। নামোর ঘর জল উঠিতেছে, তার উপর দরমা মাদুর কম্বল পাড়া একটি বালিস এই বিচানার সঙ্গে। খাওয়া ঝাল ও চিঁড়া ভাজা। ধোপা নাপিত বন্দ। পোয়াতির এই দুরাবোস্থা। ও দিকে দাই নাপিত বাজোনদার হিঝিরে অবাবিরদার। কিন্তু পআতিকে জে বিছেনা দিলে ফেলা জাবে সেইটে বড় বাজে খরচ।' (৯)

গর্ভাবস্থায় যে বধূ পরিবারের কাছে আদরযত্ন পেয়েছেন, সূতিকাঘরের প্রসঙ্গে তাঁরই লেখায় উল্লিখিত এই 'বাজে খরচ' শব্দদ্বয়ের অভিঘাত কিন্তু আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। আমরা বুঝতে পারি কৈলাসবাসিনীর তাঁর জা-শাশুড়িমাতা সকলের কাছ থেকে প্রাপ্ত ভালবাসা, যত্ন একদিকে আর পরিবারের অর্থনৈতিক খরচের হিসাব একদিকে! তখনো নারী স্বয়ং অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জায়গায় উপনীত হয়নি, তাঁর হাতে পরিবারের অর্থনৈতিক ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারও আসেনি। ফলাফলে পরিবারের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ যিনি করতেন, অর্থাৎ পরিবারের 'কর্তা', যিনি অবশ্যম্ভাবী ভাবে পুরুষও বটে, তাঁর ভাবনায় সূতিকাঘরের শয্যাসামগ্রীর জন্য খরচ অপচয়ই বটে। কেননা সেই শয্যাসামগ্রীর তো আর পরবর্তী ব্যবহৃত নেই! আমরা বুঝতে পারি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা, যা পরবর্তী উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বঙ্গের নব্য পরিবারভাবনায় একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিচার্য হবে, তখনো অবধি সে বিষয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ শুরু হয়নি। অন্তঃপুর ও আঁতুড়ঘরের অপরিচ্ছন্নতার প্রসঙ্গে আমাদের মনে আসবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীর পত্র'-এ মৃণালের পত্রে উল্লিখিত সাহেব ডাক্তারের বাড়ির অন্দর দেখে আশ্চর্য হওয়া এবং আঁতুড়ঘর দেখে বকাবকির ঘটনা। কিশোরীচাঁদ মিত্রের পরিবারে প্রসূতি নারীকে ইংরেজ ডাক্তার দেখানোর উল্লেখ মেলে নি বটে, কিন্তু প্রবাসী স্বামীর কর্মস্থল রামপুরে গিয়ে অসুস্থ কৈলাসবাসিনী যে ইংরেজ ডাক্তার বেডফোর্ট সাহেব, নেলর সাহেব প্রমুখের কাছে চিকিৎসা করিয়াছেন তার উল্লেখ মেলে আত্মকথায়। আমরা বলতে পারি, প্রসূতি মায়ের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে সূতিকাঘরের পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেওয়ার আবশ্যকতা, এই সচেতনতা কৈলাসবাসিনীর বিজ্ঞানসম্মত চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ; যা উনিশ শতকের বেশিরভাগ নারীর তথা পরিবারগুলিতে তখনো তৈরি হয়নি। এখানেই কৈলাসবাসিনী আলাদা হয়ে যান। স্বামী কিশোরীচাঁদের তত্ত্বাবধানে তিনি কেবল অক্ষরজ্ঞানসম্পন্না হননি, বরং শিক্ষার আলোকে তিনি ধারণ করেছিলেন এবং দৈনন্দিন জীবনে সেই শিক্ষার প্রয়োগ বিষয়েও তিনি ছিলেন যথেষ্ট সচেতন আর এই সচেতনতার বোধই কৈলাসবাসিনীকে স্বতন্ত্র করে দেয় ঊনবিংশ শতকের অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে।

সম্পূর্ণ ডায়েরীজুড়ে প্রকাশ পেয়েছে কিশোরীচাঁদের সঙ্গে কৈলাসবাসিনীর গড়ে ওঠা এক অপূর্ব দাম্পত্যের ছবি। কন্যা হওয়ার সংবাদ পেয়ে কিশোরীচাঁদ চিঠি দেন এবং অপেক্ষা করেন স্ত্রীর কাছ থেকে উত্তরের। কিন্তু সূতিকাঘরের 'গারোদে' অবরুদ্ধ কৈলাসবাসিনীর পক্ষে তা সম্ভব হয়ে না উঠলে কিশোরীচাঁদ লেখেন,

> '...তুমি কি নিষ্ঠুর তুমি কি নির্দয়, আমি কেলেস পেলে তুমি য়েতো শুকি হও তাহা আমি এতোদিন জানিতাম না। তোমাকে আমি ফি চিটিতে অনুরোদ করি এক নাইন নিকিতে তাহা তুমি নেকো না। কিন্তু আমি আর তোমাকে চিটি নিকিবো না। আমি বড় ভাবিত হইলাম, জদি দুই কি তিন দিন চিটি না নেকেন তা হলে মরে জাবো। কি করি সুতিকা পুজোর দোত ও কলম ছেলো তাইতে নিকিলাম।'(১০)

প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীর জন্য প্রবাসী স্বামীর এই উচাটন, এই অভিমানাহত স্বর, স্বামী-স্ত্রীর এইভাবে একে-অন্যের সঙ্গে লগ্ন থাকা বঙ্গদেশের দাম্পত্য জীবনে ছিল নতুন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, নতুন শিক্ষা ও ভাবনায় শিক্ষিত-উদ্বুদ্ধ নব্যযুবকদের কাছে বিবাহ আর কেবল শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্য বা দেশাচার পালনেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং বিবাহ সম্পর্কের নতুন বয়ান উনিশ শতকে তৈরি হচ্ছিল তাঁদের হাতে। আর তাই স্ত্রীর কাছে কিশোরীচাঁদের চিঠিতে প্রকাশিত পুরুষকণ্ঠ 'স্বামীপ্রভুর' ভাষা নয়, বরং বলা যায় এই ভাষা সেই প্রেমিকের যে একাধারে স্বামীও। রাসসুন্দরী তাঁর আত্মকথায় 'যে লোকের অধীনী হইয়া একাল পর্যন্ত দিবস গত' করার চিত্র প্রকাশ করেছিলেন, তার থেকে কিশোরীচাঁদের ছবি ছিল সম্পূর্ণত বিপরীতধর্মী। বড় অল্প সময়ের হলেও দাম্পত্যের মাধুর্য্যমাখা ছবি কেশজননী সারদাসুন্দরীর আত্মকথাতেও মেলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সারদাসুন্দরীর স্বামী দেওয়ান রামকমল সেনের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন সেনও ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র।

'স্বাধীনতা' বা 'মুক্তি'র আস্বাদ উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি অন্তঃপুরিকাদের যাপনচিত্রে এক্কেবারে অচেনাই। ইউরোপীয় শিক্ষার সঙ্গে পরিচিতিকরণের ফলাফলে নব্যশিক্ষিত যুবকদল অন্দরের সঙ্গে বাহিরকে

পরিচিত করার চেষ্টা করেন, স্বাধীনতার বৃহত্তর অর্থ তখনো অধরা ছিল মেয়েদের কাছে। কৈলাসবাসিনীর ডায়েরী থেকে আমরা লক্ষ্য করি তিনি কিন্তু 'স্বাধীনতা' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন একাধিকবার। তাঁর উল্লিখিত এই 'স্বাধীনতা'র স্বরূপের দিকে যদি আমরা দৃষ্টি দিই তাহলে দেখবো, তা ছিল অন্তঃপুর থেকে বাইরে যাওয়ার এবং বাইরের লোকজনের সঙ্গে আলাপ করার অধিকার। 'শব্বোদা আমোদ আহ্লাদে' থাকা কৈলাসবাসিনী তাই সুখী ছিলেন, তুষ্ট ছিলেন। স্বামীর কর্মস্থলে গিয়ে বাস করা কৈলাসবাসিনীর জীবন ছিল তাঁর নিজের কাছে 'স্বাধীন'; যদিও কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর স্ত্রীকে কেবল নীলমণি বসাক ও ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাসা ভিন্ন আর কোথাও পাঠাতেন না। অর্থাৎ, অন্তঃপুর থেকে বাহিরপথে পদ সঞ্চালনার ক্ষেত্র ছিল সীমিত এবং কতখানি যাওয়া হবে তাও ছিল নিয়ন্ত্রিত কিন্তু 'অই স্বাধীনতায় তুষ্ট' ছিলেন কৈলাসবাসিনী। কেননা, নিজের মতো করে এইটুকু জীবনও তখন অন্তঃপুরিকাদের ছিল কই! পাথুরিয়াঘাটার মোহিতকুমারীর স্মৃতিকথায় দেখি বাড়ির উঠোন দেখার অধিকারটুকুও তাঁর ছিল না। সেটুকু যেদিন তিনি দেখতে পেতেন সেটাই তাঁর কাছে হয়ে উঠতো কিছু পরম পাওয়া। এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে কৈলাসবাসিনী 'স্বাধীন' ছিলেন বইকি! কিশোরীচাঁদের কর্মস্থলের অন্যান্য দেশীয় ব্যক্তিবর্গের স্ত্রীদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ইচ্ছে হলে কখনো নদীতে স্নান করতে যাওয়া, মেমসাহেবের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা, স্বামীর সঙ্গে নৌকাবিহার, তাস খেলা... এমন জীবনের সঙ্গে দেখা তো তৎকালীন সব মেয়ের হয়নি।

উনিশ শতকের মেয়েদের জীবনে তীর্থযাত্রা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আসলে মনযোগী পাঠে বোঝা যায় যে এই যাত্রাগুলিই রক্ষণশীল পরিবারের 'পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গী'সম নারীদের কাছে ছিল একফালি মুক্ত আকাশ। উনিশ শতকের নারীমুক্তি বা নারীপ্রগতির পথে নারীর দেশ-বিদেশ ভ্রমণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল; যা শুরু হয়েছিল ১৮৬৯-৭০ থেকে। কিন্তু তার আগে শ্বশুরগৃহ থেকে পিত্রালয় গমণ বা আত্মীয়বাড়ি ভ্রমণ, গঙ্গাস্নানে যাওয়া, মন্দির দর্শন মূলত এগুলোই ছিল নারীর বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিতিকরণের একটুকরো অবকাশ। কিন্তু এই তীর্থযাত্রাও নেহাত সহজসাধ্য ছিল না সেকালের মেয়েদের কাছে কেননা পরিবারতন্ত্রের গোঁড়ামি, নারীর সামগ্রিক পরাধীনতা ও আর্থিকভাবে শ্বশুরকূলের উপর নির্ভরতা সে পথকেও যে সর্বদা সুগম করেনি তার বাস্তবচিত্র দেখা গেছে কেশবজননী সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথায়। কিন্তু কৈলাসবাসিনীর ক্ষেত্রে এধরণের পারিবারিক বিপত্তি আসেনি বরং তাঁর শাশুড়িমা নিজেই তাঁকে কাশী নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেন। পারিবারিক ভাবে এমন তীর্থস্থানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কৈলাসবাসিনীর পূর্বেও হয়েছিল। তাঁর নিজের বয়ানে...

> 'এইবার দেকিতে দেকিতে জাচ্চি। আর প্রথমবার শাশুড়ি রাকিতে গেচেলেন, তাহাতেও দেকেচিলুম। কিন্তু তাতে দুই ভাশুর শঙ্গে ছেলেন, আর পুত্র শোক শঙ্গে ছেল, এই কারণ ভাল করে দেকি নাই। এবারে মনের শাধে দেখিলাম...।'(১১)

বাড়ির অধিকাংশ নারীদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় কৈলাসবাসিনীর ডায়েরী জুড়ে ব্যক্ত হয়েছে নির্মল আমোদ-আহ্লাদ। স্বামীর সঙ্গে নানা স্থানে ঘুরে বেড়ানো কৈলাসবাসিনীর জীবন ছিল সুমধুর। তাঁর কণ্ঠে বেদনা ধ্বনিত হয়েছে তখনই, যখন তিনি স্বামীকে কাছে পেতেন না। কাজের সূত্রে কিশোরীচাঁদ মফস্বলে গেলে কৈলাসবাসিনী 'রবিনশেন কুরুষের মতন' থাকতেন...

> 'খেতুম শুতুম বই পড়তাম শিল্প কর্ম্ম করিতাম। আমার কন্যাকে শেকাতেম, আর এই বই নিকিতেম। আর কবে আশিবেন দিন গুনিতাম। য়েলে জেন বাচিতাম।'(১২)

কৈলাসবাসিনীর আত্মকথার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হোল, সেকালের একাধিক খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছেন কোন না কোন পৃষ্ঠায়; যেমন- প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দে, নীলমণি বসাক, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। কিশোরীচাঁদ মিত্রের মায়ের যে টুকরো-টুকরো ছবি প্রকাশ পেয়েছে তিনি এমন মায়ের মতো বলেই মনে হয়েছে যিনি কন্যা ও বধূমাতাকে সম স্নেহ ও সম্মান দেন। এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মহিলা সেকালে বিরল বটে! স্বামী ও শ্বশুরবাড়িতে বধূর এই

আদর-যত্ন-সম্মান কৈলাসবাসিনীকে একদিকে যেমন করেছে গরবিনী এবং অপরদিকে তাঁর ব্যক্তিত্বকে করেছে মজবুত ও 'আত্ম'বোধকে করেছে প্রখর।

কিশোরীচাঁদ ও কৈলাসবাসিনীর দাম্পত্যের ছবিই এই ডায়েরীর অন্যতম সুমধুর বিষয়। কৈলাসবাসিনীর ব্যক্ত নানাবিধ ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর স্বামী তাঁকে ছেড়ে থাকতে কীভাবে অপারগ ছিলেন! কিশোরীচাঁদের কর্মস্থলেই মূলত থাকতেন তাঁর স্ত্রী। শ্বশুরবাড়িতে তাঁর যাওয়া ছিল উৎসব-অনুষ্ঠান-লৌকিকতা পালনে। প্যারীচাঁদের বড় মেয়ের বিবাহে কৈলাসবাসিনীর যাওয়া নিয়ে তিনি যে ঘটনাবলীর উল্লেখ তিনি ডায়েরিতে করেছেন তা কিশোরীচাঁদের একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেমেরই নিদর্শন বলা চলে। এমন করে সযতনে সসম্মানে সেকালে স্ত্রীকে খুব অল্প পুরুষই রেখেছিলেন। পাশাপাশি মনে পড়বে 'আমার জীবন'-এ রাসসুন্দরীর সন্তাপ। স্বামীর ও পরিবারের অসুবিধা হবে বলে তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী মা কে দেখতে অবধি যেতে পারেননি তিনি। নিত্যদিনের সুবিধায় কিঞ্চিৎ অসুবিধা হবে বলে তাঁকে যেতে দেওয়া হয়নি। কী অপার বেদনায় ভরে উঠেছে রাসসুন্দরীর কলম একথা বলতে গিয়ে। অথচ এমন নয় যে রামদিয়া গ্রামের সরকার পরিবার কিছু কম বিত্তবান ছিল, এমনও নয় যে অন্দরমহলের জন্য পরিচারিকা নিয়োগ করা যেত না! বাহিরমহলে জনা বিশের বেশি পরিচারক থাকলেও অন্দরমহল পরিচারিকাশূণ্য থেকেছে অথচ সারাদিন একাহাতে কী পাহাড়প্রমাণ পরিশ্রম রাসসুন্দরীকে করতে হোত, তার সবিশেষ তথ্য মেলে 'আমার জীবন'-এ। দাম্পত্য নিয়ে রাসসুন্দরীর মিত উচ্চারণ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের কাছে 'লজ্জাশীলতা' মনে হলেও আমাদের তা মনে হয় না। বরং মনে হয় 'বলার মতো' আদৌ কিছু ছিল কি; যা যুগ যুগ ধরে চলে আসা হিন্দু সমাজে স্বামী-স্ত্রীর ছবি থেকে আলাদা কিছু? আমাদের মনে হয়েছে, নিজেদের দাম্পত্য সম্পর্কে কিছু গতানুগতিক কথা বলার কোন উৎসাহ রাসসুন্দরী অনুভব করেন নি। আলাদা কিছু বলার মতো হলে তিনি নিশ্চয়ই বলতেন, যেমন বলেছেন অন্যান্য কথা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতেই হয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা; যিনি বিলাতে বসে স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে রাশি-রাশি চিঠিতে নারীপুরুষের দাম্পত্যের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে আলোকিত করেছেন। বোঝানোর চেষ্টা করছেন, কীভাবে একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠা সম্ভব। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি দাম্পত্য সম্পর্কে যৌথতার একটা নতুন বয়ান নব্যশিক্ষিত যুবাদের হাত ধরেই বঙ্গীয় সমাজে ক্রমশ তৈরি হতে শুরু করেছিল।

কিশোরীচাঁদ যথার্থ অর্থেই পত্নীকে সহধর্মিনীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন কৈলাসবাসিনীকে 'স্ত্রীজনোচিত শিক্ষায়' সর্বদিক থেকে পারদর্শী করে তুলতে। নিজে শেখাতেন ইংরেজি, মিস টুগোড সাপ্তাহিকভাবে এসে শেখাতেন লেখাপড়া ও সেলাই, এছাড়াও ঘরের গুরুর কাছেও হোত লেখাপড়া। সংবাদ প্রভাকর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নিত্য পাঠিকা ছিলেন তিনি। কিশোরীচাঁদের সঙ্গে নানা স্থানে ঘুরে বেড়ানোর ফলে নিত্যনতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ তো চলতই। প্রতিনিয়ত ভিতর থেকে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠা কৈলাসবাসিনী তাই হয়ে উঠেছিলেন উনিশ শতকের নারীদের সাপেক্ষে এক অনবদ্য বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। তখন সমাজ ছিল মূলত একান্নবর্তী পরিবারের আওতাভুক্ত। সেই সময় শ্বশুরবাড়ি ব্যাতিরেকে বধূ স্বামীর কর্মস্থলে বাস করবে পরিবারের তরফে এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট প্রগতিশীল; কেননা সময়কাল তখন ১২৫৩বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ইংরেজির ১৮৪৬-৪৭ সাল। দীর্ঘদিন নানা স্থানে বদলি হওয়ার পর অবশেষে কিশোরীচাঁদ যখন কলকাতায় বদলি হয়ে এলেন তখন বঙ্গাব্দের হিসাবে ১২৬১ সালের আষাঢ় মাস তথা ইংরেজির ১৮৫৪। পৈতৃক বাড়িতে দিন পনের থাকার পরে কিশোরীচাঁদ চিৎপুরে গঙ্গার ধারে বাসা বাড়ি ভাড়া করেন মাসিক ৯০টাকা ভাড়ায় এবং স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে সেখানে চলে আসেন। কলকাতায় অবস্থান করেও একান্নবর্তী পরিবার ছেড়ে একক পরিবার তৈরির সিদ্ধান্তে পারিবারিক মনান্তরের কোন খবর কৈলাসবাসিনীর ডায়েরীতে মেলে না। ব্রাহ্মরা একান্নবর্তী পরিবার থেকে সরে একক পরিবার শুরু করেন ১৮৬০-৭০এর দশকে (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী জোড়াসাঁকোর একান্নবর্তী পরিবার থেকে দূরে গিয়ে একক পরিবারে থাকা শুরু করছেন ১৮৬৪তে) অথচ কিশোরীচাঁদ মিত্ররা পারিবারিকভাবে ব্রাহ্ম ছিলেন না। কিন্তু তথ্য বলছে তিনি একক পরিবার গঠন করেছেন ব্রাহ্মদেরও খানিকটা আগে। এই ঘটনাগুলি আসলে বঙ্গদেশের যুবক-যুবতীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের

বিকাশ ও 'নতুন' পরিবারভাবনার সঙ্গেই সম্পৃক্ত; যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি প্রকৃষ্ট রূপ ধারণ করেছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছিলাম নব্য শিক্ষিত তরুণ দল যে পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলতে চাইছিলেন তা এতদিনকার ঐতিহ্যিক সমাজ ও পরিবার কাঠামো থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। কৈলাসবাসিনী ও কিশোরীচাঁদের পরিবার সেই নব পরিবারভাবনারই নির্মিতি বলে আমাদের মনে হয়।

একক পরিবারে অবস্থান করলেও আমরা তাঁর সংসারের অন্দরমহলের যে ছবি পাই তাতে দেখি রান্নার জন্য আছে ব্রাহ্মণ পাচক যদিও কিশোরীচাঁদ সব ধরণের খাবারই খান, এমনকি সাহেবদের সঙ্গে একত্রে বসেও তিনি আহার করেন। তবে কৈলাসবাসিনী পুরুষভৃত্যদের সামনে বের হন না, দিনে কোথাও গেলে পাল্কিতেই যাতায়াত করেন। রামগোপাল ঘোষের মা নিমন্ত্রণ করলে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে যান ঠিকই কিন্তু অন্নগ্রহণ না করে সাগু খান। সেই নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন ইয়ংবেঙ্গলের অন্যতম সদস্য রামতনু লাহিড়ীর স্ত্রীও এবং বাড়ি ফিরে কৈলাসবাসিনী স্বামীকে তিনি জানান লাহিড়ী বাবু সমস্ত দেশাচার ত্যাগ করেছেন। কৈলাসবাসিনীর আচরণে খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে হওয়া সঙ্গত যে তিনি ধর্মীয় নিয়মনীতিতে বিশ্বাসী একারণেই এসব মেনে চলেন। কিন্তু হিন্দুর লোকাচার নিয়ে কৈলাসবাসিনীর মতামত আমাদের যুগপৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত করে। তিনি জানাচ্ছেন,

> 'আমি হিন্দুয়ানি মানিনে, কিন্তু বরাবর খুব হিন্দুআনি করি। তার কারণ আমি যদি একটু আলগা দিই তাহলে আমার স্বামি আর হিন্দুয়ানি রাকিবেন না। হিন্দুরা হলেন আমার পরম আত্মীয়। তাঁদের কোন মতে ছাড়িতে পারিবো না, ইহা ভেবে আমি খুব হিন্দুয়ানি করি। আমার বড় ভয় পাছে আমার হাতে কেউ না খান, তাহলে কি ঘৃণার কথা, তার কর্তে মরণ ভাল। একে তো আমার স্বামি প্রকাশ্যে খান,এতে জদি আমি কিছু করি তা হলে একেবারে চূড়ান্ত।...'[১৩]

কেবল তা নয়, এরপর তিনি বলছেন, কিন্তু তিনি তাঁর এই অন্তরের কথা তাঁর স্বামীকে কখনোই জানাননি। কিশোরীচাঁদ শুনলে খুশি হতেন জেনেও জানাননি কেননা তাহলে বাড়ির ব্রাহ্মণ পাচক আর থাকবে না। কৈলাসবাসিনী বলেছেন, এক মেয়ের মা না হয়ে তাঁর যদি তাঁর স্বামীর ন্যায় চার-পাঁচ জন বিদ্বান পুত্রসন্তান থাকতো তাহলে তিনি তাঁর এই অবিশ্বাসকে নির্দ্বিধায় প্রকট করতে। বিস্মিত হই এই ভেবে এগার বছরের কৈলাসবাসিনী যখন বিবাহ করে কিশোরীচাঁদের কাছে এসেছিলেন তখন থেকেই তাঁর স্বামী তাঁকে সমাজ-সংসার-নিজের যোগ্য গড়ে তুলতে তৎপর ছিলেন। প্রতিনিয়ত তাঁর স্বামীর সেই চেষ্টায় সঙ্গে সঙ্গত করে নিজেকে দীপ্ত করে তুলেছেন। এবং চমৎকৃত হই এই ভেবে যে কতখানি গভীরভাবে সমাজ, সংসার ও পরিবারকে তিনি অনুধাবন করেছিলেন আর তাই-ই ব্যক্ত হয়েছে উপরোক্ত কথাগুলিতে। উনিশ শতকের 'নতুন' পরিবারভাবনার ডিসকোর্সে আমরা এভাবেই লক্ষ্য করি মানুষ নিজেকে ব্যক্তি হিসাবে যে ভাবে দেখছে এবং নিজেকে সমাজের সদস্য হিসাবে যেভাবে দেখছে, পরিবার আসলে তার মধ্যস্থতাই করছে। কৈলাসবাসিনীর বয়ানে সেই চিত্রই পরিস্ফুট হয়েছে আর প্রকাশ ঘটেছে তাঁর নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা এবং সুগভীর আত্মমর্যাদাবোধের। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের স্ত্রী তিনি, বিদ্বান-কর্মবীর স্বামীর সকল সামাজিক সম্মানের অংশীদার তিনি হলেও স্বামীর নিজস্ব বিশ্বাসের ভিতে গড়ে ওঠা জীবনযাপনের ফলস্বরূপ কোন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তাঁর কন্যা তথা সম্পূর্ণ পরিবারের উপর যাতে না পড়ে সেদিকে তিনি সদা সতর্ক থেকেছেন। সমাজ পরিবর্তনের দিনগুলিতে বাহির ও অন্দরের মধ্যেকার কঠিন লড়াইয়ে অন্তঃপুরিকা নারীর ভূমিকা যে কী, তা স্পষ্ট হয় কৈলাসবাসিনীর বক্তব্যে এবং শুধু তাই নয় স্বয়ং কিশোরীচাঁদও কখনো জানতে পারেন নি কৈলাসবাসিনীর বলা 'তোমার জিবনকে অবিশ্বাস' এই কথার অন্তর্নিহিত দ্যোতনা কতটা সুগভীর! কতখানি দৃঢ়তা থাকলে, কতখানি সুস্পষ্ট জীবনবোধ থাকলে এই বক্তব্য তুলে ধরা যায় তা অনুমেয়। কৈলাসবাসিনীর আত্মবোধের পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় কিশোরীলালের চাকুরি জীবনে সংকট এলে। বিনা দোষে তাঁর চাকরি খারিচ হলে কাতর স্বামীকে তিনি যে ভাবে আগলেছেন-সামলেছেন, তা লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন, তাঁর স্বামী তাঁকে যে সব শিল্পকর্ম শিখিয়েছেন প্রয়োজনে তার মাধ্যমেও তিনি উপার্জন করতে সক্ষম, তাই কিশোরীচাঁদ যেন কোন দুশ্চিন্তা না করেন। কোথাও এতটুকুও অসুবিধা দুজনের হবে না। অন্তঃপুরিকা গৃহবধূ যিনি

সারাজীবন স্বামীর আদরে-সোহাগে জীবন কাটিয়াছেন, বিত্ত ও সম্ভ্রান্ততার জীবনই যিনি কেবল দেখেছেন এবং তদুপরি উপার্জনশীল নারী তখনও সমাজে অনুপস্থিত, এমতাবস্থায় নিদারুণ অনিশ্চয়তার সামনে দাঁড়িয়ে স্বনির্ভর হওয়ার কথা বলা ও পরিবার প্রতিপালনে আর্থিকভাবে অংশগ্রহণ করতে চাওয়া সে সময় নারীর জন্য খুব সাধারণ বিষয় ছিল না। নিজে বিশ্বাস না করেও যে দেশাচার বজায় রেখে তিনি নিজের ও পরিবারের সম্মানে আঘাত আসতে দেবেন না সংকল্প নিয়েছিলেন, পরিবারের বিপাকে সেই দেশাচারকে সরিয়ে উপার্জনশীল হয়ে ওঠার মতো ব্যক্তিত্বও রাখতেন কৈলাসবাসিনী। আর তাই-ই কিশোরীচাঁদের 'কখন তোমাকে অনাদর করেছি কি'-র প্রশ্নে এই মেয়ের পক্ষেই বলা সম্ভব হয় 'অনাদর কখন করো নাই বটে, কিন্তু আমিও অনাদরের কর্ম্ম কখন করিই নাই।' এই আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান কৈলাসবাসিনীর 'আত্ম'অর্জন। যদিও একথা ঠিক কিশোরীচাঁদের সাহচর্য ও প্রেম ব্যতীত কৈলাসবাসিনীর এই উত্তরণ হয়ত কখনো সম্পূর্ণ হোত না, তা তিনি নিজেও জানতেন আর সে কারণেই দ্বিতীয়বার কাশী যাওয়ার পথে লক্ষ্মীমণির সঙ্গে আলাপ হলে তাঁর জন্য বেদনা অনুভব করেন কৈলাসবাসিনী। লক্ষ্মীমণি সম্পর্কে তিনি লেখেন,

> '...তাঁর বিদ্যা বুদ্ধি বড় ভাল আর মন বড় ভাল। তিনি জদি নব্য বাবুদের হাতে পড়িতেন, তা হলে তা হলে অদ্বিতীয় স্ত্রীলোক হতেন। কিন্তু কপালক্রমে প্রাচীন স্বামীর হাতে পড়েছিলেন।...এই দুঃখু জে তিনি কোন সৎ বিদ্যানের হাতে পড়েন নাই। জ্যেমন এক একটা বিচি অমনি পড়ে গাচ হয়- হয়ে তাহাতে অনেক ফল হয় এর তাই হইয়াছে। আমাদের জে হওয়া তাহা অনেক যত্নে মাটির পাট করে জল দে হওয়া, কিছু আশ্চর্য্য নয়। আমার মন জেমন উর্ব্বরা, তখন অমন লোকের হাতে পড়িছি, এমন করে শিক্ষা দেছেন, তন্য তন্য করে বুঝায়ে দেছেন, তাহা শুনে নিতান্ত মুখ্যুরও জ্ঞান হয়...।'[১৪]

কৈলাসবাসিনীর ডায়েরী শেষ হয়েছে কিশোরীচাঁদের দেহান্তের সংবাদে...

> 'আজ আমার জিবোন শেষ হইল। ...আমি ঐহিক সুখে জলাঞ্জলি দিলুম। আমার জিবন থাকিতেও মৃত্যু হইল। সকল সুকের শেষ করিলাম কাসি মিত্রের ঘাটে।'[১৫]

স্বামীর ছায়ায় বেড়ে ওঠা কৈলাসবাসিনীর পুরো জীবনই ছিল কিশোরীচাঁদ কেন্দ্রিক। নিজের জীবন ও তাঁর মূল্যবোধ সম্পর্কে তিনি যা অনুভব করেছেন তা কিশোরীচাঁদের থেকে পাওয়া কিন্তু সেই অনুভবকে উপলব্ধির স্তরে উন্নীত করেছেন তিনি নিজে। সম্পূর্ন আত্মকথা জুড়ে তাঁর যে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা চোখে পড়ে তা কিশোরীচাঁদের 'গড়ে তোলা' ও স্বয়ং কৈলাসবাসিনীর নিজের 'হয়ে ওঠা'রই ফসল। এই ব্যক্তিত্বকে কুর্নিশ জানিয়েছিলেন স্বয়ং কিশোরীচাঁদও। তাঁর স্ত্রী যে তাঁর থেকে বেশি সাহসী, বেশি বুদ্ধিমান এবং অধিক সহ্যগুণসম্পন্ন তা অনুভব করে গর্বের সঙ্গে তা উচ্চারণ করেছিলেন কিশোরীচাঁদ আর এখানেই ঊনবিংশ শতকের 'নতুন' পরিবারভাবনার নির্মিতি। পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গী রাসসুন্দরীরা পাখা ঝাপটাচ্ছিলেন, খুঁজছিলেন মুক্ত বাতাস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই বদ্ধ পিঞ্জরের শিকলগুলো সামান্য হলেও আলগা হচ্ছিল, আলগা করছিলেন কিশোরীচাঁদ-কৈলাসবাসিনীরা। তাঁরা হয়তো অনেকটা পারেননি, কিন্তু কিছুটা পেরেছিলেন, যে কিছুটার পথ ধরে পরবর্তীতে আরও অনেকটা পারার পথ নির্মাণ হয়েছিল।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. ঘোষ, মন্মথনাথ. কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র. কলিকাতা: শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত. ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ. পৃ.১১-৪৩

২. বিশ্বাস, অহনা ও ঘোষ, প্রসূন (সম্পা). অন্দরের ইতিহাস নারীর জবানবন্দি (২য় খণ্ড). কলকাতা: গাঙচিল. জুলাই ২০১৬ (২য় মুদ্রণ). পৃ.৮৫

৩. নিয়োগী, গৌতম (সম্পা). দুটি জীবনকথা সারদাসুন্দরী দেবী শরৎকুমারী দেবী. কলকাতা: অবভাস. সেপ্টেম্বর ২০২২ (প্রথম প্রকাশ). পৃ. ১৯

৪. মিত্র, প্যারীচাঁদ. আধ্যাত্মিকা. কলিকাতা: শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং. সন ১২৮৬. পৃ. Preface-i. বিশ্বাস, অহনা ও ঘোষ, প্রসূন (সম্পা). অন্দরের ইতিহাস নারীর জবানবন্দি (২য় খণ্ড). কলকাতা: গাঙচিল. জুলাই ২০১৬ (২য় মুদ্রণ). পৃ.৮৫
৫. তদেব
৬. ঘোষ, বিনয়. বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা. কলকাতা: দীপ প্রকাশন. অক্টোবর ২০২০ (পরিমার্জিত দীপ সংস্করণ). পৃ.২২১-২২২
৭. ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পা). রাসসুন্দরী দাসী আমার জীবন. নয়াদিল্লি: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া. ২০১১ (দ্বিতীয় পুনমুর্দ্রণ). পৃ. ৩০
৮. বিশ্বাস, অহনা ও ঘোষ, প্রসূন (সম্পা). অন্দরের ইতিহাস নারীর জবানবন্দি (২য় খণ্ড). কলকাতা: গাঙচিল. জুলাই ২০১৬ (২য় মুদ্রণ). পৃ.৮৫
৯. তদেব, পৃ.৮৬
১০. তদেব, পৃ.৯৫
১১. তদেব, পৃ.৯৬-৯৭
১২. তদেব, পৃ.১০৮
১৩. তদেব, পৃ.১১৭-১১৯
১৪. তদেব, পৃ.১২২
১৫. তদেব, পৃ.১২৮

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1239-1248
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.126

রবীন্দ্র জীবনে প্রেম ও প্রকৃতি

সুমন্ত রবিদাস, *স্বাধীন গবেষক, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 09.05.2025; Accepted: 17.05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

If we look at Rabindranath's life, we can see how much space 'love and nature' occupied in his life. From a young age, it can be seen that Rabindranath used to sit on the second floor and watch the scenery of nature outside. Even as he grew up, it can be seen that when the shadow of happiness and sorrow fell on Rabindranath's life again and again, Rabindranath found a place to live in nature. Even though his first love came in the form of Anna Tarkhar, it did not last long. Again, when he lost his mind for the doctor's daughters while studying in England, he returned home with a broken heart and forgot everything. Rabindranath wanted to live in the love of Kadambari Devi, making Kadambari the 'pole star' of his life. But when Kadambari Devi committed suicide, the poet lost the strength to live in life again. At this time, the love of nature and his wife Mrinalini showed the poet the way to live. Even when his wife died, it is seen that love for nature, people, and country inspire the poet to live again. In this way, it can be seen that when the dark night approaches again and again in the poet's life, 'Love and Nature' shows the poet a new way to live. From the beginning to the end of his life, this 'Love and Nature' was inextricably linked with the poet's life. The image of this 'Love and Nature' has emerged again and again through the poet's various writings. This shows how much space 'Love and Nature' occupied in Rabindranath's life.

Keywords: Rabindranath, Kadambari Devi, Mrinalini Devi, Anna Tarkhar, love and nature, pole star, Chitra, Chaitali, Sonar Tari

আমরা যদি রবীন্দ্র জীবনের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে প্রেম ও প্রকৃতি তাঁর উপর কতটা প্রভাব ফেলেছিল। যেটা আমরা তাঁর পরবর্তীতে বিভিন্ন লেখনীর মধ্য দিয়ে দেখতে পাই। প্রেম ও প্রকৃতি রবীন্দ্র জীবনে যে কতটা প্রভাব ফেলেছিল তা আমরা ‘জীবনস্মৃতিতে’ স্পষ্টই দেখতে পাই। তাঁর পরিণত বয়সের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ ‘জীবনস্মৃতি’তে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা চাকরদের অধীনেই কেটেছে। বাড়ির পিতা- মাতার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির ছোট ছেলে বা মেয়েদের তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। তেমনি রবীন্দ্রনাথেরও ছিল না। আবার বাড়ির বাইরে এমনকি ভেতরেও ইচ্ছে মতো যাওয়া নিষেধ ছিল। ঠিক এই সুযোগে রবীন্দ্রনাথের মনকে অধিকার করে নেয় প্রকৃতি। বাইরে যেহেতু যাবার অনুমতি ছিল না, সেহেতু রবীন্দ্রনাথ জানালা দিয়ে ঘরে বসেই পুকুরের স্নান করার দৃশ্য, প্রকাণ্ড বটগাছের আলো- আঁধারির খেলা, নারিকেল বাগানের দৃশ্য প্রভৃতি প্রকৃতির দৃশ্যগুলো দেখতেন। সেই ছোটবেলার দেখা প্রকৃতির ছবি রবীন্দ্রনাথের মনকে কতটা প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্যের ‘পুরানো বট’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সেই বটগাছের যে বর্ণনা দিয়েছেন–

"নিশিদিন দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে ওগো প্রাচীন বট।...
মনে কি নেই সারাটা দিন বসিয়ে বাতায়নে,
তোমার পানে রইতে চেয়ে অবাক দুনয়নে?"[১]

শুধু 'কড়ি ও কোমল' কাব্যেই নয়, পরবর্তীতে লেখা 'সোনার তরী' কাব্যের 'দুই পাখি' কবিতায় ছোটবেলায় প্রকৃতিকে দেখার যে বর্ণনা দিয়েছেন-

"খাঁচার পাখি সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে,"[২]

এই দুই কবিতা থেকেই বোঝা যায় প্রকৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রেম কতটা ছিল, আর সেটা ছোট থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল।

দাদা সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধুর কন্যা আন্না তরখড় প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে একটা আকর্ষণ ছিল এবং এই মেয়েটিও যে কবিকে ভালোবেসেছিলেন, সে ব্যাপারে কবি নিজেই বলেছেন,

> "সে মেয়েটিকে আমি ভুলিনি বা তার সে আকর্ষণকে কোন লঘু লেভেল মেরে খাটো করে দেখিনি কোনদিন।..."[৩]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই তরুণীর যে একটা গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার কথা রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলা'য় বলেছেন,

> "আমার বিদ্যে সামান্যই, আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারত না। তা করেন নি।... আদর আবদার করবার ঐ ছিল আমার সবচেয়ে বড় মূলধন। যাঁর কাছে নিজের এই কবিআনার জানান দিয়েছিলেম তিনি সেটাকে মেপেজুখে নেন নি, মেনে নিয়েছিলেন।"[৪]

তাহলে বোঝাই যাচ্ছে ওই অন্না-ই ছিল কবির আদর- আবদারের জায়গা। যার কাছে কবি তাঁর কবিত্বের কথা ঘোষণা করতে পারতেন অনায়াসেই। 'কবি কাহিনী' প্রকাশিত হলে কবি আন্নাকে তা উপহার দেন। আন্নাকে উদ্দেশ্য করে কবি 'শুনো নলিনী', 'খোলো গো আঁখি' প্রভৃতি গানগুলি নলিনীর নামে তার উদ্দেশ্যেই রচনা করেন। শুধু গান নয়, নলিনী নাম দিয়ে কবি অনেক কবিতাও রচনা করেছেন। 'নলিনী' কবিতায় কবি আন্নার উদ্দেশ্যে বলেছেন—

"লীলাময়ী নলিনী,
চপলিনী নলিনী,
শুধালে আদর করে
ভালো সেকি বাসে মোরে,
কচি দুটি হাত দিয়ে
ধরে গলা জড়াইয়ে,"[৫]

'দামিনীর আঁখি কিবা' কবিতায়ও কবি বলেছেন-

"ও আমার নলিনী লো, বিনয়িনী নলিনী
রসিকতা তীব্র অতি
নাই তার এত জ্যোতি
তোমার নয়নে যত নলিনী লো নলিনী।"[৬]

এখান থেকে বোঝায় যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মনেও আন্নার প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল। সেই ভালোবাসার জন্যই তো নিজের পছন্দের নাম 'নলিনী' দিয়ে নিজের আন্নার প্রতি ভালো লাগার কথা কবিতার মধ্য দিয়ে, গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে গেছেন বারবার। তাহলে বলা যেতে পারে, কবির জীবনে প্রথম প্রেম এই 'আন্না তরখড়' রূপেই এসেছিল আর রবীন্দ্রনাথের মনও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। নলিনীর চপলতা, কচি হাত, নয়নের অপরূপ জ্যোতির যে বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ করেছেন, তা থেকেই বোঝা যায় কবির মনের মধ্যেও নলিনীর প্রতি ভালোবাসা ছিল। আর

ভালবাসা ছিল বলেই এত রূপ- গুণের বর্ণনা করেছেন কবি। আবার ভালোবেসে নিজের পাছন্দের নাম 'নলিনী'ও দিয়েছিলেন। কবিতা, গান, বিভিন্ন লেখনীর মাধ্য দিয়ে কবি সেই কথাই বলে গেছেন।

কবি যখন বিলেতে গিয়েছিলেন, সেখানে ডাক্তার স্কটের বাড়িতে যখন ছিলেন, তখন স্কটের দুই কন্যা যে কবির প্রতি অনুরক্ত ছিল, কবিকে ভালোবেসেছিল সে কথা কবি নিজেই বৃদ্ধ বয়সে এসে বলেছেন,

> "দুটি মেয়েই যে আমাকে ভালোবাসত একথা আজ আমার কাছে একটুও ঝাপসা নেই- কিন্তু তখন যদি সে কথা বিশ্বাস করবার এতটুকুও মরাল কারেজ থাকত।"[৭]

কবিও যে অনুরক্ত ছিল মেয়ে দুটির প্রতি তার পরিচয় 'দুদিন' কবিতায় রেখে গেছেন—

> "কিন্তু আহা, দুদিনের তরে হেথা এনু,
> একটি কোমল প্রাণ ভেঙে রেখে গেনু।"[৮]

কবি লন্ডনে দুদিনের জন্য এসে যে মেয়ে দুটির মায়ায় পড়েছিলেন তার পরিচয় এই কবিতাটির মধ্যেই পাওয়া যায়। তাইতো বারো বছর পরে কবি আবার লন্ডনে তাদের খুঁজতে গিয়েছিলেন। আমরা যাকে ভালোবাসি মনে মনে আমরা তারই ছবি আঁকি, রূপ- গুণের বর্ণনা করি। সেগুলোই রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বিলেতে যখন এই দুটি মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে সেই দুই মেয়েকে রেখে ভাঙা মন নিয়ে কবিকে আবার বিলেত থেকে ফিরে আসতে হয়। বিলেতে থাকাকালীন কবি 'ভগ্নহৃদয়' নামে এক কাব্যগ্রন্থ রচনা শুরু করেন। এই গ্রন্থটিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে কবির মনে এক ব্যথার ভাব জন্ম নিয়েছিল। বলা যেতে পারে বিলেতে যে ডাক্তারের দুই মেয়ে কবিকে ভালোবাসত, সেই ভালোবাসার অপূর্ণতা থেকেই সেই ব্যথা–

> "ক্ষমা কর মোরে, সখি, শুধায়ো না আর!
> মরমে লুকানো থাক মরমের ভার।"[৯]

বিলেতে যেই 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যের সূচনা, দেশে ফিরে তার প্রকাশ। এই কাব্যের 'উপহার' এ রবীন্দ্রনাথ তাঁর খেলার সঙ্গী, কাব্যের সঙ্গী কাদম্বরী দেবীকে কবি ভালোবাসার স্বরূপ লিখেছেন–

> "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
> এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।...
> চরণে দিনু গো আনি - এ ভগ্নহৃদয়খানি...।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ বিলেতে গিয়ে ভালোবেসে ভাঙা হৃদয় নিয়ে ফিরে এসে কাদম্বরী দেবীর ভালোবাসায় তা ভুলতে চেয়েছিলেন। কারণ আমরা জানি কবির প্রতিটি আশা -ভরসার- ভালোবাসার মূলে ছিল তাঁর বৌদি। তাইতো জীবনের 'ধ্রুবতারা' বৌদিকেই করতে চেয়েছিলেন, যাতে করে আর কোনো দিন কারো ভালোবাসায় পথ হারা না হতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসলে সকলে করুণার চোখে দেখলেও কাদম্বরীই তাকে আশা - ভরসা যুগিয়েছিল। সেই কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যার চেষ্টা করলে কবি মনে গভীরভাবে আঘাত পান। সাত বছর বয়স থেকে যার সঙ্গে মনের সম্পর্ক, যে সমস্ত আশা- ভরসার কেন্দ্রস্থল, তার আত্মহত্যার চেষ্টাতে কবি ব্যথিত হয়ে পড়ে। কবি তাঁর বৌদিকে 'তারকা' বলে সম্বোধন করে 'তারকার আত্মহত্যা ' কবিতায় প্রিয় মানুষের আত্মহত্যাতে সেই ব্যথার কথায় বলেছেন–

> "হে তারকা ছুটিতেছ আলোকের পাখা ধরে,
> তোমারে শুধাই আমি, বলগো বলগো মোরে,
> তুমি তারা, রজনীর কোন গুহা মাঝে যাবে?"[১১]

'সুখের বিলাপ' কবিতায় কবিকে ছেড়ে দাদা- বৌদিরা চলে গেলে কবি তীব্র দুঃখে বলে ওঠে–

> "কেহ -কেহ- কেহ নাই মোর।...
> ভালোবাসা গেল কি চলিয়া?
> আবার কি দেখা হবে রে?"[১২]

এখান থেকেই বোঝা যায় কবি তাঁর বৌদিকে কতটা ভালোবাসত। কতটা মনের সম্পর্ক ছিল বৌদির সঙ্গে। কবি কতটা ব্যথা পেয়েছিল এই কবিতাগুলোর মধ্যে দিয়েই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার চেষ্টা এবং

এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাদম্বরীকে নিয়ে কলকাতার বাড়ি ছেড়ে দূরে কোথাও গেলে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ একাই হয়ে পড়েন। জীবনের সঙ্গী বিচ্ছেদে কবি ব্যথিত হয়ে পড়ার ব্যথা থেকেই জন্ম নেয় 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' এর কবিতা গুলো।

দীর্ঘদিন প্রায় বছরখানেক সেই ব্যথা ভুলতে কবির সময় লেগে যায়। দীর্ঘদিন মনো দুঃখে জীবনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকার পরে অবশেষে রবীন্দ্রনাথ নিজের মনকে প্রশ্ন করলেন–

"আর কতদিন কাটিবে এমন
সময় যে চলে যায়।"[১৩] (আহ্বান সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত)

নিজের মনকে প্রশ্ন করার পরে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ একদিন প্রকৃতির মধ্যে মনের শান্তি খুঁজে পেলেন। তাই 'নির্ঝরে স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় কবি বললেন–

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখির গান!"[১৪]

প্রকৃতি যে রবীন্দ্রনাথের উপর কতটা প্রভাব ফেলেছিল তা এখান থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। কবি যখন ব্যথার সাগরে ডুবে গিয়েছিলেন, তখন প্রকৃতি কবিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল। প্রকৃতির মধ্যেই কবি মনের শান্তি, মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাইতো রবীন্দ্রনাথ 'প্রভাত সঙ্গীত' অধ্যায়ে বলেছেন, "সদর স্ট্রীটের বাড়িতে থাকিবার কালে একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাইলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্ব সংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত।..."[১৫] 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আরো ভালোভাবে কেমন করে অন্ধকার থেকে উত্তরণের পথ, মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন তা তিনি এই নাটকে সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। সন্ন্যাসী যেমন অন্ধকার গুহাকেই জীবনের সবকিছু মনে করেছিল, ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথও কাদম্বরীর আত্মহত্যার চেষ্টার পর দুঃখকেই জীবনের সবকিছু মনে করেছিলেন। সন্ন্যাসী যেমন এক বালিকার স্পর্শে গুহা থেকে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর জগতে প্রকৃতির সান্নিধ্যে, প্রেমের সান্নিধ্যে জীবনের মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন; ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতির সান্নিধ্যে মনের দুঃখ, অন্ধকার থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন।

কবি যখন প্রকৃতির মধ্যে মনের আনন্দ, দুঃখ থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন তখন কবির বিবাহ হয় এবং তার কয়েক মাস পরেই আবার দুঃখের ছায়া নেমে এল খেলার সঙ্গিনী, বৌদি কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে। খেলার বয়সে কাদম্বরী বাড়িতে বউ হয়ে আসে এবং চব্বিশ বছর বয়সে সেই সঙ্গিনী চলে গেলে কবির সঙ্গে মৃত্যুর স্থায়ী পরিচয় হয়। ছোটবেলায় মা মারা গেলেও তেমন দুঃখের সঙ্গে পরিচয় হয়নি কবির। কারণ এক দিকে তো ছোট বয়সে মা মারা যায়, আবার মার সঙ্গে তেমন কবির সম্পর্কও গড়ে ওঠেনি। মায়ের সান্নিধ্য খুব কম সময় পেয়েছেন, কিন্তু বৌদি ছিল সেই সাত বছর বয়স থেকে প্রতিটি সময়ের, কাজের, ভালোবাসার সঙ্গী। সেই চির সুখ -দুঃখের সঙ্গিনীর মৃত্যুতে কবির জীবনের প্রতি আশা- ভালবাসা যেন কমে যায়। কবি নিজেই এই কথা ' জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, "আমারও সেই দশা ঘটিয়াছিল- পায়ের নীচে হইতে জীবনের টান কমিয়া যাইতেই আমি বাঁধা রাস্তা একেবারে ছাড়িয়া দিবার জো করিয়াছিলাম।"[১৬] এই কথা থেকেই বোঝা যায় বৌদি তাঁর জীবনের কতটা অংশ জুড়ে ছিল এবং কতটা ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল বৌদির সঙ্গে।

কবি যখন প্রিয় মানুষের মৃত্যুতে জীবনের আশা হারিয়ে ফেলেছিলেন, তখন কবি আবার নতুন করে বাঁচার আশা খুঁজে পেলেন প্রকৃতির মধ্যে –

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভূবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"[১৭] (প্রাণ, করি ও কোমল)

কারণ–

"না রে, করিব না শোক,

এসেছে নূতন লোক,
তারে কে করিবে অবহেলা!”[১৮] (নূতন, করি ও কোমল)

এই সময়ে কবির জীবনে ‘ নূতন’ লোক এসেছিল তাঁর স্ত্রী ভবতারিণী দেবী। যাকে রবীন্দ্রনাথ ভালোবেসে ‘মৃণালিনী’ নাম দিয়েছিলেন। এইরকম নামকরণ আমরা দেখতে পাই তাঁর ছোটগল্প ‘হৈমন্তী’তে। যেখানে অপু হৈমন্তীকে বিয়ে করার পর ভালোবেসে হৈমন্তীকে ‘ শিশির’ নাম দিয়েছিলেন। এই নামের মধ্যে আছে একান্ত নিজস্বতা, ভালোবাসা, যা তাঁর একান্ত নিজের। মৃণালিনী আসার কয়েক মাস পরেই কাদম্বরী দেবী মারা গেলে সেই সময়ে কিছুদিন একাকীত্বে কাটানোর পরে কবি আবার বাঁচার আশা, ভালোবাসা খুঁজে পায় মৃণালিনীর মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের অনেক পত্র-পত্রিকার মধ্যে সেই ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই জন্যই কবি বৌদির শোক ভুলে স্ত্রী মৃণালিনীকে নিয়ে নতুন করে মানবের মাঝে বাঁচতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কখনোই বৌদিকে বা তার প্রতি ভালবাসাকে ভুলে যায়নি রবীন্দ্রনাথ। তার পরিচয় তাঁর বিভিন্ন কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ‘বিস্মৃতি’, সেই ‘বিস্মৃতি’কে নিয়েই কবি বাঁচতে চেয়েছিলেন।

‘মানসী’ কাব্যগ্রন্থে কবি প্রকৃত প্রেমের জয়গান করেছেন, যে প্রেম কামনা, বাসনা, রূপ, আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে। ভালোবাসা যেন কোনো আকাঙ্খার ধন নয়, বিরহেই যেন তার সার্থকতা। তাই ‘নিস্ফল কামনা’য় বলেছেন কবি–

“ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্খার ধন নহে আত্মা মানবের।”[১৯]

প্রকৃত প্রেমের রূপ কেমন হওয়া উচিত, তা ‘মানসী’ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কবি তুলে ধরেছেন। ‘মায়ার খেলা’ নাটকে অমর ও শান্তার মিলন হলে প্রমদা শূন্য হৃদয়ে চলে গেলে রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই কথায় বলেছেন–

“এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
শুধু সুখ চলে যায় - এমনি মায়ার ছলনা।”[২০]

এরপর কবিকে জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে শিলাইদহ, পতিসর, শাজাদপুর জমিদারী পরিদর্শনে যেতে হলে কবি প্রকৃতিকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পায়। সেই পল্লী প্রকৃতি কবির মনকে কতটা প্রভাবিত করেছিল, তার পরিচয় আমরা পাই ‘ছিন্নপত্রে’র মধ্যে; যেগুলো কবি বিভিন্ন সময়ে বন্ধু, ইন্দিরা দেবী, স্ত্রীকে লিখেছিলেন। এর মধ্যে আমরা যদি একটি পত্র নিয়ে আলোচনা করে দেখি তাহলেই বোঝা যাবে প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের উপর কতটা প্রভাব ফেলেছিল। ‘শিলাইদহ’ থেকে লেখা ’৫৫ নং’ পত্রে কবি শরতের সকালের এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন,

> “এমন সুন্দর শরতের সকালবেলা চোখের উপর যে কি সুধাবর্ষণ করছে সে আর কী বলব। তেমনি সুন্দর বাতাস দিচ্ছে এবং পাখি ডাকছে। এই ভরা নদীর ধারে, বর্ষার জলে প্রফুল্ল নবীন পৃথিবীর উপর, শরতের সোনালি আলো দেখে মনে হয় যেন আমাদের এই নব যৌবনা ধরণী সুন্দরীর সঙ্গে কোন এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসাবাসি চলছে, তাই এই আলো এবং এই বাতাস…জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্মল নীলিমা।”[২১]

সুন্দর সবুজ ক্ষেত, নিস্তব্ধ দুপুর, মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের খেলা, গ্রামীন জনপদের বর্ণনা, হাটে যাবার দৃশ্য, চাঁদের বর্ণনা, রাখালের গরু চরানোর ছবি প্রভৃতির অপরূপ বর্ণনা কবি দিয়েছেন। ‘ছিন্নপত্র’ এর প্রতিটি পত্রেই এই প্রকৃতির ছবি ধরা পড়েছে। প্রকৃতির সম্পর্কের গভীর প্রেমের কথা বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যেও ধরা পড়েছে। আমরা যদি তাঁর ‘পল্লীপ্রকৃতি’ প্রবন্ধটিকে দেখি তাহলেই বোঝা যাবে প্রকৃতির প্রতি কবির গভীর প্রেমের ছবি,

> “পৃথিবী আমাদের যে অন্ন দিয়ে থাকে সেটা শুধু পেট ভরাবার নয়; সেটাতে আমাদের চোখ জুড়োয়, আমাদের মন ভোলে। আকাশ থেকে আকাশে সূর্যকিরণের যে স্বর্ণরাগ, দিগন্ত থেকে দিগন্তে পাকা ফসল খেতে তারই সঙ্গে সুর মেলে এমন সোনার রাগিনী।”[২২]

‘শ্রীনিকেতন’, ‘পল্লীসেবা’, ‘উপেক্ষিতা পল্লী’ প্রভৃতি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ, সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন। পল্লী প্রকৃতির সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তিনি সেই পল্লী প্রকৃতির উন্নয়নের কথাও বলেছেন। এইসব

বর্ণনার মধ্য দিয়েই বোঝা যায় প্রকৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রেম। এই প্রকৃতি প্রেম থেকেই বিশ্বভারতীর মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে শিক্ষার পরিকল্পনা করেন তিনি। এই বর্ণনাগুলি থেকেই বোঝা যায় কবি প্রকৃতিকে কতটা ভালোবাসত এবং প্রকৃতি কবির উপর কতটা প্রভাব ফেলেছিল জীবনে।

'ছিন্নপত্রে'র সময়ের রচিত 'সোনার তরী' কাব্যেও এই প্রকৃতির রূপেরই বর্ণনা পাই। 'আকাশের চাঁদ' কবিতায় কবি এই প্রকৃতির ভালোবাসার ছবি এঁকেছেন–

"হাসিছে আকাশ, বহিছে বাতাস, পাখিরা গাহিছে সুখে।
সকালে রাখাল চলিয়াছে মাঠে, বিকেলে ঘরের মুখে।"[২৩]

'সোনার তরী' কাব্যে দেখলেই বোঝা যাবে এই কাব্যের উৎস এবং পটভূমি। প্রকৃতির প্রতি ভালবাসাই এই কাব্যের প্রধান বিষয়। প্রকৃতির রূপে, সৌন্দর্যে, মোহে যে কতটা কবি মুগ্ধ হয়েছিলেন, সেই ভালোবাসার ছবি কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে–

"হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমাপানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে;"[২৪] (বসুন্ধরা, সোনার তরী)

'চিত্রা', 'চৈতালি' প্রভৃতি কাব্যের মধ্যেও প্রকৃতির প্রতি কবির ভালবাসার ছবি লক্ষ্য করা যায়। 'চৈতালি' কাব্যের মধ্যে দেখা যায় গভীর প্রকৃতি প্রেম।

মানুষ যে নিজের ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে শুধু নিজের কিছু স্বার্থের জন্য প্রকৃতিকে বিনষ্ট করছে, এই যন্ত্র সভ্যতা ধীরে ধীরে প্রাণশক্তিকে কেড়ে নিচ্ছে, সে কথা রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি নাটকের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। মানুষ যন্ত্রের ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে তাল তাল করে সোনা সংগ্রহ করছে, বাঁধের মাধ্যমে প্রকৃতির জলধারাকে অবরুদ্ধ করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করছে। আবার 'রক্তকরবী' নাটকের রচনা প্রসঙ্গ যদি দেখা যায়, তাহলেই দেখা যাবে এর বাস্তবতাকে। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকাতে দেখেছিলেন ধনের বড় বেশি ছড়াছড়ি, কিন্তু প্রাণের বড় অভাব। অধ্যাপক রাধাকোমল মুখোপাধ্যায়ও বোম্বাইয়ের শিল্প কেন্দ্রের শ্রমিকদের করুণ অবস্থা দেখে এসে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, সে কথা প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থে। শ্রমিকদের এই করুণ অবস্থা-ই রবীন্দ্রনাথের মনে আঘাত করেছিল। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ যন্ত্র সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে জানিয়ে বলেছিলেন–

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর–
লহো তব লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা।"[২৫] (সভ্যতার প্রতি, চৈতালি)

কাদম্বরী দেবীর প্রতি যে রবীন্দ্রনাথের কতটা ভালবাসা ছিল, সে কথা আমরা পূর্বে দেখেছি। কাদম্বরীর মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ অনেক কবিতায় তার স্মৃতিচারণ করেছেন। বারবার সেই স্মৃতি, ঘুরে - ফিরে এসেছে তাঁর কাব্যে। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীর ভালোবাসায় সেই শোক ভুলতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীকে কতটা ভালোবাসত তা বিভিন্ন চিঠিপত্রের, লেখনীর মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই। সেই ভালোবাসার মানুষটি রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে হঠাৎ চলে গেলে রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়ে এতদিনের স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার সম্পর্কে বলে ওঠেন–

"এ সংসারে এক দিন নববধূবেশে
তুমি যে আমার পাশে দাঁড়াইলে এসে
রাখিলে আমার হাতে কম্পমান হাত,
সে কি অদৃষ্টের খেলা, সে কি অকস্মাৎ?"[২৬] (১৫নং, স্মরণ)

আবার কবি বলেছেন -

"হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি কি আসিল প্রলয়রাত্রি ঘোর।
চিরদিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া।"[২৭] (মুক্তপাখির প্রতি, উৎসর্গ)

মৃত্যু যে প্রিয়জনের থেকে প্রিয় জনকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে','হৈমন্তী' গল্পের মধ্যে সেই বেদনার সুর শুনতে পাই। 'নিশীথে' গল্পে প্রথম স্ত্রীর প্রতি প্রেম ভালবাসার যে সুমধুর সম্পর্ক দক্ষিণারঞ্জনের ছিল, সে কথা আমরা গল্পের মধ্য দিয়েই দেখতে পাই। কিন্তু মৃত্যুই সেই প্রিয়জনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল স্মৃতি শুধু রয়ে গেল মনে। 'হৈমন্তী' গল্পেও এই চিত্র দেখা যায়। হৈমন্তীর প্রতি অপুর ভালবাসা, একসঙ্গে বই পড়া, কিন্তু মৃত্যুই সেই প্রিয় মানুষকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল; ঠিক যেমন রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসার মানুষদের ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল স্মৃতিটুকু দিয়ে। আবার দেখা যায় মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর অনেকদিন পরে কবি স্ত্রীকে ভুলতে না পেরেই অমলাকে বলেছিলেন,

> "দেখো অমলা মানুষ মরে গেলেই যে একেবারে হারিয়ে যায়, জীবিত প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে কথা আমি বিশ্বাস করি না।"[২৮]

মরনেও যে প্রেম মরে না, তাইতো কবি বলে উঠেছিলেন–

> "বিশ্বের প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর।।"[২৯] (বিচ্ছেদ, মহুয়া)

কবির এই কথা থেকেই বোঝা যায় কবি স্ত্রীকে কতটা ভালোবাসতেন। সেই ভালোবাসার জন্যই কবির এ কথা মনে হয়েছিল। গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল জন্যই ৪১ - ৪২ বছর বয়সে স্ত্রী মারা যাবার পরেও কবি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেননি। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে প্রকৃতি, বিশ্বলোকের প্রতি প্রেম কবির সেই শোক ভুলতে সাহায্য করেছিল। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরে যেমন কবি এই বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে বেঁচে থাকার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন, তেমনি এই বিশ্ব প্রকৃতি, কর্ম প্রভৃতি সেই মৃত্যুর শোককে ভুলিয়ে দিয়েছিল। কারণ দেহের বিচ্ছেদ হলেও প্রেমের বিচ্ছেদ হয় না। তাই কবি মনের মধ্যে তাঁর প্রেমিকাকে খুঁজে পেয়েছেন। কালের যাত্রায় কবির ভালোবাসার মানুষ হারিয়ে গেলেও সেই স্মৃতি, সেই ভালোবাসা নিয়েই 'শেষের কবিতায়' লাবণ্যের মধ্য দিয়ে কবি বলেছেন–

> "সেই ধাবম কাল
> জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল–...
> আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।...
> হে বন্ধু, বিদায়।"[৩০]

রবীন্দ্র জীবনে প্রেমের আর একটা দিক লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেখানে মানুষের প্রতি যেমন, দেশের প্রতিও তেমনি প্রেম ছিল কবির মনে। কবির জীবনে যেমন মানব- মানবীর প্রতি প্রেম ছিল, তেমনি দেশের প্রতিও গভীর প্রেম ছিল। ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব পাশ হলে সারা দেশ জুড়ে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে ঠাকুর পরিবার তথা রবীন্দ্রনাথও এর বাইরে ছিলেন না। তিনি দেশ মাতার উদ্দেশ্যে বলে উঠেছিলেন, 'তোমারি তরে, মা সঁপিনু এ দেহ'।[৩১] আবার কখনো তিনি গেয়ে উঠলেন–

> "বাংলার মাটি, বাংলার জল
> বাংলার বায়ু, বাংলার ফল–
> পূণ্য হউক, পূণ্য হউক,
> পূণ্য হউক হে ভগবান।..."[৩২]

আবার তাঁর জাতীয় সংগীতের রচনা প্রভৃতি থেকেই দেখতে পারি রবীন্দ্রনাথ স্বদেশকে কতটা ভালোবাসতেন। এই স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রচনা 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের মধ্যেও দেশের প্রতি ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ইংরেজদের দেশবাসীর উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে কবি বলে উঠলেন–

> "আজকে হতে জগৎ মাঝে ছড়াব আমি ভয়, ...
> তোমার তরবারি আমার করবে বাঁধন ক্ষয়।"[৩৩]

দেশবাসীর মনের মধ্যে দেশপ্রেমকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন কবি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। দেশের বন্ধন মোচনের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন কবি। সেই সময়ে স্বদেশী আন্দোলন যে পথে চলছিল, সেই পথ যে ভ্রান্ত উচ্ছ্বাস মাত্র তা 'গোরা', 'ঘরে- বাইরে' প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন ভণ্ড দেশপ্রেমিকদের স্বদেশী আন্দোলনের নামে জনসাধারণের উপর অত্যাচারের ঘটনাকে। 'গোরা' উপন্যাসে গোরা ও তার অনুচরদের মধ্য দিয়ে দেখা যায়, বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচয়হীনতা, উচ্ছ্বাস আর ব্যর্থতা। 'ঘরে- বাইরে'

উপন্যাসেও দেখা যায় সন্দীপের ভন্ড দেশ প্রেমের পাশাপাশি নিখিলেশ, মাস্টারমশাইয়ের প্রকৃত দেশের লোকের প্রতি, দেশের প্রতি প্রেমকে। তাইতো সন্দীপ যখন জোর করে, লোভ দেখিয়ে, অত্যাচার করে বিলেতি দ্রব্য বয়কট করতে সাধারণ মানুষদের বাধ্য করতে চেয়েছিল, তখন মাস্টারমশাই বলে ওঠে,

> "তোমাদের পয়সা আছে, তোমরা দু পয়সা বেশি দিয়ে দিশি জিনিস কিনছ, তোমাদের সেই খুশিতে ওরা তো বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু ওদের তোমরা যা করাতে চাচ্ছ সেটা কেবল জোরের উপরেই।...ওদের কাছে দুটো পয়সার দাম কত সে তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।"[৩৪]

সেই সময়ে যে এইরকম স্বদেশী আন্দোলন চলছিল প্রকৃত দেশের অবস্থা, জনগণের অবস্থার কথা না জেনে - বুঝে ভন্ড যে দেশ প্রেমের আদর্শ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হত, তার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব বোঝায় যায় মাস্টারমশাইয়ের এই কথার মধ্য দিয়ে।

পরিণত বয়সে এসেও দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ সবকিছু ছেড়ে প্রকৃতির রাজ্যে যেখানে সবুজ শস্যক্ষেত্র, গরু চরে, রাজহংস বিচরণ করে সেখানে যেতে চেয়েছেন-

"আমার মন বসবে না আর - কোথাও,
সব কিছু থেকে ছুটি নিয়ে
চলে যেতে চায় উদাস প্রাণ
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।"[৩৫] (বাসা, পুনশ্চ)

'বলাই' গল্পের মধ্য দিয়েও রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন প্রকৃতির প্রতি এমনই প্রেম - ভালোবাসার ছবি,

> "এতটুকু - টুকু লতা, বেগনি, হলদে নামহারা ফুল, অতি ছোট ছোট; মাঝে মাঝে কণ্টিকারি গাছ, তার নীল নীল ফুলের বুকের মাঝখানটিতে ছোট্ট একটুখানি সোনার ফোঁটা; বেড়ার কাছে কাছে কোথাও বা কালোমেঘের লতা, কোথাও বা অনন্তমূল; পাখিতে - খাওয়া নিম ফলের বিচি পড়ে ছোট ছোট চারা বেরিয়েছে, কী সুন্দর তার পাতা-..."[৩৬]

রবীন্দ্রনাথ এই যে প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন বলাই এর মধ্য দিয়ে, যে প্রকৃতি প্রেমের কথা তুলে ধরেছেন, তা আসলে তাঁরই মনের কথা। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে কতটা ভালবাসতেন, তা আমরা তাঁর ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ্য করতে পারি। সেই প্রকৃতি প্রেমই তিনি বলাই এর মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। এই ছোট্ট বলাই আর কেউ নয়, সেই ছোট্ট রবীন্দ্রনাথই। শেষ জীবনে এসেও কবি গেয়ে গেছেন প্রকৃতির রূপের গান -

"অরুণ আলোর প্রথম পরশ
গাছে গাছে লাগে,
কাঁপনে তার তোরই সে সুর
পাতায় পাতায় জাগে-"[৩৭] (৩ নং, শেষ লেখা)

একই সঙ্গে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা থেকে কবি বলে উঠেছিলেন -

"বিবাহের প্রথম বৎসরে
দিকে দিগন্তরে
শাহনায় বেজেছিল বাঁশি,
উঠেছিল কল্লোলিত হাসি,"[৩৮] (৮ নং, শেষ লেখা)

এ থেকেই বোঝা যায়, কবির জীবনে প্রিয় মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি কতটা ভালোবাসা ছিল। মৃত্যুর শেষ সীমানায় দাঁড়িয়েও কবি তাঁর প্রকৃতি ও প্রিয় মানুষকে ভুলতে পারেননি। বারবার তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে প্রিয় মানুষের প্রতি ভালোবাসা, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার ছবি উঠে এসেছে, যা তাঁর জীবনে শেষ সময় পর্যন্ত ছিল।

এই আলোচনা থেকে দেখায় যায়, ছোট্ট রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত প্রেম ও প্রকৃতি তাঁর জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। ছোট্ট রবি সেই দোতলার জানালা থেকে প্রকৃতির দৃশ্য দেখতেন, সেই প্রকৃতিই প্রিয় মানুষদের বিচ্ছেদের সময় বারবার তাকে রাস্তা দেখিয়েছে নতুন করে বাঁচার। প্রথম জীবনে আন্না তরখড় প্রতি প্রেম থেকে শুরু করে বিলেতে ডাক্তারের কন্যাদ্বয়ের প্রতি প্রেম, তারপর বৌদি কাদম্বরী দেবীর প্রতি প্রেম এবং

কাদম্বরীর মৃত্যুর পর স্ত্রী রূপে মৃণালিনী দেবীর প্রতি প্রেম, মানুষের প্রতি, দেশের প্রতি প্রেম, তার সঙ্গে এসেছে প্রকৃতি। বারবার কবির জীবনে নানা রূপে, নানা ভাবে এসেছে প্রেম ও প্রকৃতি। বারবার প্রিয় মানুষদের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হয়ে পড়লে এই প্রেম ও প্রকৃতি নানা ভাবে এসে তাঁকে বাঁচার পথ দেখিয়েছে, যুগিয়েছে আশা। তাহলে বলায় যায় এই প্রেম ও প্রকৃতি ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ১৪২৬, পৃ: ২২০
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ৩০/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, ১৪২৪, পৃ: ১২
৩. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ১৪২৬, পৃ:৮৮
৪. তদেব, পৃ: ৮৮
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তদশ খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, পৌষ, ১৪১০, পৃ: ১১৬
৬. তদেব, পৃ: ১১৯
৭. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ১৪২৬, পৃ: ৯৩
৮. তদেব, পৃ: ৯৪
৯. তদেব, পৃ: ১১১
১০. তদেব, পৃ: ১১৪
১১. তদেব, পৃ: ১১৮
১২. তদেব, পৃ: ১২৫
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত সঙ্গীত, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, পাঁচকড়ি মিত্র (প্রকাশক), ২২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা, ১২৯৩, পৃ: ৯
১৪. তদেব, পৃ: ১৩
১৫. চক্রবর্তী, অঞ্জন, সূর্যপ্রণাম, নিউ বইপত্র, ৭৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, ২০২০, পৃ: ১৫০
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ৩০/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, ১৪২৪, পৃ: ১৫০
১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কড়ি ও কোমল, শ্রী আশুতোষ চৌধুরী সম্পাদিত, ৭৮ নং কলেজ স্ট্রীট, পীপলস লাইব্রেরি, কলকাতা, ১২৯৩
১৮. তদেব, পৃ: ১০
১৯. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ১৪২৬, পৃ: ২৫৭
২০. তদেব, পৃ: ২৩৯
২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, কার্তিক, ১৩৬২, পৃ: ১২৫
২২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পল্লীপ্রকৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, আশ্বিন, ১৩৯৩, পৃ: ৪৬
২৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সোনার তরী, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৩৮৪, পৃ: ৬৪
২৪. তদেব, পৃ: ১৮৫
২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চৈতালি, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭, পৃ: ৩৬
২৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, স্মরণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ: ২৪
২৭. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (দ্বিতীয় খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৪২৬, পৃ: ৬১
২৮. তদেব, পৃ: ৫৯
২৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মহুয়া, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৬৩, পৃ: ১৪৩

৩০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, উপন্যাস সমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড), এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ৩০/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯, ১৪২৬, পৃ: ৬৯৫-৬৯৬
৩১. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (দ্বিতীয় খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৪২৬, পৃ: ১৬৪
৩২. তদেব, পৃ: ১৬৮
৩৩. তদেব, পৃ: ১৯০
৩৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খন্ড), এস.বি. এস. পাবলিকেশন, ৩০/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, ১৪২৩, পৃ: ৭২-৭৩
৩৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পুনশ্চ, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ফাল্গুন, ১৪২৮, পৃ: ৪৪
৩৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, এস.বি. এস. পাবলিকেশন, ৩০/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, ১৪২৮, পৃ: ৬৫৮
৩৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শেষ লেখা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৯৩, পৃ: ১২
৩৮. তদেব, পৃ: ২১

গ্রন্থপঞ্জী:

১. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ১৪২৬
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ৩০/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, ১৪২৪
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তদশ খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, পৌষ, ১৪১০
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত সঙ্গীত, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, পাঁচকড়ি মিত্র (প্রকাশক), ২২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা, ১২৯৩
৫. চক্রবর্তী, অঞ্জন, সূর্যপ্রণাম, নিউ বইপত্র, ৭৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, ২০২০
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কড়ি ও কোমল, শ্রী আশুতোষ চৌধুরী সম্পাদিত, ৭৮ নং কলেজ স্ট্রীট, পীপলস লাইব্রেরি, কলকাতা, ১২৯৩
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, কার্তিক, ১৩৬২
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পল্লীপ্রকৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, আশ্বিন, ১৩৯৩
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সোনার তরী, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৩৮৪
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চৈতালি, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, স্মরণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৬৮
১২. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (দ্বিতীয় খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৪২৬
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মহুয়া, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৬৩
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, উপন্যাস সমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড), এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ৩০/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯, ১৪২৬
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খন্ড), এস.বি. এস. পাবলিকেশন, ৩০/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, ১৪২৩
১৬ . ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পুনশ্চ, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ফাল্গুন, ১৪২৮
১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, এস.বি. এস. পাবলিকেশন, ৩০/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, ১৪২৮
১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শেষ লেখা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৯৩
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দশম খন্ড), মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩, ২০১৮-২০১৯

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1249-1258
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.127

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আসামের সাংস্কৃতিক কর্মীদের অবদান

পুনম মুখার্জী, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 05.05.2025; Accepted:14 .05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In 1971, during the Liberation War, a significant influx of refugees arrived in the northeastern states of India. Assam became a sanctuary for these refugees. The people of Assam, across all strata of society, came forward to help these helpless individuals who had fled their homeland. Notably, the cultural activists of Assam took special initiatives. Playwrights wrote plays cantered on the Liberation War. The poetry and stories of that time depicted the Liberation War and the life crises of refugees. Self-taught folk poets made the Liberation War the theme of their works. The transformation of East Pakistan into a nation called Bangladesh is a moment of history marked by immense sacrifices and selfless acts of devotion. The memories of the Liberation War remain indelible in fostering unity and secular consciousness. Bangladeshi poet Dilwar wrote a poem dedicated to Assamese poet Atin Das. The literature created in Assam during 1971 about the Liberation War was not solely a product of imagination. Poets and cultural activists primarily drew inspiration from their firsthand accounts of the arriving refugees to create their works.

Keywords: Bangladesh, Liberation war, Migration, play, story poet, society, social workers

১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভৌগোলিকভাবে বিভক্ত হয়েছিল দুটি দেশে ভারত ও পাকিস্তান। দেশভাগের এই ক্ষত ভোলার নয়। ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হলেও সংস্কৃতিগতভাবে দুটি দেশের বহু প্রদেশের মানুষ ছিল যুক্ত। দেশভাগের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে বাংলা এবং পাঞ্জাব প্রদেশে। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের দুই তরফে দুই প্রদেশ। মাঝখানে দুই হাজার বর্গ কিলোমিটারের দূরত্ব। পাকিস্তানের একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তান অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তান। জনসংখ্যার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল বেশি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের মনোভাব ছিল বৈষম্যমূলক। কেবল অর্থনৈতিক শোষণ নয়, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর নিপীড়নও শুরু হয়। মহম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার এক সভায় ঘোষণা করেন, উর্দু এবং কেবলমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার জন্য শহিদ হন বীর বাঙালি সন্তানরা। সামরিক বাহিনীতেও ছিল বৈষম্য। পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশ ছিল বাঙালি। জনসংখ্যার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান, পাকিস্তানের বৃহত্তর অংশ হওয়া সত্ত্বেও দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের কুক্ষিগত। পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি চূড়ান্ত টালমাটাল অবস্থার সম্মুখীন হয়।[১] ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে, পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে বড়ো দল পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানের 'পাকিস্তান পিপলস পার্টি', পূর্ব পাকিস্তানের শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিরোধিতা করেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের সিদ্ধাতের সমালোচনা করে, বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের ডাক দেন।

মুক্তিযুদ্ধ কোনও সামরিক উত্তেজনার ফসল নয়, বরং তার পিছনে রয়েছে দীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাস। মনে রাখতে হবে দীর্ঘ নয় মাস কালব্যাপী এই যুদ্ধে বহু মানুষ মৃত্যু বরণ করেছেন। বহু মানুষ হয়েছেন ঘরছাড়া। যুদ্ধকালীন সময়ে শরণার্থী সমস্যা নতুন কিছু নয়। তবে মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যা ছিল ভিন্ন। পশ্চিম পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, নিজের দেশের পূর্ব অংশের সাধারণ মানুষদের উপর এক প্রচণ্ড দমনমূলক, প্রতিহিংসা পরায়ণ মানসিকতা পোষণ করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের কর্মীদের উপর আক্রমণ চালানো হয়। তবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কর্মীদের উপর অত্যাচার চালিয়েই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তৃপ্ত হয়নি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাতে এক নারকীয় গণহত্যা চালানো হয় পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের উপর। ১৯৪৭-এর পর হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসকদের মতে হিন্দু শাসকদের মদত ছিল পাকিস্তানের অখণ্ডতা নষ্ট করার পক্ষে।[২]

হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মীদের উপরেও অত্যাচারের আঘাত নেমে আসে। পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ সবথেকে বেশি সীমানা ভাগ করে, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি বলতে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং মিজোরামের অংশ বিশেষের কথা মনে আসে। তবে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের শরণার্থী আগমনের কথা এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির দিকে তাকালেই মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রীক যে স্মৃতির রেখার স্রোত ভেসে আসে, তার মূল যোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাকে ২৫ মার্চের কালো রাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মূলত ২৫ মার্চের পর থেকেই পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীরা ভারতের পূর্ব-পাকিস্তান সীমান্তবর্তী বাঙ্গালি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে প্রবেশ করেছিল। ১৯৭১ সালে সংগঠিত যুদ্ধে ভারত মূলত সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেছিল। প্রায় এক কোটি শরণার্থী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ভয়ে ভারতের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। মূলত ভারতের বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে এই অভিবাসন ঘটে। আসাম রাজ্যের শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দির মতো অঞ্চলগুলির মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রীক শরণার্থীজনিত ইতিহাসের প্রেক্ষাপট কিছুটা ভিন্ন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গণহত্যা শুরু হওয়ার পরপরই বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের দাবি গোটা ভারতে প্রবল হয়ে উঠেছিল।

১৯৭১ সালের প্রথম পর্ব থেকেই শরণার্থী আগমন শুরু হলেও ২৫ মার্চের পর থেকে প্রচুর শরণার্থী আসতে থাকে। প্রথম পর্বে সরকারি সাহায্যের পূর্বেই, সাধারণ মানুষ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, পাড়াভিত্তিক ক্লাব, প্রত্যেকটি এলাকার সামর্থবান ব্যক্তি শরণার্থীদের আশ্রয়, খাদ্যের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছেন। সামাজিক,অর্থনৈতিক স্তরে সাহায্যের পাশাপাশি আসামের সাংস্কৃতিক কর্মীরা সীমান্ত পেরিয়ে আসা সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। নিম্নে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ও শরণার্থীদের সাহায্যে আসামের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের তালিকা লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হল।

১) করিমগঞ্জ কলেজে আলোচনা সভা: একাত্তর সালের ২৬শে নভেম্বর করিমগঞ্জ ইউনিয়নের উদ্যোগে একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভাটির বিষয় ছিল ‘বাংলাদেশ সমস্যা’। করিমগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী রাকেশচন্দ্র রায় আলোচনা সভাটির সভাপতিত্ব করেছিলেন। ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রী কেতকী প্রসাদ দত্ত ও সহ-সাধারণ সম্পাদক শ্রী সত্যব্রত রায়ের ভাষণের পর বাংলাদেশের ছাত্র নেতা শ্রী খুরসেদ ইরন, রেজওয়ান উদ্দীন ও শ্রীমতী রেখা দাস বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বিশ্লেষণ করে ভাষণ দিয়েছিলেন। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলাদেশ বিষয়ে রচনা পাঠ করেছিল। উপাচার্য শ্রী শৈলেন শেখর দত্ত সহ কলেজের অমান্য শিক্ষকরা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য ছাত্রদের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

২) বাংলাদেশের জন্য পথ-সংগীত: একাত্তর সালের জুন মাসে, শিলচরের কবি-সাহিত্যিকদের দ্বারা এপার ও ওপার বাংলার শিল্পীদের সাহায্যে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের গণ-সংগীত এর আয়োজন করা হয়েছিল। এই আয়োজন শিলচর শহরের জনসাধারনের মনে প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। শিলচর শহরের রাস্তার উপর দিয়ে পথ চলতে চলতে এই ধরণের গণ-সংগীতের আয়োজন ছিল এই প্রথম। কবি-সাহিত্যিকদের পক্ষে শ্রী কালীকুসুম চৌধুরী বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য এটিকে একটি মাধ্যম মনে করেছিলেন।

এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন, পূর্ব-বাংলার শ্রী কনকশ্রী পাল, গৌরচাঁদ দাস, গৌতম দাস, ভারতের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত গণ-সংগীত শিল্পী শ্রী খালেক চৌধুরী ও তাঁর সম্প্রদায়। এই পথ সংগীতের অনুষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য শিলচরের কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্ব্বশ্রী কালীকুসুম চৌধুরী। হীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রামলেন্দু চক্রবর্তী বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন।[৩]

৩) গীতিনাট্য নকসা: - শিলচরের টাউন হলে মহিলা সংস্থার উদ্যোগে বাংলাদেশের পটভূমিকায় একটি নীতিনাট্য নকসার আয়োজন করা হয়েছিল। নকসাটির নাম ছিল 'বিক্ষুব্ধ বাংলা' নকসাটি দর্শক মহলে প্রচুর গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল।[৪]

৪) শরণার্থীদের সাহায্যে নাট্যানুষ্ঠান:- ১৯৭১ সালের ৯ জুন 'পূর্ব্বায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরে, শরণার্থীদের সাহায্যে হওয়া একটি নাট্যানুষ্ঠানের খবর প্রকাশিত হয়েছিল। হাইলাকান্দি টাউন হলে পূর্ববঙ্গ ত্রাণ কমিটির উদ্যোগে বাংলাদেশের পটভূমিকায় ' জয় বাংলা' নামক নাটক প্রদর্শিত হয়েছিল। নাটকটি দর্শকদের প্রশংসাও লাভ করে। এই নাটকটি সম্পর্কে জানা যায়, মূলত রাজাকারদের করা অত্যাচার, লুণ্ঠন, গণহত্যা, ধর্ষন এবং দেশত্যাগের পটভূমিতে নাটকটির নির্মাণ হয়েছিল। মূলত শরণার্থীদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে জাগরণ ঘটানো ছিল নাটকটি মঞ্চস্ত করার উদ্দেশ্য একাত্তর সালের ১৮ সেপ্টেম্বর হাইলাকান্দি ই, এন্ড, সি অফিস প্রাঙ্গনেও নাটকটি মঞ্চস্ত হয়েছিল।[৫]

বাংলার মুক্তিযুদ্ধ আলোকময়: - শরণার্থীদের মনোবল বাড়াতে, ২১ ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলন ও ১৯ মে'র বাংলা ভাষার জন্য নিবেদিত প্রাণ শহিদদের স্মৃতিকে উদ্ভাসিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আলোকময় রচিত একাত্তর সালে প্রকাশিত এই কাব্যগ্রন্থটিতে বাংলাভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কাব্য রচিত হয়েছিল।

বাংলাদেশ পত্রিকার উদ্যোগে প্রীতি সম্মেলন: সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার বিশেষ সংগ্রামী সংখ্যা সংকলন প্রকাশিত হত আসাম থেকে। একাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসে, আসামের গোপালগঞ্জের অস্থায়ী বাসভবনে আব্দুল মতিন চৌধুরী এক প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সাপ্তাহিত বাংলাদেশ পত্রিকা মূলত স্বাধীন বাংলাদেশ সম্পর্কিত খবর প্রকাশ করত। সংগ্রামী সংকলন প্রকাশ উপলক্ষ্যে ডিসেম্বর মাসে গোপালগঞ্জে একটি প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। 'যুগশঙ্খ' পত্রিকাতে এই সম্মেলন উপলক্ষে খবর প্রকাশিত হয়েছিল। শহরের বিখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী ও বাংলাদেশ এর বিষয়ে আগ্রহী নাগরিকরা এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিশিষ্ঠ আইনজীবি ব্যারিস্টার গোলাম ওসমানীর পরিচালনায় উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আন্দোলন, তার পটভূমি বর্তমান স্তর ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পরিতোষ পালচৌধুরী, অখিলবন্ধু চক্রবর্তী, আশিস দত্ত প্রমুখ। এই পত্রিকাটি প্রবীণ জননেতা, নন্দকিশোর সিংহের 'কো-অপারেটিভ প্রেস' থেকে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হতো।[৬]

মুক্তিযুদ্ধ ও অরুণোদয় পত্রিকা: ১৯৫০ সালে সাপ্তাহিক 'অরুণোদয়' পত্রিকার পথ চলা শুরু সুনীল দত্তরায়ের সম্পাদনায়। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত নিয়মিত এই পত্রিকাটি চালু ছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রথমেই 'অরুণোদয়' কার্যালয় মুক্তিফৌজ ও মুক্তিকামী বাংলাদেশের নাগরিগদের একটি তথ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে 'অরুণোদয়' পত্রিকার সম্পাদক সুনীল দত্তরায় ছিলেন বিশেষভাবে উৎসাহি। পত্রিকাটির সহযোগী সম্পাদক ছিলেন, অতীন দাশ। পত্রিকাটিতে নিয়মিত লিখতেন পরিতোষ পাল চৌধুরী, আশিস দত্ত।[৭]

বরাক উপত্যকার সহযোগী সংগঠক: - বরাক উপত্যকার অনেক সংগঠন বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ঈমাদ উদ্দীন বুলবুল এর ভাষ্য মতে তাঁরা বাংলাদেশ সহায়ক কমিটি গঠন করেছিলেন। সভাপতি শংকর রায় চৌধুরী শিলচর-২, সহ-সভাপতি মোঃ লুৎফুর রহমান জাটিঙ্গামুখ, সম্পাদক ইমান উদ্দীন বুলবুল কাটিগড়া, সহ-সম্পাদক আব্দুর রাকিম করিমগঞ্জ। জুলাই মাসে শিলচরের কাছাড় কলেজ থেকে প্রচার পত্র প্রকাশ পায়। "বাংলাদেশের জনগণকে আমরা কেন সাহায্য করিতেছি" বলে।[৮]

খালেক চৌধুরী ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: খালেক চৌধুরী বরাক উপত্যকায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সর্বতভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দিলীপকান্তি লস্কর তাঁর 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খালেক চৌধুরীর অবদান ও সীমান্ত শহর করিমগঞ্জের ভূমিকা' প্রবন্ধে 'পড়শি' পত্রিকায় লিখেছেন—

> “মূলত করিমগঞ্জ ও শিলচরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে তাঁর সংগীতের মাধ্যমে বাঙালির একতা ও যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের একত্র করে তুলতে পেরেছিলেন। গানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি বুঝিয়ে দেশাত্মবোধের চেতনা রসে মজিয়ে কত কথা, কত গল্প বলে বলে আসর জমাতেন।”[৯]

করিমগঞ্জের অধিবাসী খালেক চৌধুরী ছিলেন গণ সঙ্গীত শিল্পী। খালেক চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কয়েকজন উৎসাহী ব্যাক্তিকে নিয়ে একটি দল তৈরি করেছিলেন। গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে, রিকশায় মাইক বেঁধে পথে হেঁটে গান গাইতেন। মলয়কান্তি দে, শ্যামল দে ছিলেন খালেক চৌধুরীর সঙ্গী। মলয়কান্তি দে জানান

> “পুরো গানের বিষয়টাকেই আমাদের অভিনব মনে হতো। শুনেছি আই সি টি-তে নাকি এমন গানের স্কোয়াড বার হতো। গানগুলো ছিল অন্য ধরণের আমি, চরবাজারের শ্যামল দের খালেক দা’র গানের দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম। গানগুলোর মাধ্যমে মূলত শরণার্থীদের মধ্যে উদ্দীপনা, সাহস সঞ্চার করার চেষ্টা করতাম আমরা। যে গানগুলো আমরা গাইতাম প্রায় প্রচলিত গান না, একটা গানের কথা আলাদা ভাবে মনে আছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য, ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা গানটিকে সুর দিয়েছিলেন খালেক দা। আরেকটা গান ছিল, আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম, আমাদের সংগ্রাম চলছে। একবার মনে আছে শিলচর থেকে কবি কালীকুসুম চৌধুরী এসে সঙ্গী হয়েছিলেন। বাংলাদেশ থেকে আগত অনেক শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী সঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন খালেক চৌধুরীর। ভারত-বাংলাদেশ শিল্পী সমন্বয়ে, নজরুল জয়ন্তী পালন হয়েছিল একাত্তর সালে। পাঁচমিশেলি গানের পরিবর্তে, একাত্তর সালের বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে গান ও কবিতা পাঠ নির্বাচন করা হয়।”[১০]

বাংলাদেশের তথা সিলেটের কবি দিলওয়ারের কয়েকটি কবিতায় সুর দিয়ে গেয়েছেন একাত্তর কেন্দ্রীক গান । খালেক চৌধুরী যেমন কবিতায় সুর দিয়েছেন তেমনি একাত্তরের বিষয় অবলম্বন করে গান ও লিখেছেন। তাঁর ভুলব না ভুলব না ভুলব না তোমাদের দান। ভেঙে ভয় বন্ধনে, অধিকার অর্জনে তোমরা দিলে প্রাণ গানটি বিখ্যাত হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পর, সিলেটের একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে ১৯৭২ সালে উপস্থিত হয়েছিলেন খালেক চৌধুরী।

বরাকের কবিগানে মুক্তিযুদ্ধ: একাত্তর সালে বরাকের পল্লি কবি মোঃ আলাউদ্দিন খাঁ লিখেছিলেন ‘জয় বাংলার কবিতা’ মূলত মুক্তিযুদ্ধের ফলে দেশ ছেড়ে চলে আসা শরণার্থীদের জীবন, পূর্ব-বাংলার বাঙালিদের উপর হওয়া অত্যাচারের দলিল হয়ে উঠেছে কবিগানগুলি। নিম্নে এমনই একটি কবিগানের থেকে কিছু অংশের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হল। বরাকের কবিগান প্রথম খণ্ড থেকে কবিগানের অংশটির উদ্ধৃতি দেওয়া হল— ‘পল্লীবাসী লোক আমি ভাষা সাধারণ…আমি কি লিখিব ২ কি বলির জয় বাংলার কথা। কলমে না কালি চলে প্রাণে লাগে ব্যথা/ বড় দুঃখের কথা ২ কইতে হেতা চক্ষে আসে পাণী। রাজ্য জুড়িয়া মহামারী কভু নাহি শুনি/ মজিবুর রহমানে ২ ভাবে মনে প্রজাগণকে নিয়া (পূর্ব) পাকিস্তানের নাম জয় বাংলা বলিয়া/ মিস্টার ইয়াখাঁনে ২ নাহি মানে কি করি বয়ানে স্বাধীন বাংলা জয় ধ্বনি পূর্ব পাকিস্তান / হিন্দু মুসলিম যত ২ একমত দলবদ্ধ হইয়া। বিনা অস্ত্রে সংগ্রাম করে জয়বাংলা বলিয়া/…তখন ইয়াখাঁনে ২ নাহি মানে কি করে তখন, প্রজার উপর জুলুমজারী…বোমপাট করে ২ সহর বন্দরে গ্রামাঞ্চলে দিয়া। লক্ষ লক্ষ নরনারী অগ্নিতে জ্বলিয়া/ পুড়ে করল ছাই ২ শুনেন ভাই ঢাকার কাহিনি, বংশে বাতি জ্বালাইতে না রাখিল প্রাণী/ পরে কুমিলার ২ হায়রে হায় বেলা ২টার পরে। কেহ বসে খানা খেতে কেহ রান্না ঘরে/ হঠাৎ আওয়াজ হইল ১ বোমা পড়ল উপর থেকে ভাই। ৭০ হাজার নরনারী দেহে প্রাণ নাই/ কত মানুষ মরে ২ সহর বন্দরে যুগান্তরে পাই, এমন ঘটনা দেশে আর ঘটেনা ভাই/ যারা যারা জখম ছিল ২ কোথায় গেল না পাইলো খুজিয়া, মা জননী কোথায় গেল আধ মরা হইয়া/ হইল মরুভূমি ২ মাটির জমি পুড়ে হইল ছাই, মরা মৎস্য জলে ভাসে বাঁচবার সাধ্য নাই/ মানুষ মরে কত ২ অবিরত নিউজে খবর। আড়াই লক্ষ মানুষ মরে ঢাকার সহর/ কত স্থানে স্থানে ২ পাঠান সৈন্য গুলা বারুদ দিয়া। বাস্ত হারা করে দিল ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া/ কত জিলায় জিলায় ২ হায়রে হায় বোমা নিক্ষেপ করে। জ্বলে পুড়ে মানুষ মরে হাজারে হাজারে/ রংপুর টাউনেতে ২ পাই জানিতে গুলা বর্ষণ হয়। মানুশ-গরু শিয়াল কুকুর কিছু নাহি রয়/ এরুপ উত্তেজনা ২ আর সহেনা পাইয়া কোন বিচার। চতুরদিকে বোমার গ্যাসে হইল অন্ধকার/ একি মহামারী ২ অবিচার রাজ্য

শাসন করে। মানুষ মারি রাজ্য শাসন কোন বিধানে ধরে/...বর্ডার খোলা ছিল ২ লোক আসিল লক্ষ লক্ষ হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী দিয়াছেন আশ্রয়/ কত অফিস ঘরে ২ লোকনা ধরে হাইস্কুলে কত। আসাম প্রদেশ ১২ জিলায় ৮/১০ লাখের মত/...কবি হয় ক্রমশ এই পর্যন্ত সবাকে জানাই। বাকি কথা দ্বিতীয় সংখ্যায় দেব যে পুরাই/ কবি শেষ হইল ২ বাকী রইল কবিতার দাম। মূল্য মাত্র ২০ পয়সা সবায় জানাইলাম/ কবি শেষ হইল।[১১]

শুধু কবিগান নয়, খবরের কাগজগুলিতে বাংলাদেশ সম্পর্কিত বেশকিছু স্মৃতিলেখ্য এবং কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। এই ধরণের কাব্য সৃষ্টিগুলির উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলা সম্পর্কিত খবরাখবর গুলিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। 'পূর্ব্বায়ণ' পত্রিকায় মহানন্দ লিখেছেন 'ইয়াহিয়া হুঁসিয়ার' কবিতাটি— রক্তলোলুপ হইয়া খান হও হুঁসিয়ার/ হানা দিয়ে তুমি ভেবেছ কি মনে আমরা মানিব হার?/ কামান বন্দুক শত থাক তব ভারতের লোক জানে/ স্বদেশের মান রাখতেই হবে কোন বাধা নাহি মানে/ তুমি কি ভেবেছ দস্যু দানব ভারত করিবে গ্রাস?/ বাংলা দেশকে শ্মশান করেও মেটেনি তোমার আশ/ যারা দেয় তব শক্তি জুগিয়ে তারাও একথা জানে/ স্বাধীন ভারত উঠিবে জাগিয়া সকল শক্তি দানে/ হানাদার তুমি পাইবে শাস্তি যোগা যাহা তোমার/ ভারতের বীর সেনানীরা আজ উঠছে জেগে আবার/ তুমি কি জাননা ইয়াহিয়া খান, ভারতের নরনারী/ শত্রু দমন করিবার তরে তুলিবেই তরবারী/ হোকনা তোমার বিদেশী অস্ত্র দেখি কত আছে বল/ আমরা দাঁড়াব এক হয়ে সবে ভেবনাক দুর্বল...।[১২]

কবি, সাংস্কৃতিক কর্মীরা মূলত আগত শরণার্থীদের প্রত্যক্ষ বর্ণনা থেকেই কাব্য সৃষ্টির রসদ সংগ্রহ করেছিলেন। একাত্তর সালের প্রথম পর্ব পর্যন্ত, সাহিত্যিকদের কাব্যের বিবরণ জুড়ে ছিল মূলত, পূর্ব-পাকিস্তানে হওয়া বাঙালির প্রতি অত্যাচার, গণহত্যার চিত্র। ১৯৭১ সালের ১২ই মে 'পূর্ব্বায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল আলোকময় এর 'বাঙ্গালীর পরাজয় নাই' শীর্ষক কবিতাটি। কবিতাটি নিম্নরূপ—

'থামাও অশ্ব' কহে পাঠান জল্লাদ/ 'অসম্ভব' হুংকার মুক্তিকামী/ 'মৃত্যু ঘণায়ে এলে আগুন শিলায়/ নাই পরোয়া/ পৌঁছে গেছি লক্ষ্যে সুনিশ্চয়/ মুক্তি পিপাসুপ্রাণ/ চেনে না পরাজয়/ জল্লাদের শানানো কৃপাণ/ শিশু-নারী নির্বিচারে/ কচুকাটা করে/ বোবা কেন বিশ্বের বিবেক? / 'পুড়ছে পুড়ুক'/ চির বিপ্লবের পীঠ বঙ্গভূমি? / আগুন আহুতি দিলে ঘৃত/ দাবানলে ছিটালে পেট্রোল/ আলেয়ার বশালে দমকল/ নিভেনা আগুন:/ হয়ে উঠে অজর অমর।/ বঙ্গদেশ, বাঙ্গালীর পরাজয় নাই/ শ্মশানে যতোই বাড়ুক বাঙ্গালীর চাই।[১৩]

এগুলি ছাড়াও পরিতোষ পাল রায়চৌধুরী নিয়মিত রিপোটার্জধর্মী লেখা লিখতেন। শরণার্থী সমস্যা, পূর্ব-পাকিস্তানে সংগঠিত অত্যাচারের কাহিনি, যুদ্ধের গতি প্রকৃতি বর্ণনা থাকত তাতে। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে একাত্তর সালে শিলচরে দুটি নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার কথাও জানা যায়। যদিও নাটক দুটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। শিলচরের প্রখ্যাত কবি অতীন দাশ সেই সময় পর্বে বিক্ষিপ্ত কিছু সাহিত্যকর্ম রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

মুক্তিযুদ্ধে ভারত মূলত সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেছিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক সাহায্যের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা নিজ উদ্যোগে শরণার্থীদের সাহায্য করে দিয়েছেন মানবিকতার পরিচয়।

তথ্যসূত্র:

১. মামুন, মুনতাসীর, একাত্তরের বন্ধু যারা, অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০২২
২. মামুন, মুনতাসীর, মুক্তিযুদ্ধ একাত্তরের সাহিত্য ও পশ্চিমবঙ্গ, মাওলা ব্রাদার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০২১
৩. পূর্ব্বায়ণ (সাপ্তাহিক), সম্পাদক- চৌধুরী শক্তিধর, হাইলাকান্দি, ২৪ বর্ষ ১৯৭১
৪. পূর্ব্বায়ণ (সাপ্তাহিক), সম্পাদক- চৌধুরী শক্তিধর, হাইলাকান্দি, ২৪ বর্ষ, ১৯৭১, ১২ সেপ্টেম্বর,পৃ-২
৫. পূর্ব্বায়ণ (সাপ্তাহিক), সম্পাদক- চৌধুরী শক্তিধর, হাইলাকান্দি, ২৪ বর্ষ, ১৯৭১, ৯ জুন, পৃ-২
৬. যুগশঙ্খ, ১৯৭১, শিলচর, আসাম
৭. দাশ, অতীন, আসাম, শিলচর, ২৫.০৭.২৩
৮. বুলবুল, ঈমাদ উদ্দীন, আসাম, শিলচর, ২৯.০৭.২৩

৯. নস্কর, দিলীপ কান্তি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খালেক চৌধুরীর অবদান ও সীমান্ত শহর করিমগঞ্জের ভূমিকা, পড়শি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা, কলকাতা, প্রকাশ - শরৎ - ২০২৩, পৃ-৩২৮
১০. দে, মলয় কান্তি, শিলচর আসাম, ২৬.০৭.২৩
১১. বরাকের কবিগান (প্রথমখণ্ড), সম্পাদক - মজুমদার আবিদ রাজা জয় বাংলার কবিতা, পলি কবি মোঃ আলাউদ্দিন খাঁ, নতুন দিগন্ত প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ - জুন, ২০১৭পৃ-২৬৮-২৬৯
১২. পূর্ব্বায়ণ (সাপ্তাহিক), সম্পাদক- চৌধুরী শক্তিধর, হাইলাকান্দি, ১৯৭১
১৩. পূর্ব্বায়ণ (সাপ্তাহিক), সম্পাদক- চৌধুরী শক্তিধর, হাইলাকান্দি, ১৯৭১, ১২ মে, পৃ-৩

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1259-1265
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.128

বৈদিক যুগে নারীদের স্থান বিশ্লেষণ বা সমসাময়িক প্রেক্ষাপট

সম্রাট কোনাই, *এম এ, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 30.04.2025; Accepted:14.05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The main objective of this letter is to analyse the status of women during the Vedic period or to gain an understanding of the contemporary context. In particular, it attempts to shed light on various aspects of women's social status during the Vedic era, such as education and knowledge acquisition, domestic and family life, marital status and dignity, economic and social activities, and religious freedom. Women were given respect and dignity during the Vedic period. However, in some cases, women were considered inferior.

Although women lagged behind in education, there were some highly educated women like Ghosha, Apala, and Vishwa Vara. Many women were sages during the Vedic period and held positions of high honour. Names such as Kunti, Kaushalya, and Draupadi can be found in the Ramayana and Mahabharata. During this time, Brahmavadini women pursued lifelong learning and religious practices, such as Gargi, Maitreyi, and Lopamudra. Gargi and Maitreyi are mentioned in the Rigveda and Upanishads, where they participated in intellectual debates with men in the field of philosophy.

Keywords: Vedic period, Women status, Education, Upanishads,Knowledge acquisition, Crafts,Earthenware,Religious rituals, Swayamvara

> “তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছো আকীর্ণ করি
> বিচিত্র ছলনা-জালে
> হে ছলনাময়ী।
> মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ এ নিপুন হাতে
> সরল জীবনে”[১]

পৃথিবীর সমস্ত জীবই সত্য শিব রূপেই পরমাত্মার কোনো না কোনো অংশ। সত্য এবং সুন্দরের হাত ধরেই মানব জীবন এগিয়ে চলে গুটিগুটি পায়ে। তবে এই সত্য এবং সুন্দরকে উপাসনা করতে হয় মনন দিয়ে চিন্তন দিয়ে। সেই চিন্তন এবং মনের জগতে কোন লৈঙ্গিক বাধা রাজত্ব করতে পারে না। সে নারী হোক বা পুরুষ উভয়েই অনুভবের দরজায় সিঁধ কেটে জীবনকে সত্য শিব ও সুন্দরের পথে বিলিয়ে দেয়। সেই পথে পদ্মপুষ্প ছড়ানো থাকে না থাকে কণ্ঠক আকীর্ণ পদ্মের সমাহার, তাই উভয়কেই সেই পথ ধরেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয়। আজকে হয়তো পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের ক্ষমতা একটু খর্ব হলেও সেদিনের নারীরা যে কতটা চিন্তন দিয়ে জগৎ ও জীবনের রহস্যকে উপভোগ

[১] শেষ লেখা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

করেছিলেন তাই ধরা পড়েছে বৈদিক মনন ঋদ্ধ ঋষিদের চেতনার অন্তরালে। নারী হোক বা পুরুষ উভয়ই চিন্তন একই সরলরেখায় ছিল সেদিনের বৈদিক ঋষিদের চেতনায়। সেদিনের নারীরা কিভাবে আজকে নারীকে অনুপ্রাণিত করতে পারে তাদের প্রতিভার দাপটে তাই হলো আমার পত্রের মূল উপজীব্য বিষয়।

বৈদিক যুগে নারীরা:

"যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"[২] অর্থাৎ, যেখানে নারীদের পূজা করা হয়, সেখানে দেবতারা অবস্থান করেন। নর ও নারী এই দুই নিয়েই হচ্ছে মানব সংসার। সভ্যতার সেই ঊসালগ্ন হইতে যবে থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে ততদিন এই ভাবেই চলে আসছে। বেদে একমাত্র আদিতে পরম পুরুষ ছিলে একা। একা একা তার আর ভালো লাগলো না।- "স বৈ নৈব রেমে"[৩] তখন সেই প্রজাপতি নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে পুরুষ ও নারীর উৎপত্তি হল।সেই পুরুষ প্রকৃতিই হচ্ছে আদি প্রতি ও পত্নী।

'স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ
তত:পতিশ্চ পত্নী চাভাবতাম্'[৪]

পুরুষ ও নারী একই পরম পুরুষের দুই ভাগ।একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি একেবারে অসম্পূর্ণ। শাস্ত্রে আছে রথের দুই চাকা যেমন তাদের একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি কোনভাবে চলতে পারেনা।

বৈদিকযুগ (খ্রিষ্টপর্ব ১৫০০- ৫০০) ভারতীয় সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল, যেখানে নারীদের অবস্থান তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিল। এই সময় নারীরা শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ ও অর্থনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করত। ঋগ্বেদ সহ অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে অনেক বিদুষী নারীর উল্লেখ আছে, যারা জ্ঞান চর্চা ও আধ্যাত্মিকতার পারদর্শী ছিলেন। বৈদিক যুগে বেশ কিছু বিখ্যাত নারীর নাম পাওয়া যায়। ১) ঘোষা - ঘোষা ছিলেন একজন বিশিষ্ট ঋষিকা, যিনি বৈদিক মন্ত্র রচনা করেছিলেন। ২) আপালা- আপালা হলেন একজন ঋকবেদের গুরুত্বপূর্ণ ঋষিকা, যিনি স্বয়ং নিজে ইন্দ্র দেবের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। ৩) গার্গী -উপনিষদের যুগে গার্গীর মত এক প্রসিদ্ধ দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেছিল। যিনি যাজ্ঞবল্ক্যের মতো পন্ডিতের সঙ্গে বিতর্ক করেছিলেন। ৪) মৈত্রেয়ী- ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী যিনি আত্মা ও মোক্ষ সম্পর্কে গভীর আলোচনা করেছিলেন। ৫) লোপামুদ্রা- অগ্নির সমকক্ষ জ্ঞানী যিনি ঋষি অগস্থের পত্নী ছিলেন।

মহাভারতের যুগে নারীদের অনেক অধিকার সংকুচিত, সেখানে আমরা নারীদের চরিত্রের বিরুদ্ধে বহু কথা আলোচনা হতে দেখতে পাই। তবুও তার মধ্যেও মহাভারতের ইতিহাসের মধ্যে নারীদের গৌরবের বহু স্বাক্ষ রয়ে গেছে। যেমন জায়াকে মাতৃবৎ সম্মানর্হা মনে করিবে।- "ভার্যাং নর:পশ্যেন মাতৃবৎ"[৫]

স্ত্রীগণ যেখানে পূজিত সেখানে দেবতারা সুখী,যেখানে নারীগণ অপুজিতা সেখানে সমস্ত ক্রিয়া নিস্ফল।

"স্ত্রীয়ো যত্র চ পূজন্তে রমন্তে তত্র দেবতা:
অপুজিতাশ্চ যত্রৈতা: সর্বাস্তত্রাফলা:ক্রিয়া:।"[৬]

ঋগ্বেদ হল বৈদিক সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ। এখানে সরাসরি নারীর স্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোনও উক্তি না থাকলেও নানা বর্ণনা উপমান থেকে নারীর স্থান সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। ঋগ্বেদ-এর রচনায় কয়েকটি স্তর আছে, তার প্রথম স্তরের মন্ত্রগুলিতে নারী অপেক্ষাকৃত স্বাধীনচারিণী। দেবী ঊষা কোনও মন্ত্রে সূর্যের বধূ, কোথাও মাতা, কোথাও কন্যা; বিশ্বজনের দৃষ্টির সামনে আপন দেহশ্রী উদ্ঘাটন করছেন। (১:৪৬:৪) কখনও বা শুনি ঊষা স্মিতহাসিনী; নববধূ যেমন করে স্বামীর সামনে নিজেকে প্রকাশ করে, ঊষা তেমনই করেই নিজের আবরণ উন্মোচন করছেন। (১:১২৪:৭) সুন্দরী সুসজ্জিতা ঊষার দেহটি যেন মায়ের নিজের হাতে স্নান করিয়ে দেওয়া ও সাজিয়ে দেওয়া কন্যার দেহটি। (১:১২৩:১২) শুনতে পাই, অগ্নি তেমনই করে স্তোতার স্তবে খুশি হন যেমন করে প্রেমিক স্বামী তার বধূর সান্নিধ্যে আনন্দ পায়।

---

[২] মনুস্মৃতি ৩/৫৬

[৩] বৃহদারণ্যক ১.৪.৩

[৪] বৃহদারণ্যক ১.৪.৩

[৫] মহাভারত আদি ৭৪,৪৮

[৬] অনুশাসন ৪৬.৫.৬

(৩:৬২:৮) অগ্নি তেমনই পবিত্র যেমন পবিত্র স্বামীর দ্বারা সম্মানিত বধূ। (১:৭৩:৩) দেখা যাচ্ছে, দেবতার আনন্দ দেবতার পবিত্রতার উপমান, মানবের প্রেম, মানবীর শুচিতা। এই যুগেই শুনি নারী নিজেই তার জীবনসঙ্গী বেছে নেয়— 'স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ।' (১০:২৭:১২) আবার একটু পরের যুগে শুনি, প্রিয়া স্ত্রী যেমন প্রিয় স্বামীতে আনন্দ পায়, হে ভগদেব, তুমি যেন আমাতে তেমনই সুখী হও। (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২:৪:৬:৫৬) বহুবার একটি উপমা পাই, উপাসক তাঁর দেবতার কাছে আসছেন যেমন করে কোনও পুরুষ তার কাম্য নারীর কাছে আসে বা তার পেছনে পেছনে যায়— মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।[৭]

বৈদিক যুগে নারীদের কার্যকলাপ:

বৈদিক যুগে নারীদের স্থান ছিল তুলনামূলকভাবে উন্নত, যদিও সময়ের সাথে সাথে তা হ্রাস পেতে শুরু করে। তারা শিক্ষা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং সমাজে তাদের নিজস্ব ভূমিকা পালন করত, তবে পরবর্তীকালে তাদের অধিকার সীমিত হতে শুরু করে।

বৈদিক যুগ যা প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত: প্রারম্ভিক বৈদিক যুগ এবং উত্তর বৈদিক যুগ। এই সময়ে নারীদের সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অবস্থান উল্লেখযোগ্য ছিল। প্রারম্ভিক বৈদিক যুগে নারীরা তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতেন, তবে উত্তর বৈদিক যুগে তাদের অবস্থার অবনতি ঘটে।

শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন:

বৈদিক যুগে মহিলারা যথেষ্ট স্বাধীনতা পেতেন। তাঁরা শিক্ষা অর্জন করতে পারতেন, যাগযজ্ঞেও অংশগ্রহণ করতে পারতেন। এমনকি তাঁরা বৈদিক জ্ঞান অর্জন করার অধিকারীও ছিলেন। মুনি ঋষিদের কন্যারা আবাসিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমপরিমাণ বিদ্যা অর্জন করতে পারতেন।সেই সময় উপনয়ন মেয়েদের ক্ষেত্রেও বহুল প্রচলিত ছিল,মেয়েদের শুধুমাত্র পৈতে পরার অধিকারই ছিল না, গুরুভাইদের সঙ্গে বেদ, বেদাঙ্গ পাঠ করার সুযোগও ছিল সমান।

মহিলাদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হত, যেমন 'ঋষিকা" (অর্থাৎ যিনি ঋষিদের মতই মন্ত্রস্রষ্টা হওয়ার অধিকারিণী) 'ঋত্বিকা' (যিনি যজ্ঞের অধিকারিণী) 'ব্রহ্মবাদিনী' (যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভকরেছেন), 'মন্ত্রনীদ' বা 'মন্ত্রদৃক' (যিনি মন্ত্র বা বৈদিক জ্ঞান অর্জন করেছেন) 'পণ্ডিত' ইত্যাদি। রামায়ণ এবং মহাভারতে কুন্তি, কৌশল্যা, তারা, দ্রৌপদী ইত্যাদির নামের সঙ্গে 'ঋত্বিকা' এবং 'মন্ত্রনীদ' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। ভবভূতি বিরোচিত 'উত্তর রামচরিত' এ বাল্মীকির আশ্রমে রামের পুত্র লব-কুশের সঙ্গে আত্রেয়ীর বেদান্ত পাঠের উল্লেখ আছে।

অনেক নারী বৈদিক সাহিত্য ও দর্শনে দক্ষ ছিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মবাদিনী নারীরা আজীবন শিক্ষাগ্রহণ ও ধর্মীয় চর্চা করতেন, যেমন গার্গী, মৈত্রেয়ী ও লোপামুদ্রা। গার্গী এবং মৈত্রেয়ীর নাম ঋগ্বেদ ও উপনিষদে পাওয়া যায়, যারা জ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে যুক্তি তর্কে অংশ নিতেন এবং 'সদ্যোধবা' যারা বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত বেদ অধ্যায়ন করেছিলেন এই দুটি শ্রেণির শিক্ষিত নারী ছিলেন।

বৈদিক যুগে কন্যা সন্তানদের সাথে কখনো দূরে ব্যবহার করা হয়নি যদিও পুত্র সন্তানদেরকে কন্যা সন্তানদের বেশি পছন্দ করা হতো। তবে তারাও পুত্র সন্তানদের মতো শিক্ষা অর্জন করে করে এবং যাগযজ্ঞ উপনয়ন আচারের সাথেও ব্রহ্মচারী হওয়ার সুযোগ সুবিধাও পেত। বৈদিক যুগের নারীরা পুরুষদের মতই বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন লোপামুদ্রা এবং ঘোষা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঋক বৈদিক যুগে বেদ অধ্যায়ের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়কেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হতো এর ফলে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঋগ্বের সংহিতায় বেশ কয়েক জন নারী দ্রষ্টা ও নারী ঋষিকার নাম উল্লেখ রয়েছে যাদের মধ্যে মৈত্রী, গার্গী, লোপামুদ্রা, ঘোষা,বিশ্বাভারা,বিখ্যাত নারী লেখক হিসাবে এরা প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমরা দেখতে পাই জনক রাজ্যের রাজা বিদহের রাজসভায় গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের মতো পন্ডিতের সঙ্গে বিতর্ক করে তাকে তর্ক বিদ্যায় তাকে পরাজিত করেছিলেন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে থাকল এবং তার প্রভাব দেখা যেতে লাগল নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও। মনুর যুগ থেকে নারীর সামাজিক মর্যাদা কমে যেতে লাগল এবং নারী শিক্ষার ক্রমশ অবনতি হতে লাগল।

---

[৭] ঋগ্বেদ ৭:৮০:২

গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবন:

বৈদিক সমাজে নারীরা গার্হস্থ্য জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন। তাঁরা সংসার পরিচালনার পাশাপাশি কৃষি, পশুপালন ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও অংশ নিতেন।তাঁরা সন্তানদের লালন-পালন এবং ধর্মীয় কার্যাবলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। স্ত্রী-স্বামীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, এবং নারীদেরকে 'গৃহলক্ষ্মী' বা 'গৃহস্থালীর রক্ষক' হিসেবে দেখা হতো। সেই সময়ে নারীরা ছিলেন পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। গৃহিণী হিসেবে নারীর কর্তৃত্ব ছিল বাড়ির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে।স্ত্রী ও স্বামী একসঙ্গে যজ্ঞে অংশগ্রহণ করতেন। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হতো না, যা তার মর্যাদার প্রতিফলন।প্রাচীন ভারতের সিন্ধু সভ্যতায় নানা রকম দেব-দেবীর পূজা পার্বণের উল্লেখ পাওয়া যায়।ঋক বৈদিক যুগে বিশেষত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে নারীদের অবস্থান স্বীকৃতি ছিল।

বৈবাহিক অবস্থা ও নারীর মর্যাদা:

প্রাচীন ভারতের নারীদের বৈবাহিক অবস্থা সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এক জটিল ও পরিবর্তনশীল বিষয় ছিল। প্রথমত, বৈদিক যুগে নারীদের তুলনামূলকভাবে স্বাধীনতা ছিল। তাঁরা শিক্ষা লাভ করতেন, উপনয়ন (শিক্ষা শুরু করার ধর্মীয় আচার) গ্রহণ করতেন এবং অনেক নারী ঋষি ও কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ঋগ্বেদিক সমাজে নারীদের উপর জোর করে বিয়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। আরজই বলতে 'চিরকুমারী এবং আমাজুহ, যে নিজের বাবা-মায়ের বাড়িতে বৃদ্ধ হয়' বলে উল্লেখ করেছে, বেদ- সংহিতায়।

এই সময় নারীরা তাদের শিক্ষা সমাপ্তির পর নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী স্বয়ম্বর স্বামী বেছে নেওয়ার মাধ্যমে তাদের জীবনসঙ্গী নির্বাচন করে বিবাহিত জীবন গ্রহণের অনুমতি ছিল।

তবে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। ঋগ্বেদ- সংহিতা প্রাথমিক বৈদিক যুগে বহুবিবাহ এবং বহুপত্নী উভয়ের অস্তিত্ব প্রকাশ করেছে। বেদ-এর কিছু অনুচ্ছেদেও স্ত্রী'কে বহুবচনে স্বামীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখ করা হয়েছে। বিধবাদের জন্যও পুনর্বিবাহ সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল; তবে ঋগ্বেদিক বিবাহ ব্যবস্থায় বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি ছিল না।সেই সময় বিবাহের রীতি নানা প্রকার ছিল, বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অঞ্চলে নারীদের বৈবাহিক অবস্থার প্রকৃতি ভিন্ন ছিল,যেমন স্বয়ম্বর, গন্ধর্ব বিবাহ, ব্রাহ্ম বিবাহ, প্রজাপত্য বিবাহ ইত্যাদি। নারীরা স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা পেতেন, বিশেষ করে স্বয়ম্বর প্রথায় যেখানে মেয়েরা নিজেদের পছন্দমতো পাত্র নির্বাচন করতেন। তবে বৈদিক যুগের পরবর্তী পর্যায়ে, বিশেষ করে উত্তর বৈদিক যুগ ও মহাকাব্য যুগে নারীদের অবস্থার অবনতি ঘটে। সমাজে পিতৃতান্ত্রিক প্রভাব বাড়তে থাকে এবং নারীদের স্বাধীনতা হ্রাস পায়। বিবাহ ছিল নারীর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, এবং তাদের অধিকাংশই অল্প বয়সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতেন। পিতার কর্তৃত্ব থেকে স্বামীর কর্তৃত্বে নারীদের স্থানান্তর ঘটত। নারীকে পরিবারের মান ও ধর্ম রক্ষার এক মাধ্যম হিসেবে দেখা হতো। এই সময়ে বিবাহ বিভিন্ন প্রকার ছিল। 'ব্রাহ্ম বিবাহ' ছিল সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ, যেখানে কন্যাকে পাত্রের ধর্ম ও চারিত্রিক গুণ বিবেচনা করে প্রদান করা হতো। 'গান্ধর্ব বিবাহ' ছিল প্রেমের ভিত্তিতে বিবাহ, যা মহাকাব্যে রোমান্টিকভাবে বর্ণিত হলেও সামাজিকভাবে কম গ্রহণযোগ্য ছিল। 'অসুর বিবাহ' বা কন্যা কেনা, এবং 'রাক্ষস বিবাহ' বা বলপ্রয়োগ করে কন্যাকে বিবাহ করাও সমাজে দেখা যেত, যদিও এগুলো নৈতিকভাবে নিন্দিত ছিল।

ধর্মীয় ও আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ:

বৈদিক যুগে নারীরা সমাজে সুস্পষ্ট সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।তারা শুধু গৃহকর্ত্রী ছিলেন না, বরং ধর্মীয় ও আচার-অনুষ্ঠানে ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। বৈদিক সাহিত্য, বিশেষত ঋগ্বেদে নারীদের বিদ্যাশিক্ষা, ধর্মীয় অনুশীলন ও মন্ত্র রচনার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদিক সমাজে নারীরা তাদের পতির সাথে যৌথভাবে ত্যাগ স্বীকার করতে সম্মানিত হত। নারীদেরও বৈদিক মন্ত্র পাঠ করার স্বাধীনতা ছিল, এবং জনসভায় বিতর্ককারী হিসাবে অংশ নেওয়ার অধিকার ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের মতো বৈদিক সাহিত্যে পুরুষের মত নারীরাও ব্রহ্মচর্য পালন করত। অনেক ব্রহ্মচারীনের নাম উল্লেখ রয়েছে। মৈত্রী, গার্গী, লোপামুদ্রা , ঘোষা, তার স্পষ্ট উদাহরণ। সেই যুগের নারীরা পুরুষের মতো মন্ত্ররচনা, মন্ত্রপাঠ, যাগযজ্ঞ, ধর্মীয় সংস্কার সহ নানা বিষয়ে সম্পূর্ন স্বাধীনতা ছিল। যজ্ঞক্ষেত্রে যজমানের পাশে থাকার বিষয়ে স্বাধীন ছিল। নারীরা সেই যুগে পুরুষের মতো ধর্মচর্চায় সমান স্বাধীনতা ভোগ করে এবং তাদেরই পাশে বসে একের পর এক মন্ত্র উচ্চারণ করতেন। তাই আমরা লক্ষ করি বৈদিকযুগে নারীরা গৃহকর্মের পাশাপাশি

অপার্থিব বিষয় তথা ধর্মীয় কাজেও অংশগ্রহণ করতেন ঋগবেদের অনেক মন্ত্রে স্বামী ও স্ত্রীর একত্রে যজ্ঞ সম্পাদনের বিবরণ পাওয়া যায়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা:

বৈদিক যুগে নারীদের প্রতিদিনকার জীবন ছিল পরিশ্রমী, সৃজনশীল এবং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা কেবল গৃহিণী হিসেবে নয়, বরং পরিবার ও সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলতে সহায়ক শক্তি ছিলেন। নারীরা গৃহপালিত পশুর দেখাশোনা করতেন এবং পশুপালনের মাধ্যমে পরিবারের অর্থনৈতিক দিকে ভূমিকা রাখতেন। অনেক সময় নারীরা কৃষিকাজেও সহযোগিতা করতেন, বিশেষত বীজ রোপণ ও শস্য সংগ্রহে। নারীরা হস্তশিল্পে দক্ষ ছিলেন। তাঁরা মাটি, কাপড়, পশম ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন দ্রব্য তৈরি করতেন। এগুলো স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতেন। বৈদিক নারীরা শিক্ষিত ছিলেন। লোপামুদ্রা, ঘোষা, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রমুখ নারী ঋষিরা বৈদিক মন্ত্র রচনা করেছেন।তাঁরা গুরু হিসেবে শিক্ষাদান করতেন এবং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডেও অংশ নিতেন, যা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম হিসেবে গণ্য করা যায়।

নারীরা বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন এবং তা ঘিরে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পূজা সামগ্রী প্রস্তুতি, আলংকারিক সামগ্রী তৈরি, অতিথি আপ্যায়ন ইত্যাদি সংঘটিত হতো, তাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। বৈদিক যুগে নারীদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল। তাঁরা নিজেদের বিবাহ ও শিক্ষার সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন, যা তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতার প্রকাশ বলে ধরা যায়।বিধবা নারী পুনর্বিবাহ করতে পারতেন, যা তাঁদের জীবনে পুনরায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করত। স্ত্রী হিসেবে একজন নারীর স্বামীর সম্পত্তিতে সরাসরি কোনো অংশ ছিল না। যাইহোক, একজন পরিত্যক্ত স্ত্রী তার স্বামীর সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ এর অধিকারী ছিল। একজন বিধবা তপস্বী জীবনযাপন করবে বলে আশা করা হতো এবং তার স্বামীর সম্পত্তিতে তার কোনো অংশ ছিল না। সেই সময়ে মুদ্রা চালু না থাকায় পণ্য বিনিময় প্রথা চালু ছিল। নারীরা এই বিনিময় প্রক্রিয়াতেও অংশ নিতেন।

রাজনৈতিক কার্যকলাপ:

এই যুগে সমাজ ছিল মূলত গোষ্ঠীকেন্দ্রিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো ছিল সরল। নারীদের অবস্থান এই যুগে তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিল এবং তাঁরা সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কিছু ভূমিকা পালন করতেন। বৈদিক সাহিত্যে 'সভা' ও 'সমিতি'র উল্লেখ পাওয়া যায়, যা ছিল গোষ্ঠীর দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিষদ। এই পরিষদে প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা অংশগ্রহণ করতেন, এবং অনেক পণ্ডিতের মতে নারীরাও সভা ও সমিতিতে অংশ নিতেন। রামায়ণ ও মহাভারতে নারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনেক তথ্য আমরা পেয়ে থাকি।

ঋগ্বেদে 'ঋষিকা' বা মহিলা ঋষিদের উল্লেখ আছে, যেমন: লোপামুদ্রা, গার্গী, মৈত্রেয়ী ইত্যাদি। তাঁরা শুধুমাত্র ধর্মীয় নয়, দার্শনিক এবং রাজনৈতিক আলোচনাতেও অংশগ্রহণ করতেন। উদাহরণস্বরূপ, গার্গী ও রাজা জনকের দরবারে আত্মা ও ব্রহ্মচিন্তা নিয়ে বিতর্ক করেন, যা রাজনৈতিক সভার অংশ ছিল।

বৈদিক যুগে সাধারণত পিতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার প্রথা চালু ছিল, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীরাও সম্পত্তি ও রাজত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে পেতেন বলে ইঙ্গিত মেলে। বিশেষ করে বৈদিক সাহিত্যে 'অপালা', 'বিশ্ববারা' প্রভৃতি নারীরা যে সামাজিকভাবে শক্তিশালী ছিলেন, তার প্রমাণ মেলে। বৈদিক যুগের গোত্র ও কুলভিত্তিক সমাজে নারীরা পারিবারিক উত্তরাধিকারের মাধ্যমেও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতেন। একজন স্ত্রী রাজপরিবারে বিয়ে করলে তিনি সরাসরি রাজনীতির অংশ না হলেও রাজা বা প্রধানের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতেন। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজা না থাকলে রানী শাসনকার্য পরিচালনা করতেন— যদিও এ ধরনের দৃষ্টান্ত সংখ্যায় কম। বৈদিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতেও নারীদের উপস্থিতি ছিল বাধ্যতামূলক। যজ্ঞের মতো ধর্মীয়-রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ উপস্থিতি ও মন্ত্র উচ্চারণের প্রথা ছিল। এ থেকেই বোঝা যায়, নারীরা শুধুমাত্র গৃহকর্মে সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বরং ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক বলয়েও প্রভাব বিস্তার করতেন।তবে বৈদিক যুগের শেষভাগে ধীরে ধীরে নারীদের অবস্থান কিছুটা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। সামাজিক বিধিনিষেধ, উত্তরাধিকার আইন ও বর্ণভিত্তিক বিভাজনের কারণে নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সীমিত হয়ে পড়ে। শিক্ষালাভের অধিকার সংকুচিত হতে থাকে এবং নারীদের ভূমিকা গৃহস্থালির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

সবশেষে বলা যায়, বৈদিক যুগে নারীরা সরাসরি রাজনীতি বা প্রশাসনে অংশ নেননি ঠিকই, তবে তাদের সামাজিক, ধর্মীয় ও পারিবারিক প্রভাব ছিল যথেষ্ট। সভা-সমিতিতে তাদের সম্ভাব্য অংশগ্রহণ, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা এবং বিদুষী নারীদের মন্ত্র রচনার মাধ্যমে তারা যে একটি সচেতন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের অংশ ছিলেন, তা অস্বীকার করা যায় না।

বর্তমান সমাজে নারীদের অনুপ্রেরণা:

বৈদিক যুগের নারীরা ছিলেন স্বাধীন, শিক্ষিত, আত্মবিশ্বাসী ও সমাজে সক্রিয়। তাদের জীবনাদর্শ ও অবদান আজকের নারীদের জন্য এক অনন্য অনুপ্রেরণা। বর্তমান সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন, সমান অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে বৈদিক নারীরা আমাদের পথপ্রদর্শক।

রামায়ণে সীতা, কৌশল্যা, মন্দোদরী, শূর্পনখা প্রভৃতি নারীদের চরিত্র থেকে আমরা বিভিন্ন শিক্ষা পাই—সীতা:- আদর্শ স্ত্রী ও ধৈর্যের প্রতীক। তিনি নারীশক্তির প্রতিরূপ, যিনি নিজের নীতির সঙ্গে কখনো আপস করেননি। তাঁর চরিত্র থেকে সম্মান, ত্যাগ ও আত্মসংযমের শিক্ষা পাওয়া যায়। কৌশল্যা:- একজন আদর্শ মাতার প্রতিচ্ছবি, যিনি ধৈর্য ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। মন্দোদরী: রাবণের স্ত্রী, যিনি তাঁর স্বামীকে সঠিক পথের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর চরিত্র থেকে নৈতিকতা ও সুবিচারের শিক্ষা পাওয়া যায়। মহাভারতে নারীদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্রৌপদী, কুন্তী, গান্ধারী, সুভদ্রা প্রমুখ নারীদের চরিত্র থেকে আমরা নানা শিক্ষামূলক দিক জানতে পারি— দ্রৌপদী: বুদ্ধিমান, সাহসী এবং আত্মসম্মানের জন্য লড়াই করা এক নারীর প্রতীক। তাঁর জীবন থেকে নারীদের আত্মমর্যাদার শিক্ষা পাওয়া যায়। কুন্তী: ত্যাগ ও সহনশীলতার প্রতীক, যিনি কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরে সন্তানদের সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। গান্ধারী: স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠতা এবং ধর্মের পথে অবিচল থাকার প্রতীক। তাঁর জীবন থেকে কর্তব্যপরায়ণতার শিক্ষা পাওয়া যায়।

উপসংহার:

বৈদিক যুগ ছিল ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব, যেখানে নারীদের সামাজিক অবস্থান তুলনামূলকভাবে মর্যাদাপূর্ণ ছিল। এই যুগে নারীকে জ্ঞান, ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের পূর্ণ অধিকার প্রদান করা হতো। নারীরা শিক্ষিত ছিলেন এবং ঋষি, ঋষিকা বা বেদের মন্ত্র রচয়িতা হিসেবেও তারা পরিচিত ছিলেন। লোপামুদ্রা, ঘোষা, অপরা ও গার্গীর মতো নারীদের নাম ঋগ্বেদে পাওয়া যায়, যারা ধর্মীয় ও দার্শনিক বিতর্কে অংশ নিয়েছেন।

বৈদিক সমাজে নারীর ভূমিকা শুধুমাত্র গৃহস্থালির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তারা শিক্ষা ও ধর্মচর্চার সমান সুযোগ পেতেন। বৈদিক সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল 'উপনয়ন সংস্কার', যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়ই বেদ অধ্যয়নের অধিকার রাখতেন। বিবাহ ছিল স্বাধীনচেতা এবং পাণিগ্রহণের মতো অনুষ্ঠান নারীর সম্মতির ভিত্তিতে সম্পন্ন হতো। এমনকি বহু ক্ষেত্রে কন্যা নিজে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করতেন- যা স্বয়ম্বর প্রথা নামে পরিচিত।তবে, সময়ের প্রবাহে এবং পরবর্তী উত্তরবৈদিক ও ব্রাহ্মণ যুগে নারীর এই মর্যাদা কমতে শুরু করে। সমাজে পিতৃতান্ত্রিক প্রভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীর স্বাধীনতা হ্রাস পায় এবং তারা ধীরে ধীরে গৃহকেন্দ্রিক ও পরনির্ভরশীল ভূমিকায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

সবশেষে বলা যায়, বৈদিক যুগ নারীর জ্ঞান, শিক্ষা ও আত্মনির্ভরতার একটি স্বর্ণযুগ হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই প্রাচীন যুগ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে নারীর সমান অধিকার ও মর্যাদা কোনো আধুনিক ধারণা নয়; বরং তা ছিল ভারতীয় সভ্যতার এক উজ্জ্বল অধ্যায়, যা আজকের সমাজের জন্যও অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। ঋগ্বেদ সংহিতা, (দ্বিতীয় খণ্ড), আবদুল আযীয আল-আমান সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৫

২। কঠোপনিষদ্ (শঙ্করভগবৎকৃত ভাষ্যসমেতা), স্বামী জুষ্টানন্দ অনুদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, ২০১১

৩। কাব্যপ্রকাশ, কল্পিকা মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, শ্রী লক্ষী প্রেস প্রকাশিত, বোলপুর, প্রথম প্রকাশ, ২০০০

৪। গীতাঞ্জলি– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রকাশিত, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১৩১৭, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৯

৫। গীতবিতান (অখণ্ড সংস্করণ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, বিশ্বভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৩৮, পুনর্মুদ্রণ, ১৪২১

৬। চার্বাক-দর্শনম্, শ্রী পঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রিনা অনুদিত,সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা,প্রকাশকাল, ১৩৯৪

৭। দেবযান, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০১

৮। ধন্যালোকঃ সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, তৃতীয় প্রকাশ, ২০০৯

৯। ধন্যালোকঃ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীমদভিনবগুপ্তাচার্যকৃত লোচনটীকা সহিত), বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, প্রকাশকাল, ১৯৮৩

১০। ধর্ম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১৩১৫, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৬

১১। সেন, ক্ষিতিমোহন, হিন্দুধর্ম, আনন্দ, কলিকাতা, প্রকাশকাল, ২০১২

১২। সেন, ক্ষিতিমোহন, প্রাচীন ভারতের নারী বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৫৭

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1266-1271
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.129

ঔপনিবেশিক আমলে মেদিনীপুর জেলার ক্যানেল ব্যবস্থা ও তার প্রভাব

রাজীব বেরা, *সরকার অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক, রবীন্দ্র ভারতী মহাবিদ্যালয়, কোলাঘাট, পূর্ব মেদিনীপুর, পি এইচ ডি গবেষক, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত), বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 06.04.2025; Accepted:14 .05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Medinipur is the second largest and second populated District of Bengal and has been an agricultural District since ancient times. The population of this District is more dependent on agriculture than other districts of Bengal. The fertile land, natural and geographical environment and rivers of the district are particularly very helpful to agricultural work. In spite of this multiple canal systems were built for agricultural purposes in this District. Some important canals are the Medinipur Canal, Hijli Tidal Canal and the Orissa Coastal Canal. In 1886, the East Indian Irrigation Canal Company began boring process of the Medinipur Canal and in 1871-72 the first irrigation started through this Canal, the quantity of irrigation was 6029 acres. Excavation of the Hijli Tidal Canal began in 1868 and the Orissa Coastal Canal in 1880. Since then, the quantity of irrigation has continuously increased in this district. In 1925-26, 75698 acres of land was irrigated and the profit was 182044 Rs. In 1939-40, 64882 acres of land was also irrigated. Moreover, through various branches of these Canals irrigation was possible in a wide area of this District. Therefore, the subject of this article is how the Canal system in Medinipur District expanded the agricultural system and improved the transportation system in this District.

Keywords: Agricultural, Fertile, Natural, Geographical, Environment, Irrigation, Excavation

মেদিনীপুর, বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম ও দ্বিতীয় জনবহুল এবং অতি প্রাচীনকাল থেকেই কৃষি নির্ভর এক জেলা। বাংলার অন্যান্য জেলাগুলির থেকে এই জেলার জনসমাজ মাত্রাতিরিক্ত ভাবেই কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। সামগ্রিক ভাগে বাংলার জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশ জনগণ কৃষি কাজে যুক্ত, সেখানে এই জেলার ৭৬ শতাংশ জনগণ কৃষি কার্যের ওপর নির্ভরশীল।[১] মেদিনীপুর জেলার চেহারা অনেকটা আয়তক্ষেত্রের মতো উত্তর -দক্ষিণে লম্বা প্রায় ১৪০ কিমি. পূর্ব-পশ্চিমে একটু কম। ভূ প্রকৃতিগত দিক দিয়ে ঝাড়গ্রাম সহ মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা শক্ত পাথুরে ল্যাটেরাইট প্রকৃতির যা চাষবাষের উপযোগী নয়। আবার ঘাটাল, খড়্গপুর, তমলুক, কাঁথি, এগরা মহকুমার মাটি চাষাবাষের উপযুক্ত।

এই জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে নদী-নালার সংখ্যা একটু বেশী। হুগলি নদী এই জেলায় প্রবেশ না করলেও তার শাখানদী জেলার ভরণপোষণে সাহায্য করেছে। হুগলীর অন্যতম উপনদী রূপনারায়ণ মেদিনীপুরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, রূপনারায়ণের প্রধান উপনদী শিলাবতী ছাড়াও এই জেলাতে কাঁসাই, কেলেঘাই, সুবর্ণরেখা, হলদি, রসলপুর, তারাফেনী, ডুলুং, পারাং, তমাল, কুবাই প্রভৃতি নদী রয়েছে। নদনদী ছাড়াও অনেক খাল এই

জেলার শরীরে রক্ত সঞ্চালনে সহযোগিতা করছে অকুণ্ঠভাবে।[২] সুতরাং উপযুক্ত ভৌগোলিক পরিবেশ, উর্বর ভূমি ও একাধিক নদ-নদীর উপস্থিতি এই জেলাকে কৃষি সমৃদ্ধ জেলা হিসাবে গড়ে তুলেছে। কৃষি কাজের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

এছাড়াও জেলার সর্বত্র কৃষিকার্যের সম্প্রসারণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নৌ পরিবহনের জন্য ব্রিটিশ সরকার এই জেলাতে একাধিক ক্যানেল নির্মাণ করেছিল। ১৮৬৪ সালের ক্যানেল আইনে (The Canals Act, 1864) লেফটেনেন্ট গভর্ণরের অধীনে বাংলা প্রদেশে ক্যালেন থেকে রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত নিয়মাবলী নির্ধারণ করা, ক্যানেল, খাল ও নালা নির্মাণ--- উন্নতি সাধনের কথা বলা হয়।[৩] এই আইনের ভিত্তিতেই বাংলার অন্যান্য জেলার মতো মেদিনীপুর জেলাতে ক্যানেল, খাল ও নালার খনন কার্য শুরু হয়।

মেদিনীপুর জেলার প্রধান ৩টি গুরুত্বপূর্ণ ক্যানেল হল--- ১) মেদিনীপুর ক্যানেল, ২) হিজলী-টাইডাল ক্যানেল ও ৩) ওড়িশা উপকূলের ক্যানেল। উক্ত ক্যানেলগুলির মধ্যে মেদিনীপুর ক্যানেল নির্মিত হয়েছিল জলসেচ ও পরিবহন-এর উদ্দেশ্যে, আর বাকী দুটি ক্যানেল শুধুমাত্র নৌপরিবহনের উদ্দেশ্যে খনন করা হয়েছিল।[৪] উক্ত ক্যানেলগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে নেওয়া যাক প্রথমে---

মেদিনীপুর ক্যানেল: ১৮৬৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া ইরিগ্রেশন অ্যান্ড ক্যানেল কোম্পানী মেদিনীপুর ক্যানেলের খননকার্য শুরু করেছিল। কিন্তু ২ বছর পর সরকার এই ক্যানেলের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে নিয়ে নেয়। প্রসঙ্গত এই ক্যানেলটি ওড়িশা ক্যানেলের অন্তর্ভূক্ত পরিকল্পনা হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল উচ্চ জলপথের মাধ্যমে বানিজ্যিক পণ্য পরিবহনের যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কটক থেকে কলিকাতা পর্যন্ত নৌ-পরিবহনের পথ তৈরি করা। যদিও খুবই প্রাথমিক পর্বে এই ক্যানেলটি একটি স্বতন্ত্র প্রকল্প হিসাবে গৃহীত হয়। মেদিনীপুর পর্যন্ত কাঁসাই নদীর জল পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয় এই ক্যানেলের মধ্যে যে, এখানে জলস্তর নিয়ন্ত্রণের প্রধান কেন্দ্র নির্মিত হয়। ক্যানেলটি উলুবেড়িয়া পেরিয়ে হুগলি নদী পর্যন্ত প্রসারিত রূপনারায়ণ ও দামোদর নদী পেরিয়ে।

প্রধান মেদিনীপুর ক্যানেলটি ৪টি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বের কেন্দ্র মেদিনীপুর যেখানে জল পরিমাপের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং যার বিস্তৃতি পাঁশকুড়া পর্যন্ত। দৈর্ঘ্য ২৫ মাইল। দ্বিতীয় বিভাগটি পাঁশকুড়া থেকে দেনান হয়ে রূপনারায়ণ পর্যন্ত, ১২ মাইল এখানেও একটি লকগেট যুক্ত জলস্তর নিয়ন্ত্রণের জন্য। তৃতীয় বিভাগটি রূপনারায়ণ থেকে কাঁটাপুকুর হয়ে, কাটাপাড়া পেরিয়ে দামোদর নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। চতুর্থ বিভাগটি দামেদর থেকে হুগলী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ক্যানেলের সামগ্রিক দৈর্ঘ ৫৩ মাইল। ১৮৬৮ সালে ক্যানেলটি নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত খরচ হিসাবে ৮.৫ মিলিয়ন ধার্য কার হয়েছিল। এবং নির্মাণ কার্য শেষ হয় ১৮৮৮-৮৯ সালে খরচ হয়েছিল ৮.৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৫১ সালে ৩১ মার্চ পর্যন্ত মোট খরচ হয়েছিল ৮.৪৯ মিলিয়ন টাকা।[৫]

হিজলী টাইডাল ক্যানেল: হিজলী টাইডাল ক্যানেলের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৮৬৮ সালে এবং সম্পূর্ণ হয় ১৮৭৩ সালে। ১৮৪৮ সালে ওড়িষার বালেশ্বর বিভাগের এক্সকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার Mr.Vertanesnএর রিপোর্ট থেকে এই ক্যানেল-এর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, এই ক্যানেলের দুটি ভাগ ছিল--- একটি গেঁওখালির থেকে শুরু করে পড়েছে ইটামগরার কাছে হলদী নদীর বাম তীরে। দৈর্ঘ্য ১১ মাইল। দ্বিতীয় ভাগটি হলদী নদীর দক্ষিণ তীরের ভাইটগড়ের কাছ থেকে সোজা এগিয়ে মিশেছে কালিনগরের কাছে রসুলপুর নদীতে দৈর্ঘ্য ১৭ মাইল।[৬]এই ক্যানেলে ৪টি লকগেট নির্মিত হয়েছিল যথা, গেঁওখালি, ইটামগড়া, তেরপেখিয়া এবং কালিনগরে। এই ক্যানেলটি মূলত নির্মিত হয়েছিল নৌ-চলাচলের উদ্দেশ্যে। দৈর্ঘ্য ৪৯ ৫/৪ মাইল। নির্মাণ শুরু থেকে ১৯৫১ সালে ৩১ মার্চ পর্যন্ত খচর হয়েছিল ২.৬১ মিলিয়ন টাকা।[৭]

Mr.Vertanesnএর বিবরণ থেকে জনা যায় যে, দুটি ভাগে বিভক্ত এই ক্যানেলের প্রথম ভাগ পূর্বের বাঁকা নালা নামে খাঁড়ির সামনে-পিছনে কিছুটা নতুন ভাগে যোগ করে গড়ে উঠেছে। কোম্পানীর লবন বিভাগের দায়িত্ব ছিল বাঁকানালার রক্ষণাবেক্ষণের, কাঁথির হিজলীর লবন অফিসের সরকারি লবন এই বাঁকা নালার মাধ্যমে কলকাতায় পৌঁছাত। এরপর কোম্পানীর লবন ব্যবসা উঠে গেলে, ইস্ট ইন্ডিয়া ইরিগ্রেসন অ্যান্ড ক্যানেল কোম্পানী এই নালাকে নৌ চলাচলের উপযোগী করার জন্য গেঁওখালির কাছে ১,৪১,০০০ টাকা খরচ করে লকগেট তৈরী করা হয়। নতুন লকগেট করার পক্ষে বাঁকা নালার মাটি ভালো নয় বলে মনে করেন মাটি বিশেষজ্ঞরা। জায়গাটি অপরিচিত, যাতা - যাতবিহীন এলাকা, ফলে নরম মাটি এবং চোরাগুপ্তা থাকায় সরিয়ে আনা হয়। এর জন্য বাঁকা

নালার উত্তর বিন্দুর ৪ মাইল দূর থেকে নতুন খাল কেটে আনা হয় গেঁওখালির বাজারের কাছে। তবে দ্বিতীয়-অংশের ক্যানেলটি সম্পূর্ণ নতুন ভাবে কাটা হয়েছে তমলুক-কাঁথি রাস্তার মাইল চার দূরে সমুদ্রের দিকে। কাজ সম্পূর্ণ হলে অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসে ১৮৭৩ সালে ক্যানেলটি নৌ চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়।[৮]

ক্যানেলটির জলের গভীরতা ৮-১০ ফুট আর বর্ষায় ১৬.৫ ফুট। হান্টারের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, জলের গভীরতা ৮ ফুট থাকলেও তলদেশের চওড়া ২৬ ফুট, উপরিভাগের চওড়া ৭২ ফুট। ক্যানেলের দ্বিতীয় অংশের তলদেশের চওড়া ৬৪ ফুট এবং উপরিভাগের ৯২ ফুট। ক্যানেলটির প্রথম ভাগে জলসেচের ব্যবস্থার জন্য ৫ টি স্লুইস বসানো হয়েছিল জমিদার ও তারপ্রজাদের বিনা পয়সায় জল সরবরাহের জন্য। কারণ তারা বহুপূর্ব থেকেই চাষের জন্য জল পেয়ে আসছিল।

ওড়িশা উপকূলীয় ক্যালেন: বাংলার সাথে ওড়িশার বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য হিজলী টাইডাল ক্যানেলের দক্ষিণ ভাগের সঙ্গে আরো একটি ক্যানেলের সংযোগ ঘটানো হয় যা ওড়িশা উপকূলীয় ক্যালেন নামে পরিচিত। এই ক্যানেলটির দৈর্ঘ্য ৫৪.৫ মাইল। ক্যানেলটি শুরু হয়েছে রসুলপুর নদীর ডান তীরে বাইতগড় থেকে, যেখানে হিজলী ক্যানের সাথে যুক্ত। চলে গেছে সোজা বালেশ্বর পর্যন্ত শেষ হয়েছে মাকাই নদী পর্যন্ত। যে অংশটি হিজলী ক্যানেলের সাথে যুক্ত, যা নৌ চলাচলের জন্য নির্মিত তাতে জল সরবরাহ করা হয় রসুলপুর নদী থেকে সূবর্ণরেখা নদী পর্যন্ত। ১৮৮০ সালে এই ক্যানেলটির কাজ শুরু হয় এবং নৌ চলাচলের জন্য ১৮৮৬ সালে ক্যানেলটি খুলে দেওয়া হয়েছিল।[৯]

জলসেচ: উক্ত তিনটি ক্যানেলের মধ্যে মেদিনীপুর ক্যানেলের প্রথম দুটি বিভাগ জলসেচের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। মেদিনীপুর ক্যানেল কাঁসাই, রূপনারায়ণ, দামোদর ও হুগলী নদীকে যুক্ত করেছিল। এর মধ্যে কাঁসাই ও রূপনারায়ণ নদীর জল সেচের কাজে ব্যবহার করা হয়েচিল। ১৯৭১ সাল থেকে এই ক্যানেলের মাধ্যমে জলসেচ শুরু হয়েছিল। ১৮৭১-৭২ সালে ৬০২০ একর, ১৮৭২-৭৩ সালে ১৪১৩০ একর ও ১৮৭৩-৭৪ সালে ৩৬৩৪৯ একর জমি সেচের সুবিধা পেয়েছিল। এর ফলে কৃষি কাজের প্রতি আগ্রহের সঞ্চার করেছিল। এর ফলে যে পরিমান চাষের জমি বৃদ্ধি পেয়েছিল, তা উৎপাদনকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৮৭৪ সালে ১০,০০০ টন খাদ্য শষ্য উৎবৃত্ত অংশ হিসাবে রপ্তানি হয়েছিল।[১০]

মেদিনীপুর ক্যানেলের প্রথম অংশে অর্থা মেদিনীপুর থেকে পাঁশকুড়া পর্যন্ত অঞ্চলে জলসেচ ব্যবস্থা করা হয়েছিল দীর্ঘমেয়াদী অর্থাৎ ৭-৮ বছরের চুক্তির মাধ্যমে১৮৭৩ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত রেট ছিল একর প্রতি ১.৮ টাকা। পরবর্তী সময়ে বর্ধিত হয়ে হয় একর প্রতি ২ টাকা।[১১] ১৯২৫-২৬ সাল পর্যন্ত (রবি+খারিফ) শষ্যের সেচের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮৮০-৮১ সালে ১০৩৪৬২ একর জমি জলসেচের সুবিধা পেয়েছিল যার মধ্যে পুরোটাই ছিল খারিফ শস্য। ১৮৯০-৯১ সালে ৮২০০২ একর, ১৯০১-০২ সালে ৮২১৩৪ একর ১৯১০-১১ সালে ৭৩৯৪০ একর, ১৯২০-২১ সালে ৯১০৬৬ একর এবং ১৯২৫-২৬ সালে ৫৬৯৮ একর জমি জলসেচের সুবিধা লাভ করেছিল।[১২] ১৯১১ সালে পাঁশকুড়া ও মেদিনীপুর শাখার চাষযোগ্য জমির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯০০০ একর ও ৭১০০০ একর।[১৩] উক্ত দুই শাখার জল নিয়ন্ত্রণের জন্য দুটি অ্যানিকেট নির্মিত হয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ারদ্বয় ছিলেন পামার ও কিমার।[১৪]

১৯৩৯-৪০ সালে এই জেলাতে জলসেচের পরিমান হল ১৯৩৮-৩৯ সালে ৫৩৪১২ একর এবং ১৯৩৯-৪০ সালে ৬৪৮৮২ একর জমি জলসেচ হয়েছিল।এর মধ্যে মেদিনীপুর শাখায় ৫৪৫৬৩ একর ও পাঁশকুড়া শাখায় ৬৩১৯ একর জমি ছিল।[১৫] ১৯৫১ সালে জেলায় চাষযোগ্য জমির পরিমান ছিল ২১৩৪২০০ একর, এর মধ্যে জলসেচের মাধ্যমে চাষ হয়েছিল ৪৩৪৩১০ একর জমি[১৬]। মেদিনীপুর ক্যানেলের অধীন বেশ কিছু শাখা খাল ছিল কাঞ্ছুদিয়া-৪১৭ একর, নারায়নগড়- ২৮৫০০ একর, কাঞ্চনটোলা- ৭৭৫ একর। মুকসুদপুর ২৫৫২ একর, বুরুমুলা- ৭৯২ একর, কন্টাই ময়নাচোকু, বালিচক, জয়কৃষ্টপুর আরঙ্গবাদ, গয়লাগেরিয়া, সুরাল, বারমাহাদপুর ইত্যাদি উক্ত শাখাগুলির মাধ্যমে জেলার বিশাল এলাকা জুড়ে জলসেচের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।[১৭]

হিজলী টাইডাল ক্যানেলের উন্নতি সাধনের জন্য বালেশ্বর ডিভিশনের তৎকালীন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ আপজন সাহেব এক প্রকল্প তৈরী করেছিলেন। যার থেকে জানা যায় যে এই ক্যানেল থেকে বিগত ১৪ বছরের

বার্ষিক গড় আয় ছিল ৪৫০০০ টাকা।[১৮] এই ক্যানেলের মাধ্যমে জেলার দক্ষিণ পূর্ব অংশে প্রধানত জল সরবরাহ করা হত। ১৯০৮-০৯ সালে ৬৩৮২৪ একর, ১৯০৯-১০ সালে ৭০৪৩৮ একর, ১৯০১০-১১সালে ৭৩৯০০ একর, ১৯১১-১২ সালে ৭৯৯৯২২ একর এবং ১৯১২-১৩ সালে ৮০৫৮৫ একর জমিতে সেচের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল।[১৯] উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে এই জলসেচ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রের আয়তন বেড়েছিল। আর ওড়িশা উপকূলীয় ক্যানেল শুধুমাত্র নৌ-চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

নৌ-পরিবহন: উক্ত ক্যানেলগুলি পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। হিজলি টাইডাল ক্যানেল থেকে কত পরিমান রাজস্ব পাওয়া যাবে তার হিসাব দিতে গিয়ে Mr. Vertarnesn বলেছেন যে, এলাকার মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ বা একর প্রতি ৬ মন ধান কলকাতায় পাঠানো যাবে। এলাকার মোট রপ্তানির ৮ ভাগের ৫ ভাগ বহন করতে পারবে এই ক্যানেল। পুরো ক্যানেল এর মাধ্যমে ৫০,০০০ টন ধান পাঠানো যাবে। আর এই কাজে আয় হবে ৫০ হাজার টাকার মতো। ১৬ হাজার খরচ বাদে নিট রাজস্ব আসবে ৩৪ হাজার টাকার মতো। মেদিনীপুর ক্যানেলের রাজস্ব থেকে তার পরিবহন ব্যবস্থায় ভূমিকার কথা জানা যায়। যদিও প্রথম দিকে ১৮ ৭১-৭৯ সাল পর্যন্ত আয়ের থেকে ব্যয় বেশি। কিন্তু ১৮৭৯-৮০ সালে নিট রাজস্ব ৮৫২০০ টাকা আদায় হয়েছিল। ১৮৯৩-৯৪ সালে সর্বোচ্চ নিট রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৯৬৫৭৯ টাকা। ১৯০২-০৩ সালে নিট রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৭১২২৬ টাকা। কিন্তু বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ প্রতিষ্ঠা এবং ১৯০৩ সালে খড়্গপুর একটি রেল জংশন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলে নৌ-পরিবহনের শুল্ক অর্ধেক করে দেওয়া হয়, যাতে নৌ পরিবহনে উৎসাহ প্রদান করা যায়।[২০] ১৯১৭-১৮ সালে নিট রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৯১৬৫৪ টাকা। পরের বছরই নিট রাজস্ব কমে দাঁড়ায় ৬১১৯৮ টাকা। ১৯২৫-২৬ সালে নৌ-পরিবহন থেকে আদায় হয়েছিল--- মেদিনীপুর ক্যানেল থেকে ৬০৩২০ টাকা, হিজলী টাইডাল ক্যানেল থেকে ১০৪৪৫০ টাকা ও ওড়িশা উপকূলীয় ক্যানেল থেকে ৩৭৪৩৩ টাকা।[২১]

১৯২৫-২৬ সাল মেদিনীপুর ক্যানেলের মাধ্যমে চাল ৪০৫৭ টন, হিজলী টাইডাল ক্যানেলের মাধ্যমে চাল ১০৯ টন পরিবহন হয়েছিল।[২২] ১৯৩৩-৩৪ সালে নৌ-পরিবহনের মাধ্যমে মেদিনীপুর ক্যানেল থেকে আদায় হয়েছিল ৪৬,১৯৮১১ টাকা।[২৩] ১৯৩৫-৩৬ সালে মেদিনীপুর ক্যানেল থেকে ৬১৭২৪ টাকা, হিজলী ক্যানেল থেকে ৬৩৯০০ টাকা আদায় হয়েছিল। ১৯৩৩-৪০ সাল মেদিনীপুর ক্যানেল থেকে ১,০৩৩,৯৯৯ টাকা, হিজলী ক্যানেল থেকে ৩৫৭৫৫১২ টাকা, ও ওড়িশা ক্যানেল থেকে ২৭০৮৯০৭ টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বাহিত হয়েছিল। ফলে উক্ত বর্ষে মেদিনীপুর ক্যানেল থেকে ১০৪০৫ টাকা, হিজলী ক্যানেল থেকে ৫৩০৮৭ টাকা, ওড়িয়া ক্যানেল থেকে ২৭০২২ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছিল।[২৪]

উপনিবেশিক সরকার বাংলার কৃষিক্ষেত্রে একাধিক পরীক্ষা-নীরিক্ষা গ্রহণ করলেও উনিশ শতক থেকে বাংলার বৈপ্লবকি পরিবর্তন ঘটে নি। এযুগে চাষের জমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা বেশ খানিকটা উন্নতি হয়েছিল ঠিকই তবে তা প্রয়োজনীয় সমস্ত জলের সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব ছিল না। এ যুগে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত জলসেচ ব্যবস্থার প্রচলন হয়নি। হান্টার সাহেব বর্ধমান জেলার জলসেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন: বর্ধমান জেলায় আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত জলসেচ ব্যবস্থা প্রায় অজানা বললেই চলে যদিও পুকুর, খাল বা স্বাভাবিক জলাশয়গুলিকে বৃষ্টির জলের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সাধারণ প্রচলিত প্রথা হল ছোট ছোট নদীতে বাঁদ দিয়ে পাশের জমিতে সেচ দেওয়া। এক বিঘা ধানজমির সেচের খরচ এক টাকা আর আখের জমির পাঁচ টাকা।[২৫]

উনিশ শতক বাংলার ৭৫ শতাংশ কৃষক সরকারি জলসেচ ব্যবস্থা কৃষকদের নিয়মিত সাহায্য করতে পারত না, শুধু খরার সময় কৃষকরা এখান থেকে জল নিত। আবার ক্যানেল কর দিয়ে চাষ করা কৃষকদের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য হত। এমন কী জমিদাররা খাজনা বাকি পড়ার ভয়ে জলসেচের সম্প্রসারণে বাধা দিতেন। সরকারি ক্যানেলের জল ব্যবহার না করার জন্য কৃষকদের উৎসাহ দেওয়া হত। জর্জ ব্লিনের মতে, ১৮৯১ সাল থেকে বাংলাদেশে ধান চাষের অবনতির উল্লেখ করেছেন। রমেশচন্দ্র দত্ত এজন্য রেলপথ নির্মাণ ও জলসেচ ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন।[২৬]

১৯৩০ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটির হিসাব থেকে জানা যায় যে, বাংলার মাত্র ১০১১৩৮ একর জমিতে সরকারি সেচের ব্যবস্থা হয়েছিল। বাংলার মোট কৃষি জমির ৭ শতাংশ জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছিল।

অথচ ঐ সময় পাঞ্জাব ৫৬, যুক্তপ্রদেশে ২৯, মাদ্রাজে ২৭, বিহার ও উড়িষ্যায়-২১, বোম্বাই-এ ১৩, আসামে ১০ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। নিঃসন্দেহে জলসেচ ব্যবস্থায় বাংলা পিছিয়ে ছিল।[২৭]

১৯১১-১৭ সাল এ.কে. জেমসন সাহেবের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, চাষযোগ্য মোট জমির পরিমান হল ২০৪১৫৫০ একর। ১৯৪৪-৪৫ সালে ইসাক সাহেবের রিপোর্ট থেকে মোট চাষযোগ্য জমি ২০০১৭৮৮.১৩ একর ও ১৯৫১-৫২ বর্ষে ২৫৫১৬০০ একর চাষযোগ্য জমির কথা জানা যায়।[২৮] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিশ শতকের প্রথম থেকেই মেদিনীপুর জেলাতে চাষযোগ্য জমির পরিমান ক্রমাগত বেড়েছে। সে ভাবে জলসেচ ব্যবস্থার প্রসার ঘটে নি। তা স্বত্ত্বেও সবশেষে বলা যায় যে ঔপনিবেশিক সরকার এই জেলাতে কৃষি সম্প্রদায় ও নৌ পরিবহনের ক্ষেত্রে যে ৩টি ক্যানেলের নির্মাণ করেছিলেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এই জেলার কৃষি ইতিহাসে। সীমিত অর্থে হলেও উক্ত ক্যানেলগুলি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কৃষির বিস্তার ঘটিয়েছিল এবং কৃষকদের মনে চাষের প্রতি উৎসাহ জুগিয়েছিল।

তথ্যসূত্র:

১। Census Report-1961, West Bengal District of the Midnapore, Alipore, West Bengal, Government Press, 1966, p. 104.
২। মুখোপাধ্যায়, অভিনন্দন, অবিভক্ত মেদিনীপুর: ইতিহাসের কষ্টিপাথরে বর্তমানের বিশেষণ, নবারূণ, আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত, ১৪ এপ্রিল, ২০১৮, পৃ. ১২,১৪
৩। মান্না, সন্দীপ, ঔপনিবেশিক মেদিনীপুর জেলার ক্যানেল ব্যবস্থা: বিংশ শতকের প্রথমার্ধে এক অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষণ, অরুণ মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস অনুসন্ধান ৩৬, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, পৃ. ৩৯২
৪। Mitra A, Census 1951, West Bengal: District Handbooks, Midnapore, Alipore, West Bengal Government Press, 1953, P-Ixxxiii
৫। Mitra A, Ibid, p-Ixxxiii
৬। কুণ্ডু, কমলকুমার, হিজলি টাইডাল ক্যানেল, হরপ্রসাদ সাহু (সম্পা), মহিষাদর ইতিবৃত্ত, বাকপ্রতিমা, মহিষাদল, ২০১৬, পৃ. ৬০
৭। Mitra A, Ibid, p-Ixxxx
৮। Mitra A, Ibid, p-Ixxxx
৯। Mitra A, Ibid, p-Ixxxx
১০। মান্না, সন্দীপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩
১১। O'Malley, Lss, engal District Gazetteers-Midnapore-1911. Calcutta. Government of West Bengal, p. 121
১২। The Annual Irrigation Revenue Report for the Year 1925-26, Irrigation Dept. Government of West Bengal, 1927, p. 4,6
১৩। O'Malley, ibid, p. 122
১৪। বসু যোগেশচন্দ্র, মেদিনীপুরের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), কলিকাতা, অন্নপূর্ণা প্রকাশনি, ১৪১৬ (বঙ্গাব্দ) পৃ. ৫১৩
১৫। Mitra A, ibid, p.Ixxxiv
১৬। Mitra A, ibid, p.168
১৭। মান্না সন্দীপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩
১৮। কুণ্ডু কমল কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২
১৯। মান্না সন্দীপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪-৩৯৫
২০। O'Malley, ibid, p. 123

২১। 1925-26 Report, ibid, p-p
২২। Ibid, p. 12
২৩। Annual Irrigation Revenue Report year 1933-34, Govt. of Bengal, Irrigation Dept. p. 25
২৪। Mitra A, ibid, p. Ixxxiii-v
২৫। মুখোপাধ্যায় সুবোধ কুমার, বাংলার আর্থিক ইতিহাস, উনিশ শতক, কলকাতা, কে পি বাগজী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৭, পৃ. ৪৩
২৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
২৭। মুখোপাধ্যায় সুবোধকুমার, প্রাগুক্ত, ১৯৯১, পৃ. ৬,৭
২৮। বেরা রাজীব, মেদিনীপুর জেলার কৃষক ও কৃষিব্যবস্থা (১৮৮৫-১৯৫১)-একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা, মেদিনীপুর, কবিতিকা, ২০২৩, পৃ. ২৮, ২৯

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1272-1281
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.130

‘কবিতা’ পত্রিকার যাত্রা: বুদ্ধদেব বসুর স্বপ্ন ও বাস্তবতার এক বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

শম্ভু ভূষণ লস্কর, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম, ভারত*

Received: 14.05.2025; Send for Revised: 17.05.2025; Revised Received: 17.05.2025; Accepted: 28.05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Bengali literature has been enriched in various ways by different literary periodicals. In the twentieth century, the role of periodicals in the practice and development of Bengali literature was immense. Sabujpatra, Kallol, Kali-Kalam, Pragati, and Porichoy played significant roles in shaping the course of Bengali literature and contributed to its enrichment in many ways. Yet, why did Buddhadeva Bose feel the need to publish a distinct literary magazine named Kobita? In this essay, we will attempt to explore that question.
Keywords: Buddhadeb Bose, Kobita Literary Magazine, History and Significance

১৯১৪ সালে প্রকাশিত ‘সবুজপত্র’ বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে স্বতন্ত্র একটি পত্রিকা। প্রমথ চৌধুরী বাংলা চলিত গদ্যকে ব্যবহার করে দেখালেন, যেকোন বিষয়েই চলিত গদ্য ব্যবহার করে সাহিত্য রচনা করা যায়। তাছাড়া বাঙালি লেখকেরা যাতে সাধুভাষা বর্জন করে চলিত ভাষাকে গ্রহণ করতে পারেন, তার জন্য বদল ঘটালেন। অর্থাৎ “সবুজ পত্র বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার প্রয়োগে যে-পথ নির্দেশ করেছিল, সে পথে রবীন্দ্রনাথ চলেছিলেন প্রমথবাবুর অনুসরণে। এখানে পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়: বচনটি সার্থক হয়েছিল।”[১] বুদ্ধদেব বলেছিলেন- “সবুজ পত্র বাংলা ভাষার প্রথম লিটল ম্যাগাজিন।”[২] এই কথাকে প্রমাণ করতে তিনি লিটল ম্যাগাজিনের স্বধর্মকে বর্ণনা করেছিলেন এভাবে ম্যাগাজিন নামেই যখন প্রতিবাদ, তখন রূপে ও ব্যবহারেও তা থাকা চাই-আর সেটা শুধু একজন অধিনায়কেরই নয়, একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর। “‘সবুজপত্র’এ এই লক্ষণ পুরোমাত্রায় বর্তেছিলো। তাতে বিদ্রোহ ছিলো, যুদ্ধ-ঘোষণা ছিলো, ছিলো গোষ্ঠীগত সৌষম্য।”[৩] তাছাড়া বুদ্ধদেব বসুর মতে, সবুজপত্রের প্রথম দান প্রমথ চৌধুরী বা বীরবল, দ্বিতীয় দান চলতি ভাষার প্রতিষ্ঠা, তৃতীয় দান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বুদ্ধদেবের ভাষায়-

> “‘প্রমথ চৌধুরী আর রবীন্দ্রনাথ-এ’দুজনের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিলো ‘সবুজপত্রে’; প্রথম জনের আত্মপ্রকাশের জন্য, দ্বিতীয় জনের নতুন হবার জন্য। প্রচলিত অন্য কোনো পত্রিকায়, অন্য কোনো সম্পাদকের আশ্রয়ে প্রমথ চৌধুরীর স্বকীয়তার বিকাশ হতে পারতো না; তাছাড়া শুধু রচনাতেই নয়, সম্পাদনাতেও তিনি ছিলেন প্রতিভাবান।”[৪]

রবীন্দ্রনাথ ‘সবুজপত্রে’র কাছে পেয়েছিলেন পুরোনো অভ্যেসের বেড়ি ভাঙার সাহস, যৌবনের স্পর্শ, গদ্য ভাষার জন্মান্তর সাধনের প্রেরণা, যে-প্রেরণা তাঁর নিজেরই মনের নেপথ্যে কাজ করছিলো, তাকে নিঃসংকোচে মুক্তি দেবার পথ পেয়েছিলেন।

একথা বলা প্রয়োজন যে, মনন-চিন্তার বৌদ্ধিক সমাবেশে ‘সবুজপত্র’ স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছিল শিক্ষিত বিদগ্ধ জনের পত্রিকারূপে। নবীনদের বেশি জায়গা দিতে পারেনি। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত পত্রিকায় রবীন্দ্র পরবর্তী নবীন কবিদের জন্য এটি উপযুক্ত ছিল না।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক নানা ঘাত-প্রতিঘাতে স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিকতার ভাঙনের ফলে প্রচলিত মূল্যবোধের বিবর্তন যেভাবে পাশ্চাত্য শিল্প সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল তার প্রতিফলন বাংলা সাহিত্যেও গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। যুদ্ধ পরবর্তী ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরো তীব্র আকার ধারণ করে,সরকারের দমননীতি, অর্থনৈতিক মন্দা, কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের উত্থান এবং সমাজে নারীর অবস্থান ইত্যাদি প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। সেই সময় বাস্তববাদী সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদে ১৯২৩ সালের ১৫ এপ্রিল (বৈশাখ ১৩৩০) সম্পাদক দীনেশচন্দ্র দাশ ও সহ সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় ‘কল্লোল’ পত্রিকা। ‘কল্লোল’এর প্রাণপুরুষ অচিন্তকুমার সেনগুপ্তের ভাষায়-‘‘কল্লোল বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা,সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।’’[৫] রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত হবার সচেতন প্রয়াসে রবীন্দ্র-পরবর্তী সাহিত্যিকদের নতুন ভাবনা ও স্বপ্নের আশ্রয়স্থল ও লীলাক্ষেত্ররূপে চিহ্নিত হয়েছিল ‘কল্লোল’। আধুনিক মনন নিয়ে দীর্ঘ প্রচলিত সংস্কার, বিশ্বাস এবং নির্দিষ্ট প্রথানুসারী চিন্তা-ভাবনার সম্পূর্ণ বিরোধিতার জন্য কল্লোলে’র লেখকেরা অতি আধুনিক হিসেবে নিন্দিত হলেও; লেখার মধ্যে দিয়ে সমাজের নিম্নবর্গীয় বাস্তবতাকে বার বার তুলে ধরেছেন। কল্লোলের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন-

> ‘‘কল্লোলে যাঁদের লেখা পড়তুম-গোকুলচন্দ্র নাগ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র-নতুন নাম সব, কিন্তু আমার মনে চঞ্চলতা অনুভব করতাম। ‘প্রবাসী’তে যে-লেখাটা বেরোলো সেটা হয়তো বহু পাঠকের চোখে পড়লো, কিন্তু ঐ ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে আমি গেছি হারিয়ে। কিন্তু ‘কল্লোল’ যেন চিনতে পারলো আমাকে, সেই অভিজ্ঞানে আমিও নিজেকে চিনলাম। অর্থাৎ, ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত হওয়া মানে বিজ্ঞাপন, আর ‘কল্লোলে’ প্রকাশিত হওয়া মানে নিজেকে আবিষ্কার করার আনন্দ।’’[৬]

লেখকদের প্রতি সম্মান ও সহৃদয়তা ‘কল্লোল’এর একটি অন্যতম আকর্ষণ ছিল। সেই সময় যে রচনাগুলি কোন সম্পাদক দ্বারা স্পৃষ্ট হবার সম্ভাবনা ছিলো না ‘কল্লোল’ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ও প্রকাশ করেছে। তবুও ১৯২৬ সালের এপ্রিলে শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মুরলীধর বসুর উদোগে প্রকাশিত হল ‘কালি-কলম’। এদিকে অজিত দত্ত আর বুদ্ধদেব বসুর যৌথ সম্পাদনায় ‘প্রগতি’ (১৯২৭) প্রকাশিত হলো ঢাকা থেকে। ‘প্রগতি’র নিয়মিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন অচিন্ত্যকুমার, জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে। ‘কালি-কলম;এ মোহিতলাল, প্রবোধকুমার সান্যাল ও জগদীশ গুপ্ত। ‘কল্লোল’ ভেঙে তিন ভাগ হলো, কিন্তু ‘কল্লোল’এর মূল লেখকদের তার প্রতি আসক্তি কমলো না তাঁদের অনেকেরই অনেক ভালো লেখা ‘কল্লোল’ই বেরিয়েছে।

‘কল্লোল’ প্রধানত গল্পকেন্দ্রিক পত্রিকা ছিল। তার সমকালকে গল্প, উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে নাগরিক জীবন, বাস্তববাদ, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব, শ্রেণিচেতনা ও বিপ্লবী ভাবনা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ধারণ করেছিল। কিন্তু যদিও আধুনিক কবিদের কবিতা ‘কল্লোল’এ প্রকাশিত হয়েছিল তবুও এককভাবে আধুনিক কবিতার বিকাশের জন্য যে জায়গা প্রয়োজন সেটা ‘কল্লোল’এ যথেষ্ট ছিল না।

বাংলা সাহিত্যপত্রের ইতিহাসে স্বল্পায়ু হলেও ‘কল্লোল’এর মতনই বিবর্তনকারী পত্রিকা হচ্ছে ‘প্রগতি’। বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত ও অন্যান্য তরুণ লেখক যাঁরা ‘ঢাকাগোষ্ঠী’ নামে পরিচিত তাঁদের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম ছিল ‘প্রগতি’। অজিত দত্তের কথায়-

> ‘‘আমরা ঢাকায় ছিলাম, আমাদের একটি নিজস্ব সাহিত্য পত্রিকার প্রয়োজন বোধ করেছিলাম। ‘কল্লোল’ আর ‘প্রগতি’র কথা বলতে গিয়ে তাই বুদ্ধদেব বসু বলেছেন- ‘প্রগতি’ পত্রিকাটিকে ‘কল্লোলে’রই একটি টুকরো বলা যায়; এ দুয়ের মধ্যে সংযোগ ও বিনিময় ছিলো নিবিড়।’’[৭]

এই কথার প্রমাণ পত্রিকার দুটির লেখকসূচির দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যায়। খ্যাতি-অখ্যাতি,স্তুতি-নিন্দা দুই পেয়েছিল ঢাকার তরুণ সাহিত্যগোষ্ঠীর ‘প্রগতি’। জীবনানন্দ দাশের কবিতা যখন আলোড়ন তুলেছিল সাহিত্য পাঠকের কাছে। তা সত্ত্বেও ‘প্রগতি’র লেখাগুলি ‘শনিবারের চিঠি’র কাছে সমালোচিত হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রত্যুত্তরও বজায় রেখেছিলেন। তথ্য মতে,

> "প্রথম বছর বারোটি সংখ্যা ...দ্বিতীয় বছরের প্রথম ছমাসের পর সপ্তম ও অষ্টম যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় এরপর আর নতুন সংখ্যা প্রকাশ পায়নি। পরে তৃতীয় বর্ষে প্রথম পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশ সম্ভব হলেও 'প্রগতি' মাত্র দু বছর পাঁচ মাসের আয়ুষ্কাল পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে। আষাঢ় ১৩৩৪ (১৯২৭) থেকে কার্তিক ১৩৩৬ (১৯২৯)।"[৮]

'প্রগতি' স্বল্পায়ু হলেও বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। প্রধানত আধুনিক বাংলা কবিতাকে 'প্রগতি' যোগ্য সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। 'প্রগতি'র তরুণ লেখকরা চাইছিলেন নতুন কবিতা, যেখানে থাকবে মুক্তচিন্তা, নতুন ছন্দ, প্রতীকবাদ ও পাশ্চাত্য সাহিত্যচর্চার প্রতিফলন। কবিতায় রোমান্টিকতা ও আবেগকে সংযত করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, নাগরিক জীবন, ও বাস্তবতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বুদ্ধদেব বসুও লিখেছেন অনেক কবিতা। তাই একথা নি:সন্দহে বলা যায় যে প্রগতি পত্রিকা খুব বেশিদিন না চললেও, পরবর্তী 'কবিতা' পত্রিকার ভিত্তিভূমি তৈরি করেছিল।

'কবিতা' পত্রিকার সূচনা ও সূত্রপাতের ক্ষেত্র আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' (জুলাই ১৯৩১) পত্রিকা। বুদ্ধদেব বসুর মতে-

> "'পরিচয়ে জরুরিতম প্রয়োজন ছিল সুধীন্দ্রনাথেরই নিজের, তাঁর ব্যক্তি স্বরূপের স্ফূর্তির জন্য। এর আগে পর্যন্ত সুধীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু মহলে আবদ্ধ। সাহিত্য বিষয়েঔৎসুক্য নিয়েও তাঁর নাম আগে শুনিনি।"[৯]

বুদ্ধদেব বসু প্রথম 'পরিচয়' পত্রিকাটি দেখেন এম.এ পরীক্ষার দিনে পায়চারী করা শোভন সরকারের হাতে। সেদিন বিকেলেই ডাকযোগে পত্রিকাটি বুদ্ধদেবের হাতে আসলে তিনি দেখলেন যে, লেখকের মধ্যে এক ধূর্জটিপ্রসাদ ছাড়া বাকি নামগুলো পর্যন্ত অচেনা। তারপর শুক্রবাসরীয় সন্ধ্যায় গিয়েছেন কয়েকবার। কিন্তু 'পরিচয়' এর ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বুদ্ধদেব বসু অনুধাবন করেছিলেন সেটি হচ্ছে, তিনি 'পরিচয়'এর মজলিসে ঠিক মানসিক স্বাচ্ছন্দ পাননি। তাঁর ভাষায় যেন একটু অধিক মাত্রায় সচারু ও সমৃদ্ধ ও শোভমান, যেন আড্ডা নয়, আয়োজিত একটি অধিবেশন- এমনি মনে হয়েছিল আমার। বুদ্ধদেব বুঝেছিলেন তত্ত্বালোচনায় এঁদের যতটা দক্ষতা সাহিত্য রচনায় ততটা নয়- এঁদের মধ্যে লেখক আছেন দুজন মাত্র। সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু এই কথা ও বলেছেন যে-

> "পশ্চিমী মানসের নতুন ধারাটিকে 'পরিচয়' তাদের সামনে তুলে ধরেছিল শুধু সাহিত্যে নয়-- বিজ্ঞান, দর্শন শিল্পকলা সকল ক্ষেত্রে। পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যে বাংলা রচনা সম্ভব এই আদর্শের জন্য 'পরিচয়'আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।"[১০]

'পরিচয়' পত্রিকা প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা, বিদেশি সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন, মতাদর্শগত রচনাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। তবে কবিতা একেবারে অনুপস্থিত ছিল না। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, বিশেষ করে প্রগতিশীল ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার কবিদের লেখা। কিন্তু কবিতা ছিল গৌণ, কারণ পত্রিকাটি সাহিত্যকে একটি মতাদর্শগত ও চিন্তাগত চর্চার জায়গা হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। ফলে কবিতাকেন্দ্রিক সাহিত্যপত্রের প্রতি যে বাসনা বুদ্ধদেব বসুর, তা অতৃপ্ত থেকে গিয়েছিল। আর সেই বহু প্রতীক্ষিত ঐতিহাসিক মূহুর্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল 'পরিচয়'এর আড্ডাতেই। তাই কবিতা পত্রিকার সূত্রপাতের কথা জানাতে গিয়ে বুদ্ধদেব জানিয়েছেন-

> "পরিচয়'এর কোনো-এক বৈঠকে অন্নদাশঙ্কর রায়ের হাতে একটি পত্রিকা দেখেছিলাম। রোগা চেহারা, ইট-রঙের মলাটের উপর শেলির ছবি ছাপানো, নাম মনে নেই। ভাষা ইংরেজি, জাতি মার্কিন, ভিতরে ছিলো চওড়া মার্জিনে সুন্দর করে সাজানো কবিতা, শুধু কবিতা, আর কবিতারই বিষয়ে কিছু আলোচনা। এই প্রথম আমি কবিতার কোনো পত্রিকা চোখে দেখলুম।"[১১]

'পরিচয়'এর আড্ডা থেকে বুদ্ধদেব বসু সবচেয়ে বড়ো যে সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন, তা হল **'কবিতা'** পত্রিকা প্রকাশের স্বপ্ন। কেননা তাঁর বালক বয়স থেকে পরিণত বয়স অবধি তিনি দেখেছেন পত্রিকাগুলির কবিতার প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যবহার। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য যে-কোন লেখকের পদ্যজাতীয় রচনার কাজ হচ্ছে পাদপূরণ। গদ্য ভোজের

মাঝখানে সংকুচিত হয়ে থাকতে। সামান্যতম জায়গাই তার বিধি নির্দিষ্ট। কিন্তু কবিতাই যে একটা স্বতন্ত্র সাহিত্য এমনভাব কোথাও নেই। বুদ্ধদেব বসু স্বপ্ন দেখতেন, এমন কোন পত্রিকা হবে যে শুধু মাত্র কবিতার জন্য নিবেদিত। কিন্তু কথাটি কারো কাছে উচ্চারণ করেন নি। সেই স্বপ্নের একটা বাস্তব রূপ মার্কিনি নমুনাটিতে দেখতে পেয়ে ভেবেছেন, বাংলায় এরকম একটি কবিতা বিষয়ক পত্রিকা থাকলে কবিতা এবং কবিরা পদপ্রান্তিক অবমাননা থেকে বেঁচে যাবেন।

বুদ্ধদেব বসু নিজের কল্পনাকে অসম্ভব ভাবলেও সেটাকে মন থেকে বিদায় দিতে পারেননি, মাঝে-মাঝে সেটাকে নিয়ে ভাবতেন। ইতিমধ্যে বুদ্ধদেব বসুর জীবনে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল ১৯ জুলাই, ১৯৩৪ সালে, যখন তিনি গায়িকা ও সাহিত্যিক প্রতিভা বসুকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন। তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার এক অনন্য উদাহরণ। বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিভা বসু তাঁকে মানসিক সমর্থন ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, যা তাঁর সৃষ্টিশীলতায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তাঁদের সম্পর্কের এই দিকটি সুন্দরভাবে উঠে এসেছে প্রতিভা বসুর লেখা 'জীবনের জলছবি' গ্রন্থে, যেখানে তিনি তাঁদের জীবনযাত্রা, সাহিত্যচর্চা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের নানা দিক আলোকপাত করেছেন। বুদ্ধদেব বসু যখন তাঁর যোগেশ মিত্র রোডের বাড়িতে এক সান্ধ্য আড্ডায় 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ করার কথা ব্যক্ত করার সঙ্গে অর্থাভাবের কথাটি তুললেন, তখন সহধর্মিনী প্রতিভা বসু তাঁকে সাহস যুগিয়েছেন। কারণ জীবনে অর্থাভাব থাকলেও কোন সৃষ্টিশীল ইচ্ছাকে কখনো থামিয়ে রাখেন নি, মনকে ছোট করেন নি, 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ ভাবনার ক্ষেত্রেও সেই সান্ধ্য আড্ডায় কোনো দুঃখ এসে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, মনকে ছোট করে দেয়নি, হাহুতাশের জন্ম হয়নি, বরং ইচ্ছাকে প্রকাশের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। প্রতিভা বসুর কথায়-

> "চাঁদা তুলে টাকা জোগাড়ের বুদ্ধিটা কার সেটা মনে নেই, তবে প্রথম চাঁদাটা যে আমিই তুলেছিলাম সেটা ভুলিনি। সেই দার্জিলিংয়ের মায়া মাসিমাই দিয়েছিলেন। চাঁদার হার পাঁচ টাকা। বুদ্ধদের পাঁচ টাকা, প্রেমেন্দ্র মিত্র পাঁচ টাকা, মায়া মাসিমা পাঁচ টাকা-পনেরো টাকা তো উঠেই গেল। কী ফূর্তি সকলের। বাড়ি ভেসে গেল সুখের জোয়ারে। সান্ধ্য আড্ডাটা জোরালো হলো। শেষ পর্যন্ত পঁয়ত্রিশ টাকা চাঁদা উঠতেই শুরু হয়ে গেল কাজ।"[১২]

১৯৩৫ সালের ১ অক্টোবর বুদ্ধদেবের প্রথম সন্তান (মিমি) আর 'কবিতা' পত্রিকা একই দিনে জন্মলাভ করল।
'কবিতা' পত্রিকা যেদিন সত্যিকার অর্থে বেরোলো, বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন-

> "কোনো সম্বল বা আয়োজন ছিলো না; দেখা যাক না কী হয়-এই গোছের মনের ভাব নিয়ে আরম্ভ হলো। বিষ্ণু দে, আর একজন অ-কবি বন্ধু, পাঁচ টাকা করে চাঁদা দিলেন, প্রথম দুই সংখ্যা বিনামূল্যে ছেপে দিলেন সদ্যস্থাপিত পূর্বাশা প্রেস। কলকাতার সুধীসমাজে যাঁদের মুখ চিনি বা নাম জানি, এই রকম পনেরো-কুড়ি জনের কাছে প্রথম সংখ্যাটি পাঠিয়ে দিলাম-গ্রাহক হবার অনুরোধ জানিয়ে। সেই অনুরোধ প্রায় সকলেই সম্মানিত করলেন...। সমর সেন নিয়ে গেলেন এসপ্লানেডের স্টলে, তারা বললে এইটুকু কাগজ ছ-আনা দিয়ে কে কিনবে, চার পয়সা দাম হলে ঠিক হতো। দু-দিন পরে আরো কুড়ি কপি পাঠাতে হলো সেখানে-এতে স্টলওলা নিশ্চয়ই অবাক হয়েছিলো-কিন্তু আমি আরো বেশি।"[১৩]

কিছুটা ভয়ে ভয়ে রবীন্দ্রনাথকেও পাঠিয়েছিলেন 'কবিতা' সংখ্যাটি। পত্রটি পাঠিয়ে তিনি ভয় পেয়েছিলেন কেননা-সামান্য কর্তব্যবোধে, দায়সারা গোছের কোন কিছু যদি রবীন্দ্রনাথ লিখে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তা না হয়ে তৈরী হল এক স্মরণীয় মূহুর্ত। বুদ্ধদেবের ভাষায়-

> "কিন্তু আমাদের সব দ্বিধা উড়িয়ে দিয়ে দ্রুত এলো তাঁর উত্তর-মস্ত একখানা তুলোট কাগজের এপিঠ-ওপিঠ ভর্তি সেই অনিন্দ্যসুন্দর হস্তাক্ষর, উপরন্তু এলো তাঁর আনকোরা নতুন লম্বা মাপের গদ্য-কবিতা, 'ছুটি' (আশ্বিনে সবাই গেছে বাড়ি)- তাঁর সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ একটি রচনা।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথ 'কবিতা' পত্রিকা পড়ে বিশেষ আনন্দের কথা জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন প্রত্যেক রচনার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁর ভাষায়-

> “সাহিত্য-বারোয়ারির দল-বাঁধা লেখার মতো হয় নি। ব্যক্তিগত স্বাতন্তর‌্য্য নিয়ে পাঠকদের সঙ্গে এরা নূতন পরিচয় স্থাপন করেছে।...জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে-এছাড়া অজিতকুমার দত্ত ও প্রণব রায়ের কবিতা পড়ে আমার মন তখনি স্বীকার করেছে তাঁদের কবিত্ব।”[১৫]

এডওয়ার্ড টমসন বিদেশে যিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চা করতেন; তাঁকেও বুদ্ধদেব বসু ‘কবিতা’ পত্রিকা পাঠিয়েছিলেন। কয়েকমাসের মধ্যে ‘টাইমস লিট্রেরি সাপ্লিমেন্ট’এ ‘**Bengal: Land Made For Poetry**’ শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতার বই ‘বীথিকা’ ‘পরিচয়’ ‘কবিতা’ ও মাদ্রাজের ইংরেজি পত্রিকা নিয়ে দীর্ঘ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে ‘কবিতা’ পত্রিকা বিদেশেও অভ্যর্থনা লাভ করল।

‘কবিতা’ পত্রিকা প্রকাশে যে যত্ন, যে নিষ্ঠা বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন তা অনন্য। তাঁর সমসাময়িক প্রত্যেক কবির উপর লিখেছেন, মনোযোগ ও সময় দিয়েছেন, নিরপেক্ষ হয়ে সমালোচনা করেছেন সম-সাময়িক কবিদের যার দৃষ্টান্ত বিরল।

‘কবিতা’ ত্রৈমাসিক, প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫ সালের আশ্বিন মাসে। আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়-বছরে এই চারটি সংখ্যা বেরুতো। কোনো কোনো বছরে পাঁচটিও বেরিয়েছে (বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক ১৯৪৭), শততম সংখ্যাটি বেরিয়েছে ইংরিজি ও বাংলায়। প্রথম ও দ্বিতীয় বছরে সম্পাদক হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম আছে, সহকারী সম্পাদক সমর সেন। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বছরে সম্পাদক শুধুই বুদ্ধদেব বসু। ১৯৬১ সালে বুদ্ধদেব বসু আমেরিকায় অধ্যাপনার জন্য চলে গেলে নরেশ গুহ সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। ‘কবিতা’র প্রথম বছরে বার্ষিক মূল্য ছয় আনা। প্রথম সংখ্যায় সোনালি-হলুদ প্রচ্ছদে কিউবিস্ট ছাঁদে ‘কবিতা’ পত্রিকার নাম লেখা। কবিরা ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অজিতকুমার দত্ত, প্রণব রায়, স্মৃতিশেখর উপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র বাগচী। সংখ্যা শুরু হয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্র-এর ‘তামাশা’ কবিতা দিয়ে। প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতি যে সচেতন ভাবনার ফসল তা সকলেই জানেন। দ্বিতীয় সংখ্যা শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ‘ছুটি’ কবিতা দিয়ে। প্রথম বছরে জীবনানন্দের ‘মৃত্যুর আগে’, ‘বনলতা সেন’, ‘হায় চিল’, ‘হাওয়ার রাত’ সহ দশটি কবিতা, সমর সেনের ষোলোটি। কবিতার একেবারেই প্রথম নিয়ম-ভাঙা প্রকাশ। কোনো কোনো সংখ্যায় পাতার পর পাতা একই কবির কবিতা দেখতে পাই। এটা আর কোনো পত্রিকায় দেখা যায়নি। ‘কবিতা’ পত্রিকার প্রায় পঞ্চাশ ভাগ লেখাই বুদ্ধদেব বসু-র। সাহিত্যের যে কোনো বিশেষ ঘটনা নিয়ে স্বনামে, বেনামে বুদ্ধদেব লিখেছেন। আর লিখেছেন প্রতিটি প্রধান বাঙালি কবির কবিতার সমালোচনা। কবিদের বৈশিষ্ট্য তিনি চিহ্নিত করে দিয়েছেন। যেমন ‘নির্জনতম কবি জীবনানন্দ’। আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে নির্জন, সবচেয়ে স্বতন্ত্র।

‘কবিতা’ পত্রিকার সূচনা থেকেই বুদ্ধদেব বসু আরো একটি বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন, সেটি হচ্ছে কবিতার ভাষা, ছন্দ, কাব্যভাবনার পরীক্ষা নিরীক্ষা মধ্যে দিয়ে সমসাময়িক বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক কবিতার যোগসূত্র স্থাপন করা। ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি জানিয়েছেন-

> “‘সনে’, ‘ছিনু’, ‘মম’, ‘তব’, শব্দ ছেঁটে ফেলতে হবে, আকাশকে ‘গগন’ বা সূর্যকে ‘তপন’ বলা কখনোই চলবে না...”[১৭]

প্রগতি’র কাল থেকেই বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে একটি অংশ ছিল প্রচারকের তিনি নিজেই তা স্বীকার করেছেন। তাই সাহিত্যপত্রের দায়বদ্ধতা নিয়ে বলতে গিয়ে লিখেছেন-

> “শুধু রচনা প্রকাশ করাই পত্রিকার কাজ নয়-সে-রচনা যতই ভালো, যতই নির্বাচিত হোক না। লেখককে প্রকাশ করাও তার কর্তব্য, পরিবর্তনের ধাত্রী এবং আধার হওয়া তার কাজ।”[১৮]

তাই ‘কবিতা’ পত্রিকার সূচনাপর্ব থেকেই অপর্যাপ্তভাবে প্রকাশিত ও আলোচিত হয়েছেন অনেকেই। রচনায় সামান্যতম দুর্বলতা দেখলে সেটুকুও ধরিয়ে দিয়েছেন। সমালোচনায় সমকালীন প্রতিভাবানদের মৌলিকতা ও গুণকীর্তনে তিনি সর্বদা মুখর থেকেছেন। নানাজনকে দিয়ে লেখাতে চেয়েছেন পছন্দের বই সম্পর্কে। জীবনানন্দ দাশের অধিকাংশ বিখ্যাত কবিতাই ছাপা হয়েছে ‘কবিতা’য়। সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেব বসুরও

তাই। সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে ‘কবিতা’ই চিহ্নিত করেছে। আরো অনেক পরিচিত অপরিচিত কবিদের সসম্মানে গ্রহণ করে বাংলা আধুনিক কবিতা ও কবিতাপত্রের ইতিহাসে ‘কবিতা’ পত্রিকা শিরোধার্য হয়ে আছে।

‘কবিতা’ পত্রিকার প্রায় ছাব্বিশ বছরের ইতিহাসে(১৯৩৫-১৯৬১) একশ চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে যুগ্ম সংখ্যা মাত্র চারটি। এছাড়া বিশেষ সংখ্যা তেরটির মধ্যে কবিতা বিষয়ে প্রবন্ধ, রবীন্দ্র সংখ্যা, নজরুল সংখ্যা, জীবনানন্দ সংখ্যা, সুধীন্দ্রনাথ সংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ সংখ্যার তালিকায় তিনটি-মার্কিন সংখ্যা (দ্বিভাষিক), বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ সংখ্যা, এবং শততম সংখ্যা বা আন্তর্জাতিক ইংরেজি-ভাষা সংখ্যাটি ‘কবিতা’র সম্পাদকের বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করেছিল। বুদ্ধদেব বসু ‘আন্তর্জাতিক সংখ্যা’ প্রকাশ করে চেয়েছিলেন বিশ্ব সভায় বাঙালি কবিদের একটা মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে। আবার ‘কবিতা’য় প্রকাশিত হয়েছিল কালিদাস রচিত ‘মেঘদূত’-এর বঙ্গানুবাদ, যা তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার আর একটি দিক উন্মোচন করেছিল। স্বদেশের পাঠকদের কাছে কবিদের ব্যক্তিগত পরিচিতি সংক্ষেপে তুলে ধরার ব্যবস্থা করেন ‘বিংশ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা’ থেকে। ‘কবিতা’ পত্রিকায় তাঁর রচিত প্রয়াণ লেখাগুলিও অত্যন্ত মূল্যবান। বিশেষত, কবি নন, কিন্তু সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে কৃতী মানুষদের স্মরণ করেছেন গভীর সমবেদনার সঙ্গে- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির কুমার ভাদুড়ী, কিংবা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, হিমাংশুকুমার দত্ত বিষয়ে তাঁর শ্রদ্ধা আমাদের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। আর একটা দিকও উল্লেখনীয়, শুধু সম্পাদক হিসাবে তিনি সতর্ক ও বিচক্ষণ ছিলেন তা নয়, মানুষ হিসাবেও তাঁর সহকর্মী কবিদের প্রতি মনোযোগী ও সহমর্মী ছিলেন। প্রভাতকুমার দাশের কথায়-

> “কবি হেমচন্দ্র বাগচীর দীর্ঘদিনের মানসিক পীড়াজনিত অসুস্থতার জন্য ‘শেষ রক্ষা’ নাটক নিউ এম্পায়াবে মঞ্চস্থ করে অভিনয়লব্ধ আটশত টাকা কবিবন্ধুর চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।”[১৯]

আবির্ভাব মুহূর্তেই ‘কবিতা’ সকলের মন জয় করে নিতে পেরেছিল সেটা কোনো বহিরঙ্গ আয়োজনের আড়ম্বরে নয়, সর্বাত্মক গুণগত সাফল্যই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করে যথার্থই লিখেছিলেন:

> “কবিতার প্রথম বছরের চারটি সংখ্যা বাংলায় আধুনিক কাব্য-ইতিহাসে এমন একটি স্বাক্ষর রেখে গেছে যা কোনো দিন মুছবে না। আধুনিক কবিতা যে নিছক একটা মানসিক বিলাস বা খামখেয়ালী বস্তু নয়, সে-কথা এই চারটি সংখ্যা থেকেই বাঙালী পাঠকবর্গ অনুভব করেন।”[২০]

জীবনানন্দ দাশ, অজিত দত্ত, সমর সেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ইত্যাদি। এঁদের কবিতা আগে নানা পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু কবির সম্মান তাঁরা পান নি। তাঁদের কবিতা নিয়ে ভালো করে আলোচনাও হয়নি। ‘কবিতা’ পত্রিকাই প্রথম তাঁদের কবি-সম্মান দেয়, তাঁদের কবিতা নিয়ে নিষ্ঠাভরে আলোচনা করে। একথা শ্রদ্ধার দাবি রাখে যে, নিজে একজন প্রধান কবি হয়েও অন্যান্য কবিদের বিষয়ে আলোচনা, উৎসাহ ও মনোযোগ দিয়েছেন। বুদ্ধদেবের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলা কবিতার অগ্রগতিকে সকলের সামনে তুলে ধরা। বাংলা কবিতা বিষয়ে সামান্যতম অবজ্ঞা, কিংবা উপেক্ষায় অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেতেন।

প্রথমাবধি ‘কবিতা’ পত্রিকায় আলোচনা ও উদাহরণ দ্বারা বুদ্ধদেব স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছিলেন যে পদ্যের আকারে মিলিয়ে লেখা রচনামাত্রকেই কবিতা বলে না। তাই কুড়ি বছর অতিক্রম করে, দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন:

> “আজ ভেবে দেখলে মনে হয়, ‘কবিতা’ আরম্ভ হয়েছিল পত্রিকারূপে নয়, কবিদের পত্রিকারূপে।...সমকালীন সৎকাব্যের সমগ্র ধারাটিকে আমরা এর মধ্যে সংহত করতে চেয়েছিলাম।”[২১]

একই সম্পাদকীয়তে তিনি ‘কবিতা’র বিশ বছরের পরিক্রমায় সার্থকতার দিকটি উল্লেখ করেছিলেন এভাবে:

> “আজকের দিনে যাঁরা পঞ্চাশ-প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত, এবং যাঁরা কুড়ির কিনারায় কম্পমান-তাঁদের এবং তাঁদের মধ্যবর্তী সকলেরই জন্য আমাদের আমন্ত্রণ অবারিত রেখেছি, কনিষ্ঠরাও ইতিমধ্যে

তাঁদের কাব্যচর্চার কিছু প্রমাণ দিয়েছেন। বাংলাদেশে কবিতার প্রচার, মনে হয়, বিবর্ধমান; এই বিষয়টিতে প্রকাশকদের মধ্যে যে-সদ্যগর্ভিণীর অরুচি ছিলো তাও এখন অবসিত বললে ভুল হয় না। তার একটা বড়ো প্রমাণ এই যে গত দু-তিন বছরের মধ্যে তরুণ কবিদের অন্তত পঁচিশখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হতে পেরেছে, তার অনেকগুলো আবার একেবারে প্রথম বই।"[২২]

বাংলা সাহিত্যপত্রের ইতিহাসে 'কবিতা' পত্রিকা স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্য আর কোনও বাংলা কবিতা পত্রিকারই নেই।

'কবিতা' পত্রিকার প্রায় একশো চারটি সংখ্যায় চাব্বিশ বছর ধরে প্রকাশিত বিভিন্ন কবি, সমালোচক ও লেখকদের রচনাগুলি এখন বর্ষানুসারে লিপিবদ্ধ করা হল-

প্রথম বর্ষ। আশ্বিন,১৩৪২ (প্রথম সংখ্যা)

কবি/ লেখক	বিষয়
১) প্রেমেন্দ্র মিত্র	তামাশা (কবিতা)
২) বুদ্ধদেব বসু	চিল্কায় সকাল (কবিতা)
৩) বুদ্ধদেব বসু	ঘুমের গান (কবিতা)
৪) বুদ্ধদেব বসু	বিরহ (কবিতা)
৫) বিষ্ণু দে	পঞ্চমুখ (কবিতা)
৬) সমর সেন	Amar Stands Upon (অনুবাদ কবিতা)
৭) সমর সেন	মুক্তি (কবিতা)
৮) সমর সেন	স্মৃতি (কবিতা)
৯) সমর সেন	প্রেম (কবিতা)
১০) সঞ্জয় ভট্টাচার্য	নীলিমা (কবিতা)
১১) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	জাগরণ (কবিতা)
১২) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	জন্মান্তর (কবিতা)
কবি/লেখক	**বিষয়**
১৩) জীবনানন্দ দাশ	মৃত্যুর আগে (কবিতা)
১৪) অজিতকুমার দত্ত	ন খলু ন খলু বাণঃ-(কবিতা)
১৫) প্রণব রায়	আলাপ (কবিতা)
১৬) স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়	প্রচ্ছন্ন (কবিতা)
১৭) হেমচন্দ্র বাগচী	সমাপ্তির সুর (কবিতা)
১৮) বুদ্ধদেব বসু	কবিতায় দুর্বোধ্যতা(সমালোচনা)

প্রথম বর্ষ। পৌষ,১৩৪২ (দ্বিতীয় সংখ্যা)

কবি/ লেখক	বিষয়
১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ছুটি (কবিতা)
২) বুদ্ধদেব বসু	দয়াময়ী (কবিতা)
৩) সমর সেন	বিস্মৃতি (কবিতা)
৪) সমর সেন	দুঃস্বপ্ন (কবিতা)
৫) সমর সেন	ইতিহাস (কবিতা)
৬) স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়	স্বপ্ন-সিদ্ধি (কবিতা)
৭) স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়	পুরুৎঠাকুর (কবিতা)
৮) জীবনানন্দ দাশ	বনলতা সেন (কবিতা)
৯) জীবনানন্দ দাশ	কুড়ি বছর পর (কবিতা)
১০) জীবনানন্দ দাশ	মৃত মাংস (কবিতা)

১১) জীবনানন্দ দাশ	ঘাস (কবিতা)
কবি/ লেখক	**বিষয়**
১২) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	শেক্সপীয়রের সনেট অবলম্বনে (কবিতা)
১৩) বিষ্ণু দে	প্রথম পার্টি (কবিতা)
১৪) বুদ্ধদেব বসু	আধুনিকতার মোহ (সমালোচনা)
১৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	চিটিপত্র (বুদ্ধদেব বসুকে লেখা)
১৬) বুদ্ধদেব বসু	নতুন কবিতা,বীথিকা-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর(সমালোচনা)
১৭) বুদ্ধদেব বসু	অর্কেষ্ট্রা-সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (সমালোচনা)
১৮) বুদ্ধদেব বসু	সন্ধ্যালোকে-সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (সমালোচনা)

উপরে শুধুমাত্র কবিতা পত্রিকার প্রথম বর্ষের দুটি সংখ্যা লিপিবদ্ধ করা হলো। এই সংখ্যাগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়, কবিতার প্রতি বুদ্ধদেব বসুর সততা ও নিষ্ঠা কতটা নিবেদিত। যে আশা নিয়ে তিনি ‘কবিতা’ পত্রিকার সূচনা করেছিলেন সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন-

> “কবিতার জন্য পরিচ্ছন্ন আর নিভৃত একটু স্থান করে দেবো, যাতে তাকে ক্রমশপ্রকাশ্য উপন্যাসের পদপ্রান্তে বসতে না হয়…তারই জন্য নির্দিষ্ট খেয়ায় সধর্মীর সঙ্গে সসম্মানে সে পৌঁছতে পারে স্বল্পসংখ্যক সুনির্বাচিত পাঠকের কাছে-এইটুকু মাত্র ইচ্ছা করেছিলাম।”[২৩]

বুদ্ধদেব বসু নিজেই ‘সসম্মানে’ আর ‘সুনির্বাচিত’ কথাদুটি লক্ষ করতে বলেছিলেন। ‘কবিতা’র প্রতিটি সংখ্যাই বাঙালি পাঠককে প্রায় তিন দশক ধরে এই কথাদুটির সামর্থ্য বিশেষভাবে লক্ষ করতে বাধ্য করেছে। কবিতার নির্বাচনে বুদ্ধদেব সবসময়ই সফলতম লেখাটির জন্য উৎসুক থাকতেন। কবিতাকে সম্ভাব্য গন্তব্যে পৌঁছে দেবার মেধাবী ও পরিশ্রমী দায়িত্বটুকুও তিনি সানন্দে পালন করতেন।

১ অক্টোবর ১৯৩৫ সালে ‘কবিতা’ পত্রিকা আরম্ভ হয়ে সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় মার্চ-এপ্রিল ১৯৬১ সালে। এই দীর্ঘ পথযাত্রায় ‘কবিতা’কে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। পত্রিকার বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ‘কবিতা’ পত্রিকার তেরো বছর পূর্তির সময়কার সম্পাদকীয় বক্তব্যে। যেখানে পত্রিকার আর্থিক সংকট, পাঠকসংখ্যার হ্রাস, বিজ্ঞাপনের অভাব এবং প্রকাশনার ক্রমবর্ধমান খরচের চাপে এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কতটা কঠিন হয়ে পড়েছে, তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই সম্পাদকীয়তে ‘কবিতা’ পত্রিকার বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রাথমিক মুহূর্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে ধরা যেতে পারে। এখানে বুদ্ধদেব বসু সরাসরি স্বীকার করেছেন যে ‘কবিতা’র আয়ের তুলনায় ব্যয় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকার জন্য অত্যন্ত প্রতিকূল।পত্রিকার টিকে থাকার জন্য বিজ্ঞাপন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, কিন্তু কলকাতার দাঙ্গা ও ব্যবসামন্দার কারণে বিজ্ঞাপনদাতাদের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। ফলে ‘কবিতা’র জন্য নিয়মিত প্রকাশনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

বুদ্ধদেব বসুর কথায়-

> “কবিতা’র সংসারে অকুলোন ঘটতে-ঘটতে এখন অসম্ভবের কাছাকাছি এসেছে। ১৯৩৮-এর তুলনায় ‘কবিতা’র দাম বেড়েছে আড়াইগুণের কিছু বেশি, বিজ্ঞাপনের হার দ্বিগুণের কিছু কম, আর খরচ বেড়েছে অন্তত চারগুণ।… এই সংকট আর বেশিদিন সহ্য করতে নিশ্চয়ই সে পারবে না।”[২৬]

উক্ত আবেদন থেকে বোঝা যায়, তখনকার সময়ে নতুন গ্রাহক পাওয়া কতটা কঠিন হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধদেব বসুর এই বক্তব্য শুধুমাত্র ‘কবিতা’র সংকটেরই চিত্র নয়, বরং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সাহিত্য পত্রিকার টিকে থাকার সংগ্রামের প্রতিফলনও বটে।

তিন বছর পর আবার আশ্বিন ১৩৫৮ (সেপ্টম্বর-অক্টোবর) ১৯৫১ মাসে সম্পাদকীয়তে বুদ্ধদেব বসু জানালেন আর্থিক অসদ্ভাবের কথা, কবিতা’র প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ার কথা। তবুও বুদ্ধদেব প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন অবস্থাটা সামাল দেবার জন্য। এই সম্পাদকীয়তে জানালেন-

> “...কবিতা’র এই আশ্বিন সংখ্যা চৈত্র মাসে বেরোলো। চৈত্র সংখ্যার আর সময় হবে না; এর পরেই আষাঢ় সংখ্যা প্রকাশিত হবে-আশা করছি যথাসময়েই।...এর পর থেকে পত্রিকা প্রকাশ যাতে নিয়মিত হয়, এই সংকল্পসাধনের জন্য আমাদের গ্রাহক এবং পাঠকদের সহযোগিতা আমরা প্রার্থনা করি।”[২৮]

কালের প্রবাহে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির যেমন পরিবর্তন ঘটে, তেমনি সাহিত্যের নির্মাণভাবনা, শৈলীতেও তার স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ‘কবিতা’ পত্রিকা বাংলা কবিতাকে সুদীর্ঘ বছর লালন করলেও ১৯৫০-এর পরবর্তী বংলাসাহিত্যের গতি ভিন্ন পথে প্রবাহিত হতে শুরু করে। সে সময়ের যুগধর্ম রক্ষার্থে ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় তরুণ কবিদের মুখপাত্র ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকা। ‘কবিতা’ পত্রিকা যেহেতু অবিভাবকসুলভ তাই এতে কবিতা প্রকাশের সৌভাগ্যকে তরুণ কবিরা শ্রদ্ধাভরে গ্রহন করেছেন।

চৈত্র ১৩৬৭(মার্চ-এপ্রিল ১৯৬১) সংখ্যাই যে ‘কবিতা’ সর্বশেষ সংখ্যা হবে সেটা কেউ ভাবেননি। কারণ পত্রিকার অন্যান্য সংখ্যার মতো এই সংখ্যাতেও গ্রাহক হবার নিয়মাবলী, ঠিকানা বদল হলে সঙ্গে সঙ্গে তা জানাবার অনুরোধ ইত্যাদি সংবলিত বিজ্ঞপ্তিটিও বেড়িয়েছিল। তবুও ‘কবিতা’র প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। ‘বুদ্ধদেব বসুর জীবন’ গ্রন্থে সমীর সেনগুপ্ত জানিয়েছেন- কবিতা বন্ধ হয়ে যাবার জন্য আক্ষেপ তরুণ কবিদের অন্যতম ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকায় ধ্বনিত হল প্রায় দু-বছর পরে- চৈত্র ১৩৬৯(মার্চ-এপ্রিল ১৯৬৩) সংখ্যায়-

> “...প্রথম লিখতে আরম্ভ করার সময় আমরা ভাবতুম যদি কখনো ‘কবিতা’ পত্রিকায় আমার রচনা ওঠে, তবে জীবন ধন্য হবে।... এখন যারা কবিতা লিখতে শুরু করবেন- তাঁদের জন্য এ স্বর্গ রইল না। তাঁরা কোন কাগজে নিজের লেখা দেখে জীবন ধন্য করবেন কোনো কাগজ নেই আর।...”[২৯]

‘কবিতা’ হঠাৎ বন্ধ করে দিলেন কেন? এরকম একটি জরুরী প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ‘অন্যমন’ নামক ছোট পত্রিকার ১৩৭৬ (১৯৬৯ খৃ.) শরৎকালীন সংখ্যায় বুদ্ধদেব একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন পত্রিকা বন্ধ করে দেবার অন্তর্নিহিত কারণ-

> “...কয়েক বছর আগে অনেকটা স্বল্প ব্যবধানে আমাকে দু-দুবার বিদেশে যেতে হ’লো এবং সেই সময়েই ‘কবিতা’ এত অনিয়মিত হ’য়ে পড়লো...একেবারে আসল কারণ বোধহয় এই যে আমি নিজেই পত্রিকা পরিচালনায় ক্লান্ত হ’য়ে পড়েছিলাম; নিজের জন্য, নিজের লেখার জন্য আরও বেশি সময় চাচ্ছিলাম। পত্রিকা সম্পাদনা যৌবনের কাজ। যৌবন পেরিয়ে এসে তা না করাই উচিত।”[৩০]

‘সাহিত্যপত্র’এর স্বধর্ম প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব নিজেই বলেছিলেন-

> “স্বল্পায়ুতাই এদের চরিত্র লক্ষণ। বিশেষ-কোনো সময়ে, বিশেষ-কোন ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর উদ্যমে, বিশেষ কোনো একটি কাজ নিয়ে সঞ্জাত হয়, এবং সেটুকু সম্পন্ন হলেই এদের তিরোধান ঘটে। সেটাই শোভন, সেটাই যথোচিত।”[৩১]

‘কবিতা’ পত্রিকা শুধু একটি সাহিত্যপত্র ছিল না, এটি ছিল বাংলা কবিতার এক নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন। নানা সংকট ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেও এই পত্রিকা আধুনিক বাংলা কবিতার বিকাশে যে ভূমিকা রেখেছে, তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। নতুন কবিদের জন্য যেমন অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, তেমনি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে গভীর সাহিত্যচিন্তা ও উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে। বুদ্ধদেব বসুর নেতৃত্বে ‘কবিতা’ হয়ে উঠেছিল এক সৃজনশীল মঞ্চ, যেখানে নবীন-প্রবীণ কবিরা মিলে বাংলা কবিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। ‘কবিতা’ শুধুমাত্র কবিতা চর্চার ক্ষেত্র তৈরি করেনি, বরং আধুনিক বাংলা কবিতার ভাষা, কাঠামো ও বিষয়বস্তুতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। নবীন কবিদের জন্য এটি ছিল আশ্রয়, যেখানে তারা তাদের নিজস্ব কণ্ঠকে প্রকাশের সুযোগ পেয়েছেন। প্রবীণ কবিরাও তাঁদের সৃজনশীলতার নতুন দিক উন্মোচনের ক্ষেত্র হিসেবে । ফলে এটি হয়ে উঠেছে এক সমৃদ্ধ সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র, যা কবিতার পাশাপাশি সাহিত্যের অন্যান্য শাখাকেও প্রভাবিত করেছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাই ‘কবিতা’ পত্রিকার অবদান অবিস্মরণীয়ভাবে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

তথ্যসূত্র:

১) দেব, হারীতকৃষ্ণ, সবুজ পাতার ডাক,আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ মিঃ, কলকাতা ৭০০০০৯, ১৯৯৭, পৃ.৩০
২) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-৪ ‘সাহিত্যপত্র’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২০, পৃ.৩৪১
৩) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-৪ ‘সাহিত্যপত্র’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২০, পৃ.৩৪২
৪) তদেব, পৃ.৩৪২
৫) সেনগুপ্ত, অচিন্তকুমার, কল্লোল যুগ, ডি.এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা-৬, আষাঢ় ১৩৫৮, পৃ.৩০
৬) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-৪ ‘সাহিত্যপত্র’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২০, পৃ.৩৪৩
৭) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-১ ‘আমার যৌবন’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২২, পৃ.৭৯
৮) দত্ত, সন্দীপ, বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিবৃত্ত ১৯০০-১৯৫০, গাঙচিল, কলকাতা ৭০০১১১, জানুয়ারী ২০১৬, পৃ.৭৮
৯) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-৪ ‘সাহিত্যপত্র’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২০, পৃ.৩৪৫
১০) তদে্ব, পৃ.৩৪৫
১১) তদেব, পৃ.৩৪৬
১২) বসু, প্রতিভা, জীবনের জলছবি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০২০, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ.১১৮
১৩) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-১ ‘আমার যৌবন’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২২, পৃ.১৩৪
১৪) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-১ ‘আমার যৌবন’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২২, পৃ.১৩৭
১৫) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-৪ ‘সাহিত্যপত্র’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২০, পৃ.৩৪২
১৬) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-৪ ‘কবিতা ও আমার জীবন’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২০, পৃ.৬৩২
১৭) তদেব, পৃ.৬২৩
১৮) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-৪ ‘সাহিত্যপত্র’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২০, পৃ.৩৪১
১৯) বসুরায়, শেখর, বৈদগ্ধ্য, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা ৭০০০২৭, মে ১৯৯৯, পৃ. ২৫৪
২০) বসুরায়, শেখর, বৈদগ্ধ্য, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা ৭০০০২৭, মে ১৯৯৯, পৃ. ২৫০
২১) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-৪ ‘কবিতার কুড়ি বছর’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২০, পৃ.১৩৩
২২) তদেব, পৃ.১৩৪
২৩) তদেব,পৃ.১৩২
২৪) বসু, প্রতিভা, জীবনের জলছবি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০২০, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ.১৫১
২৫) বসুরায়, শেখর, বৈদগ্ধ্য, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা ৭০০০২৭, মে ১৯৯৯, পৃ. ২৫৮
২৬) কবিতা পত্রিকা, ত্রয়োদশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা-আষাঢ়,সম্পাদকীয়, পৃ.১২৬
২৭) কবিতা পত্রিকা, ষষ্ঠদশ বর্ষ, আশ্বিন সংখ্যা-১৩৫৪, সম্পাদকীয়, পৃ.১৮১
২৮) সেনগুপ্ত, সমীর, বুদ্ধদেব বসুর জীবন, প্রতিভাস, কলকাতা ৭০০০০২, জানুয়ারী ২০১৯, পৃ.৩১৭
২৯) সেনগুপ্ত, সমীর, বুদ্ধদেব বসুর জীবন, প্রতিভাস, কলকাতা ৭০০০০২, জানুয়ারী ২০১৯, পৃ.৩১৭
৩০) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-৪ ‘সাহিত্যপত্র’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২০, পৃ.৩৫০

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1282-1290
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.131

প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রে ক্যান্সার বিষয়ক একটি আলোচনা

ড. অসীম চক্রবর্তী, *সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, উইমেন্স খ্রিশ্চান কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.05.2025; Accepted: 28.05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The ancient physicians of India were not unaware of cancer as a disease. Although the term "cancer" does not have a direct equivalent in classical Ayurvedic texts, references to certain diseases with symptoms and clinical features similar to cancer can be found. These diseases have been discussed in various contexts within Ayurvedic literature. This article explores those conditions and attempts to explain them in light of modern medical science. While the word *"cancer"* is not explicitly mentioned in Ayurvedic texts, there are multiple references to diseases whose signs, symptoms, and progression are comparable to those of modern cancer. Diseases such as "Arbuda" and "Granthi" are described in a way that suggests tumor-like growths and abnormal cellular proliferation. Ayurvedic scriptures provide detailed discussions on the causes, development, and potential treatments of these conditions. This article analyses such ancient disease descriptions and offers a comparative interpretation from the perspective of contemporary medical science, showcasing the profound insight of ancient Indian medical knowledge and its relevance in modern times.

Keywords: Veda, *Cancer,* Āyurveda, Suśruta Saṁhitā, Modern medical science

ক্যান্সার শব্দের উৎপত্তি এবং প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে ক্যান্সার ধারণা

"ক্যান্সার" শব্দটি গ্রিক ভাষা থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ "কাঁকড়া"(Crab)। চিকিৎসাবিজ্ঞানে বহুদিন ধরে এই শব্দটি একটি কারিগরি পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে—"ক্যাঙ্কার"(Canker)— যা ক্ষয়প্রাপ্ত ঘায়ের (eroding ulcers) ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হতো। এই প্রতিশব্দ ব্যবহারের পেছনে অনুপ্রেরণা ছিল, বৃদ্ধি বা টিউমারের চারপাশে প্রসারিত অসংখ্য দৃশ্যমান শিরা বা রক্তনালীর উপস্থিতি, যা দেখতে কাঁকড়ার পাঞ্জার মতো মনে হত। ভারতের প্রাচীন চিকিৎসকগণ ক্যান্সারকে একটি রোগ হিসেবে অজানা ভাবেননি। যদিও প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে **'ক্যান্সার'** শব্দটির সরাসরি প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না, তবুও এমন কিছু রোগের উল্লেখ রয়েছে, যাদের লক্ষণ ও উপসর্গ আধুনিক ক্যান্সারের সাথে মিল রয়েছে। এই রোগসমূহ আয়ুর্বেদীয় সাহিত্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে ঐসব রোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে তাদের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

ডব্লিউ. আর. বেল্ট(W. R. Belt) মতে, ক্যান্সার শব্দের ব্যবহার এসেছে এর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের কারণে— যেমন **কাঁকড়া** কোনো বস্তুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে রাখে এবং সহজে ছাড়া যায় না, তেমনি টিউমারও সংশ্লিষ্ট অংশের সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে এবং তা থেকে আলাদা করা কঠিন।

ম্যালিগন্যান্ট (ঘাতক) রোগগুলির সুনির্দিষ্ট সনাক্তকরণ ও বিভাজন প্রক্রিয়া প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের বর্ণনার অনেক পরে আধুনিক যুগে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। তবে ক্যান্সারজাত রোগের প্রাচীনতম উল্লেখ আমরা দেখতে পাই অথর্ববেদে। সেখানে রোগটির নামকরণ করা হয়েছে **'আপচিত'** (Apacit) হিসাবে। এটি দেহের বিভিন্ন স্থানে স্ফীতি বা ফোলার(swelling) আকারে বর্ণিত হয়েছে। এটি মোটেই বোঝায় না যে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকরা ম্যালিগন্যান্ট রোগসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। বরং তারা তাদের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ক্যান্সারকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ত্বকের উপরিভাগে অথবা দেহের গভীরে অবস্থিত দীর্ঘস্থায়ী স্ফীতি বা দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতের(chronic ulcers) আকারে বর্ণনা করেছেন। এমন দীর্ঘস্থায়ী স্ফীতি বা গাঠিত অংশগুলিকে তারা বিশেষ গুরুত্বের সাথে চিহ্নিত করেছিলেন। এরূপ দীর্ঘস্থায়ী স্ফীতি বা গাঁটসমূহকে আয়ুর্বেদে **আর্বুদ** (Arbuda) শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে এগুলি মারাত্মক বা বিপজ্জনক বৃদ্ধির লক্ষণ বহন করে। অন্যদিকে, নিরাময় অযোগ্য দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত বা ঘাঁকে অসাধ্য ব্রণ (Asadhya Vrana) নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ক্যান্সার একটি অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির রোগ, যার জটিলতা শরীরবৃত্ত, শারীরিক গঠন, প্রাণরসায়ন, আণবিক জীববিজ্ঞান এবং জিনের অভিব্যক্তি— প্রতিটি স্তরেই বিদ্যমান। এই রোগের চিকিৎসা করা এক বিশাল সংগ্রাম। এই রোগ প্রতিরোধে অস্ত্রোপচার, রেডিয়োথেরাপি, বিকিরণ চিকিৎসা, ইন্টারফেরন থেরাপি, হরমোন থেরাপি এবং রক্ত সঞ্চালনসহ বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। তবে বর্তমানে ব্যবহৃত চিকিৎসাপদ্ধতিগুলি মূলত জীবাণু বা প্যাথোজেন নির্মূল বা তাদের বিস্তার কমানোর উদ্দেশ্যে গৃহীত, এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট আসন্ন সমস্যাগুলিও প্রতিরোধের চেষ্টা করা হয়। ফলে, ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের মৃত্যু ও অসুস্থতার হার এখনও অনেক বেশি।

আয়ুর্বেদ, যা কেবলমাত্র একটি চিকিৎসা পদ্ধতি নয়, বরং একটি জীবনধারা, যার মূল লক্ষ্য হলো রোগ প্রতিরোধ এবং সমগ্র জীবন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রোগের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা। মাধবকরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, রোগের বিকাশক্রমে 'নিদান' হলো প্রথম এবং প্রধান স্তর, যা রোগের উৎপত্তি সম্পর্কে বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

সুতরাং, **আয়ুর্বেদ**— বিশেষ করে **সুশ্রুত সংহিতায়** বর্ণিত **আর্বুদ-গ্রন্থি** সংক্রান্ত ক্লিনিকাল সংজ্ঞার আলোকে— ক্যান্সার চিকিৎসায় একটি নতুন দিশা প্রদানের সম্ভাবনা রাখে।

শ্রেণীবিভাগ (Classification):

যদিও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের যুগে রোগ নির্ণয় এবং নিশ্চিতকরণের জন্য হালকা ও ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল (টিস্যু ভিত্তিক) পরীক্ষায় প্রচুর প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, প্রাচীন কালে এইসব সুবিধা অনুপস্থিত ছিল। সে সময় চিকিৎসকদের সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হতো রোগের বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল লক্ষণ এবং দোষ (দোষ তত্ত্ব: বাত, পিত্ত, কফ) ভিত্তিক বিশ্লেষণের ওপর।

তৎকালীন সময়ের সীমাবদ্ধতাগুলিকে(lacunae) বিবেচনায় রেখে, প্রাচীন বর্ণনার আলোকে ম্যালিগন্যান্ট (ঘাতক) রোগসমূহকে নিম্নরূপ শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে:

যেসব রোগকে স্পষ্ট ম্যালিগন্যান্সি (ঘাতক রোগ) হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে: এ ধরনের রোগে টিস্যুর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, আশেপাশের কোষ ও টিস্যুর উপর আক্রমণাত্মক প্রভাব এবং শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা (মেটাস্টাসিস) স্পষ্টভাবে দেখা যায়। আয়ুর্বেদে এগুলিকে **আর্বুদ**(Arbuda) নামে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. যেসব রোগকে ম্যালিগন্যান্সি হওয়ার সম্ভাব্য রোগ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে: এ ধরনের রোগে কিছু ম্যালিগন্যান্ট বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকতে পারে, তবে তা সর্বদা স্পষ্ট বা নিশ্চিত নয়।

এসব ক্ষেত্রে রোগটি ধীরে ধীরে মারাত্মক রূপ নিতে পারে অথবা নির্দিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পেতে সময় নিতে পারে। আয়ুর্বেদে এগুলি দীর্ঘস্থায়ী গাঁট, অসাধ্য ব্রণ(Asadhya Vrana) অথবা অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতের রূপে চিহ্নিত করা হয়-

১. ম্যালিগন্যান্সির (ঘাতক রোগের) অনুরূপ উপসর্গ প্রদর্শনকারী রোগসমূহ।

২. স্পষ্ট ম্যালিগন্যান্সি (ঘাতক রোগ) হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে এমন রোগসমূহ

এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত রোগসমূহকে আবার নিম্নরূপভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে:

(ক) অরুবুদ (Arbuda) - নবগঠিত টিউমার বা অস্বাভাবিক কোষ বৃদ্ধি (Neoplasia)

(খ) অসাধ্য ব্রণ (Asadhya Vrana) - মারাত্মক বা ম্যালিগন্যান্ট প্রকৃতির দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত (Malignant ulcer)

(ক) আর্বুদ (Arbuda)

বৈদিক যুগে **আর্বুদ** শব্দটি একটি সাপের মতো দৈত্য বোঝাতে ব্যবহৃত হতো, যাকে দেবতা ইন্দ্র পরাজিত করেছিলেন (মনিয়ার উইলিয়ামস অনুযায়ী)। অপরদিকে, সাহিত্যিক অর্থে অরুবুদ বলতে বোঝানো হয় একটি গাঁট বা বৃহৎ পিণ্ড। সুশ্রুত সংহিতা অনুসারে, আর্বুদ হলো একটি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকা বৃহৎ আকারের, গোলাকার আকৃতির, গভীর স্তরের সঙ্গে সংযুক্ত (স্থির) পিণ্ড, যা সাধারণত পেকে না (অর্থাৎ পুঁজ ধরে না), মাঝে মাঝে সামান্য ব্যথা দেয় এবং দেহের যেকোনো অংশে গঠিত হতে পারে। এটি মূলত মাংস (মাংসধাতু) এবং রক্ত (রক্তধাতু)-কে আঘাত করে, যা ত্রিদোষ (বাত, পিত্ত, কফ) বিকৃতির ফলে ঘটে।[i]

(খ) আর্বুদের কারণ ও রোগগঠন (Etiopathogenesis of Arbuda)

আর্বুদের রোগগঠন মূলত দোষ তত্ত্ব (Vata, Pitta, Kapha) ভিত্তিক। ভ্রান্ত আহার-বিহার (Mithya Ahara-Vihara)- যেমন অনুপযুক্ত খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার মাধ্যমে- দোষসমূহ বিকৃত হয় এবং বিভিন্ন ধাতু (যেমন মাংস, মেদ, রক্ত ইত্যাদি)-কে আক্রান্ত করে, যার ফলে অরুবুদের সৃষ্টি হয়। যদিও অরুবুদের উৎপত্তির জন্য তিনটি দোষই দায়ী, তবুও প্রায় সকল আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে কফ দোষকে (Kapha) বিশেষভাবে প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুশ্রুত সংহিতায় বলা হয়েছে, কফের আধিক্যের ফলে আর্বুদ সাধারণত পাকে না (অর্থাৎ পুঁজ জমে না), এবং দেহে যেকোনো ধরনের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বা পিণ্ড সৃষ্টির প্রধান ও সাধারণ কারণ হিসেবে কফকেই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়েছে।[ii]

এভাবে দেখা যায়, শরীরে কফ দোষের অতিরিক্ত বিকৃতি (vitiated Kapha) ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী হতে পারে, এমন অনুমান করা যুক্তিযুক্ত। সুশ্রুত সংহিতায় উল্লেখ আছে, উত্তেজনা (Irritation)[iii] এবং আঘাত (Trauma)[iv] আর্বুদ সৃষ্টিতে উদ্দীপক বা প্ররোচক ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন, বাহ্যিক জননেন্দ্রিয়ের (external genitalia) বর্ধনের জন্য কিছু উত্তেজক ঔষধের স্থানীয় প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের ঔষধের অপব্যবহার বা অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের ফলে (যেমন লিঙ্গ বর্ধক চিকিৎসা- (Linga Vriddhikara Yoga) মাংস- আর্বুদ (Mamsarbuda) সৃষ্টি হতে দেখা গেছে।

সুশ্রুতের মতে, আঘাত (Trauma) মাংস -আর্বুদের (Mamsarbuda) একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। অপরদিকে, বাগভট বলেছেন, অতিরিক্ত মাংসধাতুর (Mamsa Dhatu) গঠন হলে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হতে পারে (আ. হৃ. সূ. ১১/১০), যেমন:

- গলগণ্ড (Galaganda),
- গণ্ডমালা (Gandamala),
- আর্বুদ (Arbuda),
- গ্রন্থি (Granthi),
- অধিমাংস (Adhimamsa) ইত্যাদি।

এতে বোঝা যায় যে, ভ্রান্ত আহার (Mithya Ahara) এবং ভ্রান্ত বিহার (Mithya Vihara) স্থানীয় বা সিস্টেমিক বায়োরসায়নিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে (সু.নি. ১১/১৩), যার মধ্যে হিমোডায়নামিক্স (রক্তপ্রবাহের গতি ও চাপ — S. N. 11/16)-এর পরিবর্তনও অন্তর্ভুক্ত, এবং এর ফলেই অরুবুদের সৃষ্টি হয়।

আর্বুদের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Arbuda)

আর্বুদ সমূহকে নিম্নোক্ত শিরোনামগুলির অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে:

১. দোষ অনুসারে আর্বুদের প্রকারভেদ: ত্রিদোষ (বাত, পিত্ত, কফ) বিকৃতির উপর ভিত্তি করে অরুবুদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

২. অবস্থান অনুসারে আর্বুদের প্রকারভেদ: দেহের কোন অংশে অরুবুদ সৃষ্টি হয়েছে, তার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

৩. প্রগনোসিস (রোগের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা) অনুসারে আর্বুদের প্রকারভেদ: কোন আর্বুদের নিরাময়যোগ্যতা বা জটিলতার উপর ভিত্তি করে এর শ্রেণীবিভাগ করা হয় — যেমন নিরাময়যোগ্য, কঠিন বা অসাধ্য (Asadhya) ইত্যাদি।

৪. ধাতু (টিস্যু) অনুসারে আর্বুদের প্রকারভেদ: যে ধাতু বা টিস্যু (যেমন মাংস, রক্ত, মেদ ইত্যাদি) আক্রান্ত হয়েছে, তার ভিত্তিতে অরুবুদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

দোষ অনুসারে আর্বুদ (Arbuda According to Dosha)সুশ্রুত দোষভিত্তিকভাবে অরুবুদকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন:[v]

১.বাতজ আর্বুদ (VatajaArbuda)
২.পিত্তজ আর্বুদ(Pittaja Arbuda)
৩.কফজ আর্বুদ(Kaphaja Arbuda)
৪. ত্রিদোষজ আর্বুদ (Tridosaja Arbuda)

এটি ইঙ্গিত করে যে, শরীরে দোষসমূহের (বাত, পিত্ত ও কফ) বিকৃতি বা বিশৃঙ্খলা- যা অন্য দোষের তুলনায় কম বা বেশি হতে পারে- malignant (ঘাতক) বৃদ্ধি সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দোষগুলির চরম বিকৃতি বা বিচ্যুতি শরীরে মারাত্মক পরিণতি (মৃত্যু পর্যন্ত) ডেকে আনতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন দোষ বিকৃতির উপর ভিত্তি করে, আর্বুদ লক্ষণ বিশ্লেষণ করে এগুলিকে যথাক্রমে বাতজ, পিত্তজ অথবা কফজ আর্বুদ হিসেবে নির্ণয় বা লেবেল করা যায়। আর যদি কোনো আর্বুদের মধ্যে তিনটি দোষের মিশ্র লক্ষণ একত্রে বিদ্যমান থাকে, তবে সেটিকে ত্রিদোষজ আর্বুদ বলা হয়। তবে, নির্দিষ্টভাবে কোনো আর্বুদের নির্ণয় বা বিশেষ দোষ নির্ধারণ করতে হলে, আয়ুর্বেদের মৌলিক গবেষণা এবং বিশদ উন্নত অধ্যয়নের প্রয়োজন।

ধাতু (টিস্যু বা কোষ) অনুসারে আর্বুদ (Arbuda According to Dhatu)

এটি থেকে বোঝা যায় যে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকরা স্থানীয় কারণ হিসেবে অথবা দোষের বিকৃতির (doshic derangement) মাধ্যমে বিভিন্ন ধাতু বা টিস্যুর জড়িত থাকার বিষয়ে সচেতন ছিলেন। সুশ্রুতের নিদান স্থানে (Nidana Sthana) আর্বুদের ক্ষেত্রে তিন ধরনের ধাতু বা টিস্যুর সংশ্লিষ্টতার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হলো:

১.মেদজ আর্বুদ (Medaja Arbuda)— মেদ বা চর্বিযুক্ত টিস্যু (fatty tissue) থেকে উৎপন্ন আর্বুদ।

২.মাংসজ আর্বুদ (Mamsaja Arbuda)— মাংসপেশি বা পেশী টিস্যু (muscular tissue) থেকে উৎপন্ন আর্বুদ ।

৩. রক্তজ আর্বুদ (Raktarbuda)— রক্ত বা রক্ত সম্পর্কিত টিস্যু (blood tissue) থেকে উৎপন্ন আর্বুদ।

তবে, আরও একটি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় যেখানে অস্থি (Asthi) বা হাড়ের সংশ্লিষ্টতা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে অধ্যস্থি (Adhyasthi) নামে এক ধরনের আর্বুদের বর্ণনা করা হয়েছে, যা অস্থির অতিরিক্ত বৃদ্ধি বা ফুলে যাওয়ার মতো (swelling) অবস্থা নির্দেশ করে, যদিও এটিকে সরাসরি অস্থ্যার্বুদ (Asthyarbuda) নামে অভিহিত করা হয়নি।

পুনরায়, যদি কোনো বিশেষ স্থানে অস্থিক্ষয় (Asthi Kshaya) ঘটে এবং তা প্যাথলজিক্যাল ফ্র্যাকচার (রোগজনিত হাড় ভাঙ্গা) অথবা হাড়ের ধ্বংসাত্মক পরিবর্তনের (osteoclastic destructive changes) সাথে মিলে যায়, তবে সেই অবস্থাকেও অস্থ্যার্বুদ (Asthyarbuda) এর আওতায় ধরা যেতে পারে।

অবস্থান অনুসারে আর্বুদ প্রকারভেদ (Types of Arbuda According to Sites)

সুশ্রুতের মতে, আর্বুদ দেহের যেকোনো স্থানে বা টিস্যুতে হতে পারে, এমন কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই যা অরুবুদের সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পেতে পারে। আর্বুদ দেহের বিভিন্ন অঙ্গে দেখা যেতে পারে, যেমন:

- বর্তমারবুদ (Vartmarbuda) — চোখের পাতায় আর্বুদ
- কর্ণারবুদ (Karnarbuda) — কানে আর্বুদ
- নাসারবুদ (Nasarbuda) — নাকে আর্বুদ
- তালুয়ারবুদ (Taluarbuda) — তালুতে আর্বুদ
- জালবুদ এবং অষ্টারবুদ (Jalabuda ও Ostharbuda) — ঠোঁটে আর্বুদ
- গলারবুদ (Galarbuda) — গলায় আর্বুদ
- মুখারবুদ (Mukharbuda) — মুখগহ্বরে আর্বুদ
- শিরারবুদ (Sirarbuda) — মস্তিষ্ক বা মস্তকের টিউমার

উপরোক্ত স্থানগুলি ছাড়াও, জেনাইটাল অঙ্গ বা জননাঙ্গেও আর্বুদ দেখা দিতে পারে, যা শুকদোষ (Suka Dosa) নামক ব্যাধির অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে দুটি ধরণের আর্বুদ লক্ষ্য করা যায়:

- মাংসারবুদ (Mamsarbuda) — মাংসপেশির বৃদ্ধি সম্পর্কিত
- শোনিতারবুদ (Sonitarbuda) — রক্ত সম্পর্কিত বৃদ্ধি

এগুলি সাধারণত বিভিন্ন প্রকারের লিঙ্গবৃদ্ধিকার যোগ (Linga Vriddhikara Yoga) বা ঔষধের অপব্যবহারের ফলে সৃষ্ট হয়।

প্রগনোসিস (রোগের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা) অনুযায়ী আর্বুদ প্রকারভেদ (Types of Arbuda According to Prognosis)

আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ অনুযায়ী, আর্বুদকে নিরাময়ের সম্ভাবনা অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. সাধ্য (Sadhya)- যেসব অরুবুদের নিরাময় সম্ভব।

২. অসাধ্য (Asadhya)- যেসব আর্বুদের নিরাময় প্রায় অসম্ভব বা খুব কঠিন।

অধিকাংশ আর্বুদের নিরাময়যোগ্যতা সম্পর্কে (Prognosis of Most Arbudas)

প্রায় সব ধরনের আর্বুদ, যার মধ্যে রয়েছে-

- মাংসার্বুদ (Mamsarbuda),
- রক্তার্বুদ (Raktarbuda) এবং
- ত্রিদোষজ আর্বুদ (Tridoshaj Arbuda),

— যখন এগুলি কান, নাক, গলা ইত্যাদি স্থানে ঘটে, তখন এগুলিকে সাধারণত অসাধ্য (Asadhya) অর্থাৎ অনিরাময়যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়।

তবে, কিছু কিছু আর্বুদের সাধ্য (Sadhya) বা নিরাময়যোগ্য হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে, যা সম্ভবত —

- সিস্ট (Cyst)
- সৌম্য টিউমার (Benign Tumor) অথবা
- দীর্ঘমেয়াদী প্রদাহজনিত ফুলে যাওয়া (Chronic Inflammatory Swelling)- হতে পারে।

পুনরাবৃত্তি (Recurrence) ও মেটাস্ট্যাসিস (Metastasis)

সাধ্য আর্বুদ (Sadhya Arbuda) কোনো নির্দিষ্ট সময় পর অসাধ্য আর্বুদ (Asadhya Arbuda)-এ রূপান্তরিত হতে পারে, অর্থাৎ এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে অগ্রসর হতে পারে। অথবা, অসাধ্য আর্বুদ শরীরের অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়তে পারে, যাকে আধুনিক ভাষায় মেটাস্ট্যাসিস (Metastasis) বলা হয়।

আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে এই ধরনের ক্যান্সার বৃদ্ধির এবং বিস্তারের বিকাশকে "আর্বুদ(Adhyarbuda)" অথবা "দ্বিরার্বুদ (Dvirarbuda)" নামে অভিহিত করা হয়েছে। এর দ্বারা সম্ভবত বোঝানো হয়েছে — টিউমারের পুনরাবৃত্তি (recurrence) এবং দূরবর্তী স্থানে বিস্তার (metastasis)।

- যদি পূর্ববর্তী কোনো স্থানে অথবা তার কাছাকাছি এলাকায় পুনরায় অরুবুদ দেখা দেয়, তাহলে তাকে বলা হয় অধ্যার্বুদ (Adhyarbuda) (পুনরাবৃত্তি)।
- যদি বিভিন্ন স্থানে ধারাবাহিকভাবে একই ধরনের একাধিক বৃদ্ধি ঘটে, তাহলে তাকে বলা হয় দ্বিরার্বুদ (Dvirarbuda) (মেটাস্ট্যাসিস)।

অসাধ্য ব্রণ (Asadhya Vrana)- (ম্যালিগন্যান্ট আলসার)

অসাধ্য ব্রণ বিভিন্ন কারণে হতে পারে, যার মধ্যে ক্যান্সার অন্যতম প্রধান কারণ হতে পারে এবং তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুশ্রুত যেসব ভিন্ন ধরনের অসাধ্য ব্রণের (Asadhya Vrana) বর্ণনা দিয়েছেন, সেগুলি আধুনিক দৃষ্টিকোণে ম্যালিগন্যান্ট আলসার (Malignant Ulcers) হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

সুশ্রুতের মতে, এই ধরনের আলসারগুলির বৈশিষ্ট্য:

- দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির (Chronic),
- তোলা বা গড়ানো প্রান্তবিশিষ্ট ক্ষত (Raised or Rolled Edges),
- ফুলকপির মতো শক্ত মাংসল বৃদ্ধি (Firm, Fleshy Masses resembling Cauliflower),
- বিভিন্ন ধরনের ক্ষরণ (Various Types of Discharges) ।

এছাড়াও, কখনো কখনো এ ধরনের আলসারের সাথে কিছু সাধারণ উপসর্গও দেখা যায়, যেমন:

- বেদনাদায়ক শ্বাসপ্রশ্বাস (Painful Respiration),
- অরুচি (Anorexia),
- দীর্ঘস্থায়ী কাশি (Chronic Cough),
- কাক্ষেক্সিয়া বা চরম দুর্বলতা (Cachexia) ইত্যাদি,

যা ক্যান্সারের অগ্রগতি বা মেটাস্ট্যাসিস-এর (শরীরের অন্য স্থানে বিস্তারের) নির্দেশক হতে পারে।

ম্যালিগন্যান্সি (ক্যান্সার) হিসাবে বিবেচিত হতে পারে এমন রোগসমূহ

এখানে মূলত সেইসব রোগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেগুলি অসাধ্য (Asadhya) বলে চিহ্নিত এবং যাদের কিছু লক্ষণ ক্যান্সারের মতো। এই রোগগুলি হলো:

- মাংসজ অষ্ট (Mamsaja Ostha)
- আলস (Alasa)
- মাংস কচ্ছপ (Mamsa Kacchapa)
- গলৌধ (Galaudha)
- অসাধ্য গলগন্ড (Asadhya Galaganda)
- ত্রিদোষজ গুল্ম (Tridosaja Gulma)
- অসাধ্য ব্রণ (Asadhya Vrana)
- লিঙ্গার্ষ (Lingarsa) ইত্যাদি।

১. মাংসজ অষ্ট (Mamsaja Ostha)

এটি ঠোঁটের একটি অসাধ্য রোগ, যেখানে ঠোঁট ভারী, পুরু, ও মাংসল ফোলা আকার ধারণ করে এবং মাঝে মাঝে সেখানে আলসার (ক্ষত) দেখা দেয়। এ ধরণের ক্ষত এক্সোফাইটিক লেসন (Exophytic Lesion) এর সঙ্গে তুলনীয়, যা আধুনিক ভাষায় Ackerman's Cancer নামে পরিচিত।

২. আলসর (Alasa)

রক্ত (Rakta) এবং কফ্ (Kapha) দোষের বিকৃতির কারণে জিভের (tongue) নিচে গভীরভাবে একটি ফোলা তৈরি হয়। এটি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এবং দুর্গন্ধযুক্ত (Fishy Odour) তরল নিঃসরণ করে

আশেপাশের গঠনগুলিকে ধ্বংস করে দেয়। এই রোগের বৈশিষ্ট্য সালাইভারি গ্রন্থির (Salivary Glands) Adenocystic এবং Mucoid Epidermoid Tumours এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

৩. মাংস কচ্ছপ (Mamsa Kacchapa)

কফ্ দোষের বিকৃতির ফলে তালুতে (Palate) একটি বড় ফোলা হয়, যা ব্যথাযুক্ত এবং ধীরে ধীরে আকারে বৃদ্ধি পায়। এটি নিরাময় অযোগ্য এবং আধুনিক দৃষ্টিকোণে হার্ড প্যালেট টিউমার (Tumour of Hard Palate) এর সাথে তুলনীয়।

৪. গলৌধ (Galaudha)

এটিও রক্ত এবং কফ্ দোষের বিকৃতির ফলে হয়। এই রোগে গলায় ব্যাপক ফোলা দেখা দেয়, যা খাদ্যনালী (Esophagus) ও শ্বাসনালী (Trachea) দুটো পথেই বাধা সৃষ্টি করে। ফলে রোগীর খাওয়া-দাওয়া এবং শ্বাস নেওয়া উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা হয়, এবং অবশেষে এটি রোগীর পক্ষে প্রাণঘাতী (Fatal) হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের উপসর্গসমূহ আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে ওরোফ্যারিংস (Oropharynx) অঞ্চলের ম্যালিগন্যান্ট গ্রোথের (Malignant Growth) লক্ষণগুলির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

অসাধ্য গলগন্ড (Asadhya Galaganda)

দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান গলগন্ড বা থাইরয়েড গ্রন্থির স্ফীতি, যার সাথে অনোরেক্সিয়া (ক্ষুধামন্দা), দুর্বলতা, কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন (ভরাট বা ভাঙা গলা) দেখা দেয় এবং প্রচলিত চিকিৎসায় সাড়া দেয় না — একে আধুনিক ভাষায় থাইরয়েড গ্রন্থির কার্সিনোমা (Carcinoma of Thyroid Gland) হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

অসাধ্য গুল্ম (Asadhya Gulma)

এই রোগে পেটের ভেতরে ধীরে ধীরে আকারে বাড়তে থাকা একটি শক্ত স্ফীতির সৃষ্টি হয়, যা কাছাকাছি টার্টয়েজের মতো দেখতে হয় এবং নড়াচড়া করে না (Fixed Mass)। ফোলা অংশের চামড়ার ওপর শিরাগুলি (Veins) ফুলে ওঠে। সঙ্গে রোগী ভোগে ক্যাক্সিয়া (Cachexia- শরীরের চরম দুর্বলতা), কাশি, বমি, জ্বর ইত্যাদি উপসর্গে। এই লক্ষণসমষ্টি পেটের ভিতরে কোনও ম্যালিগন্যান্ট গ্রোথ (Intra-abdominal Malignant Growth) এর সম্ভাবনা নির্দেশ করে।

অসাধ্য উদররোগ (Asadhya Udara Roga)

যখন অ্যাসাইটিস (Ascitis- পেটের মধ্যে পানি জমা) এর সাথে পাশে ব্যথা (Flank Pain), চরম ক্ষুধামন্দা, মাঝে মাঝে ডায়রিয়া, দুর্বলতা এবং পেটের তরল বের করে দেওয়ার পর আবার তরল জমে যাওয়া দেখা যায়, তখন এটি ম্যালিগন্যান্ট অ্যাসাইটিস (Malignant Ascitis) এর সাথে মিল খুঁজে পায়।

লিঙ্গর্ষ (Lingarsa)

যখন দোষগুলি (দোষের বিকৃতি) বাহ্যিক যৌনাঙ্গে (External Genitalia) জমে স্থানীয় পেশিকে (Musculature) আক্রান্ত করে, তখন সেখানে চুলকানি শুরু হয় যা ধীরে ধীরে ক্ষতে (Ulcer) রূপান্তরিত হয়। এই ক্ষত থেকে রক্তসিক্ত মাংসল বৃদ্ধি (Fleshy Mass with Blood Discharge) হয়। এ ধরনের উপসর্গসমষ্টি আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে প্যাপিলারি কার্সিনোমা (Papillary Carcinoma) এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

এমন কিছু রোগ যেখানে ক্যান্সারের সম্ভাবনা প্রবল হয় উপরে উল্লিখিত রোগগুলির পাশাপাশি কিছু অন্যান্য রোগও আছে, যেগুলি "অসাধ্য" হিসেবে বিবেচিত এবং যাদের ক্ষেত্রে ক্যান্সারের উপস্থিতি একেবারে অস্বীকার করা যায় না।এদের লক্ষণ ও রোগের প্রকৃতি ক্যান্সারের সাথে সম্ভাব্য সংযোগ নির্দেশ করে। সেই রোগগুলি হল:

- ত্রিদোষজ নদী ব্রণ (Tridoshaja Nadi Vrana)
- অসাধ্য প্রদর (Asadhya Pradara)

- অসাধ্য কামলা (Asadhya Kamala)
- চর্মকীলা (Carmakila) ইত্যাদি।

ত্রিদোষজ নাড়ী ব্রণ (Tridosaja Nadi Vrana) – (সূত্র: সুশ্রুত নিদানস্থান)[vi]

ত্রিদোষজ নাড়ী ব্রণ হলো এমন একটি অবস্থা, যেখানে শরীরের বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘস্থায়ী পূয়ঃস্রাবযুক্ত সাইনাস (Chronic Discharging Sinus) তৈরি হয়। এর ফলে রোগী অনুভব করে- দাহজনিত অনুভূতি (Burning Sensation), শ্বাসকষ্ট (Dyspnoea), অনিদ্রা (Insomnia), মানসিক বিভ্রান্তি (Mental Confusion), এবং বিভিন্ন ধরণের স্রাব (Different Types of Discharges)

এই নাড়ী বৃণ বা সাইনাস সাধারণত নিচের রোগগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায়:

ফিস্টুলা-ইন-আনো (Fistula-in-Ano), দীর্ঘস্থায়ী অস্থিমজ্জা প্রদাহ (Chronic), অ্যাক্টিনোমাইকোসিস (Actinomycosis) যদিও এগুলি সরাসরি ম্যালিগন্যান্ট নয়, তবুও মলদ্বার নালীর (Anal Canal) কার্সিনোমাথেকেও অনুরূপ লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে।

অসাধ্য প্রদর (Asadhya Pradara)– (সূত্র: মাধব নিদান)[vii]

এই অবস্থায় রোগিণীর যোনিপথ থেকে বিভিন্ন রঙের, ঘনত্বের এবং গন্ধযুক্ত অতিরিক্ত স্রাব হয়। এর ফলে দেখা দেয় ধীরে ধীরে ক্ষুধামন্দা, ওজন হ্রাস , দেহের দুর্বলতা (Emaciation) এই ধরণের উপসর্গসমষ্টি জরায়ুর ক্যান্সার (Carcinoma of the Uterus) এর সাথে মিলে যেতে পারে।

অসাধ্য কামলা (Asadhya Kamala)– (সূত্র: মাধব নিদান)[viii]

এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকা জন্ডিস (Jaundice) দেখা যায়, ব্যথা সহ অথবা ব্যথা ছাড়াই। এটি একটি অসাধ্য রোগ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। যদিও এরকম অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী সিরোসিস (Chronic Cirrhosis) অথবা পিত্তনালীতে পাথর আটকে যাওয়ার (Common Bile Duct Obstruction) ফলে হতে পারে, যা সাধারণত ম্যালিগন্যান্ট নয়, তবুও পিত্তনালী (Biliary Tract) বা অগ্ন্যাশয়ের মাথা (Head of Pancreas) অথবা যকৃতে ক্যান্সার (Carcinoma Liver) এর ফলে এই ধরণের লক্ষণও প্রকাশ পেতে পারে, যেখানে পিত্ত প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ডুয়োডেনামে পিত্ত পৌঁছাতে পারে না।

উপসংহার:

উপরোক্ত আলোচনাগুলি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকগণ malignancy বা ক্যান্সার জাতীয় রোগসমূহ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁরা রোগের কারণ ও বিকাশ (Etiopathogenesis), রোগের ধরন (Types), আক্রান্ত স্থান (Sites), পর্যায় (Stages) এবং বিস্তার (Spread) সম্বন্ধে ধারনা দিয়েছিলেন। এছাড়া, দোষ (Dosa) ও ধাতু (Dhatu) তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে রোগ বিকাশের বিশ্লেষণ করা সম্ভব এবং রোগীর প্রকৃতি (Prakrti) এবং ধাতুর (Dhatu) সম্পর্কেও আরও বিশদ গবেষণা প্রয়োজন বলে বোঝানো হয়েছে। ধাতুগত উপাদানগুলির (Dhatu factors) বিশ্লেষণ রোগের নির্দিষ্ট প্যাথোজেনেসিস (রোগের বিকাশ প্রক্রিয়া) ও নির্ণয়ের নির্দিষ্ট মানদণ্ড (Criteria of Diagnosis) নির্ধারণে সহায়ক হতে পারে (বর্তমানে গবেষণাধীন)। এর পাশাপাশি, রোগের চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনার সম্পর্কেও একটি বিস্তৃত বিবরণ উপলব্ধ রয়েছে। এই রোগগুলির ব্যবস্থাপনার ধারণা আয়ুর্বেদে এই বিষয়ে একটি বিশদ অধ্যয়ন বিশ্বব্যাপী ভোগান্তিতে থাকা মানবজাতির জন্য একটি নতুন আলোকবর্তিকা প্রদান করতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. চোপড়া, এ., দোইফোড়ে, ভি. ভি. আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা: মূল ধারণা, চিকিৎসা নীতি ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা। কমপ্লিমেন্টারি অ্যান্ড অল্টারনেটিভ মেডিসিন, ২০০২

২. প্রসাদ, জি. সি , গবেষণা প্রবন্ধ: আয়ুর্বেদে ক্যান্সারের ধারণা, প্রাচীন সায়েন্স অব লাইফ, ১৯৮২

৩. স্ত্রী, অম্বিকাদত্ত , সূশ্রুত সংহিতা , চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী। পুনর্মুদ্রণ: ২০০৭

৪. মূর্তি, কে. আর. শ্রীকান্ত, বাগভটের অষ্টাঙ্গ হৃদয়ম, চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস একাডেমি, পুনর্মুদ্রণ: ২০১৪

৫. মূর্তি, কে. আর. শ্রীকান্ত। বাগভটের অষ্টাঙ্গ হৃদয়। বারাণসী: চৌখাম্বা ওরিয়েন্টালিয়া; ২০০৫

---

[i] সুশ্রুত সংহিতা (সূ. নি. ১১/১০, ১১)
[ii] সুশ্রুত সংহিতা (সূ. নি. ১৯/১৫)
[iii] সুশ্রুত সংহিতা (সূ.নি. ১৪/৩)
[iv] সুশ্রুত সংহিতা (সূ.নি. ১১/১৮)
[v] সুশ্রুত নিদান (সূ.নি. ১১/২৫ এবং সূ.উ. ২২/৯)
[vi] সুশ্রুত নিদানস্থান ১০/১৩
[vii] মাধব নিদান ৬১/৪-৫
[viii] মাধব নিদান ৮/১৯-২০

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1291-1298
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.132

সংগঠিত খেলার নতুন দিক হল ই-স্পোর্টস

চিন্ময় মণ্ডল, *গবেষক, শারীরশিক্ষা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
ড. সুশান্ত সরকার, *অধ্যাপক, শারীরশিক্ষা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.05.2025; Send for Revised: 21.05.2025; Revised Received: 23.05.2025; Accepted: 28.05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

E-sports, short for electronic sports, refers to competitive video gaming in which players and teams compete against each other in various video games. Like traditional sports, eSports involves skilled players, organised competition, and a growing fan base. The eSports industry continues to develop and expand, with new games, leagues, and opportunities emerging on a regular basis. It has gained recognition from the mainstream media, and some traditional sports organisations have even entered the main stage of esports by creating their own teams or leagues. If you look at history, it started in North Korea in the 1960s. At that time, e-sports was not very popular, but today its scope is far-reaching. Although its impact on physical education is not observed in the same way, it can be assumed that its dominance will increase to a great extent in the future. At leisure, people play a variety of mobile games that are usually recreational, but it would not be wrong to say that e-sports is expanding as a profession. Some of the games that have been added to eSports include League of Legends, Dota 2, EA Sports FC Online, Arena of Valour, Dream the kindoms 2, Peacekeeper Elite, Street Fighter (Asian Games 2022 included competitive sports) Free-fire, ludo, chess, word games, sudoku, playing cards, etc. are also very popular. Athletes participating in e-sports should be aware of their health, especially taking preventive precautions for sleep disturbances, weight gain, stress, vision problems, metabolic disorders, etc.

Keywords: E-sports, Video games, Asian Games, Health

ই-স্পোর্টসের সূচনা নিয়ে নানা তথ্য থাকলেও, অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও গবেষণা অনুসারে ১৯৭২ সালের ১৯ অক্টোবর আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্পেসওয়ার' গেমের উপর প্রথম ই-স্পোর্টস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, যেটি *ইন্টারগ্যাল্যাকটিক স্পেসওয়ার অলিম্পিকস* নামে পরিচিত। এতে ২৪ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন এবং বিজয়ী হিসেবে ব্রুস বাউমগার্ট ইতিহাসে প্রথম গেমার হিসেবে নাম লেখান।

এরপর ১৯৭৪ সালে জাপানে 'সেগা' কোম্পানি দেশব্যাপী 'অল জাপান টিভি গেম চ্যাম্পিয়নশিপ' আয়োজন করে, যা ই-স্পোর্টসের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে "স্পেস ইনভেডার্স" গেমের ওপর প্রথম বৃহৎ ই-স্পোর্টস টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে হাজার হাজার খেলোয়াড় অংশ নেয়।

"ই-স্পোর্টস" শব্দটি মূলত ১৯৯০-এর দশকের শেষ দিকে প্রচলিত হয় এবং ২০০০ সালের পর অনলাইন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের (যেমন ইউটিউব, টুইচ) প্রসারে ই-স্পোর্টস বিশ্বব্যাপী বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। ২০১৮ সালে

জাকার্তা এশিয়ান গেমসে ই-স্পোর্টস প্রদর্শনীমূলক খেলা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ২০২২ সালের এশিয়ান গেমসে ৩০টি দেশের ৪৭৬ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন চীনের হাংঝু শহরে।

বর্তমানে ই-স্পোর্টসে বহু আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যেমন—ভ্যালরান্ট চ্যাম্পিয়ন্স ২০২৫, FNCS 2025 Global Championship, The International 2025, Esports World Cup 2025, FISSURE Playground #2 এবং ২০২৫ সালের লীগ অফ লেজেন্ডস ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ, যা চীনের বেইজিং, সাংহাই ও চেংডুতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ই- স্পোর্টস এখন শুধু বিনোদন নয়, বরং একটি বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া, যার অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও সামাজিক গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে।

ই- স্পোর্টস সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে কিছু বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করা দরকার সে গুলি হল-

গেমস: E Sport মাল্টিপ্লেয়ার অনলাইন ব্যাটল অ্যারেনা (এমওবিএ) ফার্স্ট-পার্সন শুটার (এফপিএস) রিয়েল-টাইম স্ট্র্যাটেজি (আরটিএস) ফাইটিং গেম, স্পোর্টস সিমুলেশন এবং আরও অনেক কিছু সহ বিভিন্ন ধরনের ভিডিও গেমগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। জনপ্রিয় শিরোনামগুলির মধ্যে রয়েছে ই-ফুটবল, লিগ অফ লেজেন্ডস, গ্লোবাল অফেন্সিভ, ডোটা 2, ওভারওয়াচ, ফোর্টনাইট এবং আরও অনেক গেম। *Fortnite, Overwatch* এবং *PUBG Mobile* এর মতো ব্যাটল রয়্যাল ও থার্ড- পার্সন শুটার গেমও ই-স্পোর্টসে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ই-স্পোর্টস বিভিন্ন ধরনের গেমের সমন্বয়ে গঠিত, যেখানে MOBA, FPS, RTS, ফাইটিং, স্পোর্টস সিমুলেশন এবং আরও অনেক ধরনের গেম প্রতিযোগিতামূলকভাবে খেলা হয়।

পেশাদার খেলোয়াড় এবং দল: ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়ার মতো ই-স্পোর্টসেও পেশাদার খেলোয়াড় রয়েছে, যারা প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা অনুশীলন করে এবং সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এসব খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত দলগুলো সাধারণত বিভিন্ন সংস্থা বা স্পনসর প্রতিষ্ঠানের অধীনে পরিচালিত হয় এবং তারা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় লিগ ও টুর্নামেন্টে অংশ নেয়। প্রতিটি দলের থাকে নিজস্ব ফ্যান ফলোয়িং, ক্লাব কালচার এবং ব্র্যান্ড ভ্যালু- যা ঐতিহ্যবাহী ফুটবল বা ক্রিকেট দলের মতোই। ই-স্পোর্টস টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে পেশাদার গেমাররা বিপুল পরিমাণ পুরস্কার রাশি জিতে থাকেন, যা তাদের আয়ের প্রধান উৎস। অনেক খেলোয়াড় স্ট্রিমিং, স্পনসরশিপ এবং বিজ্ঞাপন থেকেও আয় করেন।

সারসংক্ষেপে বলা যায় যে ই-স্পোর্টসে পেশাদার খেলোয়াড় ও দলগুলো ক্রীড়া জগতের নতুন তারকা, যাদের প্রতি রয়েছে বিশ্বজুড়ে বিশাল দর্শক ও ফ্যানবেস, এবং যারা গেমিং- কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে অর্থ, খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করছেন। ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়ার মতো, ই-স্পোর্টসেও পেশাদার খেলোয়াড় রয়েছে যারা সর্বোচ্চ স্তরে অনুশীলন এবং প্রতিযোগিতায় তাদের সময় উৎসর্গ করে। দলগুলি, প্রায়শই সংস্থা বা সংস্থাগুলির দ্বারা স্পনসর করা হয়, এবং লিগ ও টুর্নামেন্টে অংশ নেয় ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া দলগুলির মতো ফ্যান ফলোয়ি থাকে। এছাড়াও বিপুল পরিমাণ পুরস্কার রাশি খেলয়াড়দের অর্থ উপার্জনের মূল স্রোত তৈরি করে।

পুরস্কার এবং স্পনসরশিপ: ই-স্পোর্টস টুর্নামেন্টগুলোতে বিজয়ীদের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ বরাদ্দ থাকে। অনেক বড় আন্তর্জাতিক ইভেন্টে পুরস্কারের পরিমাণ কয়েক মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ভ্যালরান্ট চ্যাম্পিয়ন্স ২০২৫- এর পুরস্কার রাশি নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫,০০,০০০ ডলার।

এছাড়া, ই-স্পোর্টস ইন্ডাস্ট্রির দ্রুত বৃদ্ধির পেছনে বিভিন্ন সংস্থা ও ব্র্যান্ডের স্পনসরশিপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। গেমিং টিম, টুর্নামেন্ট এবং ইভেন্টগুলো প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড, এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক কোম্পানির কাছ থেকে স্পনসরশিপ পেয়ে থাকে, যা এই খাতের আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী করেছে এবং গেমারদের জন্য নতুন পেশাগত সুযোগ তৈরি করেছে। ই-স্পোর্টসে বড় অঙ্কের পুরস্কার এবং বহুজাতিক সংস্থার স্পনসরশিপ এই শিল্পের প্রসার ও পেশাদার গেমারদের অর্থ উপার্জনের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করছে।

স্ট্রিমিং এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম: ই-স্পোর্টস ইকোসিস্টেমের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ টুইচ, ইউটিউব গেমিং এবং অন্যান্য অনলাইন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের চারপাশে ঘোরে। সর্বপ্রথম টিভি মাধমে সম্প্রচারিত শুরু করে ১৯৭৭ সালে অরিজিনাল স্পোর্ট চ্যানেল বর্তমানে এম. এস. জি. প্লাস, এরপর ১৯৭৯ সালে ESPN সম্প্রচার শুরু করে, টিভিতে সম্প্রচারিত ই-স্পোর্টস এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে কারণ সম্প্রচারকরা তাদের জনসংখ্যার জন্য ই-

স্পোর্টস বিষয়বস্তু খুঁজছেন। ভারতবর্ষে ডিডি স্পোর্টস 18 মার্চ 1998 সালে চালু হয়েছিল। শুরুতে এটি দিনে ছয় ঘন্টা ক্রীড়া অনুষ্ঠান সম্প্রচার করত, যা 1999 সালে বাড়িয়ে 12 ঘন্টা করা হয় তবে এখনও অবধি ই- স্পোর্টসের কোনো খেলা সম্প্রচার করা হয়নি তবে ক্রমবর্ধমান ই-স্পোর্টসের চাহিদা সম্ভবত খুব তাড়াতাড়ি এখানেও সম্প্রচার হতে পারে। পেশাদার খেলোয়াড় এবং বিষয়বস্তু নির্মাতারা তাদের গেমপ্লে লাইভস্ট্রিম করেন, ইউটিউব, ফেসবুক, টুইচ ইত্যাদি মাধ্যমের মধ্যে ভক্তদের সাথে জড়িত হন এবং তাদের নিজ নিজ খেলার চারপাশে খেলোয়াড় সম্প্রদায় তৈরি করেন।

কাস্টিং এবং বিশ্লেষণ: E Sport ইভেন্টগুলিতে প্রায়শই ধারাভাষ্যকার (কাস্টার) থাকে যারা প্লে-বাই-প্লে ধারাভাষ্য এবং বিশ্লেষণ প্রদান করে, যা নৈমিত্তিক এবং নিবেদিত ভক্তদের জন্য দেখার অভিজ্ঞতা বাড়ায়। গ্লোবাল রিচ-ই-স্পোর্টসের বিশ্বব্যাপী দর্শক রয়েছে, যেখানে বিশ্বজুড়ে ভক্ত এবং খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এবং অনুসরণ করে। আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টগুলি বিভিন্ন দেশের দল এবং খেলোয়াড়দের আকর্ষণ করে, যা একটি বৈচিত্র্যময় এবং প্রাণবন্ত মনভাবের দিকে পরিচালিত করে। অভিজ্ঞ কাস্টার এবং ভাষ্যকাররা এই ভূমিকাগুলির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। ই-স্পোর্টস সাংবাদিকতা এবং বিষয়বস্তু তৈরি জনপ্রিয় কর্মজীবনের পথ হয়ে উঠেছে। এই ক্ষেত্রের পেশাদাররা ই-স্পোর্টস শিল্প সম্পর্কিত খবর, ঘটনা এবং গল্পগুলি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করে।

ই-স্পোর্টস সংস্থা এবং পরিকাঠামো: পৃথক খেলোয়াড়দের পাশাপাশি, পেশাদার ই-স্পোর্টস সংস্থা রয়েছে যা দল, খেলোয়াড় এবং বিভিন্ন ইভেন্টে তাদের অংশগ্রহণ পরিচালনা ও সমর্থন করে। এই সংস্থাগুলি প্রশিক্ষণ, বিপণন এবং স্পনসরশিপের মতো দিকগুলি পরিচালনা করে। নতুন গেম, লিগ এবং সুযোগগুলি নিয়মিতভাবে উত্থিত হওয়ার সাথে সাথে ই-স্পোর্টস শিল্পের বিকাশ এবং সম্প্রসারণ অব্যাহত রয়েছে। এটি মূলধারার মিডিয়া থেকে স্বীকৃতি অর্জন করেছে এবং কিছু ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া সংস্থা এমনকি তাদের নিজস্ব দল বা লীগ তৈরি করে ই-স্পোর্টসের জায়গায় প্রবেশ করেছে। শারীরিক শিক্ষায় ই-স্পোর্টস (বৈদ্যুতিন ক্রীড়া) অন্তর্ভুক্ত করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে শারীরিক ক্রিয়াকলাপ, দলগত কাজ এবং কৌশলগত চিন্তাভাবনা প্রচারের একটি উদ্ভাবনী এবং আকর্ষণীয় উপায় হতে পারে। খেলাধুলা এবং ব্যায়ামের মতো ঐতিহ্যবাহী শারীরিক ক্রিয়াকলাপ শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও, ই-স্পোর্টস মানসিক চঞ্চলতা, সমন্বয় এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় অবদান রাখতে সম্ভব। ই-স্পোর্টসকে শারীরিক শিক্ষাতে একীভূত করার জন্য এখানে কিছু সম্ভাব্য সুবিধা এবং বিবেচনা রয়েছে।

শারীরিক দক্ষতা: ভার্চুয়াল রিয়েলিটি শিরোনামের মতো কিছু ই-স্পোর্টস গেমের জন্য শারীরিক নড়াচড়া এবং সমন্বয় প্রয়োজন হতে পারে, যা শারীরিক ক্রিয়াকলাপে অবদান রাখতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় জাইরোস্কোপ যা একটি যন্ত্রের অভিযোজন ও কৌণিক বেগ বজায় রাখতে ব্যবহৃত হয়, এটি পরিচালনা করতে শারীরিক নড়াচড়া খুব দ্রুততার সঙ্গে করতে হয়।

কৌশলগত চিন্তাভাবনা: ই-স্পোর্টস প্রায়শই কৌশলগত পরিকল্পনা, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা যা ভার্চুয়াল এবং বাস্তব জীবনের উভয় পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

দলগত কাজ এবং যোগাযোগ: অনেক ই-স্পোর্টস গেমের জন্য কার্যকর দলগত কাজ এবং যোগাযোগের প্রয়োজন হয়, যেমন কৌশলগত ও পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নিজের দলের প্রতি দায়বদ্ধতা ও মিত্রতার মধুরতা বজায় রাখে। যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতামূলক দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

মোটর দক্ষতা: যে গেমগুলিতে গতি নিয়ন্ত্রণ বা ভি-আর জড়িত থাকে সেগুলি মোটর দক্ষতা এবং স্থানিক সচেতনতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। প্রতিক্রিয়া সময়ের বিশেষ ভুমিকা রয়েছে এই সমস্ত খেলা গুলি খেলার জন্য, খুব কম সময়ে প্রতিক্রিয়া সাধন ও বৈদুতিন যন্ত্রের সঙ্গে ভালো তালমেল প্রতিস্থাপন করে উচ্চ পর্যায়ে গতি সমন্বয় খেলাগুলি ভালো খেলতে পারবে।

অন্তর্ভুক্তি: ই-স্পোর্টসের অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ। প্রচলিত খেলাধুলার তুলনায়, ই-স্পোর্টসে অংশগ্রহণের জন্য শারীরিক সক্ষমতা বা শক্তি অতটা জরুরি নয়। ফলে, বিভিন্ন শারীরিক দক্ষতার

শিক্ষার্থীরাও সহজেই ই-স্পোর্টসে অংশ নিতে পারে। এখানে মূলত মানসিক দক্ষতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কৌশলগত চিন্তা এবং হাত-চোখের সমন্বয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এ কারণে, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকা শিক্ষার্থীরাও ই-স্পোর্টসে নিজেদের প্রতিভা প্রকাশ করতে পারে এবং অন্যদের সঙ্গে সমানভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারে। ই-স্পোর্টস তাই সকলের জন্য উন্মুক্ত একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তির সুযোগ অনেক বেশি। এটি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে, সামাজিক দক্ষতা গড়ে তুলতে এবং মানসিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

জ্ঞানীয় বিকাশ: ই-স্পোর্টস শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি খেলোয়াড়দের জ্ঞানীয় বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গবেষণায় দেখা গেছে, ই-স্পোর্টস গেম খেলার সময় খেলোয়াড়দের প্রতিক্রিয়া সময় (reaction time), হাত-চোখের সমন্বয় (hand-eye coordination) এবং একসাথে একাধিক কাজ করার দক্ষতা (multitasking) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া, সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বিভিন্ন তথ্য একসাথে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ই-স্পোর্টস গেমারদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এছাড়া, গেমের জটিল পরিবেশে দ্রুত মানিয়ে নেওয়া এবং চাপের মধ্যে মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতাও বাড়ে। তাই, ই-স্পোর্টস নিয়মিত চর্চা করলে এসব জ্ঞানীয় দক্ষতা উন্নত হয়, যা পড়াশোনা কিংবা পেশাগত জীবনেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি: ই-স্পোর্টসের ঐতিহ্যবাহী শারীরিক ক্রিয়াকলাপের পরিপূরক হওয়া উচিত, প্রতিস্থাপন করা উচিত নয়। সামগ্রিকভাবে সুসংগঠিত শারীরিক শিক্ষার জন্য উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পর্দার সময় এবং স্বাস্থ্য: পর্দার সময় এবং চোখের স্বাস্থ্য, অঙ্গবিন্যাস এবং আসীন আচরণের উপর এর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। বিরতি এবং সঠিক কর্মদক্ষতা বিজ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করবে। ই- স্পোর্টসে অংশগ্রহণকারীদের দীর্ঘ সময় ধরে কম্পিউটার, গেম কনসোল বা মোবাইলের পর্দার সামনে বসে থাকতে হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, পেশাদার ও অপেশাদার ই-স্পোর্টস গেমাররা প্রতি সপ্তাহে গড়ে ২৪-৩১ ঘন্টা পর্যন্ত গেম খেলে থাকেন। চীনের কিছু খেলোয়াড় দিনে প্রায় ১৪ ঘন্টা অনুশীলন করেন। এত দীর্ঘ সময় একটানা পর্দার সামনে বসে থাকার ফলে চোখের ক্লান্তি, দৃষ্টিশক্তির সমস্যা, পিঠ ও ঘাড়ে ব্যথা, হাত ও কাঁধের গতিশীলতা হ্রাস এবং মাথাব্যথার মতো স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখা দিতে পারে। এমনকি নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করলেও এই ওভারসিটিং-এর ক্ষতি পুরোপুরি পূরণ হয় না। তাই ই- স্পোর্টস খেলোয়াড়দের জন্য পর্দার সময় নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত বিরতি নেওয়া এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন অত্যন্ত জরুরি।

খেলা নির্বাচন: এমন খেলা বেছে নিতে হবে যা বয়স-উপযুক্ত, অহিংস এবং ইতিবাচক মূল্যবোধের প্রচার করে। যেমন- সুদুকু, ওয়ার্ড গেম, দাবা, ই-ফুটবল, লিগ অফ লেজেন্ডস, গ্লোবাল অফেন্সিভ, ডোটা 2 ইত্যাদি।

সরঞ্জাম এবং সুবিধা: কনসোল, পিসি বা ভিআর সেটআপ যাই হোক না কেন, উপযুক্ত গেমিং সরঞ্জামগুলিতে ব্যবহার করার সময় সচেতন থাকতে হবে যাতে এগুলি শারীরিক ক্ষতি সাধন না করে। গতি-ভিত্তিক গেমের জন্য পর্যাপ্ত স্থান প্রয়োজন।

তত্ত্বাবধান এবং নিরাপত্তা: দায়িত্বশীল এবং নিরাপদ গেমিং আচরণ নিশ্চিত করার জন্য সঠিক তত্ত্বাবধান গুরুত্বপূর্ণ। ন্যায্য খেলা এবং ক্রীড়াবিদতার জন্য নির্দেশিকা প্রতিষ্ঠা করা উচিত। মিতব্যয়িতা এবং ভারসাম্যের গুরুত্ব সহ ই-স্পোর্টসের সম্ভাব্য সুবিধা এবং অসুবিধা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। যার ফল স্বরুপ আমরা সর্বাঙ্গীণ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারি।

কমিউনিটি বিল্ডিং: কমিউনিটি এবং টিম ওয়ার্কের অনুভূতি গড়ে তুলতে ই-স্পোর্টস ব্যবহার করা জেতে পারে। টুর্নামেন্ট, লিগ বা সহযোগিতামূলক প্রকল্পের আয়োজন করতে হবে। যে কোন বয়সের শারীরশিক্ষায় ই-স্পোর্টসের সংহতকরণ, যে কোনও উদ্বেগের সমাধান এবং তাদের সমর্থন নিশ্চিত করার বিষয়ে পিতামাতার সাথে যোগাযোগ করা উচিত।

অভিযোজনযোগ্যতা: প্রযুক্তি বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে নতুন ই-স্পোর্টসের প্রবণতা এবং গেমগুলি সম্পর্কে আপডেট থাকতে হবে যা শারীরশিক্ষার পাঠ্যক্রমকে উন্নত করতে পারে। ই-স্পোর্টসকে শারীরিকশিক্ষার সঙ্গে যত্ন

সহকারে একীভূত করে শিক্ষকরা আরও গতিশীল এবং আকর্ষক পন্থায় শেখার পরিবেশ তৈরি করতে পারেন যা শারীরিক এবং জ্ঞানীয় বিকাশের প্রচারের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ এবং দক্ষতার বিস্তৃত পরিসরকে সরবরাহ করবে।

কাজের সুযোগ এবং আয়: ই-স্পোর্টস ক্রীড়াবিদ, পেশাদার খেলোয়াড় বা গেমার হিসাবেও পরিচিত, বেতন, স্পনসরশিপ এবং টুর্নামেন্ট জয়ের মাধ্যমে যথেষ্ট আয় করতে পারেন। ডোটা 2, লিগ অফ লেজেন্ডস, কাউন্টার-স্ট্রাইক গ্লোবাল অফেন্সিভ এবং ফোর্টনাইটের মতো জনপ্রিয় গেমের শীর্ষ খেলোয়াড়রা লক্ষ লক্ষ ডলার আয় করেছেন। অনেক খেলোয়াড় টুইচ, ইউটিউব এবং ফেসবুক গেমিংয়ের মতো প্ল্যাটফর্মে তাদের গেমপ্লে সরাসরি সম্প্রচার করে অর্থ উপার্জন করে। তারা বিজ্ঞাপন, অনুদান, স্পনসরশিপ এবং তাদের দর্শকদের কাছ থেকে সাবস্ক্রিপশন রাজস্বের মাধ্যমে আয় করে।

গেম ডেভেলপার এবং প্রকাশকরা: গেম ডেভেলপার এবং প্রকাশকরা ই-স্পোর্টস শিরোনাম তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে জড়িত থাকেন। খেলোয়াড়দের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এবং তাদের খেলায় অংশগ্রহণ থেকে তারা উপকৃত হয়। গেম ডেভেলপাররা হলেন সেই ব্যক্তিরা বা প্রতিষ্ঠান, যারা ভিডিও গেম তৈরি করেন। তারা গেমের ধারণা, ডিজাইন, প্রোগ্রামিং, গ্রাফিক্স, অডিও এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত দিক নিয়ে কাজ করেন। ডেভেলপাররা গেমের কাহিনি, চরিত্র, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং গেমপ্লে নির্ধারণ করেন, যাতে খেলোয়াড়রা আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতা পান। অন্যদিকে, গেম প্রকাশকরা (Publishers) গেমটি বাজারজাতকরণ, বিপণন, বিতরণ এবং বিক্রির দায়িত্ব নেন। তারা ডেভেলপারদের কাছ থেকে গেম নিয়ে সেটি বড় পরিসরে প্রচার করেন, বিজ্ঞাপন দেন এবং বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে দেন। অনেক সময় প্রকাশকরা আর্থিক সহায়তাও প্রদান করেন, যাতে ডেভেলপাররা গেমটি উন্নত করতে পারেন।

ই-স্পোর্টস বিপণন এবং বিক্রয়: যে সংস্থাগুলি ই-স্পোর্টস দলগুলিকে স্পনসর করে বা টুর্নামেন্টের আয়োজন করে তাদের ই- স্পোর্টস ইকোসিস্টেমের মধ্যে তাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলি প্রচার করার জন্য বিপণন এবং বিক্রয়ের পেশাদারদের প্রয়োজন। এই ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ সংস্থা এবং সংস্থাগুলি খেলোয়াড়দের প্রতিনিধিত্ব করে, চুক্তি নিয়ে আলোচনা করে এবং তাদের ব্যবসায়িক বিষয়গুলি পরিচালনা করে।

ই-স্পোর্টস মেডিসিন এবং ক্রীড়া মনোবিদ্যা: ই- স্পোর্টস আরও প্রতিযোগিতামূলক ও পেশাদার হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়দের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা গুরুত্ব পাচ্ছে। দীর্ঘ সময় ধরে পর্দার সামনে বসে থাকার কারণে চোখের সমস্যা, পিঠ-ঘাড়ের ব্যথা, হাতের ক্লান্তি, ওভারসিটিং-এর ঝুঁকি এবং মানসিক চাপ, উদ্বেগ, পারফরম্যান্স অ্যাংজাইটি ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ কারণে ই-স্পোর্টস খেলোয়াড়দের সহায়তা করতে স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার, বিশেষ করে স্পোর্টস মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানীদের চাহিদা বাড়ছে।

স্পোর্টস মেডিসিন বিশেষজ্ঞরা খেলোয়াড়দের শারীরিক সমস্যা ও আঘাতের চিকিৎসা, সঠিক ব্যায়াম ও বিশ্রামের পরামর্শ দেন। অন্যদিকে, ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানীরা মানসিক চাপ, মনোযোগ, আত্মবিশ্বাস, এবং পারফরম্যান্স বৃদ্ধির কৌশল শেখান। ই-স্পোর্টসে পারফরম্যান্স বৃদ্ধির জন্য শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ই-স্পোর্টস শিল্পে আয় ব্যক্তির দক্ষতার স্তর, দক্ষতা এবং তাদের নির্দিষ্ট ভূমিকার উপর নির্ভর করে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়ার মতো, ই-স্পোর্ট অংশগ্রহণকারীদের একটি ছোট শতাংশই অত্যন্ত উচ্চ আয় অর্জন করে। এই শিল্পে বেশিরভাগ ব্যক্তি মাঝারি থেকে নিম্ন আয়ের উপার্জন করেন, বিশেষ করে প্রবেশ-স্তরের ভূমিকায়। যেহেতু ই-স্পোর্টস শিল্প দ্রুত বিকশিত হচ্ছে, তাই কর্মজীবনের সুযোগ এবং আয়ের প্রত্যাশা সম্পর্কে অবহিত সিদ্ধান্ত নিতে সর্বশেষ উন্নয়ন এবং প্রবণতার সাথে আপডেট থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। উপরন্তু, আঞ্চলিক বৈচিত্র্য আয়ের স্তরকে প্রভাবিত করতে পারে, কারণ ই-স্পোর্ট শিল্প অন্যদের তুলনায় নির্দিষ্ট অঞ্চলে বেশি প্রতিষ্ঠিত এবং লাভজনক। অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক ক্রিয়াকলাপের মতো ই-স্পোর্টসেরও ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকতে পারে, যা নির্ভর করে

কীভাবে তাদের কাছে যাওয়া হয় এবং পরিচালনা করা হয় তার উপর। এখানে ই- স্পোর্টসের কিছু সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে:

ইতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া-

উন্নত জ্ঞানীয় দক্ষতা: ই-স্পোর্টসের মাধ্যমে কৌশলগত চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মাল্টিটাস্কিংয়ের মতো জ্ঞানীয় দক্ষতাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে।

হাত-চোখের সমন্বয়: ই-স্পোর্টস খেলা, বিশেষত যে খেলাগুলির জন্য সুনির্দিষ্ট নড়াচড়া প্রয়োজন, তা হাত-চোখের সমন্বয় এবং সূক্ষ্ম মোটর দক্ষতার উন্নতি করতে পারে।

দলগত কাজ: অনেক ই-স্পোর্টস দলভিত্তিক, যা দলগত কাজ, যোগাযোগ এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে নেতৃত্বদান এবং সহযোগিতার প্রসার ঘটায়।

সামাজিক মিথস্ক্রিয়া: ই-স্পোর্টস সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং সংযোগের জন্য একটি মঞ্চ প্রদান করতে পারে, যা খেলোয়াড়দের তাদের আগ্রহের অংশীদারদের সাথে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ করে দেয়।

কর্মজীবনের সুযোগ: ই-স্পোর্টস একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পে পরিণত হয়েছে, যা খেলোয়াড়, কোচ, ধারাভাষ্যকার এবং আরও অনেক কিছু হিসাবে কর্মজীবনের সুযোগ প্রদান করে।

বিনোদন: ই-স্পোর্টস খেলোয়াড় এবং দর্শক উভয়ের জন্য বিনোদন এবং অবসরের উৎস হতে পারে।

নেতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া-

আসীন জীবনধারা: দীর্ঘ সময় ধরে ই-স্পোর্টস খেলে একটি আসীন জীবনধারা তৈরি হতে পারে, যা স্থূলতা এবং হৃদরোগজনিত সমস্যার মতো নেতিবাচক স্বাস্থ্যের পরিণতি ঘটাতে পারে।

আসক্তি: অতিরিক্ত খেলাধুলা আসক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে, যেখানে ব্যক্তিরা তাদের খেলার অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করা চ্যালেঞ্জিং বলে মনে করে, যা তাদের ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে।

চোখের চাপ: পর্দার সামনে দীর্ঘ সময় থাকা চোখের চাপ এবং কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোমের মতো সম্পর্কিত সমস্যার কারণ হতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী Uv Protection, Anti Blue Rays চশমা ব্যবহার করতে হবে।

ঘুমের ব্যাঘাত: ই-স্পোর্টস টুর্নামেন্ট এবং গভীর রাতে গেমিং সেশনগুলি ঘুমের ধরণকে ব্যাহত করতে পারে, যার ফলে ক্লান্তি, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে।

সামাজিক বিচ্ছিন্নতা: যদিও ই- স্পোর্ট গুলি সামাজিক মিথস্ক্রিয়াকে সহজতর করতে পারে, খেলোয়াড়রা অফলাইন সামাজিক ক্রিয়াকলাপ থেকে সরে গেলে অতিরিক্ত গেমিং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার দিকেও নিয়ে যেতে পারে।

একাডেমিক বা কর্মজীবনের অবহেলা: অতিরিক্ত সময় ধরে গেমিং শিক্ষাগত বা কর্মজীবনের দায়িত্বগুলিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে, যার ফলে স্কুল বা কর্মক্ষেত্রে খারাপ প্রভাব পরতে পারে, অভিভাবকে বিশেষ পর্যবেক্ষণ রাখতে হবে এবং খেলোয়াড়দের সচেতন থাকতে হবে।

নেতিবাচক আচরণ: কিছু ব্যক্তি আরও আক্রমণাত্মক হতে পারে বা নেতিবাচক আচরণ প্রদর্শন করতে পারে, বিশেষ করে প্রতিযোগিতামূলক অনলাইন পরিবেশে, যা অনলাইনে হয়রানি এবং বিষাক্ততার কারণ হতে পারে।

আর্থিক প্রভাব: ই-স্পোর্টসে কর্মজীবন শুরু করা আর্থিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে এবং সমস্ত খেলোয়াড় সাফল্য বা আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাই প্রযুক্তিগত প্রতারণার (Technical fraud) শিকার হয়ে পড়েন অনেক খেলোয়াড় যা তাদের অর্থপ্রদান করার জন্য বাধিত করা হয়।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে ই-স্পোর্টসের প্রভাব ব্যক্তিভেদে পরিবর্তিত হয় এবং গেমিংয়ে ব্যয় করা সময়, খেলাধুলার ধরণ এবং ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনযাত্রার মতো বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে। সম্ভাব্য নেতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি হ্রাস করার জন্য, খেলোয়াড় এবং তাদের চারপাশের লোকদের জন্য সংযম অনুশীলন করা, গেমিং এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর ভারসাম্য বজায় রাখা এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার প্রতি সচেতন হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু, যদি আসক্তি বা অত্যধিক নেতিবাচক আচরণের

মতো গেমিং-সম্পর্কিত সমস্যাগুলি উদ্বেগের বিষয় হয়ে ওঠে তবে চিকিৎসকের সহায়তা নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। ই-স্পোর্টের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা সম্ভব, তার জন্য প্রয়োজন সঠিক জ্ঞান, অনুশীলন, ধারাবাহিকতা যা খেলোয়াড়দের জীবিকা নির্বাহণ করতে সাহায্য করবে।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. ডিডি স্পোর্টস হোম। প্রসার ভারতী। ২০২৪ জুন ০৩। https://prasarbharati.gov.in/dd-sports-home/

২. এশিয়ান গেমসে ই স্পোর্টস। (২০২৪, জানুয়ারী ০৮)। উইকিপিডিয়া। https://en.wikpedia.org/wiki/Esports_at_the_Asian_Games

৩. ডিডি স্পোর্টস। (2023, July 19). উইকিপিডিয়া। https://en.wikpedia.org/wiki/DD_Sports

৮. টোডোরভ, এস। (2023, August 31). এস্পোর্টস খেলোয়াড়রা কত উপার্জন করে? ই-স্পোর্টস গ্রিজলি। https://www.esportsgrizzly.com/how-much-do-esports-players-make

৫. ক্রীড়া টেলিভিশন চ্যানেলগুলির তালিকা। (2023, September 12)। উইকিপিডিয়া। https://en.wikpedia.org/wiki/List_of_sports_televiation_channels

৬. ওয়ার্দার, কে। (2022, March 7). এস্পোর্ট। বিজনেস অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং, 64 (3) 393-399। https://doi.org/ 10.1007/s 12599-022-00748-w

৭. হামারি, জে, এবং স্যোব্লম, এম। (2017, April 3). ই-স্পোর্টস কী এবং কেন মানুষ এটি দেখে? ইন্টারনেট রিসার্চ, 27 (2) 211-232। https://doi.org/ 10.1108/intr-04-2016-0085

৮. কলিস, ডব্লিউ। (2020, August 4). দ্য বুক অফ এস্পোর্টস। রোসেটা বুকস।

৯. ইয়িন, কে, জি, ওয়াই, ঝুয়াং, ডব্লিউ, গাও, ওয়াই, টং, ওয়াই, সং, এল, এবং লিউ, ওয়াই। (2020). স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং সুবিধার সাথে এস্পোর্টসকে যুক্ত করাঃ বর্তমান জ্ঞান এবং ভবিষ্যতের গবেষণার চাহিদা। ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান জার্নাল, 9 (6) 485-488। https://doi.org/ 10.1016/j. jshs. 2020.04.006

১০. শর্মা, এম, পালানিচামি, টি, সাহু, এম, এবং কাঞ্চনা, ডি। (2020). চাপের উপর এস্পোর্টসের প্রভাবঃ একটি নিয়মতান্ত্রিক পর্যালোচনা। ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকিয়াট্রি জার্নাল, 29 (2) 191। https://doi.org/ 10.4103/IPj. ipj _ 195 _ 20

১১. বানাই, এফ, গ্রিফিথস, এমডি, ডেমেট্রোভিক্স, জেড, এবং কিরালি, ও। (2019, October). এস্পোর্ট গেমার এবং বিনোদনমূলক গেমারদের মধ্যে মানসিক যন্ত্রণা এবং গেমিং ডিসঅর্ডারের মধ্যে প্রেরণার মধ্যস্থতাকারী প্রভাব। ব্যাপক মনোরোগবিদ্যা, 94,152117। https://doi.org/ 10.1016/j. comppcych. 2019.152117

১২. আলী, এস, ইলমাস, এম. এস, এবং হাসান, এস। (2019, December 30). সরগোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রীড়া কার্যক্রমের প্রচারে টেলিভিশন স্পোর্টস চ্যানেল দেখার প্রভাব। গ্লোবাল মাস কমিউনিকেশন রিভিউ, IV (I) 95-107। https://doi.org/ 10.31703/gmcr.2019(iv-i).07

১৩. খেলাধুলাঃ ব্যবসায়িক মডেল। (2018, October 19). মার্সার ক্যাপিটাল। https://mercercapital.com/article/esports-business-models-article

১৪. স্বর্গ, ডি। (2013, January). ভিডিও গেমগুলি দর্শকদের খেলা হিসাবে শুরু হয়। নতুন বিজ্ঞানী, 217 (2899) 20। https://doi.org/ 10.1016/s 0262-4079 (13) 60094-9

১৫. করবিল, পি। (2012, February 27). বই পর্যালোচনাঃ স্ট্রেচিং ভিডিও গেমস। সিমুলেশন এবং গেমিং, 43 (2) 286-288। https://doi.org/ 10.1177/1046878111436166

16. https://esportsinsider-com.translate.goog/2024/08/highest-earning-esports-players-ofalltime?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bn&_x_tr_hl=bn&_x_tr_pto=rq#:~:text=The%20highest%20earner%20on%20Esports,(%24288%2C300)%20in%20second%20place.

১৭. "Esports Olympic Games will be 'huge moment' for competitive gaming- BBC"। জুলাই ১৬, ২০২৪। সংগ্রহের তারিখ ডিসেম্বর ২, ২০২৪।

১৮. "The IOC has created the Olympic Esports Games, which will be a separate Games held in 2025 and not part of the Summer or Winter Olympics"। জুলাই ২৯, ২০২৪। সংগ্রহের তারিখ ডিসেম্বর ২, ২০২৪।

১৯. *Top games for Esports: Must-play titles of the year*. (2025, May 22). Marshmallow Challenge Blog. https://www.marshmallowchallenge.com/blog/top-games-for-esports-must-play-titles-of-the-year/

২০. *ই-স্পোর্টস: খেলাধুলার নতুন এক জগৎ এবং কোটি টাকার এক শিল্প.* (2022, 17). Roar Media Archive. https://archive.roar.media/bangla/main/sports/e-sports

২১. *ই-স্পোর্টস টুর্নামেন্ট কী আসলে জুয়া?* (2025, March 1). Rumor Scanner. https://rumorscanner.com/fact-file/esports-tournament-gambling/18896

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1299-1305
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.133

‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ নাটকে পরিবেশ সচেতনতা ও আজকের সমাজ

মুস্তাফিজুর রহমান, *এম এ, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 18.05.2025; Accepted: 28.05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Environmental awareness is an important aspect in Kalidasa's play Abhijnan Shakuntalam. The play the natural and beautiful environment where the deep relationship and love between humans and nature is portrayed, which is set in the ashram of Maharshi Kanva, which is in a peaceful and serene environment. The peaceful environment of this ashram is inextricably linked to the play. Dushmanta's love and divorce with Shakuntala and their eventual reunion are beautiful images. On the other hand, Shakuntala's nature-loving character where she establishes a humane relationship with birds, animals and plants. King Dushmanta protects the forest, which shows his awareness of environmental protection. Shakuntala's love for nature is an important aspect of the play. She is familiar with the various forms of nature and enjoys its beauty. From these aspects, Abhijnan Shakuntalam portrays a deep picture of environmental awareness, which is relevant even today.

Keywords: Humans, Beautiful picture, Deep relationship, Nature-loving, Birds, Animals, Plants, Forest, Inextricably, Environmental

“আমি যদি জন্ম নিতেম
    কালিদাসের কালে
দৈব হতেম দশম রত্ন
    নবরত্নের মালে,
একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে
    রাজার কাছে নিতেম চেয়ে
উজ্জয়নীর বিজন প্রান্তে
    কানুন ঘেরা বাড়ি।”[১]

কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’ নাটকে পরিবেশের প্রতি গভীর সংবেদনশীলতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নাটকটিতে পরিবেশের প্রতি ভালোবাসার চিত্র তুলে ধরেছে। শকুন্তলার চরিত্রটি প্রকৃতির সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে, যা সৌন্দর্য এবং নারীত্বের প্রতীক হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। নাটকের প্রথম চারটি অংকে পরিবেশের সাথে মানব জীবনের সম্পর্ক স্থাপন করে শকুন্তলা প্রকৃতির প্রতি যে প্রেম তা এই চরিত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি

১ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষণিকা, সেকাল

পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যেমন পাখি, পশু, গাছপালা, নদী এদের সাথে শকুন্তলা যে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল এবং তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল এবং পরিবেশের প্রতি ভালোবাসার পরিচয় দেন। রাজা দুষ্মন্ত পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল এবং বনভূমি রক্ষার প্রতি সচেষ্ট, যা পরিবেশ রক্ষার প্রতি তার সচেতনতার প্রমাণ মেলে। কালিদাসের কাছে প্রকৃতি একটি পৃথক সত্তা পৃথক ব্যক্তিত্ব। যা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ছোট বড় সকল ঘটনার সাথে একান্ত ভাবে সম্পৃক্ত মানুষের সাথে পরিবেশের প্রতি এক এক নিবিড় ও মধুর সম্পর্ক। মহাকবি কালিদাস ব্যতীত অন্য কোন কবি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে কিনা তা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

কালিদাস ও অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটক:

কালিদাস ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর কবি। কালিদাস কে আমরা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সুবর্ণযুগকে বুঝি যে যুগে কবি ছিলেন এক সংস্কৃতির মূর্তপ্রতীক। কবির উজ্জয়নীর প্রতি অনুরাগ দেখে অনেকে মনে করেন তিনি সেখানেই জন্মেছিল। কারণ এই পরম্পরা অনুসারে কালিদাস উজ্জয়নীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়কালীন তিনি নবরত্ন সভার অন্যতম শ্রেষ্ঠরত্ন ছিলেন এবং কালিদাস তার রচনার দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য, রাজধানী উজ্জয়নী ও রাজসভার উল্লেখ রয়েছে। তিনি দুটি মহাকাব্য লিখেছেন সেগুলি হল কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ, মেঘদুত নামে খন্ডকাব্য, অভিজ্ঞান শকুন্তলা, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোবর্ষীয় নামে তিনটি নাটক রচনা করেছিলেন। তিনি এছাড়াও পুষ্করমালা, নলোদয়, কুন্ডপ্রবন্ধ সরস্বতীস্রোত প্রভৃতি লিখেছেন। কালিদাস এই সব রচনাগুলি ছাড়াও তিনি আরো অলংকার শাস্ত্রে বিভিন্ন গ্রন্থে বিবিধ কোষকাব্যে কালিদাসের নামে বহুশ্লোক পাওয়া যায়। কালিদাসের রচনাগুলি সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে বিবেচিত হয়। তার কাব্য ও নাটকে গভীর সৌন্দর্য, আবেগ এবং মানব জীবনের নানা দিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মেঘদুত কাব্যে মেঘের মাধ্যমে বিরোধী মানুষের কষ্টের কথা সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। কুমারসম্ভবে শিব ও পার্বতীর মিলন এবং রঘুবংশে রঘুকুল বংশের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তার নাটকগুলোতে মানব জীবনের বিভিন্ন ঘটনা যেমন প্রেম যুদ্ধ এবং ক্ষমতা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকটিতে শকুন্তলা ও দুশমনদের প্রেম এবং তাদের বিয়োগান্ত পরিনিতি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই নাটকের নামকরণ হয়েছে শকুন্তলার নামের সাথে সম্পর্কিত কারণ এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে। মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকে অগ্নি মিত্র ও মালবিকার প্রেম এবং তাদের মিলন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বিক্রমোর্বশীয়ম নাটকে রাজা বিক্রমোর্বশ ও উর্বশীর প্রেম এবং তাদের মিলন বর্ণিত হয়েছে। কালিদাসের রচনাগুলি শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বে সমাদৃত। তার লেখাগুলি বিভিন্ন ভাষায় লেখা হয়েছে। এবং বিভিন্ন সাহিত্যিকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। কালিদাসের প্রভাব বাংলা সাহিত্যেও বিশেষভাবে বাংলা ভাষার অনেক কবি ও সাহিত্যিক তার রচনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

কালিদাসের এই তিনটি নাটকের মধ্যে অন্যতম হলো 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্', নাটকটি কবি কালিদাসের প্রতিভা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এটি বলার কারণ তার অন্যান্য কাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সবকিছু এই কাব্যে পরিগণিত হয়েছে। অর্থাৎ ভাষা, ভাব, গুণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ছন্দ, রস ও অলংকার এরমধ্যে সবকিছু সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকটিতে রয়েছে।

মহাভারতের আদি পর্বের একটি সামান্য কাহিনী হল কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকটি। এই নাটকটি রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেম, বিবাহ, বিচ্ছেদ এবং শেষ পর্যন্ত তাদের পুনর্মিলনের একটি সুন্দর আবেগপূর্ণ গল্প। এই নাটকের নায়িকা শকুন্তলা হলেন ঋষি বিশ্বামিত্র ও অপ্সরা মেনোকার কন্যা। শকুন্তলা কে কৃষি কন্ব পালন করে, তাই তিনি কণ্বের পালক কন্যা। এই নাটকে শকুন্তলার সাথে হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্মন্তের পরিচয় হয় এবং তাদের মধ্যে প্রেম হয় যা পরে শকুন্তলা এবং দুষ্মন্ত গন্ধর্ব বিবাহ রীতি অনুসারে বিবাহ করেন। তারপর নিজের নাম অঙ্কিত একটি আংটি উপর দিয়ে দুষ্মন্ত রাজধানীতে ফিরে যান। এরপর শকুন্তলা একদিন অতি চিন্তায় মগ্ন ছিলেন তখন আশ্রমে উপস্থিত হলো মহর্ষি দুর্বাসা তখন শকুন্তলা স্বামীর চিন্তায় অন্য মনস্ক হয়ে দুর্বাসাকে লক্ষ্য করেনি। যথচিৎ সৎকার না করায় ঋষি দূর্বাসা অভিশাপ দিলেন যে শকুন্তলা যাকে এক মনে চিন্তা করছে তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেও তাকে চিন্তা করতে পারবে না অবশেষে প্রিয়ংবাদের চেষ্টায় সাপের অভিশাপটা কিছুটা কমে ঋষি বলেন কোন শকুন্তলা অলংকার দেখাতে পারলে রাজা শকুন্তলাকে চিনতে পারবেন। অভিশাপের ঘটনাটি শকুন্তলা জানতে পারল না। এদিকে মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ফিরে এলেন এবং গর্ভবতী শকুন্তলাকে অতি গৃহে পাঠানোর প্রয়োজন মনে করলেন। শকুন্তলা দুজন ঋষি মাতা গৌতমের সাথে রাজধানীর পথে রওনা দিলেন সচিতীর্থে অঞ্জলি দেওয়ার সময় রাজার দেওয়া আংটিটি হারিয়ে

ফেললেন এবং সে আংটি টি একটি রুই মাছ গিলে ফেলল। এরপর শকুন্তলা রাজসভায় উপস্থিত হন কিন্তু দূর্বাসার অভিশাপের কারণে রাজার কোন কথা মনে পড়ে না পরে রাজা শকুন্তলাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এবং সেই সময় শকুন্তলা রাজাকে আংটি টি দেখাতে পারলেন না। হলে শকুন্তলা কে অপমান করে রাজসভা থেকে বের করে দেওয়া হয়। তারপর এক জেলে রাজা দুষ্মন্তের বিয়ের আংটিটি মাছের পেটে রাজার নামাঙ্কিত আংটিটি পাওয়া যায়। চোর সন্দেহে তাকে রাজার কাছে আনা হয় তারপর রাজা কে আংটিটি দেখার পর দুষ্মন্তের শকুন্তলার সাথে তার নিজের বিবাহের সময় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ মনে পড়ে যায়। তারপর ইন্দ্রের ডাকে দুষ্মন্ত স্বর্গে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং জয়লাভ করেন। তারপর ফেরার পথে কাশ্যপের আশ্রম পরিদর্শন করার সুযোগ পায়। সেখানে সে তার নিজের পুত্রের পাশাপাশি ও শকুন্তলা কেউ দেখতে পায়। একত্রিত হওয়ার পর রাজা শকুন্তলা এবং ভরত সকলেই রাজকীয় শহরে ফিরে আসে।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের পরিবেশ ভাবনা:

মহাকবি কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যে তার অবদান রয়েছে অবিস্মরণীয়। কালিদাস কে আমরা একটি সুবর্ণ যুগকে প্রতিপন্ন করতে পারি। কালিদাসের রচনা গুলির মধ্যে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'নাটকটি দর্শকের এবং পাঠকদের এক বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। আরও যে তার রচনাশৈলী গুলি আছে সেগুলি পাঠকদের মুগ্ধ করে। তার এই অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে যে পরিবেশ ও প্রকৃতি যে ভাবনা কাব্য নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে তা দেখা যায়। শুধুমাত্র কাব্যিক সৌন্দর্য নয়, তার যে নাটকসমূহে পরিবেশের ভাবনা দর্শক ও পাঠকদের প্রতি মুগ্ধ করে।যেমন নাটকের বিভিন্ন স্থানে প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, বন ও আশ্রমের প্রতি আবেগ এবং পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। নাটকটিতে পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে জীবনযাপন এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ধারণা গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অভিজ্ঞান শকুন্তলমে প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। নাটকের চরিত্রগুলি বিশেষ করে রাজা দুষ্মন্ত আশ্রমের বাসিন্দারা প্রকৃতিকে সম্মান করে তারা প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সচেতন। নাটকে বন ও আশ্রমের প্রতি আবেগও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বনো আশ্রমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নিরবতা নাটকের চরিত্রের মধ্যে শান্তি ও আনন্দ তৈরি করে। শকুন্তলার আশ্রমের পরিবেশে বেড়ে ওঠা তার প্রকৃতি প্রেমের একটি প্রমাণ। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক দেখা যায়। এই সম্পর্কটি কেবল মানুষের জীবনে প্রকৃতির গুরুত্বই প্রকাশ করে না, বরং প্রকৃতিকে সম্মান করার প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরে।

পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রাচীন ভারতবর্ষে পরিবেশ সংরক্ষণের যে চিন্তন তা সংস্কৃত সাহিত্যেও ছিল তা কালিদাসের দৃশ্য কাব্য গুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। পরিবেশ রক্ষা করা মানব জীবনের জন্য খুবই প্রয়োজন। কালিদাস তার 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকটিতে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি বিশেষ স্থান অধিকার করে রেখেছেন। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের প্রথম অংকে প্রথমেই নান্দী শ্লোকে অষ্টমূর্তিধর শিবের উল্লেখ রয়েছে। সেগুলি হল ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য ও যজমান। এগুলি পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিবেশের প্রতি কবি কালিদাসের যে আবেগ তা এই নাটকে উদ্ভিদ জগতের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কন্বমুনির আশ্রমে গাছপালা দেখাশোনার ভার শকুন্তলা ও তার দুই প্রিয় সখি অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার। যেই মহর্ষি কন্ব স্বভাবসুন্দর এই অপরূপ সৌন্দর্যময়ীকে তপস শেয়ার যোগ্য করার বাসনা পোষণ করেন তিনি নিশ্চিত রূপে নীল পদ্মের পাপড়ির ধার দিয়ে শমীবৃক্ষের শাখা ছেদন করতে চাইছেন-

> "দং কিলাব্যাজমনোহরং বপুস্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
> ধ্রুবং স নিলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি"[২]

প্রথম অংকের শকুন্তলাকে দেখে রাজা দুষ্যন্ত মনে করেছে যেন সেই প্রকৃতি কন্যা। সে যেন পদ্মফুল শৈবাল দ্বারা ঘেরা থাকলেও রমনীয় মনে হয়, চন্দ্রের কলঙ্ক মলিন হলেও তা চন্দ্রের সৌন্দর্য বাড়ায়। এই তন্বী শকুন্তলা বল্কলবসন পড়ে থাকলেও বেশি সুন্দর মনে হয়-

[২] অভিজ্ঞান শকুন্তলম্

“সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম।”[৩]

চতুর্থ অংকে শকুন্তলার পতিগৃহে যাওয়ার পথে সরোবর গুলি প্রস্ফুটিত পদ্মে এবং সবুজ মৃণালে সুন্দর হোক; ছায়া দেই এমন বৃক্ষগুলি সূর্যর তাপ দূর করুক; পথের ধূলি হক পদ্মের পরাগরেনুর মত কোমল; বাতাস হোক শান্ত আর সুখদায়ক; পথ হোক নিরুপদ্রব বা নিরাপদ এগুলি করেছেন মহর্ষি কন্ব-

“রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভিশ্ছায়া-
দ্রুমৈর্নিয়মিতার্কময়ূখতাপঃ।
ভূয়া কুশেশয়রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ”[৪]

এ অংকে, ঘুম থেকে উঠে শিষ্যের প্রবেশের সময় সে দেখে একদিকে চন্দ্র অস্ত্র যাচ্ছে, আরেকদিকে অরুনকে সারথি করে সূর্য উঠে আসছে। দুই তেজময় চন্দ্র ও সূর্য একই সঙ্গে বিলয় এবং অভ্যুদয় বা উদয় দেখে আমার মনে হচ্ছে যে সংসারের লোকেরা নিজের নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের শিক্ষা নিয়ে থাকে-

“যাত্যেকতোঅস্তশিখরং পতিরোষধীনা-
মাবিষ্কৃতোহরুণপুরঃসর একতোঅর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ
লোকো নিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু।”[৫]

এই অঙ্কে কোন গাছ মঙ্গলকাজে ব্যবহারের জন্য চাঁদের মত হয়ে বিশেষ ধরনের বস্ত্র দান করল। অন্য এক গাছ থেকে পা রাঙানোর আলতা নিঃসৃত হল। অন্যান্য গাছ থেকে বনদেবতারা নতুন পল্লব বের হবার মতো মণি বন্ধ পর্যন্ত হাত বের করে অলংকারগুলি দিলেন-

(কালিদাসের অনুভবের সঙ্গে বলতে পারি যে-4/5)
ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডু তরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতং
নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপভোগসুলভো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্বভাগোত্থিতৈ-
র্দত্তান্যাভরণানি তৎকিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ।।

পঞ্চম অঙ্কে বৈতালিক রাজার কাজকে দেখে তুলনা করেছে নিজের সুখ ভোগে নিঃস্পৃহ থেকে প্রতিদিনই প্রজা সাধারণের জন্য আপনি কষ্ট স্বীকার করেছেন। অথবা আপনাদের কাজের ধারায় এরকম। গাছ নিজের মাথায় সূর্যের প্রচণ্ড তাপ সহ্য করে কিন্তু তার ছায়ায় যারা আশ্রয় নেয় তাদের তাপ দূরবীভূত করে থাকে-

স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ
প্রতিদিনমথবা তে বৃত্তিরেবংবিধৈব।
অনুভবতি হি মূর্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম”[৬]

কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’ নাটকে পরিবেশের প্রতি যে ভাবনা দেখা যায়, যেখানে আশ্রমের পরিবেশ শান্ত স্নিগ্ধ যা পরিবেশের অনাবিল মাধুর্যে পরিপূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, বন ও আশ্রমের প্রতি আবেগ এবং পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক নাটকটিকে একটি বিশেষত্ব দিয়েছে। নাটকটি পরিবেশের প্রতি

[৩] অভিজ্ঞান শকুন্তলম্
[৪] অভিজ্ঞান শকুন্তলম্
[৫] অভিজ্ঞান শকুন্তলম্
[৬] অভিজ্ঞান শকুন্তলম্

শ্রদ্ধাশীলতা প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে জীবনযাপন এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ধারণার প্রতি জোর দেয় যা আধুনিক যুগেও প্রাসঙ্গিক।এইভাবেই মহাকবি কালিদাস প্রাকৃতিক পরিবেশের যে ভাবনা তা সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই কালিদাস মানবজিতের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সুদক্ষ প্রকৃত অর্থেই প্রকৃতির কবি।

কালিদাসের পরিবেশ সচেতনতা ও আজকের সমাজ:

কালিদা ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমী এবং পরিবেশ সচেতনতর কবি। তার রচনাগুলি পরিবেশের বিভিন্ন দিক যেমন গাছপালা, পশুপাখি, নদী, মেঘ, পর্বত ইত্যাদি সুন্দর ভাবে বর্ণনা হয়েছে। প্রকৃতির প্রতি গভীর অন্তর্দৃষ্টি মানুষের হৃদয়ের সাথে মিলেমিশে এক অসাধারণ রূপ তৈরি করেছে। পরিবেশের প্রতি মানুষের দায়িত্ব নাটকে দেখা যায়। আশ্রমে প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন করে। তারা প্রকৃতির প্রতি সম্মান দেখায় এবং পরিবেশ রক্ষা তাদের স্বার্থকে অধীন করে, রাজা দুষ্মন্ত ও প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং পরিবেশের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করে। পরিবেশের প্রতি সচেতনতা নাটকে পরিবেশের প্রতি সচেতনতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। পরিবেশে ভারসাম্য রক্ষার জন্য সচেতনতা প্রয়োজন এই ধারণা কালিদাস স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

কালিদাসের পরিবেশ সচেতনতা দেখা যায় ‘অভিজ্ঞান সুকান্তলম্’ নাটকে। এই নাটকে প্রথম অংকে পশুপাখি ও মানুষের মধ্যে গভীর বন্ধন আছে ।নাটকের শুরুতে বৈখানস মুনি রাজা দুষ্যন্তকে হরিণ হত্যা করতে নিষেধ করে বলেছেন-এই আশ্রমের হরিণকে হত্যা করবেন না। হরিণের এই কোমল দেহ আপনার এই বান তুলোয় আগুন লাগানোর মত। কোথায় এই মৃগশিশুর কোমল প্রাণ, আর কোথায় বা আপনার সুতীক্ষ্ণ বজ্রের মত দারুন বাণ-

> ন খলু না খলু বানঃ সন্নিপাত্যোঅয়মস্মিন্
> মৃদুনি মৃগশরীরে তূলরাশাবিবাগ্নিঃ।
> ক্ব বত হরিণকাণাং জীবিতং চাতিলোলং
> ক্ব চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শাস্ত্রে।”[৭]

এই অঙ্কে এক হাতি রথ দেখে ভয় পেয়ে আমাদের তপস্যার মূর্তিমান বিঘ্নের মত এই আশ্রমে প্রবেশ করছে। প্রচন্ড আঘাতে সে হাতে গাছপালা সব ভাঙছে; জোড় আঘাত করায় কোন এক গাছের ডালে তার একটা দাঁত গেঁথে রয়েছে; পায়ে জড়িয়ে আছে টেনে আনা অনেক লতা-মনে হচ্ছে তাকে যেন দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে আর আশ্রমের হরিণগুলি তাকে দেখে চারিদিকে ছুটে পালাচ্ছে-

> (কালিদাসের প্রথম অংকের অনুভূতি হল-1/30)
> তীব্রাঘাতপ্রতিহততরুঃ স্কন্ধলগ্নৈকদন্তঃ
> পাদাকৃষ্টব্রততিবলয়াসঙ্গসঞ্জাতপাশঃ।
> মূর্তো বিঘ্নস্ত পস ইব নো ভিন্নসারঙ্গযূথো
> ধর্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ।।

চতুর্থ অংকে পরিবেশের সঙ্গে এ নাটকে এক নিবিড় সম্পর্ক দেখা যায়। হে সন্নিহিত আশ্রমবৃক্ষগন তোমরা জলপান না করা পর্যন্ত যে আগে জলপান করত না, যে অলঙ্কার প্রিয় স্নেহবশতঃ তোমাদের পাতা ছিড়তো না, তোমাদের প্রথম ফুল ফোটার সময় হলে যে উৎসব বলে মনে হতো-সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাচ্ছে, তোমরা সবাই অনুমতি দাও-

> পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলংযুষ্মাস্বপীতেষু যা
> নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
> আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
> সেয়াং যাতি শকুন্তলা প্রতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম”[৮]

---

[৭] অভিজ্ঞান শকুন্তলম্

[৮] অভিজ্ঞান শকুন্তলম্

পঞ্চম অংকে ব্রতচারী তাপসীদের কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে এটা হতে পারে কি? নাকি কেউ তপোবনের জীবজন্তুর উপর অন্যায় আচরণ করেছে? আমার কোন অন্যায় আচরণে তপবনের লতায় ফুল-ফল হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে-এমন হতে পারে কি? এইরকম নানা চিন্তায় আমার মন পাগল হয়ে উঠেছে-

কিং তাবদ্ব্রতিনামুপোঢ়তপসাং বিঘ্নৈস্তপো দূষিতং
ধর্মারণ্যচরেষু কেনচিদুত প্রাণিষ্বসচ্চেষ্টিতম্।
আহোস্বিৎ প্রসবো মমাপচরিতৈর্বিষ্টম্ভিতো বীরুধা-
মিত্যারূঢ়বহুপ্রতর্কমপরিচ্ছেদাকুলং মে মনঃ”[৯]

কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকটি কেবলমাত্র একটি সাহিত্যিক সৃষ্টি নয়, এটি পরিবেশের সচেতনতার একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। কেবল শকুন্তলা নাটকই নয় কালিদাসের সমগ্র সৃষ্টি সিংহভাগ জুড়ে আছে পরিবেশের সচেতনতা। তার কাছে প্রকৃতিকে জীবন্ত সত্তা হিসাবে দেখানো হয়েছে, যা তার পরিবেশ সচেতনতার প্রমাণ। এবং কালিদাস স্যার এই নাটকে পরিবেশ রক্ষার বার্তা স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। তিনি প্রকৃতিপ্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং সেই বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আমাদের আজকের সমাজে পরিবেশের প্রতি মানুষের সচেতনতা বাড়ছে। কারণ মানুষ তাদের পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে যার ফলে জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যপ্রাণীর বিলুপ্তি এবং বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি হচ্ছে। আজকের সমাজে পরিবেশের ক্ষতির কারণ শিল্প, পরিবহন, ইসি এবং ব্যক্তিগত কার্যকলাপের কারণে বায়ু, জল ও মাটি দূষিত হচ্ছে। আবার এই কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বন্যা, খরা ও ঝড় হচ্ছে, যা বন্যপ্রাণীর বাসস্থান এবং জীব বৈচিত্র্য কে প্রভাবিত করছে। এই কারণে কালিদাসের নাটকের পরিবেশ সচেতনতা আজকের সমাজে পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে এবং আজকের সমাজেও অনেক মানুষ পরিবেশ নিয়ে সচেতন এবং পরিবেশ বান্ধব জীবনযাত্রা গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। আবার অন্যদিকে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন সংগঠন এবং মানুষ কাজ করছেন। যারা পরিবেশ রক্ষার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন।

উপসংহার:

কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে পরিবেশের প্রতি গভীর সচেতনতা এবং ভালোবাসার একটি সুন্দর চিত্র রয়েছে। এই নাটকে প্রাকৃতিক জগত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরো গল্পটি প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে ঘটে। যা আজকের সমাজে এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কালিদাস, যিনি প্রাকৃতিক জগতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নাটকের মূল চরিত্রে শকুন্তলা এবং রাজা দুষ্মন্তে প্রেম এবং তাদের জীবনের ঘটনাগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির মধ্যে ঘোরে। এই নাটকটি আমাদের মনে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার জন্ম দেয়। যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর পৃথিবী তৈরি করতে সাহায্য করে। পরিশেষে বলা যায় যে পরিবেশ জীবন ভাবনার বদলা আনতে পারে। তাই পরিবেশের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি জীবনকে সত্য এবং সুন্দর করবে আর সেই সত্য এবং সুন্দরের পথ ধরে জীবন কিভাবে এগিয়ে যেতে পারে তার রূপরেখা অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ (সম্পাদক), অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৩
২. দত্ত, ভবতোষ, রবীন্দ্রচিন্তাচর্চা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮
৩. দাস, করুণাসিন্ধু, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনা প্রসঙ্গে, সারস্বত কুঞ্জ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৬
৪. দাসগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ, সৌন্দর্যতত্ত্ব, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৭, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪০৪
৫. দাশগুপ্ত, শিবপ্রসাদ (সম্পাদক),ভারতীয় ষড় দর্শনশাস্ত্র, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রকাশকাল, ২০০১
৬. দিব্যবন্ধু, উপলব্ধিতে বেদ ও উপনিষদ্, সিদ্ধাশ্রম গবেষণা কেন্দ্র, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ, ১৮২০

[৯] অভিজ্ঞান শকুন্তলম্

৭. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, উপনিষদের পঠভূমিকায় রবীন্দ্রমানস, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯২
৮. দে, সুশীল কুমার, শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ (সম্পাদক), ভারতকোষ (প্রথম খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, কলিকাতা, প্রকাশকাল, অপ্রাপ্ত
৯. দেবী, মৈত্রেয়ী, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৭৯
১০. ধর, নিরঞ্জন, বিবেকানন্দ অন্য চোখে, উৎস মানুষ সংকলন, প্রথম প্রকাশ - ১৯৮৭, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১১
১১. নন্দী, সুধীরকুমার, নন্দনতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৯, চতুর্থ প্রকাশ, ২০১৩
১২. নিয়োগী, গৌতম, রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ধর্ম, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৪২০
১৩. পাল, প্রশান্ত, রবিজীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১
১৪. প্রামাণিক, সুবোধচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা, শতাব্দী গ্রন্থনভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৮
১৫. পোদ্দার, অরবিন্দ, ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক, পরিবেশক ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৫
১৬. বসু, প্রমথনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ (প্রথম ভাগ) উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৯২
১৭. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (চতুর্থ খণ্ড), মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, প্রকাশকাল, অপ্রাপ্ত
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, উপনিষদ্ ও রবীন্দ্রনাথ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ১৯৮০ চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১২
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত, হে ভারত ভুলিও না (স্বামীজির বাণী ও চিকাগো বক্তৃতা), বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১, তৃতীয় প্রকাশ, ২০১২
২০. বন্দোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, উপনিষদের দর্শন, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৩
২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, উপনিষদের বাণী, গীতা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮১
২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি, বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩

Guidelines for Submission to Atmadeep:
The Atmadeep is dedicated to publishing original works, including research papers, book reviews, article reviews, and abstracts of theses. Submission to this journal implies that the work has not been previously published elsewhere and is not under consideration for publication elsewhere.

Comprehensive Submission Guidance:
- Authors, researchers, and writers interested in submitting their papers are encouraged to do so online.
- Submissions should be in Bengali and formatted in Avro Keyboard, using Bensen and font size 14.
- The journal accepts submissions exclusively in the Bengali language.

Details to include:
- Title: Should be concise and informative.
- Authors' Names: Include names followed by designation, postal address (including email ID and phone number).
- Abstract: Abstracts should be in English and should not exceed 250 words.
- Bibliography: আচার্য, দেবেশ কুমার, ব্যবহারিক বাংলা ও সাহিত্য গবেষণার পদ্ধতি বিজ্ঞান, ইউনাটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ২০১৯-২০।
- Email: editor@atmadeep.in

Plagiarism:
Authors are urged to avoid plagiarism. Any detected instances of plagiarism will be the sole responsibility of the authors.

Review Process
- All the manuscript will be preliminary examined by the Editor-in-Chief and then forwarded to the Reviewers & other Editors of the Journal.
- The papers shall only be published after recommendation of the Reviewers & Associate Editors.
- Information regarding the selection or rejection of articles/papers will be only through Email.
- The journal shall publish the article/papers only after completion of the formalities mentioned in selection letter.
- The journal will also not take the responsibility of returning the rejected articles.

At every stage preceding publication, the editors of the journal shall have the right to make corrections (if needed) in articles/papers to suit the requirement of the journal.

N.B.: Papers will be accepted only when accompanied with abstract (to be written in English only). Submission of papers without abstract (in English) or mere submission of an abstract without the paper would lead to non-acceptance of the same.

Publication Ethics
Publication ethics are the principles and guidelines that govern the conduct of authors, reviewers, editors, and publishers in scholarly publishing. Ensuring ethical practices is crucial for maintaining the integrity and credibility of academic research. Here are some key aspects of publication ethics of our journal:

- **Authorship:** All authors should have made significant contributions to the research and agree to be listed as authors. Misrepresentation of authorship, such as ghost authorship or gift authorship, should be avoided.
- **Originality and Plagiarism:** Authors should ensure that their work is original and properly cited. Plagiarism, including self-plagiarism, is unethical and undermines the integrity of scholarly publishing.
- **Data Integrity:** Authors are responsible for the accuracy and integrity of their research data. Fabrication, falsification, and manipulation of data are serious ethical violations.
- **Conflict of Interest:** Authors should disclose any potential conflicts of interest that could influence their research or its interpretation. These may include financial interests, affiliations, or personal relationships that could bias the work.
- **Peer Review:** Peer review plays a critical role in ensuring the quality and validity of published research. Reviewers should conduct their evaluations objectively and provide constructive feedback.
- **Editorial Independence:** Editors should make decisions based on the merits of the research and without influence from commercial interests, personal biases, or other undue pressures.
- **Publication Ethics Policies:** Journals should have clear and accessible policies on publication ethics, including instructions for authors, ethical guidelines for reviewers and editors, and procedures for handling ethical issues or misconduct.
- **Responsibility of Publishers:** Publishers have a responsibility to support and enforce ethical standards in scholarly publishing. This includes providing resources for editors and reviewers, promoting transparency, and addressing allegations of misconduct.

Publication Charge

The authors should note that there is no submission fee; however, there is a reasonable publication fee for each accepted article to meet the cost of manuscript handling, typesetting, office cum admin expenses, web-hosting charges, up-loading charges, internet expenses, website update and maintenance, electronic archiving and other recurring expenses. The publication fee is obligatory for publication.

- **Indian Authors:** The publication fee for single author per accepted paper is Rs. 1000.00 and Rs. 1200.00 for multiple authors.
- **Foreign Authors:** The publication fee of the accepted paper is $25 for single authored paper and $30 for multiple authored papers
- **Print copy:** Print Copy of the issue can be supplied on payment of Rs. 600.00 per copy. Annual subscription for the print copy is Rs. 3000.00 per Volume (inclusive of postal charges within India) Single print copy can be supplied outside India on payment of 25$ (inclusive international shipping charge) per copy.